( সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচন )

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত।

তৃতীয় বর্ষ—১৩২২



জগৎ আর্ট-প্রেস,
২৬নং বেচারামের দেউড়ী হইতে-
প্রিণ্টার—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক
৮নং পাটুয়াটুলী হইতে প্রকাশিত।

—•০•—

সন ১৩২২ সাল।

বার্ষিক মূল্য মায় ডাকমাশুল দুই টাকা ছয় আনা মাত্র।

# বর্ষ-সূচী।

বাড়ীর পথে

Artist—H. D. Roy

# বিক্রমপুর।

| তৃতীয় বর্ষ। | বৈশাখ; ১৩২২। | প্রথম সংখ্যা। |
|---|---|---|

## বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ

বিক্রমপুরের কথা—নানা সুখ দুঃখও ঘাত প্রতি ঘাতের ভিতর দিয়া 'বিক্রমপুর' তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। মানুষের আশা অনেক সময়েই সফল হয় না, আমরা যে আশা বুকে লইয়া 'বিক্রমপুর' সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছিলাম, দুঃখের বিষয় তাহা আমাদের পূর্ণ হয় নাই। 'তাই আশা ভঙ্গ দুঃখ মরণ সমান' মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। অর্থাভাব, দারুণ দৈব দুর্বিপাক, ব্যাধির আক্রমণ এ সকল বিগত বর্ষে আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্যের প্রধানতম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেজন্যই মনের মত সাজ-সজ্জায় এবং নিয়মিত সময়ে 'বিক্রমপুর' প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। এবৎসর আমার কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু 'বিক্রমপুরের' সম্পাদন বিষয়ে সাহায্যের জন্য অগ্রসর হওয়ায় আবার নবোৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। যে সকল লেখক ও লেখিকা বিগত বর্ষে আমাদিগকে প্রবন্ধ ইত্যাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, ভরসা করি তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষেও আমাদিগকে পূর্ব্ববৎ সাহায্য করিবেন। গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গ আমাদের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহাদের নিকট আমরা গুরুতর অপরাধে অপরাধী। এবৎসর হইতে আমরা সর্ব্বপ্রকারে গ্রাহকবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য প্রয়াস পাইব এবং কাগজ নিয়মিত প্রকাশ হইবে।

পল্লী কথা—পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য-সুখ দিন দিনই অন্তর্হিত হইতেছে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা এবং দরিদ্রতাই উহার প্রধান কারণ। গ্রাম্য-স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে রাস্তাঘাট, বন-জঙ্গল এবং পুষ্করিণী এ তিনটীর

সংস্কারের প্রয়োজন। রাস্তা ঘাট সংস্কার করিতে যাইয়া বহু স্থলেই ফৌজদারী মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়। জঙ্গল কাটা সেও এক ভীষণ ব্যাপার। সারাবাড়ী জঙ্গলে অন্ধকার হইয়া থাকুক, রৌদ্র ও বাতাস খেলিবার কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকুক, তবু গাছের মায়ায় কেহ গাছ কাটেন না। এজন্য অনেক সময় সংস্কারেচ্ছু ব্যক্তিবর্গ পল্লীগ্রামের সংস্কার-কার্য্যে অগ্রসর হইতে চাহেন না।

তারপর পুষ্করিণীর কথা। প্রতি গ্রামেই দুই তিনটি করিয়া ভাল পুষ্করিণী থাকে,—থাকিলে কি হইবে, সে সকলের জল নির্ম্মল রাখিবার জন্য কেহ বড় একটা মনোযোগ করেন না। সে দিকে একটু বিশেষরূপ লক্ষ্য করিলে কলেরা, রক্তামাশয় প্রভৃতি বহু দুরারোগ্য রোগের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

উপদেশ দেওয়া সহজ —কিন্তু কার্য্য করা বড়ই কঠিন। অর্থাভাবই ইহার প্রধান কারণ। গ্রামের লোকের অবস্থা দিন দিনই—শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহারা কি পরিবার প্রতিপালন করিবে, না পুষ্করিণী-সংস্কারের ব্যবস্থা করিবে? আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে, বাসগৃহ, পানীয়জল, পরিচ্ছদ ইত্যাদির সুব্যবস্থা হয়। কিন্তু আবার দেখা যাইতেছে যে অর্থ থাকিলে ও অনেকে দেশের কথা ভাবেন না, উহার হিতার্থে কোনরূপ চেষ্টা যত্ন করেন না। অনেক সময় দেখা যায়—গ্রামের সাধারণ অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীর দীঘি বা পুষ্করিণীর জল যতটা পরিষ্কার, ধনীর বাড়ীর তদ্রূপ নহে। ধনী মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষের খনিত সরোবরটার সংস্কার হয় না, কেন হয় না? কারণ তিনি দেশে আসেন না, দেশে আসিবার আবশ্যকতা নাই কাজেই বাড়ীর পুষ্করিণীটার সংস্কারেরও প্রয়োজনীয়তা মনে করেননা। দেশে যান না, কাজেই দেশের লোকের প্রতি যে তাঁহাদের একটা কর্ত্তব্য আছে সে কথাও ভুলিয়া যান। বিলাসিতায় কিংবা অন্যান্য তুচ্ছ বিষয়ে তাঁহাদের যে অর্থব্যয় হয়, তাহার দশভাগের একভাগ অর্থব্যয় করিলেও তাঁহারা দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। সৎকার্য্য দ্বারা মানুষের হৃদয় যত সহজে জয় করা যায়, কঠোর শাসনে বা শক্তি-প্রয়োগে তাহা হয় না। দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় যে কত আনন্দ, তাহা যিনি উহা না করিয়াছেন তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন না। বিক্রমপুরের বড় বড় গ্রামে ধনী ও উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সংখ্যা নেহাৎ

ন্যূন নহে, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই দেশে আসেন না, এমন নহে, যখন দেশে আসেন সে সময়ে গ্রামের কথা বড় কেহ ভাবেন না। নিজ নিজ স্বার্থ কিংবা পুত্র কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করিয়াই বাড়ী হইতে চলিয়া যান। যে অল্প সময় থাকেন তখন 'দেশে শরীর টেঁকেনা, লোকজন নাই' দলাদলি মারামারি বড় ঝঞ্ঝাট এ সকল নানা কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু কেহই গ্রাম্য পথ, ঘাট, পুষ্করিণী ইত্যাদির কিরূপে সংস্কার করা যাইতে পারে? ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোক্যালবোর্ড হইতে গ্রামের জন্য কি সাহায্য পাওয়া গিয়াছে? গ্রাম্য রাস্তাগুলি কেন সংস্কার হইতে পারে না, কোন্ রাস্তার সংস্কার সম্বন্ধে কাহার কোন্ আপত্তি, আপত্তির হেতু মীমাংসার কি কি ব্যবস্থা হইতে পারে সে সকল দিকে গ্রামের লোকেরা যদি আগ্রহান্বিত না হ'ন তাহা হইলে কিরূপে গ্রাম্য স্বাস্থ্য ও পথ ঘাটের উন্নতি হইবে?

পুষ্করিণী পানায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, জলে দুর্গন্ধ হইয়াছে, চারিপাড়ে ঝোপ ঝাড়ে অন্ধকার করিয়া আছে, অথচ পুকুরের চারিপাড়ে যাহাদের বাড়ী তাহারা সকলেই সঙ্গতিশালী লোক, পাছে নিজ নিজ স্বার্থ নষ্ট হয়, সে জন্য নিজেরা কেহই পুষ্করিণী পরিষ্কারের জন্য মনোযোগী নহেন। কিন্তু যখন মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর উহার পরিষ্কারের জন্য সরিকগণের প্রতি আদেশ দিলেন অমনি নির্ব্বিবাদে সকল অংশীদারগণ মিলিত হইয়া অর্থব্যয় করিলেন, পুষ্করিণীটি পরিষ্কার হইল! এইরূপ লজ্জা, এইরূপ ধিক্কার পাইয়াও আমাদের মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠে না! মানুষ হইবার আকাঙ্ক্ষা দিন দিনই যেন আমাদের হ্রাস পাইতেছে! এই আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হওয়া যেমন আবশ্যক, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত কার্য্য করাও তেমন প্রয়োজন।

যাহারা ধনী তাঁহাদের যেমন অর্থ দ্বারা দেশের কার্য্য করিবেন, তদ্রূপ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র যাহারা তাহারাও নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য ও প্রীতিদ্বারা সমাজকে সুগঠিত করিবার চেষ্টা করিলে অতি সহজেই গ্রামের অনেক কল্যাণ সাধন করিতে পারেন। ভারতবর্ষ দরিদ্র বটে, কিন্তু মহত্ত্বে ও হৃদয়ে ভারতবাসী দরিদ্র নহে। যাহার অন্ন জোটে না এমন দরিদ্র কৃষকের বাড়ীতেও যদি একজন অতিথি উপস্থিত হয়, সে কখনও নিরাশ হইয়া ফিরে না। বালক বালিকাদের দৈনন্দিন শিক্ষাই অতিথি সেবা ও পরোপকারিতা। পূর্ব্ববঙ্গত এ বিষয়ে

এখনও অগ্রগণ্য। বিক্রমপুরের অধিবাসীরা অতিথিপরায়ণতার জন্য বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিখ্যাত। সে দেশে মুষ্টি ভিক্ষা সংগ্রহ কঠিন কার্য্য নহে, প্রতি গ্রামে মাসে যদি দুইবার করিয়া মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে অর্থ সংগ্রহের যে বিশেষ কষ্ট হয় তাহা নহে। মানুষ যদি হৃদয়ের হেয় প্রবৃত্তিগুলির অধীন না হয়, সৎকার্য্যকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে তাহা হইলে সে জীবনকে কত মধুর করিয়া তুলিতে পারে।

'আমাদের দেশে বহু সংখ্যক লোক এক বেলাও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ছিন্ন মলিন বস্ত্র খণ্ডে কোম প্রকারে লজ্জা রক্ষা করে, এবং গৃহহীন বা প্রায় গৃহহীন অবস্থায় কালযাপন করে।'* একথা কয়টী অতি সত্য। বর্ষাকাল, ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, চালের খড় ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে, এক মেজে জলের মধ্যে হয়ত স্বামী স্ত্রী অনাহারে শিশু পুত্রটীকে বুকে করিয়া অশ্রু জলে ভাসিতেছে। গ্রাম্য লোক কেহ হয়ত সহানুভূতি প্রকাশ করিল, কেহ হয়ত করিল না। দরিদ্রের অবস্থার উন্নতির জন্য সমাজ কি কিছু করিতে পারে না? কি করিতে পারে তাহাই বিবেচ্য। মাড়োয়ারী ও পার্শীদের মধ্যে এ বিষয়ে বেশ দৃষ্টি আছে। দেশ হইতে যদি কোনও নিঃসম্বল মাড়োয়ারী কোনও সহরে আইসে তাহা হইলে প্রত্যেক মাড়োয়ারী তাহাকে নিজ নিজ দোকান হইতে এক এক যোড়া কাপড় দিয়া ব্যবসা করিবার জন্য সহায়তা করে; ঐরূপ সাহায্য পাইয়া সে অল্প সময়ের মধ্যেই অতি সহজে ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করে। পার্সী সমাজের মধ্যেও এইরূপ রীতি আছে; তাহারা সমাজের কেহ দরিদ্র হইলে একটী টাকা ও একখানা ইট পাঠাইয়া দেয়। অতি বড় যে ধনী সেও ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করে না। আমাদের গ্রাম্য সমাজে এইরূপ রীতি সহজেই অনুসৃত হইতে পারে; ইহা দ্বারা অতি সহজেই মূলধন সংগৃহীত হয়। গ্রামে ছোট কাজ বা ছোট খাটো ব্যবসাবলম্বন করিতে খুব বেশী অর্থেরও ত প্রয়োজন হয় না।

ভূদেব বাবুর মত 'যেন আমি অনুমাত্রও দেশের কাজে লাগিতে পারি' এ বিশ্বাস যদি প্রত্যেক গ্রাম্য যুবক, বৃদ্ধ ও শিক্ষিত ব্যক্তির থাকে তাহা হইলে দেশের অনেক কাজই অতি সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

---

* প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩২১।

**রায় বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী**—বিপিন বিহারী বিক্রমপুরের একজন উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। বিক্রমপুরস্থ পঞ্চসার গ্রামে ১৮৬৭ খৃঃ আগষ্ট মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে মানুষ কিরূপ ভাবে স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে পারে বিপিনবিহারীর জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দরিদ্রের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া নানাবিধ প্রতিকূলাবস্থার মধ্য দিয়া ইনি বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিপিন বাবু অবশেষে রুড়কী ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যুক্ত প্রদেশে সহস্রাধিক মুদ্রা বেতনে ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত ছিলেন; ১৯১৩ খৃঃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়।

বিক্রমপুরের এইরূপ কত মহাত্মার কীর্ত্তিময় পুণ্য-জীবন-কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত তাহার অবধি নাই। ৺বিপিন বাবুর একটী বিস্তৃত জীবন-কথা কেহ লিখিয়া পাঠাইলে আমরা তাহা আনন্দের সহিত পত্রস্থ করিব।

*          *          *          *

**দেশের কথা**—দেশের কথা প্রচার করা 'বিক্রমপুরের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্তই ধারাবাহিক ক্রমে গ্রাম্য-বিবরণ প্রকাশ করা হইতেছে। প্রত্যেক গ্রামের লোকেরা যদি নিজ নিজ গ্রামের উল্লেখযোগ্য সংবাদ, স্বাস্থ্য, ফসল, রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, স্ত্রীশিক্ষার বিষয়, পুষ্করিণী, ডোবা,—খাল বিলের অবস্থা, মামলা মোকদ্দমার বিবরণ, গ্রাম্য মৃত ও জীবিত খ্যাতনামা পণ্ডিত, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, ব্যবসায়ী-শিল্পী প্রভৃতির কার্য্য-প্রণালী শিল্পের বিবরণ, ধান-চাউল ইত্যাদির দর, বদমায়েস ইত্যাদির উপদ্রব, গ্রাম্য লোকের সাধারণ হিতজনক কার্য্যের কথা ও তৎসঙ্গে প্রবাসী ও দেশবাসী সঙ্গতি সম্পন্ন ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা লিখিয়া পাঠান, তাহা হইলে পল্লীগ্রামের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় বিক্রমপুর বাসী শিক্ষিত ভদ্র মহোদয়গণের এ বিষয় মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। বিক্রমপুরে সাহায্যে বিক্রমপুরের গ্রাম্য দুঃখ দুর্দ্দশা ও অভাব অভিযোগ প্রচারের ব্যবস্থা হইলে সে সকলের প্রতীকারের উপায়ও নানারূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এ বিষয়ে শিক্ষিত গ্রামবাসীরা কখনও উদাসীন হইবেন না। বলা বাহুল্য যে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস ও লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

**প্রবাসী বিক্রমপুর বাসী**—বিক্রমপুরের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই প্রবাসে কর্ম্ম স্থলে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি-বহুল জীবন-কথা অনেক-স্থলে দেশের-লোকেরাই জানেন না। এই অভাবের দূর হওয়া কর্ত্তব্য। এজন্য আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে যাঁহারা প্রবাসে আছেন তাঁহারা যদি সে সকল স্থানের বিক্রমপুরের অধিবাসীবর্গের কীর্ত্তি-কাহিনী সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করেন তবে দেশের বিশেষ উপকার হয়।

* * * *

বিদগাঁও নিবাসী ৺যোগেন্দ্র চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় গত কার্ত্তিক মাসে ৪৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি ব্যবসায়ে একসময় বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, পরে ব্যবসায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষ অবস্থায় বিশেষ অর্থাভাব বোধ করেন। তাঁহারই পিতা ৺ মহিমচন্দ্র দাস ও খুল্লতাং ঈশ্বর চন্দ্র দাস মহাশয় বিক্রমপুরের অনেক রাস্তাঘাট করিয়া এবং বিদ্যালয়ের নানাবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া দেশব অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। যোগেন্দ্র বাবু সরল ও পরোপকারী লোকছিলেন ভগবান তাঁহার আত্মার সদ্গতি করুন।

---

# কেদার নাথ।

কেদারনাথ ভ্রমণের কথা যদি গোড়া হইতে আরম্ভ করি তাহা হইলে সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, তাই পথের মাঝখান হইতেই যাত্রা আরম্ভ হইল, নতুবা কথা যে ফুরাইতে চাহিবে না। গত পূর্ব্ব বৎসর ৩রা আষাঢ় অতি প্রত্যুষে রামভরা চটি হইতে কেদারনাথজীর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম কাল রামভরা চটিতেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলাম। এখন এই রামভরা চটি কোথায় সে কথা বলিতে গেলে, এক মস্ত বড় ভূ-বৃত্তান্ত লইয়া বসিতে হয়। একাহার বলিয়া দিই রামভরা হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত কেদারনাথের পথের একটী ক্ষুদ্র চটি, তাহার অধিক কোন পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অসম্ভব। আজ

আকাশ অনেকটা পরিষ্কার, কয়েক দিন হইতে ক্রমাগত খুব ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল, এ সময়ে এই দুর্গম পথে যাতায়াত বড়ই বিপজ্জনক। একেত পথ অতি ভীষণ, কোন রূপে একজন লোক হাঁটিয়া চলিতে পারে, তারপর যখন 'ঝর ঝর বরযে জলদ ঘন নীর' তখন যে পথের কি অবস্থা হয় তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার নহে, কেহ যদি সে সুখ সম্ভোগ করিতে চান একবার সে পথে যাইতে পারেন। ঝড়ের সময় মেঘ ও বজ্রের প্রলয় নির্ঘোষে যখন বিরাট পর্ব্বত দেহ কম্পিত হইতে থাকে, আর বনরাজি ঘন আন্দোলিত হইতে থাকে এবং সাঁই সাঁই সোঁ সোঁ রবে নৃত্য করিতে করিতে বাতাস দৌড়ায় তখন প্রতি মূহুর্ত্তে মনে হয় বুঝি এইখানেই এই বিজন পর্ব্বত-বক্ষেই জীবনের চির সমাধি হইবে।

আমরা যে পথে চলিয়াছি, উহা ঠিক পাহাড়ের গা ঘেঁসিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উর্দ্ধ দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এক পাশে খুব উঁচু পাহাড়, বড় বড় শিলার স্তূপ। কোন কোন শিলাখণ্ড এইরূপ ভাবে অবস্থিত যে, সামান্য স্পর্শেই উহা আমাদের মস্তকোপরি পতিত হইয়া আমাদের কেদার দর্শন তখনই শেষ করিয়া দিবে বলিয়া ভয় হইতেছিল। সময়ে সময়ে ঐরূপ শিলা পতনে দুর্ঘটনা ও ঘটিয়া থাকে। অপরদিকে অতল স্পর্শ খাদ। পথ বড়ই ভীষণ। যদি ঝাম্পানওয়ালাদের একজনের ও একটু পা পিছ্‌লে যায়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। শত সহস্র ফিট্ নিম্নে নিপতিত হইতে হইবে, হাড় ক'খানার অস্তিত্ব ও তখন থাকিবে কিনা সন্দেহ।

খানিকটা পথ চলিয়া আসিয়া একটা অতি ভয়ানক স্থানে পৌছিলাম। পথের ঠিক্ মাঝ দিয়া একটা সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ বা ফাটল চলিয়া গিয়াছে, উহার উপর এক হাত চওড়া একখানা কাঠ ফেলা, ঐ কাঠ খানার উপর দিয়া আমাদের পার হইতে হইবে। কাঠখানা যে খুব মজবুত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু দূর হইতে উহা দেখিয়া আমার শরীর ভয়ে জড়সড় হইয়াছিল। সত্য কথা বলিতে কি আমি রীতিমত কাঁপিতে ছিলাম আর মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছিলাম। সঙ্গের লোকজনেরা আমার মুখের ভাব দেখিয়াই ভয়ের কথা বেশ বুঝিতে পারিল। এখানে নানা জল্পনা-কল্পনায় খানিক সময় কাটিয়া গেল। কিন্তু কল্পনাত ঐ স্থানে আমার জন্য সুপ্রশস্ত লৌহ সেতু বাঁধিয়া দিতে পারে না, আর এত পুণ্য ও করি নাই যে, স্বর্গ হইতে কোন দূত আসিয়া

আমাকে কোলে করিয়া এই স্থান পার করিয়া দিবে। ঐ কাষ্ঠ খণ্ডের উপর দিয়াই আমাকে এই খাদের অপর পারে যাইতে হইবে। আমি তখন চক্ষু বুঁজিয়া ঝাম্পানের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঝাম্পানওয়ালারা বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া এমন সন্তর্পণে ঐ কাষ্ঠখণ্ডের উপর দিয়া আমাকে লইয়া গেল কখন যে, ঐ খাদ পার হইয়া গেলাম তাহা জানিতেও পারিলাম না। সহসা লোকজনের আনন্দ-ধ্বনিতে চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, খাদ পার হইয়া আসিয়াছি। আর নয়ন সমক্ষে দূরে কেদারনাথজীর মন্দির তুষার-মণ্ডিত অত্যুচ্চ গিরি শৃঙ্গে শোভা পাইতেছে। এত দিনে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-জগৎ উন্মুক্ত হইল। আজ আকাশে মেঘ নাই, গাঢ় নীল গগন গায় সূর্য্যদেব সোণার কিরণ রাশি ঢালিয়া দিতেছেন। সাদা বরফে ঢাকা পাহাড়গুলি তপন কিরণে ঝল মল করিতেছে। সত্য সত্যই উহার সহিত 'কাঞ্চন-কিরণ নহ-সমতুল'। বদরীনাথের পাহাড় হইতেও কেদারনাথের পাহাড়ের উচ্চতা অধিক। প্রায় এগার হাজার ছয় শত ফিট হইবে।

কেদারনাথ হিন্দুর পবিত্র মহাতীর্থ, শৈবের পরম সাধনার স্থান। এখানে খুব বেশী শীত। আষাঢ় মাস, কিন্তু আমাদের দেশের মাঘ মাসের তীব্র কনকনে শীতের অপেক্ষা এখানকার শীত ভয়ানক। গায়ে প্রচুর পরিমাণে কাপড় চোপড় জড়াইয়াও শীতের হস্ত হইতে রক্ষা পাই নাই। পাহাড়ের পথে খানিক দূর যাইতে যাইতে শুনিলাম কে যেন অদূরে গায়িতেছে,—

জয় প্রভু! কেদারনাথ উদয় চরণ তেরা (অতি দরশন তেরা)

কণ্ঠস্বর রমণী কণ্ঠের ন্যায় বোধ হইতেছিল। এই বিজন-পথে সুমধুর সুরের রাগিণী বড়ই মধুর লাগিতেছিল। পথের বাঁকটুকু ফিরিয়া দেখিলাম, একটী ক্ষুদ্র চটীর পাশে গাছের ছায়ায় বসিয়া একটী বাঙ্গালী যুবতী গান গাহিতেছে, আর একজন সন্ন্যাসী যুবক গানের সঙ্গে সঙ্গে ডমরু বাজাইতেছে, আর মাঝে মাঝে স্বীয় রাসভ-নিন্দিত কণ্ঠ মিলাইয়া গানের মাধুর্য্য বিনষ্ট করিতেছে! তাহারা গায়িতেছিল :—

'জয়ী প্রভু! কেদারনাথ উদয় চরণ তেরা (অতি দরশন তেরা)।
রক্ষণা তোমার রক্ষিয়ে প্রভু! রক্ষিলে যুগ চার॥
ব্রহ্মা তোম্, বিষ্ণু তোম্, রাজ্য সৃষ্টিকে আধার।

জল থল মুখ বাস কিয়ে ভয়ে নিরঙ্কার ॥
জাঁগো আগুয়ানী বৈকুণ্ঠ ক্ষেত্রপালা।
মাথে মস্তিক্ প্রভু! রুদ্রায়া হিমালা ॥
পাদুকা চরণ তেরে শক্তি পাতালা।
ডিমি ডিমি তেরা ডমরু বাজে ধ্বজা, ত্রিশূল সাজে!
বড় দয়াল প্রভু! হো! হো! মৃদঙ্গ তাল বাজে!
জয়ী জয়ী পরভু! ভস্ম ডারিয়ে, অভিমানিকা
গরব জারে, হারোয়া কংশ মারে।
লোভ লাভ মায়া মন মোহে, গোবিন্দজি গুণ বিচারে,
কোন নিন্দা লোভে!
ধ্যায়ে বদ্রি বিশাল লালাজি হো! বদ্রি বিশাল।
লীল্লা অপার, কুছ্ দেগকো করলে!
নিত্ নিত্ সুমীরণ ( চিন্তাকরা ) বদ্রি কেদার,
তেরা শেতা কর্লে সকলি সংসার।
আগে হিমাচল অগম অপার!
ময়তো কর্লে গঙ্গাস্নান, ময়কো জানেদে গৌরী গঙ্গাস্নান।
বল কি পাপী শঙ্কর কি পূজা, তোমবিনা আতর নাহি দূজা।
জানে দে গৌরী রাধা গঙ্গাস্নান ॥

যথোপযুক্ত সুরলয় সহকারে গানটি গীত না হইলেও তখন উহা আমার নিকট বড়ই সুন্দর লাগিতেছিল। যাত্রিগণ সকলেই উৎকর্ণ হইয়া ঐ সঙ্গীত—ধারা পান করিতেছিল। আমরাও ঝাম্পান হইতে নামিয়া বিশ্রাম করিবার সঙ্গে সঙ্গে গান শুনিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম এই সুন্দরী বাঙ্গালী যুবতী কেমন করিয়া এই কাঠ খোট্টা হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর সহিত মিশিল। তীর্থের পথে কত কলঙ্ক-কাহিনী শুনিয়াছি—কত কি দেখিয়াছি তাই এ দৃশ্য আমার কাছে বড় একটা নূতন লাগিল না। গান শেষ হইলে সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল 'মশাই—চিন্‌তে পাচ্ছেন কি?' সেই যে কাশীতে দেখা হয়েছিল? কেদার নাথ যাচ্ছেন ত? বেশ, একত্র যাওয়া যাবে ভালই হ'লো, সন্ন্যাসীর কথায় আমার একে একে সব কথা মনে হইল, তাইত

এতক্ষণ এই ঠাকুরকে চিনিতে পারি নাই। আমি হাসিয়া বলিলাম—'স্বামিজী, বিলক্ষণ চিনেছি, কিন্তু যে সাজে সেজেছেন কে বলবে আপনি বাঙ্গালী'। ঠাকুর গর্ব্বিত ভাবে হো! হো! করিয়া হাসিয়া উঠিল। এখানে সন্ন্যাসী ঠাকুরও এ যুবতীর ইতিহাস একটু না বলিয়া পারিলাম না—এই যুবতীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে। যুবতী ব্রাহ্মণ কুলীন কন্যা। শ্বশুর বাড়ী কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে। দেখিতে অতি সুন্দরী। আজানুলম্বিত কেশপাশ—দিব্যি ফুটফুটে—গৌরবর্ণ, গড়ন পিটন গোল গাল, ভাসা ভাসা কাল ডাগর চোখ—বয়স সতের আঠারোর বেশী হইবে না। এক কথায় সে সুন্দরী—সে সৌন্দর্য্যে মাদকতা ও যথেষ্ট আছে। ষোল বছর বয়সের সময় এক অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ হয়, বিবাহের এক বছর পরেই তাহার কপাল পুড়িল, সে বিধবা হইল। পরে সতীনের ছেলে, ছেলের বৌ, ছেলেরা—বিমাতাকে আদর যত্নের ত্রুটি করে নাই, কিন্তু সেখানে তাহার মন টিকিলনা, সতীনের ছেলের বৌরা নাকি তাহাকে গঞ্জনা করিত। তাহারি ফলে সে বাপের বাড়ী চলিয়া যায়—সেখানে এই সন্ন্যাসী—ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ। তখন ইনি সন্ন্যাসী ছিলেন না,—থিয়েটার করিয়া, যাত্রা গাহিয়া ইয়ারকি দিয়া কাটাইতেন। সংসারে জ্যেষ্ঠ দাদা ছিল অভিভাবক, তাহার শাসন মানা দায় হইয়া উঠিল। সহসা একদিন পাড়ার এই বিধবা যুবতীকে লইয়া প্রস্থান। এখন ইনি হইয়াছেন কাশীর এক আশ্রমের কর্ত্তা, আর যুবতী তাহার সেবাদাসীই বলুন— বা শক্তি। আশ্রমের কর্ত্তা হইতেও ইনি যেরূপ চতুরতা খেলিয়াছিলেন তাহাতে ও ইহার বুদ্ধি ও বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যুবতী-টী এহেন সাধু-সংসর্গে থাকিয়া কারণ এবং গঞ্জিকা সেবনে বিশেষ অভ্যস্থা হইয়াছেন। সৌন্দর্য্যেও অনেকটা কালীমা পড়িয়াছে। বাঙ্গালী-সুলভ সাজ সজ্জা আর নাই। পরিধানে লালপেড়ে গৈরিক বস্ত্র, ললাটে মস্তবড় সিন্দুরের ফোঁটা, হাতে ত্রিশূল, সে এক অপূর্ব্ব বেশ। লজ্জা আর তাহার নাই—কতকটা পুরুষোচিত দৃঢ়তা আসিয়া পড়িয়াছে,—এখনও একটু সামান্য সঙ্কোচ আছে—সেটুকুও যে আর বেশী দিন থাকিবে তাহাত মনে হয় না। তাহা হইলে এমন করিয়া সে পথে বাহির হইতে পারিত না। আমাদের সমাজের কঠোর বিধানে কত যে অশান্তি ঘটিতেছে সে কথা কেহই ভাবেন না।

সমাজ-সংস্কারের দিকে ছোট বড় সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত। মানুষ—মানুষ—দেবতা নহে। বাসনা নিবৃত্তির বক্তৃতা দেওয়া সহজ কিন্তু কার্য্যতঃ পারা বড় কঠিন। ঠাকুরদাদার আমলের শাস্ত্রের শাসন বর্ত্তমান যুগে চলে না। যাক্ আসল কথা বলি।

আমরা প্রায় বেলা দশটার সময় কেদারনাথ ধামে পঁহুছিলাম। হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। তাড়াতাড়ি ঝাম্পান হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমবেত যাত্রী মণ্ডলীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিলাম "জয় কেদারনাথজীকি জয়।".

কেদারনাথের মন্দিরটি দক্ষিণ-দ্বারী। সম্মুখে বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত মণ্ডপ গৃহ। সর্ব্বাগ্রে কেদারনাথজীকে দর্শন করিলাম। কেদারনাথ হস্তপদ বিশিষ্ট মূর্ত্তি নহেন—লিঙ্গ মূর্ত্তি। প্রায় পাঁচ ফিট উচ্চ এবং চারি ফিট বেড় হইবে।

মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় বামদিকে চারিটী মূর্ত্তি দেখিলাম। উহার তিনটি শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত, অপরটি কৃষ্ণ প্রস্তরে গঠিত। উহার মধ্যে কেদারের ভোগ মূর্ত্তিও বিরাজিত, এখানে দ্রৌপদী, কুন্তী, গরুড়, নারায়ণ প্রভৃতির মূর্ত্তি ও দেখিলাম। মন্দিরটি প্রাচীন, কিন্তু সম্মুখস্থ মণ্ডপ-গৃহটি আধুনিক। উহা বড় জোর পঞ্চাশ বছরের পুরাতন। এখানে দেবার্চ্চনার শেষ কার্য্য 'গোত্র হত্যা।' 'গোত্রহত্যা' কথাটা একটু বুঝাইয়া বলি। মহাদেবের শীর্ষদেশে ঘৃত বিলেপন করিয়া যাত্রিগণ কেদারনাথ দেবকে যে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, তাহাই 'গোত্রহত্যা' নামে অভিহিত। কথাটার অর্থ কি তাহা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না। আমরা গোত্রহত্যা সুফল প্রভৃতি কার্য্য শেষ করিয়া অন্যান্য দর্শনীয় স্থান দর্শন করিবার জন্য মন্দিরের বাহিরে আসিলাম। গভর্মেণ্টের আদেশে এখানকার রাউল বা রাহুল সাহেবই কেদারনাথজীর ম্যানেজার বা সর্ব্বে সর্ব্বা। তাঁহার কথা পরে বলিব।

মন্দিরের পশ্চাতে ও এদিকে ওদিকে অমৃতকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, সুফলকুণ্ড, হংসকুণ্ড, রেতককুণ্ড, উদককুণ্ড, ইত্যাদি বিরাজমান। অমৃতকুণ্ডটি মন্দিরের নিকট অবস্থিত, খুব ছোট। একটী ছোটপাহাড়িয়া নদী পার হইয়া, হংসকুণ্ডে যাইয়া মৃত পরিজনের অস্থি ও পিণ্ড দান করিতে হয়। নদীটির নাম 'জয়শক্তি'। হংসকুণ্ডের বেড় ছয়হাত হইবে। মন্দিরের নিকটেই রেতককুণ্ড এই কুণ্ডের নিকট দাঁড়াইয়া বম্ বম্ শব্দ করিলে বুদ্বুদ উঠিতে থাকে। ইহার কোনও

বৈজ্ঞানিক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই কুণ্ডের জল পারদ-মিশ্রিত বলিয়া পানকরা নিষেধ, তবে তিনবার গণ্ডূষ জল লইয়া আচমন করার বিধি আছে! উদককুণ্ডের জল পান করিতে হয়। উহার জলে গন্ধকের গন্ধ পাইলাম। ইহার আকার হংসকুণ্ডের ন্যায়। কুণ্ড ইত্যাদি দর্শন করিয়া আমরা মন্দিরের পশ্চাৎভাগে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এদৃশ্যের তুলনা নাই। এই বিশাল গিরিশ্রেণী উন্নত মস্তকে কতদূরে কোথায় যাইয়া মিশিয়াছে, কে বলিবে? স্থানটি অতি বিজন। সে বিজনতায় এমন একটা স্তব্ধভাব বিরাজমান, যেন আপনাকে মায়াপুরীর পাষাণ—প্রাচীরে আবদ্ধ অসহায় এবং বড় নিঃসম্বল বলিয়া মনে হয়। এই বিরাট বিশাল গগণচুম্বী দিগন্ত বিশারী পর্ব্বত শ্রেণী কত বড়, কত বৃহৎ, ইহার নিকট আমরা কত ক্ষুদ্র! দূর পর্ব্বতের মাথার উপরে চিরতুষার-মুকুট-ধারী অত্যুচ্চ শৃঙ্গরাজি। ইহাদের শীর্ষদেশ তুষারাবৃতই থাকে। কখনও এ সমুদায় তুষার একেবারে গলিত হয় না। এখানকার গিরিশ্রেণীর এই মহামহিমময় দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমার মনে হইতেছিল, এদৃশ্য শুধু অন্তরের উপভোগ্য, নহে আহা! বাক্যে বলিবার।'

কেদারনাথ মন্দিরের ঠিক্ উত্তর দিকে একটী খুব বড় পাহাড় দেখা যায়,—ঐ পাহাড়টির নাম স্বর্গারোহণ। উহার গাত্র বাহিয়া একটি নির্ম্মল স্রোত-ধারা নিম্নাভিমুখে নামিয়া আসিয়াছে। এধারার নাম স্বর্গদ্বারী গঙ্গা। গঙ্গার ঠিক্ পাশ দিয়াই একটি ক্ষুদ্র শীলাকীর্ণ বন্ধুর পথ বহিয়া চলিয়াছে, মন্দিরের, পশ্চাৎ হইতে পথের বক্রতা কতক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পথের নাম 'মহাপথ'। পঞ্চপাণ্ডব এই মহাপথেই স্বর্গের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখান হইতেইস্বর্গারোহণের প্রকৃত পথ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া পাণ্ডাঠাকুরেরা বলিলেন। যে পাহাড়ের উপর কেদারনাথদেবের মন্দির অবস্থিত—তাহার নাম কৈলাসপর্ব্বত। 'স্বর্গারোহণ' পাহাড়—কৈলাস পর্ব্বত হইতে অনেক উচ্চ। কেদারনাথের দারুণ শীতেই আমরা অস্থির কাজেই—'স্বর্গারোহণের' ন্যায় দারুণ দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত-পথে অগ্রসর হওয়ার আশা তখনই ত্যাগ করিলাম। স্বর্গে যাওয়ার পথই দেখিলাম! ইহাও কম সৌভাগ্যের কথা নহে। মহাপথের অপর নাম ভৃগুপত্তন। ভৃগুপত্তনের পথে এপর্য্যন্ত কেহ অগ্রসর হইয়া অসম

সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। স্বর্গারোহণ পর্ব্বত ও তাহার দূরবর্ত্তী অপর একটি পর্ব্বত হইতে পাঁচটী নদী বা ঝরণা নামিয়া আসিয়া কেদার মন্দিরের নিম্নভাগে মিলিত হইয়াছে। ঐ পঞ্চধারার নাম পঞ্চগঙ্গা। ঐগুলি সরস্বতী, মন্দাকিনী, ক্ষীরগঙ্গা, মহাদধি, স্বর্গদ্বারী এই পঞ্চনামে বিখ্যাত। সরস্বতীর ধারা অতিক্ষীণ। কেদারনাথের অল্প দক্ষিণ দিকে এই পঞ্চধারার সঙ্গম হইয়াছে। মন্দিরের অনতিদূরে যে স্থানে মন্দাকিনীর সহিত ক্ষীর ধারার সম্মিলন হইয়াছে, উহাকে ব্রহ্মতীর্থ কহে। ব্রহ্মতীর্থের অদূরে মন্দাকিনীর উপর একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত-সেতু বিরাজমান। এই সেতুর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-দর্শন করা বস্তুতঃই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল। পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ পর্ব্বতের নাম ছিল পুরন্দর পর্ব্বত; কথিত আছে পুরন্দর নিজ অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ পর্ব্বতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া কেদারনাথের আরাধনা করিয়াছিলেন; তজ্জন্যই উহার নাম হয় পুরন্দর পর্ব্বত। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবেরা এইপথে স্বর্গারোহণ করিবার পর হইতেই উহা স্বর্গদ্বার বা স্বর্গারোহণ পর্ব্বতনামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কেদারনাথ ধামে একটী বিদ্যালয় আছে। আমরা যখন দেখিয়াছিলাম তখন উহার ছাত্রসংখ্যা মাত্র পনের জন ছিল। 'অমরকোষ,'-বেদপাঠ; শিবস্তুতি ও অঙ্কের মধ্যে মিশ্র চারি নিয়মপর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রেরা সকলেই ব্রাহ্মণ। শিক্ষকের নাম বালকরাম। বয়স একুশ বৎসর। নিবাস গুপ্তকাশী—শোনিতপুর। বেতন মাসিক বার টাকা। পণ্ডাগণ চাঁদা করিয়া শিক্ষকের বেতন দেন। প্রত্যেক ছাত্র মাসিক একটাকা হারে বেতন দেয়। পনের জনের অধিক ছাত্র হইলেও শিক্ষক মহাশয় এই বার টাকার অধিক বেতন পাইবেন না। বিদ্যালয়ের নাম "কেদারনাথ কা পাঠশালা।" প্রাতে নয়টা হইতে বারটা এবং অপরাহ্নে দুইটা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত স্কুল বসিবার নিয়ম। রবিবার, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, অষ্টমী তিথি একয় দিন স্কুলে পাঠবন্ধ থাকে। শিক্ষক মহাশয় পৃথগাসনে বসিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন।

কেদারনাথের মোহান্ত বা সেবায়েত পূজনীয় শ্রীমান্ রাউল বা রাহুল সাহেব উখা (উখা) মঠে থাকেন। এই উখামঠের সহিত বাণকুমারী উষার বহু

স্মৃতি বিরাজিত। উষামঠ কেদারনাথ হইতে তিন দিনের রাস্তা, প্রায় ছয় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। শীতের ছয়মাস উষামঠেই কেদারনাথের পূজা হইয়া থাকে। কারণ ছয়মাস কেদারনাথ দেবের মন্দির বরফে সমাচ্ছন্ন থাকে। ছয়মাস বরফেরনীচে থাকে বলিয়াই প্রথম দৃষ্টিতে এই মন্দিরটি তেমন প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা কেদারনাথ হইতে ফিরিয়া বদ্রিনারায়ণ যাইবার পথে রাউল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। যাত্রিগণ ইঁহাকে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী-দক্ষিণা দিয়া থাকে। আমরা এক পয়সা হইতে একটাকা পর্য্যন্ত দক্ষিণা দিতে দেখিয়াছিলাম,—সেজন্য ইঁহার ব্যবহারের কোনও তারতম্য দেখিলাম না।

কেদারনাথের মাটীর একটা বিশেষত্ব এই যে উহা প্রতিপাদ বিক্ষেপেই থল্ থল্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, মনে হয় বুঝি পা বসিয়া যাইবে, কিন্তু দ্রুত হাঁটিলেও পা বসিয়া যায় না। কেহ কেহ এস্থানে গন্ধকের খনি আছে বলিয়া অনুমান করেন। সে অনুমান একেবারে অলীক বলিয়া মনে হয় না। কারণ এখানকার অনেক কুণ্ডের জলে গন্ধকের গন্ধ স্পষ্ট অনুভূত হয়।

দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া মন্দিরের একধারে বসিয়া খানিক ক্ষণ বিশ্রাম করিলাম। স্থান-মাহাত্ম্যে অনেকটা হয়। এখানে সংসারের কথা মনে হয় না, আত্মীয় স্বজনের কথা মনে ও আসে না। এতউচ্চে মধুর সৌন্দর্য্য মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়। সংসারের হিংসা দ্বেষ—ক্ষুদ্র দেনা পাওনার গোলযোগ—সে যেন কত নীচ কত হেয় বলিয়া মনে হয়, মনে হয় তাহারা বুঝি এত উচ্চে এই দেবস্থানে পৌছিতে পারে না।

কেদারনাথের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার সম্মুখস্থ তোরণ-দ্বারে একটী বৃহৎ ঘণ্টা দোদুল্যমান। এই ঘণ্টাটি নেপাল-রাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার সময় যাত্রিগণ একে একে প্রায় সকলেই ঘণ্টাধ্বনি করিয়া থাকে। তোরণের দুই ধারে নানাবিধ শ্রীমূর্ত্তি। দক্ষিণ দিকে 'নন্দী' ( বৃষ ) মূর্ত্তি, গরুড়, পঞ্চপাণ্ডব, পরশুরাম, প্রভৃতি মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের ভিতর দিকের অংশে ও কয়েকটি মূর্ত্তি, সেগুলি পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি বলিয়া পাণ্ডাঠাকুর ব্যাখ্যা করিলেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল মূর্ত্তির সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের

মূর্ত্তির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা ঠাহর করিতে পারিলাম না। সমুদয় মূর্ত্তি বৌদ্ধ মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হইল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নহি, কাজেই আমাদের এই সিদ্ধান্ত অলীক হওয়াও অসম্ভব নহে।

তোরণ দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে একটী ছোট বারান্দা, বারান্দার পরেই সুবৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত মণ্ডপ-গৃহ। মণ্ডপের সম্মুখে কেদারনাথদেবের মন্দির। উহার উর্দ্ধভাগ তাম্র-মণ্ডিত। মন্দির, তোরণ ইত্যাদি সমুদায়ই প্রস্তর-নির্ম্মিত, —তেমন কারু-মণ্ডিত নহে। মন্দিরটী অতি প্রাচীন; তাহা একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি করা যায়। মন্দিরের এক পাশে বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড সমূহ পড়িয়া আছে। মন্দিরের উচ্চতা ১২৫ ফিট বলিয়াই মনে হইল, খুব বেশী হইলেও ১৫০ ফিটের অধিক হইবে না ইহা ঠিক। কেদারনাথের মন্দিরের উপরিভাগ হইতে স্ফটিক-স্বচ্ছ শীতল-সলিল-ধারা দিবা রাত্রি ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতেছে। এসম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মন্দিরের ঠিক্ মধ্য ভাগে দেবাদিদেব অবস্থিত।

এইবার পূজার কথা বলিব। প্রথমে কেদারনাথজীর শীর্ষদেশে গঙ্গাজল 'চড়াইতে' হয়। তারপর পুষ্প-চন্দন অর্পণ, ধূপ-দীপ প্রদান। এইরূপ **'ব'** আকারের মণ্ডল চন্দন দ্বারা অঙ্কিত করিয়া মহাদেবের পূজা-অর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রণামি দিতে হয়, সন্দেশ ভোগ দেওয়াই প্রচলিত পদ্ধতি। পাণ্ডাঠাকুর ঐ **'ব'** মণ্ডলে নিজ হস্তদ্বারা যাত্রীর হস্তধারণ করিয়া ঐ মণ্ডল লেপন করিয়া কহিতে থাকেন—"কেদারনাথ তোমারা ( যাত্রীর নামোল্লেখ করিয়া ) মাতাকে, পিতাকে গুরুকে, বন্ধুকে, যাত্রা সুফল হয়। পাঁচ কি পঁচিশ, শোভন কি জড়ি মতিকে ফল ঔর স্বর্গলোক লাভ হয়।" তার পর দক্ষিণার কথা, যাহার যেমন শক্তি তিনি তাহাই দিয়া বলিয়া কহিয়া রেহাই পান। পূজোপযোগী কতকগুলি উপকরণের মূল্যও যাত্রীদিগকে দিতে হয়। পাণ্ডাঠাকুর এইস্থানে যাত্রীর নামে দেবতার অর্চ্চনা করেন, বেদপাঠ করেন ও হোম করিয়া থাকেন।

নানাস্থান ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় শেষ হইয়া গেল। সন্ধ্যাকালে অবসন্ন দেহে চটীতে ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিয়াছিলাম বাসায় যাইয়াই আহার্য্য প্রস্তুত দেখিব, কিন্তু কার্য্যে তাহার কিছুই হয় নাই। শুনিলাম বেলা দুইটার সময় ডাল তুলিয়া দিয়া বেলা ছয়টায় নামান হইয়াছে, তথাপি ডাল

অর্দ্ধসিদ্ধ অবস্থাতেই রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ বেচারা আর কি করিবে! পাণ্ডাঠাকুর বলিলেন শীতাধিক্যই ইহার কারণ।

পরদিন অতি প্রত্যূষে কেদারনাথ ত্যাগ করিলাম। আমাদিগকে পুনরায় গুপ্তকাশী হইয়া বদরিকাশ্রম যাইতে হইবে। কাজেই এখন ক্রমাগত তিন দিন 'উতরাই'।* কেদারনাথ সম্বন্ধে বিস্তারিত পৌরাণিক আখ্যান আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক "স্কন্দপুরাণের 'কেদার খণ্ড' পাঠ করিলে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। আমরা যখন কেদারনাথ হইতে রামবান চটির দিকে অগ্রসর হইলাম, তখন খুব সূর্য্যোদয় হয় নাই। শুধু পূর্ব্বদিকে উষা-সুন্দরীর অলক্ত-রাগ-লাঞ্ছিত চরণদ্বয়ের ক্ষীণাভা তুষার-মণ্ডিত-গিরিশ্রেণীর পশ্চাৎ ভাগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চরণ-মঞ্জীরের রুণু রুণু ধ্বনির অনুকরণ করিয়া মন্দাকিনী-ধারা মৃদু-কলনাদে বহিয়া চলিয়াছে। কেদারনাথের মন্দিরদ্বার তখনও উন্মুক্ত হয় নাই। আমরা করযোড়ে চিরজীবনের জন্য দেবাদিদেবকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটু অগ্রসর হইতেই আমাদের সহযাত্রী ডাক্তার বাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন "জয় কেদারনাথজী কি জয়।" পর্ব্বত বক্ষ হইতে কে যেন গুরু গম্ভীর নাদে 'জয় কেদারনাথজী কি' জয়' রবে আমাদিগকে বিদায় অভিনন্দন দান করিল।

---

# হৃদয়-বাণী।

—:**:—

(১)

২২ শে জুন ১৯১৩।

এই জীবনটা কি, ও এই জীবনকে লইয়া কি করিতে হইবে—এই দুইটী প্রশ্নই মানব-মনকে চিরকাল আলোড়িত বিলোড়িত করিতেছে।

ভারতবাসী, প্রথম প্রশ্নের সমাধান লইয়া চিরকাল ব্যস্ত। সমাধান নিতান্ত কঠিন। সে চায় জীবন জিনিষটা কি, বুঝিয়া শেষে কাজ করিতে। প্রশ্নেরও উত্তর হয় না—কাজ ও হয় না। ভাবিতে ভাবিতেই ক্ষুদ্র জীবন অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ইংরাজ এই সকল জটিল প্রশ্নের বড় ধার ধারেনা। জীবনটাকে,—এজগৎ-টাকে তাহারা নিতান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। ইহার উন্নতি সাধন—কাজ কর্ম্মদ্বারা ইহাকে পূর্ণ করা—ইহাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত কারণেই কর্ম্মজগতে ভারতবাসী অপেক্ষা ইংরাজ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ভাবজগতে তাহার কাছে ও সে আসিতে পারে না। ইংরাজী-সাহিত্যে উচ্চকবি, উচ্চবৈজ্ঞানিক আবির্ভূত হইয়াছেন অনেক, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রকৃত দার্শনিক পণ্ডিত তাহাদের সমাজে একজন ও এপর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই।

ইংরাজের ভিতর, ইয়ুরোপীয়গণের ভিতর চিন্তাশীল দার্শনিক বলিয়া—যাহারা বিখ্যাত,—তাহারা আমাদের দেশের সে শ্রেণীর লোকের তুলনায় আমার কাছে নিতান্তই ক্ষুদ্রশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়।

ভাব কর্ম্ম অপেক্ষা মূলতঃ অধিকতর শক্তিশালী। তাই, কর্ম্মবহুল ইয়ুরোপীয় সমাজ যুগে যুগে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নূতন নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, বৃদ্ধ ভারত অজয় ও অমর—আজ ও যেন সে জীবন প্রহেলিকার ভাব সমূহ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পূর্ব্বেরই ন্যায় বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে।

অনেকেরই বিশ্বাস সদাব্যস্ত ইংরাজের সংঘর্ষে আসিয়া ভাব-প্রবণ ভারত নূতন কর্ম্মবহুল জীবন ধারণ করিবে। আমার মনে হয়, এ ধারনা ভুল। অন্ততঃ ঈদৃশ পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে বহুশতাব্দীর প্রয়োজন। হইলে অবশ্য ভালই। আমাদের পক্ষে দেশ সমাজ ইত্যাদি বিষয় লইয়া অধিক দিন জীবন-কর্ত্তন করা অসম্ভব। আমাদের দৃষ্টি চিরকালই সংসারের উর্দ্ধে কিসের দিকে যেন আবদ্ধ। আমাদের সমাজের ভিতর যাহারা একটু শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর লোক অর্থাৎ যাহাদের হৃদয়ে সৎ ও উচ্চভাব কিছু ক্রীড়া করে, তাহারাই ধীরে ধীরে সংসারের অনিত্যতার দিকে সরিয়া পড়ে। নিজের অস্তিত্বেই সে এক প্রকার আস্থাহীন হইয়া পড়ে, পরের জন্য, চিন্তা করাকে সে তখন অসার, নিতান্ত অসার বলিয়া মনে করে—দেশ, সমাজ স্বজাতি ইত্যাদিতো দূরের কথা।

মূলতঃ উপরের দিক হইতে দেখিতে গেলে দেশ, স্বজাতি ইত্যাদি কি? এই সকল সংজ্ঞা হইতে জগতের উন্নতি হইয়াছে,—অবনতি ও যথেষ্ট হইয়াছে। মোটের উপর, বুঝিবা অপকারই বেশী। ইহাদের জন্য মানুষ মানুষের শত্রু,—একে অন্যের অনিষ্ঠ সাধন করিয়া ও নিজকে ধন্য মনে করিতেছে। ভারতবাসী কর্ম্মী হউক বা না হউক, আমার মনে হয় যে—ভাব-প্রাণ ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া ইংরাজ কালে কর্ম্মে আসক্তি-বিহীন হইয়া পড়িবে, এসিয়ার কাছে ইয়ুরোপকে শেষটা পরাস্ত মানিতেই হইবে।

২৯ শেজুলাই ১৯১৩।

রাত্রি।

আমার মতে, মানব-সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষের শিক্ষা অপেক্ষা ও স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতির অধিকতর যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। বিশেষতঃ, আমাদের মত সমাজের পক্ষে—যেখানে প্রায় সমস্ত রমণীগণই একপ্রকার অশিক্ষিতা—তাহার তো কথাই নাই। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে পুরুষ স্ত্রীলোকের উপর আগাগোড়া অত্যাচারই করিয়া আসিতেছে। জীবনের সুখ যাহা সেই ভোগ করিয়াছে, রমণীকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিতেই একপ্রকার দেয় নাই—তাহারই একটী ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। ফল হইয়াছে যে সমাজে যত পশ্বাচিত ভাবেরই অধিকতর বিকাশ হইয়াছে—যথা হিংসা, দ্বেষ, কাটাকাটি, মারামারি। দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, পবিত্রতা, কোমলতা, মধুরতা, সৌন্দর্য্য—যাহা রমণী চরিত্রের ভূষণ ও বিশেষত্ব—তাহার উন্মেষ ভাল করিয়া হইতেই পারে নাই।

মোটের উপর, একদিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যদিক বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। একসময় ছিল, যখন স্ত্রীলোকের শিক্ষার-কোনও ব্যবস্থাই ছিলনা। এখন সকলেরই চক্ষু খুলিয়াছে—[ বাদ বুঝিবা আমাদের ]। সকলেই দেখিতেছে, যে সমাজের অর্থ—কেবল পুরুষ নহে, পরন্তু পুরুষ ও স্ত্রীর সমষ্টি বিশেষ। কিন্তু তথাপি পুরুষের শিক্ষার জন্য যে প্রকার খরচ হয়, তাহার অর্দ্ধেক ও রমণীর জন্য হয় না। যে সমাজে রমণীদের শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় হইবে আমার বিশ্বাস তাহা কালে সকল সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। এতদিন

যেমন আমরা স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যালাভ করিতে দেই নাই, এক্ষণ তেমনই তাহাদের শিক্ষার জন্য—পুরুষের শিক্ষার অপেক্ষাও অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। যে সমাজে, যে গৃহে স্ত্রী শিক্ষিতা বিদূষী—সে গৃহে সে সমাজে পুরুষ অশিক্ষিত থাকিতে পারে না। শিক্ষিত পিতার মূর্খ পুত্র দেখা যায় অনেক কিন্তু শিক্ষিতা মাতার মূর্খ সন্তান কেহ দেখিয়াছে কি?

সমস্ত বঙ্গদেশ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হয়। আমাদের নগরে, নগরে, গ্রামে গ্রামে—বালিকাদের জন্য, স্ত্রীলোকদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হউক, কলেজ স্থাপিত হউক, তাহাদের গৃহে থাকিয়া পড়িবার নানাপ্রকার বন্দোবস্ত হউক, যেখানে পুরুষের শিক্ষায় একটাকা ব্যয় হইতেছে সেখানে স্ত্রীলোকের জন্য দু'টাকা ব্যয় হউক—আমার বিশ্বাস তাহা হইলে বাঙ্গলার মুখশ্রী ফিরিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। পুরুষের শিক্ষার জন্য দশলক্ষ, আর স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য দশ হাজার, এভাবে চলিলে দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন একশত বৎসরেও হইবে না। আমাদের দেশে যখন অবরোধ-প্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি পাঠের অন্তরায় স্বরূপ নানা প্রথা বিদ্যমান, তখন অন্যদেশে পুরুষের শিক্ষার অনুপাতে স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য যদি অর্দ্ধেক টাকা ব্যয় হয় তাহা হইলে আমাদের অন্ততঃ চতুর্গুণ ব্যয় করা উচিত। যেমন করিয়া হউক, প্রত্যেক রমণীকে সুশিক্ষা দিতেই হইবে—দিতেই হইবে। তাহা না হইলে, হে সমাজ—সংস্কারক! হে রাজনৈতিক! সমস্ত শ্রম—পণ্ডশ্রম!

---

৩১ শে জুলাই, ১৯১৩।

বৃহস্পতিবার (ভোর)।

কাজ। মানুষে কাজ করে, বাচাল গল্প করিয়া সময় কাটায়। ইংরাজের মত কম কথা কেহ বলেনা, কিন্তু জগৎ জোড়া তাহার রাজত্ব। লোকগুলি দেখিতে ব্যাকুবের মত, লম্বা লম্বা হাত পা, মস্ত বড় দেহটা চক্ষুর ভিতর বুদ্ধির কোনও চিহ্ন নাই, মিন্ মিন্ করে কথা কহে কিন্তু কাজে সকলের প্রথম,

তখন তার বুদ্ধি, তার তৎপরতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। বাক্যবাগীশ ফরাসী ও Silent ইংরাজ-উভয়ে কত পার্থক্য! ইংরাজের ন্যায় রোমানগণ ও নাকি কম কথা বলিত। রোমানদিগের ন্যায় তাহারা তাদের মহাকাব্য কোনও কাগজে লিখিবার চেষ্টা করে নাই, জগতের পৃষ্ঠায় তাহা অক্ষয় ভাবে খোদিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষ,-অষ্ট্রেলিয়া, কেনেডা, মিসর, নিউজিলেণ্ড, দক্ষিণ অফ্রিকা কত নাম করিব, সর্ব্বত্রই তাদের কীর্ত্তি ব্যাপ্ত—পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ স্থানের লোক তাদের পদতলে মাথা নোয়াইয়া আছে।

বুদ্ধি অপেক্ষা—চরিত্রের ক্ষমতা অধিক্। তাই, প্লেটো ও কেণ্টের মত দার্শনিক থাকিতে ইয়ুরোপের কোটী কোটী লোক আজ ও ধীবর পুত্রের চরণপূজা করিয়া ধন্য হইতেছে। লোক চিরকালই শক্তির উপাসক। চরিত্র-বলে আজ ইংরাজ জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতি।

ইংরাজদের আদর্শ মহাপুরুষ ( Hero ) Sir John Drake স্বকার্য্য সাধনায় তৎপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দয়া-মায়া-শূন্য, নির্ভীক মৌন নাবিক। তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীয়গণের আদর্শে গঠিত ইংরাজ জাতির ঘরে ঘরে তাঁহার মত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, স্বদেশভক্ত বীরপুরুষ সমূহ বিদ্যমান। রাণী এলিজাবেথের সময় হইতে, ইংরাজের জাতীয় অভ্যুদয়। তাহার পর, প্রায় পাঁচশত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহার ভিতর-ইংরাজ কয়টী বক্তৃতা করিয়াছে! বক্তৃতা করে নাই, কিন্তু ধীরে ধীরে অসীম অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম চেষ্টার ফলে, জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে।

ইংরাজ কথা বলে না—কাজ করে। মিছা দয়ামায়া জানে না—তার হাতে দয়া দৌর্ব্বল্যে পারিণত হয় নাই। সে শক্তির উপাসক, নীরবতার উপাসক, সে কাজের উপাসক।

তোমার মত সুন্দর পুরুষ, তোমার অপেক্ষা সুন্দর পুরুষ, তোমার অপেক্ষা অনেক সুন্দর পুরুষ জগতে অনেক জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে—করিবে—কই তাদের কে সংবাদ রাখে? তোমার কাজ দিয়াই—তোমাকে লোকে দেখিতে চায়। তুমি বড়—যদি তোমার কাজ বড় হয়।

কাজ কর, কাজ কর। নিজ মনে কাজ কর, দেখিবে তোমার ও যশ জগৎ ব্যাপ্তহইয়া পড়িবে। ইংরাজের অনুসরণ কর। নীরবতার উপাসক হও, মানুষ হও।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯১৩।

শনিবার ( রাত্রি )।

আমরা এত দরিদ্র কেন? ইহার কারণ আমরা দরিদ্রতাকেই ভালবাসি। সর্ব্বস্ব ত্যাগী সংসার বিরাগী, সন্ন্যাসী আমাদের জীবনাদর্শ। ধর্ম্মে—কর্ম্মে, পুঁথি-পুস্তকে—সর্ব্বত্রই সন্ন্যাসীর পূজা। আমরা সংসারে, ধনে কিম্বা পরাক্রমে বড় হতে চাই নাই, বড় তাই হইও নাই। পৃথিবীর ভিতর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী জাতি হইয়াও আমরা সকলের পদতলে পতিত!

আমরা অল্পেই সন্তুষ্ট—অভাব নিতান্ত কম। একমুষ্টি চাউল ও এক খানা পরিধানের কাপড় হলেই আমাদের চিন্তা একপ্রকার দূর হয়, ইহার ফলে, আমাদের উৎসাহ, উদ্যমের নিতান্ত অভাব!

আমাদের ধর্ম্ম, একপক্ষে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। সংসার অসার, জীবন অনিত্য, ধনমান যশ সম্পদ সর্ব্বৈব মিথ্যা, বাল্যকাল হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই বাণী শুন্‌তে শুন্‌তে সত্যই আমরা কার্য্যের স্পৃহা হারিয়ে ফেলি। সংসার যে অসার, অনিত্য—তাহা কে না দেখে—প্রতিনিয়ত, মৃত্যু কত আত্মীয় স্বজন, পরিচিত অপরিচিত লোককে অপসারিত করিতছে। এই সত্য অমর? প্রচার করিয়া লাভ নাই, ক্ষতি বরং যথেষ্ট—এতে মনে অবসাদ ও দুর্ব্বলতা আসে।

নিতান্ত দরিদ্র আমরা, তাই দু'একটা পয়সা যা পাই—তার বড়ই হিসাব করিয়া চলি। তাই, আমরা উৎসাহশূন্য ও উদ্যমশূন্য। বিশেষতঃ জাতিভেদের বিষময় ফলে ঘরের বাহির না হওয়ায়, অন্য লোকের ও জাতির সঙ্গে মিশিতে শিখি নাই,—সাহস ও তেমন হয় নাই কিম্বা নাই। এই জন্য যদি দু-একটী টাকা কোথাও পাই—তাহাই জমাইয়া রাখি, পাছে কোনও নূতন কাজে হাত দিয়া তাহা খোয়াইয়া ফেলি।

এত হিসাব,—এত জমাইবার প্রবৃত্তি ভাল নয়। আমি কৃপণ অপেক্ষা অমিতব্যয়ীকে পছন্দ করি। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক সমূহ হইতে মাঝে মাঝে মহা বীর পুরুষ মহৎকর্ম্মীর আবির্ভাব হয়। ফরাসী জাতি মহাহিসাবী—ইংরাজ তেমন নয়। কিন্তু ইংরাজ সাহসী অধিক। তাই, আজ ইংরাজের কাছে ফরাসী পরাস্ত।

আমরা যখন এখনকার অপেক্ষা, ভাল খেতে ভাল পর্‌তে শিখ্‌ব,—তখন আমাদের ও অবস্থার উন্নতি হবে। পূর্ব্বকালের ঋষির ন্যায় খালিগায় খালিপায় থাকা ও একবেলা আহার করা যদি এখনও আমাদের জীবনাদর্শ হয়, তবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য। 'মোটা ভাত মোটা কাপড়'—এই আদর্শ যেন আমাদের চক্ষে আর লোভনীয় বলে মনে না হয়। যখন ভাল থাকিতে ইচ্ছা করিবে তখন অর্থোপার্জ্জন করিবার শক্তি আহরণ—করিবার ইচ্ছা ও হইবে, চেষ্টা ও হবে। ইংরাজীতেযে Plain Living and High Thinking এর কথা আছে, তাহা আমাদের মত আলুভাতে ভাত খাওয়া ও কন্থা শয্যা নয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

## বৈচিত্র্য।

একি—সখি—অপরূপ
বিপরীত বৈচিত্র্য ভুবনে,
মধুর করিলে তুমি
দুঃখ, দৈন্য, আমার জীবনে।
দাসত্ব মধুর এত ?
এত সুখ পরাধীনতায় ?
পরাজয়ে এত গর্ব্ব ?
এত তৃপ্তি মুক্তিহীনতায় ?
চরণে লুটায়ে পড়া
সে যে হলো গৌরবের ধন,
বেদনা মধুর হলো,
কাম্য হলো শরের বিঁধন।
চরণে অর্পন করি
এ যোদ্ধার কবচ কৃপাণ,
তব পাশে বন্দী হওয়া
কাম্য হলো রণ অবসান।

সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া
একেবারে রিক্তনিঃস্ব হওয়া
তাহাতে আমার এত ?
লঘু যাহে ভবভার বওয়া।
কারাগার হলো স্বর্গ,
ভিক্ষাবৃত্তি শিরের ভূষণ,
তিরস্কারে সুধা ঝরে,
ভ্রূকুটিতে কুসুম বর্ষণ
করিলে সুখেরে সুধা
দুখে তুমি করিলে যে মধু,
তিক্ত-কটু হলো স্বাদু
স্পর্শে তব ওগো প্রাণ বধূ।

শ্রীকালিদাস রায়।

---

# বিক্রমপুরের গ্রাম্য-বিবরণ হল্‌দিয়া।

হল্‌দিয়া বিক্রমপুরের একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহা প্রসিদ্ধ হল্‌দিয়ার খালের পারে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমদিকে হল্‌দিয়ার বন্দর। বন্দরের ঠিক পশ্চিম দিয়াই খালটী বহিয়া গিয়াছে। খালটী পদ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, কনকসার, কোরহাটী, হল্‌দিয়া, গয়ালিমান্দ্রা, দক্ষিণপাইকসা, শ্রীনগর, ষোলঘর, হাঁসাড়া, রাজানগর, টেঘরিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামের মধ্য দিয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে।

হল্‌দিয়া গ্রামের উত্তর দিক দিয়া এই খাল হইতে একটী ক্ষুদ্র শাখা উৎপন্ন হইয়া নাগেরহাট, দক্ষিণচারগাঁ, বৈলগার, সিলিমপুর, প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া মধ্যপাড়ার নিকট প্রসিদ্ধ 'কালীগঙ্গা, নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, ইহা 'পোড়াগঙ্গা' নামে পরিচিত। সুধী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়

তৎপ্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' এর ৮ পৃঃ পাদটীকায় 'কালীগঙ্গা' কেই পোড়াগঙ্গা নদী বলিয়া লিখিয়াছেন এবং 'পোড়াগঙ্গা' কে 'কালীগঙ্গা' নামেরই রূপান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ 'কালীগঙ্গা' ও 'পোড়াগঙ্গা' কে পৃথক পৃথক নদী বলিয়াই জানে; এবং সাধারণের নিকট এই ক্ষুদ্র প্রবাহটী 'পোড়াগঙ্গা' বলিয়াই পরিচিত। গ্রামের বৃদ্ধদের মুখেও আমরা বাল্যকালাবধি এটিকে 'পোড়াগঙ্গা' বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি। যদি 'কালীগঙ্গা' ও 'পোড়াগঙ্গা'র পৃথক অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যায় এবং যদি 'পোড়াগঙ্গা, বাস্তবিকই 'কালীগঙ্গা' নদীর পরিবর্ত্তিত নাম হইয়া থাকে তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র প্রবাহটী ও যে 'কালীগঙ্গা' নদীরই একটী শাখা এরূপ ও অনুমান করা যাইতে পারে।

হল্দিয়ার বন্দর বিশেষ প্রসিদ্ধ ও কারবারের কেন্দ্রস্থল। বন্দরে সারি সারি বিপনিশ্রেণী জন-সাধারণ ও ব্যবসায়ীগণের কল-কোলাহল এবং খালের তীর ভূমির অপূর্ব্ব দৃশ্য এ স্থানটীকে যেন নাগরিক শোভা-সৌন্দর্য্যে পরিণত করিয়াছে। বন্দরটী খাস গভর্মেণ্টের পত্তনে, সরকার বাহাদুর সম্প্রতি ইহার আয়তন অনেকদূর বৃদ্ধি করিয়া কতকগুলি নূতন দোকানদার বসাইয়াছেন। একটী বড় খালের তীরে অবস্থিত বলিয়া ইহা ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক স্থল, কিন্তু খালটী ভরিয়া গিয়া ক্রমশঃ বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ জলাগমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাতে বড় মাল বোঝাই নৌকা চলাচলের বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে, শীঘ্র এটীকে খনন না করাইলে অনতিদূর ভবিষ্যতে ইহার তীরে অবস্থিত বড় বন্দরগুলির ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ অসুবিধা ও ক্ষতি হইবে।

প্রত্যুষে ও মধ্যাহ্নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যহ বাজার ও সপ্তাহে দুইদিন সোম ও শুক্রবার হাট বসে। এখানে আসাম, ভোটগাঁ প্রভৃতি নানা দূর দেশ হইতে আনীত বিবিধ প্রকারের কাষ্ঠ, কলিকাতা, ঢাকা, চাঁদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থান হইতে আনীত কাপড়, জামা, জুতা, টীন, লৌহ, চাউল, কয়লা, ভূষিমাল ও মনোহারী দ্রব্যের প্রচুর পরিমাণ আমদানী হইয়া থাকে। লৌহ কারবারের জন্য এস্থানটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। ত্রিপুরা, চাঁদপুর, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার পাইকারগণ এখান হইতে সর্ব্বদা লৌহ রপ্তানি করিয়া

থাকে। মাল বোঝাই বড় বড় জেলে নৌকা সর্ব্বদাই এস্থলে বাঁধা থাকে।

এখানকার জোলাগণের তাঁতে প্রস্তুত কাপড়, ছিট, লুঙ্গি, গামছা ও চাদর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; এবং ত্রিপুরা, কাছাড়, শিলচর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে।

কর্ম্মকার, নাপিত, মালাকারগণ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিতে বিশেষ পটু, ভুঁইমালী-গণ দাঁ, কুড়াল, হাতুড়ী, গজাল, ছিটকা প্রভৃতি লৌহের জিনিষ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বিবাহ ও অন্যান্য শুভকার্য্যের শোভা-যাত্রার জন্য এই গ্রামের মালাকারগণ কাগজ, তুলা ও শোলাদ্বারা নানা প্রকারের ঝাড়, চৌকী, পুতুল ও বৃক্ষলতাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, এইসমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প নিপুণ্যতার পরিচায়ক। বর্ত্তমান সময়ে রাঙেব পরিবর্ত্তে তুলা, শোলা ও কাগজের কাজ করাইতেছেন। তদবধি ইহারা শোলা, তুলা ও কাগজ প্রভৃতি দ্বারা দেবতার অঙ্গে ও চালির যে সমস্ত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিয়া থাকে তাহা বাস্তবিকই নয়ন-মন-মুগ্ধকর।

ভুঁইমালী ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা এই সমস্ত শুভকার্য্য, ও পূজা পার্ব্বণাদিতে আতসবাজি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

নমঃশূদ্রগণ মিস্তিরীর কাজে বিশেষ দক্ষ, ইহাদের নির্ম্মিত কাষ্ঠের দ্রব্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ধোপাগণ ঝিনুক দ্বারা এক প্রকার চূন প্রস্তুত করে, ইহাকে শামুক চূন বলে; ইহার মূল্য খুব অল্প এক মালসা চূনের মূল্য মাত্র এক পয়সা।

চরকার প্রচলন এখন আর দেখা যায় না, কেবল ব্রাহ্মণমহিলাগণ এখনও কার্পাশ তুলা দ্বারা পৈতা প্রস্তুত করিয়া থাকেন; পূর্ব্বে এক পয়সায় একটী পৈতা পাওয়া যাইত; এখন দুটী পয়সা দিয়া একটী পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা তাগা ( মাজার বাইটা ) প্রস্তুত করিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

এ গ্রামের মুসলমান ও নমঃশূদ্রগণই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবন-ধারণ করে। পাটের চাষ খুব বেশী হয়, ধানের চাষ ও মন্দ হয় না। অন্যান্য 'খন্দের' সময় কায়ন, তিল, যব, ধনিয়া সর্ষপ, মরিচ, মেথি, কালিজিরা, মেস্কুসর, তরমুজ, ক্ষিরাই উস্তে ও করলা প্রভৃতি প্রধান।

খালের তীরে বাইদাগণ বহু নৌকায় এক যোগে বসবাস করে; ইহাকে বাইদার বহর বলা হয়। একস্থানে অবস্থান করিয়া ইহারা নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে হাটে বাজারে মনোহারী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে। বারমাস ইহারা নৌকাতেই বসতি করে।*

শ্রীযুক্ত সীতানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীতে একটী টোল আছে। ভিন্ন জেলার ২।৩ টী ছাত্র ও এখানে থাকিয়া অধ্যয়ন করেন, অধ্যাপক মহাশয় শিষ্যগণের আহার প্রদান করেন।

এখানে ২।৩টী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বালিকাগণের স্বতন্ত্র পাঠশালা আছে।

কুকুটিয়া, কাজিরপাগলা, ব্রাহ্মণ গাঁ ও সানিহাটীর স্কুল সমূহ সন্নিকটে বলিয়া এতদিন এখানে কোন স্বতন্ত্র উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু কুকুটীয়ার ও অন্যান্য স্কুল গুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ায় আজ কতিপয় বৎসর যাবৎ এ গ্রামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। আমাদের বিশ্বাস জনহিতৈষী উদ্যোগী ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিলে হলদিয়ার ন্যায় জন-প্রধান ও সমৃদ্ধিশালী গ্রামে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।

১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে 'হিতৈষী সভা' ও 'দুর্গা পাঠাগার' সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। গ্রামের লোকের অভাব ও অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতিকার করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; এক সময়ে এই সভাদ্বারা গ্রামের লোকের প্রভূত উপকার সাধন হইয়াছে। ছোট ছোট মোকদ্দমা সালিশী দ্বারা নিস্পত্তি করিয়া দেওয়া এবং পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা ও ইহারা করিয়া দিতেন। এই সভার অধীন একটী public Library যুবকেরা সহর বাসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

---

*( ১ ) হলদিয়ার হাট, কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যাদির বিস্তৃত বিবরণ ভূতপূর্ব্ব Settlement Officer শ্রীযুক্ত প্যারি বাবুর মুদ্রিত Report এ, ১৩২০ সনের মাঘ ও চৈত্র মাসের 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' পত্রিকায় এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত 'ঢাকার' ইতিহাস. এর ১ম খণ্ডে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত M. R. A. S, মহাশয় ও তল্লিখিত 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' হলদিয়ার হাটের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিগত ১৩১২ সনের বৈশাখ মাসে এগ্রামে দুর্গা পুস্তকাগার নামে একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি রাখা হয়।

এ গ্রামে কতিপয় ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন কয়েক খানা দলিল আছে, ঐ সকল পাঠে বিক্রমপুরের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহা জানিতে পারা যায়, এই দলিল গুলির অধিকাংশই দাসত্ব-প্রথা ও দান বিক্রয় সম্বন্ধীয়। বিক্রমপুরে যে এক সময়ে দাসত্ব-প্রথার খুব প্রচলন ছিল ইহা হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। দাসগণ এখানে স্বেচ্ছায় বিক্রীত হইত এবং একপরিবারস্থ স্ত্রী পুরুষ সকলেই দাস্য বৃত্তিতে নিযুক্ত হইবার চুক্তিতে আত্ম-বিক্রয় করিতে পারিত।

সন ১১৪৬ পরগণাতী ৫০৭ সানের মাহে ১৩ কার্ত্তিকের এক খানা ভূমি বিক্রয় দলিলের একার্দ্ধ ফারসী ও অপরার্দ্ধ বঙ্গ ভাষায় লিখিত। একই দলিলে দুই ভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হইল।

শ্রীযুক্ত বামাচরণ বিদ্যালঙ্কার শ্রীযুক্ত সীতানাথ তর্কবাগীশমহাশয়দের ও নিকট কতকগুলি অতি প্রাচীন হস্ত লিখিত সংস্কৃত পুঁথি আছে। গ্রন্থগুলির অধিকাংশেরই পরিচয় অদ্যাপি ও নির্ণীত হয় নাই।

কালীবাড়ী, সুবচনী, মঠ-মন্দির রজত নির্ম্মিত বিষ্ণু মূর্ত্তি ও আখড়া, হল্‌দিয়ার কালীবাড়ী বিশেষ প্রসিদ্ধ, কালী প্রত্যক্ষ জাগ্রতা দেবী। ইঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। দেবীর দর্শনের জন্য এবং 'মানত' দিবার জন্য নানা স্থান হইতে বহু লোকের আগমন হইয়া থাকে এবং বাদ্যাদি সহকারে পূজা দিয়া থাকে।*

এই কালী ১১৭৫ সালে মহারাজ রাজবল্লভের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রায় কেবলকৃষ্ণ স্বর্গীয় রাজাকান্ত চাটার্জ্জিকে দান করেন এবং কালীর সর্ব্ববিধ ব্যয়

* বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত M. R. A. S. মহাশয় ১৩১৯ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় 'বিক্রমপুরের স্থাপত্য-চিহ্ন, শীর্ষক প্রবন্ধে হল্‌দিয়ার কালী মন্দিরের সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় তৎপ্রণীত 'ঢাকার ইতিহাসের' ১ম খণ্ডে হল্‌দিয়ার কালীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

নির্ব্বাহার্থ বৃত্তি স্বরূপ ১৷৷০ দ্রোণ ভূমিও দান করিয়াছিলেন; মূর্ত্তিটী উচ্চতায় কিঞ্চিন্ন্যূন ২ ফুট হইবে। ইহা কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং অতিশয় সুন্দর। প্রতি অমাবস্যা নিশিতে ও অন্যান্য বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে মায়ের নিকট ছাগ বলি হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে গ্রামের লোকের চাঁদায় মায়ের মন্দিরে মহাসমারোহে এক পূজা দেওয়া হয়। 'ইহাকে পঞ্চায়তী পূজা' বলে। পূজা হইবার পূর্ব্বে গ্রামের সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে মায়ের মন্দিরে ঘৃত ও সলিতা দিয়া থাকে, এই অসংখ্য সলিতা ও ঘৃত পূজার পূর্ব্বে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত মায়ের মন্দিরে সমস্ত রাত্র জ্বালান হয়।

পূজার দিন গ্রামের বয়স্থা মহিলাগণ সারাদিন নিরম্বু উপবাস থাকেন; এই পূজায় গ্রামের সর্ব্ব সাধারণ যেগদান করিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করিয়া থাকে। কালীর মন্দিরটীও খুব প্রাচীন, মন্দিরে একটী পিত্তল নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি ও অন্যান্য অনেক গুলি মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

সুবচনী- -কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পরে কালী বাড়ীতে মহাসমারোহের সহিত 'বটাশ্বথ' বৃক্ষ বিবাহ প্রদান করা হয়, ইহাকে সুবচনী' বলে। বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এই রূপ একটী না একটী বিবাহিত 'বটাশ্বথ' বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সমস্ত গুলিই 'সুবচনী' নামে সুপরিচিত।

হিন্দু রমণীগণ এই সমস্ত বৃক্ষকে খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন এবং দেবতা জ্ঞানে তৈলসিঁদুর বিলেপন ও দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকেন। 'বটাশ্বথ' বৃক্ষের এইরূপ বিবাহ-প্রথা কত কাল যাবৎ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে—তাহার কারণ অনুসন্ধানের যোগ্য।

মঠ—শ্মশানোপরি বিনির্ম্মিত এ গ্রামে ২।৩টী মঠ আছে ইহার সব গুলিই আধুনিক।

রজত নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি—প্রায় ৮।১০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে একটি পুষ্করিণী খননে এক খানা অনিন্দ্য সুন্দর রজত-নির্ম্মিত-বিষ্ণু মূর্ত্তি পাওয়া যায়; ইহা দৈর্ঘ্যে $\frac{১৩}{৪}$ ইঞ্চি ও প্রস্থে $\frac{২১}{২}$ ইঞ্চি। ক্ষুদ্র হইলেও ইহার শিল্প নৈপুন ও কারুকার্য্য অতীব রমণীয় ও নয়ন-মন-মুগ্ধকর। মূর্ত্তিটী চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী,

—বনমালা বিভূষিত প্রস্ফুটিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান। ইহার শিরে কিরীট, কর্ণে কর্ণ ভূষা,—গলে বন মালা ও যজ্ঞোপবীত, বস্ত্র হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত পরিহিত নিম্নস্থ বেদীর সম্মুখে গরুড় করযোড়ে উপবিষ্ট। দক্ষিণদিকে ধন ধান্যের অধিকারিণী দেবী কমলা! বামে বিদ্যাদায়িনী দেবী সরস্বতী বীণাকরে অবস্থিতা। মূর্ত্তিটী এক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রণেতা শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত M. R. A. S. মহোদয় বিগত ১৩১৮ সনে আষাঢ় মাসের 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় 'বিক্রমপুরে প্রাপ্ত রজত নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে এই মূর্ত্তিটীর সচিত্র বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং এটী দাক্ষিণাত্যে শিল্পাদর্শে খৃঃ দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী যুগের নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে এই বিষ্ণু মূর্ত্তিটীর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহার বদন কমল যেরূপ হাস্য বিভাসিত তদ্রূপ অতি অল্প বিষ্ণু মূর্ত্তিরই দেখিতে পাওয়া যায়।

বারোয়ারী কালীপূজা, এখানে দুটী বৈরাগীর আখড়ায় পিত্তল নির্ম্মিত লক্ষ্মী-নারায়ণ ও মদন মোহনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে হল্‌দিয়ার বন্দরে ও গ্রামের ভিতর ৩।৪খানা বাড়োয়ারী কালী পূজা হয়। এই সময় নানা প্রকার ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়, বলিয়া এই প্রকার পূজা পার্ব্বণাদি সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত পূজা উপলক্ষে যাত্রা ও কবি গানে বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়। বাড়োয়ারী পূজা হইবার তিনদিন পূর্ব্বে অহোরাত্র কীর্ত্তন হইয়া মহা সমারোহের সহিত মহোৎসব ও কাঙ্গালী ভোজন হয়।

গ্রামের নমঃশূদ্রদের মধ্যে ত্রিনাথের পূজার বিশেষ প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা গাঁজা সেবনে বিভোর হইয়া খোল করতালাদি সহযোগে নৃত্যাদি সহকারে গান করিয়া থাকে।

সাহা ব্যবসায়ী ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে 'কিশোরী ভজন' সম্প্রদায়ের লোক আছে, কতিপয় বৎসর যাবৎ তাহাদের প্রতি গ্রামের লোকের তীব্র দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় এখন আর উক্ত অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায় না।

বৃকট শ্রেণীর এক প্রকার ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক এ গ্রামে পরিদৃষ্ট হয়; ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরাই এই সম্প্রদায় ভুক্ত। ইহারা হিন্দুর পৌত্তলিকতা

মানে না, এমন কি কালী, দুর্গা প্রভৃতি হিন্দুর দেব দেবীর নাম পর্য্যন্ত ও ইহারা মুখে উচ্চারণ করা দোষ মনে করে।

নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে 'স্বপ্নে আদেশ হওয়া' 'হরি পাওয়া' 'শীতলা পাওয়া' 'মনসা পাওয়া' প্রভৃতির ভণ্ডামির কথাও শুনা যায়।

নিম্ন শ্রেণীর দুঃস্থ লোকদিগকে প্রায়ই বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে দেখা যায়; ইহাদের মধ্যে ব্যভিচারীতার ও বাহুল্য পরিদৃষ্ট হয়।

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে মুসলমানদের নমাজ পড়িবার একটি জুম্মাঘর আছে।

প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ এই গ্রামে একটী বড় মেলা বসে তাহা 'গলুইয়া' নামে সুপরিচিত। এই মেলা হইতে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী ধন্যা, সরিষা, কালিজিরা, মেথি প্রভৃতি মাল মসল্লা সংগ্রহ করিয়া রাখে। গলইয়ায় ছোট আমোদ—প্রমোদের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। 'গলইয়ার' দিন ঘুড়ি খেলার ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। 'গলইয়া' তুরমী খেলা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক; বাইদগণ ইহা খেলিয়া থাকে।

এই গ্রামে ৭।৮ খানা দুর্গোৎসব হইয়া থাকে এবং 'মনসা' ও দুর্গাপূজার দশহরা মিলে, তদুপলক্ষে দুটী বড় মেলা বসে। দশহরার দিন নমঃশূদ্র, কৈবর্ত্ত ও মুসলমানগণ নৌকার বাইচ খেলিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করিয়া থাকে। পূজার নবমী গাওয়া উৎসব ও লক্ষ্মীপূজার ছড়া বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

দোলের 'হুলির' দিন এ গ্রামে একটী বড় শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে। 'হুলির' দিন আবাল-বৃদ্ধ সকলেই বিশেষ আমোদ অনুভব করিয়া থাকে।

এই সমস্ত মেলা ও গলইয়ায় জুয়া খেলার বিশেষ বাহুল্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহাদের উপর ইহার নিবারণের ভার তাহারা প্রায়ই কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া এই সমস্ত অনিষ্টকর অনুষ্ঠানের প্রশ্রয় দিয়া থাকে।

১৩২০ সনের মাঘ মাসে এই গ্রামে জনৈক বৈরাগী কর্ত্তৃক একটী বড় ধর্ম্ম মেলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল; ইহাতে নানা স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০০।৪০০ শত বাউল ও বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিয়াছিল; মেলা দুই দিন স্থায়ী হইয়াছিল; মেলায় দুই দিন বাউল ও বৈষ্ণব গায়ক গণের নানা প্রকার বাদ্য-যন্ত্র সহকারে—সুমধুর—গীতধ্বনির উচ্চ চীৎকারে ও

অঙ্গ ভঙ্গীসহকারে নৃত্যের তুমুল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সমস্ত গ্রাম আনন্দে প্রতিধ্বনিত—করিয়া তুলিয়াছিল।

গ্রীষ্মাবকাশে ও পূজার ছুটিতে গ্রামের শিক্ষিত যুবকগণ কর্তৃক থিয়েটার হইয়া থাকে।

চৈত্র মাসে চড়ক পূজার সময় গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা—'কালীর কাচ্ বাহির করিয়া থাকে—ইহারা সন্ধ্যার পরে বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে বাড়ী বাড়ী যাইয়া নানা প্রকারের সাজ সজ্জা সহকারে অভিনয় করিয়া থাকে;—প্রথমেই কালী, নাচ হয়—তৎপর নানা প্রকারের কৌতুকপ্রদ সং ও গীত হয়।

কার্ত্তিক ব্রত, পৌষ-সংক্রান্ত, শ্রীপঞ্চমী, চৈত্র-সংক্রান্ত ও অন্যান্য পূজা পার্ব্বণ দি উপলক্ষে ভিন্ন ভিন্ন দলে হরিসংকীর্ত্তনের দল বাহির হইয়া গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সংকীর্ত্তন করিয়া থাকে।

মহিলা বার ব্রত ও খেলার বিবরণ গুলি বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামে প্রায় একই রূপ। বালিকাগণের মাঘ মণ্ডল, যমপুকুর, তারা ব্রত, তুষ তুষাণী ফাগুণ কুণা প্রভৃতি ব্রতের ছড়া ও কথা বড়ই শ্রুতিমধুর।

এই সমস্ত ব্রত কথা,খেলার বিবরণ, পূজা পার্ব্বণাদির বিবরণ বিশদ ভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

খেলা—খেলার উপযোগী এ গ্রামে ৩,৪টী মাঠ আছে। পূর্ব্বে ছোট খোলার মাঠে Foot ball এবং cricket খেলা হইত এবং কালীর বাড়ীর ও 'সুবচনীর ভিটায়' এবং অন্যান্য ছোট ছোট মাঠ গুলিতে দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, ডুগু, ডুগু, বৌয়াছি বৌয়াছি, বৌছোয়ানি, গাউছা মাউছা প্রভৃতি নানা প্রকার খেলা খেলিয়া বালকগণ আমোদ অনুভব করিত, কিন্তু এখন আর সে সমস্ত দেশীয় খেলার বড় একটা প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না, বালকগণ এখন সে সমস্ত খেলার রুচি Foot ball ও cricket খেলায় বরণ করিয়া লইয়াছে।

ছোট ছোট ছেলে পেলেরা এখন ও চোক বুজানি, কাটকোট, লোস্তা লোস্তা, কুমইর-কুমইর, বুদ্ধিমন্ত, ডাঙ্গাগুটি; হৈলডুব প্রভৃতি খেলিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের অধিকাংশ ব্রতই পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের ব্রত কথা গুলিও শুনিতে বড়ই মধুর ও কৌতুহলোদ্দীপক; এ সমস্ত ব্রতকথা

ও ছড়া প্রভৃতি বাঙ্গালার সমাজে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের পুরাতন ইতিহাসের এক অধ্যায়।

এই গ্রামের ব্যবসায়ী ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে 'শীতলা' ও কালিকার ব্রতের খুব প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে 'ঘোষের দীঘী' নামে একটী বড় দীঘী আছে ও গ্রামের বহু লোকে ইহার জল ব্যবহার করিত কিন্তু এখন ইহার জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে Local Board এর ব্যয়ে 'কালীর বাড়ীর ও আর একটী পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার হইয়াছে—কিন্তু পানা, বাইচা ও অন্যান্য আবর্জ্জনা রাশিতে এ দু'টী পুষ্করিণীর জল ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। চৈত্র বৈশাখ মাসে গ্রামের ভিতর বড়ই জল কষ্ট হয়, তখন অধিকাংশ পুষ্করিণীতেই ডুব দিয়া স্নান করিবার উপযুক্ত পরিমাণ জল থাকে না। গ্রামের ধনী ব্যক্তিগণ যদি নাচগান ও বিলাসব্যসনে অর্থ ব্যয় না করিয়া এই সমস্ত দীঘী পুষ্করিণী গুলির—পঙ্কোদ্ধার—করিতেন তাহাহইলে গ্রীষ্ম কালের দারুণ জলাভাবের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবার ব্যবস্থা হইত।

এখানকার জল বায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর, তবে ঋতুভেদে ওলাউঠা, জ্বর, হাম প্রভৃতি ব্যাধির ও প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা অতি বিরল। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও পৌষ মাঘ মাসে যখন নানাবিধ ব্যাধির আশঙ্কা হয় তখন প্রত্যহ ঊষা ও সান্ধ্য-সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে এ রীতি বড়ই উত্তম, ইহাতে মন বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকে।

বিগত আদম সুমারিতে এই গ্রামের লোকসংখ্যা ৫৫৫৩ জন, গ্রামটী খুব বড় না হইলেও এখানে শিক্ষিতের সংখ্যা যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের M. A. B. A. উপাধীধারীর সংখ্যা কম নহে।

লৌহজঙ্গ ও মাওয়ার ষ্টীমার ষ্টেশন এখান হইতে সন্নিকটে;—কলিকাতা ও ঢাকা যাতায়াত করিতে উক্ত দুই ষ্টেশন হইয়া যাতায়াত করিতে হয়।

ভাড়ার জন্য এখানে সর্ব্বদা ছোট বড় নানা প্রকারের কেরাইয়া নৌকা প্রস্তুত থাকে। মোট বহিবার জন্য কুলি পাওয়া যায়; হাটবার দিবস ভাড়ার জন্য বহু ঘোড়া পাওয়া যায়।—স্ত্রীলোকগণের যাতায়াতের জন্য পালকী, শোয়ারী

ও মহাপায়া সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। বর্ষার সময় নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা নৌকার অভাবে সামান্য দূরে যাতায়াতের জন্য 'কলার ভেলা' ও 'টাগারী' ব্যবহার করিয়া থাকে; উহার দৃশ্য বড়ই সুন্দর।

১৩১৬ সনে এক খানা ক্ষুদ্র ষ্টীমার মাল বোঝাই করিয়া লৌহজঙ্গ হইতে হলদিয়া দিনে দুই বার যাতায়াত করিত; ইহাতে ব্যবসায়ীগণের মাল আনার পক্ষে—বড়ই সুবিধা ছিল; কিন্তু খালে বার মাস ষ্টীমার চলাচলের উপযুক্ত পরিমাণ জল না থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই সেখানা বন্ধ হইয়া যায়।

উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে এ গ্রামে একটী আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয়—আছে। এখানে একজন এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, চারজন নেটিব ও তিন জন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার আছেন। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে—হেকিমী, 'ফইকরামীর' ও অভাব নাই।

পীড়া হইলে সাহা গণ পূর্ব্বে ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইতেন না এবং ঔষধ খাইতেন না, পীড়া সহকারে তিন বেলা স্নানহারাদি করিতেন এবং তুলসি তলায় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেন; ইহাকে 'হরির নামে' থাকা বলে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেই কুসংস্কার অনেকটা দূর হইয়াছে; এখনও ইহাদের অনেকে পাঁটাভোগ 'হরি বাড়ী গিয়া থাকেন।

আনুমানিক ১২৫০—৫২ সনের মধ্যে এই গ্রামে 'চট্টোপাধ্যায় বংশের জনৈক ব্রাহ্মণ-রমণী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

বর্ষার সময় এখানে শবদাহের বড়ই অসুবিধা হইত। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনেকে স্থানাভাব বশতঃ খালের জলে শব ভাসাইয়া দিত; এরূপ প্রথা সর্ব্বথা নিন্দনীয় ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। কতিপয় বৎসর যাবৎ গ্রামের লোকের যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যোগে এখানে একটী পাকা শ্মশান-ঘাট নির্ম্মিত হইতেছে।

প্রতি বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে খুব ঝড় তুফান হইয়া থাকে। ১৫। ১৬ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একবার একটি বড় ঝড় হইয়াছিল, সেই ঝড়ে অনেকের ঘর দরজা পড়িয়া যায় এবং খালে অনেক গুলি নৌকা ডুবিয়া যায়।

এই ঝড়ের প্রভাব হলদিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী নাগেরহাট গ্রামে খুব বেশী পরিলক্ষিত হইয়াছিল। গাছ পালা ও ঘর দরজার চাপা লাগিয়া ৩।৪টী লোক

মারা যায় এবং ঘরের টিন ছুটীয়া গিয়া ছুইটি স্ত্রীলোকের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; সে দৃশ্য স্মরণ হইলে শরীর এখনও রোমাঞ্চিত হয়। এই ঝড় সম্বন্ধে বৃদ্ধদের মুখে নানা প্রকার কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। ১৩১৬ সনের ঝড়েও লোকের সামান্য রকম ক্ষতি হইয়াছিল।

ভূমিকম্প—বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে এ গ্রামে দুটী বড় ভূমিকম্প হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৮৯৭ খৃঃ ভূমিকম্প কিছু গুরুতর রকমের হইয়াছিল।

জলকম্প—১৩১৮,১৯ সনে এখানে একবার জলকম্প হয়; রাত্রি ২।৪ দণ্ডের পরে অত্যল্প কালস্থায়ী ২।৩ বার নীলাভ আলো হইয়া সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর জলকম্পন হইতে থাকে।

উল্কাপাত—কতিপয়-বৎসর পূর্ব্বে এগ্রামে একবার উল্কাপাত হইয়াছিল। জনৈক চৌকীদার মাঠে উহার দুই খণ্ড অংশ পাইয়া সযত্নে রক্ষা করে এবং হিন্দুর সরল ধর্ম্ম-বিশ্বাসে উহাতে তেল সিন্দূর বিলেপন করিতে থাকে, ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টার মিঃ ষ্টেপলটন এই বিষয় অবগত হইয়া স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়া উল্কা দু'খণ্ড চাহিয়া নেন। শুনিয়াছি উহার একখণ্ড ঢাকা কলেজের লেবরেটরীতে ও অপর খণ্ড বিলাতের Royal museum এ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

বজ্রাঘাত—বিগত ৮।১০ বৎসরের মধ্যে এ গ্রামে দুইটী লোকের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে এবং ২।৩ খানা ক্ষেত্রের শস্য পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

সর্পাঘাত—কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে সর্পাঘাতে এগ্রামে একটী লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

জলডুবি—বর্ষার অত্যধিক জল বৃদ্ধি হেতু প্রায় প্রতি বৎসরই ২।১টী শিশুর জলে ডুবিয়া মৃত্যু হইয়া থাকে।

অগ্নিকাণ্ড—প্রতি বৎসর পৌষ মাঘ মাসে প্রায়ই ২।১ খানা মুসলমান বাড়ী আগুনে পুড়িতে দেখা যায়, পাক করিবার সময় নাড়ায় আগুন লাগিয়াই অধিকাংশ স্থলে এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

দুর্ভিক্ষ, চুরি, ডাকাতি—১৩১৩ সনের বর্ষার সময় অত্যাধিক পরিমাণে জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হয়; এবং চাউলের মূল্য ১০।১১৲ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া যায়—সেই সময়-হল্‌দিয়া বন্দরে চাউল লুট হয়;

এবং ১৩১৬ সনের বর্ষার সময় এই বন্দরে একটী রাজনৈতিক ডাকাতি হয়, সময় সময় এই গ্রামে চোরের খুব উপদ্রব হইয়া থাকে।

এই গ্রামের দক্ষিণ সীমানায় একটী বিরাট 'হিজলবৃক্ষ' এক কানীর অধিক জমি জুড়িয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা দর্শক মাত্রেরই হৃদয়ে বিস্ময়োদ্রেক করে। 'হিজল' বৃক্ষ কোথাও এত বড় হইতে দেখা যায় না! এই বৃক্ষটী 'বাউলিয়া' বা 'বারালিয়া' বৃক্ষ নামে পরিচিত; এই বৃক্ষটি অতিশয় প্রাচীন। আড়াইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন কাগজ পত্রে এই বৃক্ষটীকে 'কুণ্ডলী' বৃক্ষ নামে আখ্যাত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃক্ষটির সহিত গ্রাম্য বিবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত রহিয়াছে। ইহার নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে পূর্ব্বে এই বৃক্ষের নীচে 'বাউল' সম্প্রদায় ভুক্ত এক জন সাধু বাস করিতেন, তাহার নাম হইতেই ইহা 'বাউলিয়া নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে; এই বৃহৎ বৃক্ষটী দ্বাদশটী শাখায় চারিদিকে বিস্তারিত রহিয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ ইহার 'বারলিয়া' নামোৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করেন। ইহার প্রত্যেকটী শাখাই—ভিতরে-ফাঁপা। সর্ব্বাপেক্ষা ইহার বিশেষত্ব এই যে কার্ত্তিক হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বর্ষায় জলাগম না হয় সে পর্য্যন্ত ইহার শাখাগুলি মাটির সহিত মিশিয়া থাকে, আর বর্ষার সময়ে জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাখাগুলি আপনা হইতেই ভাসিয়া উঠে। কেন এরূপ হয় এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

বৃক্ষটীর মূলদেশে কাণের ন্যায় দু'টী ছিদ্র দৃষ্ট হয়; হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বৃক্ষটীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং দেবতা জ্ঞানে তেল সিন্দূর বিলেপন ও দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকেন।

উন্মুক্ত মাঠের মাঝ খানে এই বৃহদাকৃতি বৃক্ষটীর অবস্থান বড়ই মনোরম এবং নয়ন-মন-মুগ্ধকর।

'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রণেতা শ্রাদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিগত ১৩১৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বিক্রমপুরের বিখ্যাত বাউলিয়া বৃক্ষ শীর্ষক সচিত্র প্রবন্ধে এই বৃক্ষটীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার প্রবন্ধ হইতে প্রয়োজনানুসারে আমরা অনেকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

শ্রীনগেন্দ্রলাল চন্দ।

# প্রহেলিকা

## নবম পরিচ্ছেদ।

সংসারে যত স্থান আছে, তন্মধ্যে ঐ যে—নগরের প্রান্তদেশে অবস্থিত দূরে রাজবাটীটী দেখিতেছ, এমন কদর্য্যস্থান অতি বিরল।

মর্ম্মর-প্রস্তর-গঠিত সৌধাবলিশোভিত ঐ বাটীটির দিকে দৃষ্টি করিলে কে মনে করিতে পারে, এত সৌন্দর্য্যের ভিতর এত কদর্য্যতা, এত নিষ্ঠুরতা, এত জ্বালা-যন্ত্রণা, এত পাপ মিশিয়া রহিয়াছে? যদি কেহ দিব্যনেত্রে উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, ঐ যে রাজবাটী,—অর্থরাশির সাহায্যে যাহা নিত্য নূতন নূতন উৎসবের ব্যাপদেশে সদা প্রফুল্ল, আমোদময়,—লোকজনের কোলাহলে সর্ব্বদা মুখরিত—যাহা অনুমান দ্বিশত বৎসর কাল হইতে কবিত্ব-মণ্ডিত হইয়া শোভা পাইতেছে,—উহার প্রতি চূড়া হইতে, প্রতি কক্ষ হইতে, প্রতি ইষ্টক খণ্ড, ইষ্টক-কণা হইতে কত নষ্টগৌরবের, কত হৃতসর্ব্বস্বের, কত লুণ্ঠিত সতীত্বের, ভয়াবহ অন্যান্য কত শত অত্যাচারের হৃদয়-বিদারক হাহাকার ধ্বনি, দ্বিপ্রহরা রজনীর নীরবতা ভেদ করিয়া বৎসর হইতে বৎসরান্তরে ঊর্দ্ধে দেবতার চরণতলে যাইয়া পৌঁছিতেছে!

ঐ সকল মর্ম্মবেদনা উপলব্ধি করিবার জন্য কি কেহ নাই? পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই? পাপীর কি শাস্তি নাই?

পরের প্রাণে বেদনা দিয়া কে কবে শান্তি লাভ করিয়াছে? কল-হাস্যময় ঐ রাজবাটীর ভিতর কেহ কভু সুখ দেখিয়াছে কি?

এখানে পতির সহিত পত্নীর সম্বন্ধ নাই। থাকিলেও, তাহা শিথিল হইয়া গিয়াছে! পিতা পুত্রের জন্য চিন্তা করে না। পুত্র বৃদ্ধ পিতার অবমাননা করিতেছে। ভ্রাতা ভ্রাতার গলায় ছুরি দিতেছে। ভৃত্য প্রভুর খাদ্যে বিষ মিশাইয়া তাহার প্রাণবধ করিয়া অর্থসহ পলায়ন করিতেছে। এ নরকে কে কাহার মিত্র? এক শত্রু অন্য শত্রুকে বিনাশ করিতেছে। মাঝে মাঝে, সকলে সমবেত হইয়া একজনকে নির্য্যাতন করিতেছে। কখনও বা, একজনই সকলকে নির্য্যাতন করিতেছে। ভীষণ দৃশ্য! ভীষণ অবস্থা! কিন্তু সত্য, অতি সত্য।

এ তোষামদ ও খোষামদ পূর্ণ বায়ুমণ্ডলের ভিতর মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

পরন্তু, অজ্ঞানান্ধকারের ভিতর যে সকল পাপ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া ওঠে—মিথ্যাকথন, প্রবঞ্চনা, নৃশংসতা, নরহত্যা, ব্যভিচার, সমস্ত ভীষণ দোষই এখানে বর্ত্তমান। রাজবংশটী একটী ধারাবাহিক নৃশংসতা, ও বর্ব্বরতার ইতিহাস।

অন্নদাপ্রসাদ—জিলার সুবিখ্যাত রাজা। বাঙ্গালার শেষ মুসলমান নরপতিগণ যখন দিন দিন নির্বীর্য্য ও শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিলেন, যখন শাসন-নীতির বিশৃঙ্খলতাবশতঃ দস্যুতস্করের ভয়াবহ অত্যাচারে রম্যা বঙ্গভূমি প্রেতভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিতেছিল, তখন অন্নদাপ্রসাদের কোনও একপূর্ব্বপুরুষ জনৈক মুসলমান ভূস্বামীর অধীনে সামান্য মাসিক পঞ্চমুদ্রা বেতনে তহশীলকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নানাপ্রকার জালিয়াতি ও জুয়াচুরির সাহায্যে বার্ষিক পঞ্চলক্ষ মুদ্রা আয়ের ভূসম্পত্তি সৃজন করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার তিরোধানের পর, সময়বিশেষে জমিদারীর আয় বর্দ্ধিত ও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। সে সময় রাজা অন্নদাপ্রসাদের এই জমিদারী হইতে বার্ষিক অনুমান লক্ষমুদ্রা আয় হইতেছি।

রাজাবাহাদুর এক সময় অতি সুপুরুষ ছিলেন। কন্দর্পনিন্দিত তাহার বদনকমল যে দেখিত সেই আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না! কিবা সুন্দর বর্ণ, কিবা দেহের নয়নাভিরাম গঠন। কিন্তু, এখন আর পূর্ব্বের সে লাবণ্য বড় নাই। নয়নদ্বয় কোটরাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অনেকটা রক্তাভ, চারিদিকে কালিমার রেখা পড়িয়াছে। বদন হইতে কেবল বিলাসিতার ও লাম্পট্যের ভাবই যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। এই সবে মাত্র পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়স, পূর্ণযৌবন, কিন্তু দেখিলে মনে হয় যেন প্রৌঢ়াবস্থা অতি সন্নিকট। মোটের উপর তাহাকে দেখিলে দর্শকের হৃদয়ে আর আনন্দের উদ্রেক হয় না।

তিনি লেখা পড়ার ধার ধারিতেন না। হইলে কি হয়? সুশিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত জমীদার বলিয়া তাহার সুখ্যাতি ছিল। তাহার একটি পার্শি প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল। তাহার দ্বারা বক্তৃতা লেখাইয়া সভা সমিতিতে মাঝে মাঝে পাঠ করিতেন। বাল্যকালে একজন ইংরেজ শিক্ষকের কাছে একটু ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। পোষাক, পরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তায়, চাল চলনে তিনি সকল বিষয়েই সাহেবদের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

রাজবাটীতে কোথায় কি হইত, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহার সঠিক সংবাদ জানা দুষ্কর ছিল। কিন্তু সকলেই বলিত, উহা সর্ব্বপ্রকার পৈশাচিক পাপ-লীলার

প্রেতভূমি। রাজা বাহাদুরের বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তিরূপ যজ্ঞে যে নিয়ত কত লোকের মান-সম্ভ্রম কত অবলা দরিদ্র বালিকার সর্ব্বস্বধন আহুতিস্বরূপ প্রদত্ত হইত, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

এক্ষণে, রাজা বাহাদুরের সংসারের কথা একটু বলিব।

রাজার মাতা রাণী দুর্গামণি তখনও বিদ্যমান। তিনি বুড় রাণী নামে খ্যাত। বয়স পঞ্চাশতের কিছু উপরে কিন্তু বয়সের তুলনায় তাহাকে অল্পবয়স্কা দেখা যাইত। মৃত রাজা বড় সৌখীন পুরুষ ছিলেন, তাহার স্ত্রী তাহারই অনুরূপা। এই যে বয়স হইয়াছে, বৈধব্যদশা, তথাপি সময়মত কেশগুচ্ছ না আঁচড়াইলে তাহার মাথা ধরিত এবং পরিধানের বসনখানা মিহিন ও ফিট্‌ফিটে ধপধপে না হইলে ও শয্যায় দুই একটু এসেন্সের গন্ধ না ছড়াইলে, শরীরটা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করিত। আহারের প্রতি তীব্র দৃষ্টি থাকার দরুণ, শরীরটী এখনও বেশ হৃষ্টপুষ্ট রহিয়াছে। তাহাকে দেখিলে মনে হইত, ও মুখখানিতে এক সময় না জানি কত রসই মাখান ছিল।

রাজাবাহাদুর মাতার, স্ত্রীর, কি পরিজন বর্গের অন্য কাহার ও সংবাদ রাখিতেন না কিন্তু তজ্জন্য বুড় রাণীর কোনও প্রকার যত্নের ক্রটী হইত না। কারণ, তাহার দুই কন্যা বর্ত্তমান। এদিকে, তাহার হস্তে, দুইলক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ গচ্ছিত। অনাদর ত দূরের কথা, বরং আদরের আধিক্যবশতঃ তাহাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত হইতে হইত।

রাজাবাহাদুরের স্ত্রী রাণী মুক্তাসুন্দরী দেখিতে পরমা রূপবতী, এমন সুন্দরী সচরাচর দেখা যায় না। যৌবনের প্রথমোন্মেষের সময় রাজা বাহাদুর কোনও বন্ধুর বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। মুক্তাসুন্দরী তখন সৌন্দর্য্যে চারিদিক আলো করিয়া পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলেন। রাজাবাহাদুর তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং তৎপরে তাহাকে বিবাহ করেন।

বিবাহের পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত রাণীর বড়ই আদর ছিল। কিন্তু অবশেষে আঘ্রাত কুসুমের ন্যায় রাজাবাহাদুর ক্রমে ক্রমে তাহার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। দরিদ্রের কন্যা, কত সুখের কল্পনায় হৃদয় রঞ্জিত করিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল। বৎসর কয়েক যাইতে না যাইতে তাহার

সকল আশায় ছাই পড়িল। তখন তিনি বিংশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, দুটী পুত্রের জননী।

রাজাবাহাদুর তাহাকে সঙ্গে লইয়া মাঝে মাঝে কলিকাতায় বেড়াইতে যাইতেন। সেখানে অনেক বন্ধুবান্ধবের সহিত তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইত। তিনি আদর করিয়া তাহাকে তাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। প্রথম প্রথম তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন কিন্তু শেষে আর লজ্জা থাকিলনা।

এদিকে, রাজার ব্যবহার দিন দিন কেমন বিসদৃশ হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি গৃহে আর বড় একটা থাকিতেন না যখন আসিতেন, তখন সুরোন্মত্ত হইয়া, পাগলের ন্তায় প্রলাপ বকিতেন ও স্ত্রীকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতন করিতেন। হিন্দুরমণী, বাল্যকাল হইতে কথাবার্ত্তায়, চলিতে ফিরিতে, স্বামীর যে আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইয়াছিল, বিবাহের রজনীতে যে স্বামীমূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের উদ্রেক করিয়াছিল, রাজার কঠোর নির্ম্মম ব্যবহারে, তাহা তাহার সম্মুখ হইতে দিন দিন অপসারিত হইতে লাগিল! রাজার ইয়ারদের মধ্যে দুই একজন, তাহার মনের ঈদৃশ ভাবে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল এবং রাজার বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা নানাকথা বলিয়া তাহাকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। শেষে, এমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল, যখন রাজার প্রতি রাণীর মনে ভয়ানক ঘৃণার ভাবের সঞ্চার হইল।

ইহার পর, ঈদৃশ ইয়ারবেষ্টিতা রাণীর পক্ষে যাহা হওয়ার তাহাই হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন। রাজার অগোচরে, পাপের লীলা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে লাগিল। তার পর, একদিন রাণীকে বাটীতে পাওয়া গেলনা। মাখনলাল নামে রাজার এক ইয়ারের সঙ্গে তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

অনেক অনুসন্ধান ও অনেক অর্থব্যয়ের পর রাজার অনুচরগণ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তখন তিনি স্ত্রীকে লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। উভয়ের ভিতর কথাবার্ত্তা, দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হইল। রাজাবাহাদুর এক বারাঙ্গনার সহিত বাহির বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু, খাওয়া দাওয়া তখনও মাঝে মাঝে ভিতর বাটীতে হইত। একদিন কোনও গুরুতর

কারণ বশতঃ, রাজা রাণীকে প্রহার করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি বারবনিতাসহ ছাতের উপর পায়চারী করিতেছেন, এমন সময় গুড়ুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল এবং সেই মুহূর্ত্তে সন্ করিয়া তাহার কাণের পাশ দিয়া একটা গুলি চলিয়া গেল। তিনি স্পন্দিতবক্ষে মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, ভিতর বাটীর ছাতের উপর হইতে মাখনলাল ও রাণী তাড়াতাড়ি দৌড়াইয়া চলিয়া গেল। তৎপরদিবস হইতে, তিনি বাটীর ভিতর যাওয়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন।

পূর্ব্বেই, রাণীর গর্ভজাত দুইটী পুত্রসন্তানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। নয়নাভিরাম বালকযুগল, সাধারণ লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পিতামাতার নয়নমণি হইয়া থাকিত কিন্তু এই নির্ম্মম, ভোগ-বিলাস-বিভোর বিশাল রাজবাটীতে তাহাদের দিকে দৃষ্টি করিবার কেহই নাই! রাজাবাহাদুর সর্ব্বদা বিলাসিতার ভিতর ডুবিয়া থাকিতেন। সুরাপান ও ইয়ারদের সহিত অসার ও কুৎসিৎ হাস্যকৌতুকে তাহার সময় কর্ত্তিত হইত। রাণী ও একবার পুত্রদুটীর দিকে ফিরিয়া চাহিতেন না। নির্ম্মল গার্হস্থ্য জীবনের ভিতর যে বিমল আনন্দ বিরাজ করে, তাহা উপভোগ করা তাহাদের ভাগ্যে ছিলনা।

রাজার ভগ্নীদ্বয়মধ্যে কেহই সুন্দরী পদবাচ্য নহে। জ্যেষ্ঠা হিরণ্ময়ী, কিঞ্চিৎ দীর্ঘাবয়বা। সচরাচর রমণী যাদৃশ আকৃতিসম্পন্না হইয়া থাকে, তদপেক্ষা একটু অধিকতর দীর্ঘাকৃতি। শরীরের বর্ণ তেমন সুন্দর নয়। মেজাজটা ও তত ভাল নয়, কথায় কথায় চটিয়া উঠিত। তবে, মোটের উপর মনটী সরল।

কনিষ্ঠা কিরণ্ময়ী সর্ব্ববিষয়েই তাহার বিপরীত। খার্ব্বাকায়া, বর্ণ খুব ফরসা না হইলেও একেবারে মন্দ নহে। মুখখানা গোলগাল, কাজকর্ম্ম চলাফেরা সকল বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেকটা মাতার অনুরূপ। প্রকৃতি যে চেহারাখানি তাহাকে দিয়াছিল, তাহার প্রতি জ্যেষ্ঠাভগ্নীর ন্যায় বীতশ্রদ্ধা না হইয়া, সে তাহার ভিতর যতটা সৌন্দর্য্য নিহিত ছিল, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিত। প্রখরবুদ্ধিসম্পন্না বলিয়া তাহার খুব সুখ্যাতি ছিল। স্বভাবটীও নিতান্ত নরম, কেহ কোন অপ্রিয়-কথা বলিলেও কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিত। কিন্তু স্বকার্য্য সাধনে এমন তৎপরা কেহই ছিলনা। ছলে, মিষ্টি কথাটী বলিয়া, চোখের চাহনির ভঙ্গীতে সে লোকের মন কাড়িয়া নিত এবং

সুযোগ বুঝিয়া নিজের কার্য্যোদ্ধার করিত। তাহার কেহ শত্রু ছিলনা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে রাজবাটীর ভিতর কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিত না।

এই তো গেল রাজপরিবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের কথা। রাজ জামাতা দুটীকে এই শ্রেণীর বহির্ভূত রাখা গেল, কারণ স্বাধীনভাবে প্রবৃত্তি-চালনাই যদি মনুষ্য-জীবনের প্রধান লক্ষণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে উহার অন্তর্ভূত করা সুকঠিন হইয়া ওঠে।

রাজবাটীতে অন্যান্য কত লোক যে বাস করিত, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। সমুদ্রকূলের বালুকণা, আর বাঙ্গলার ধনী লোকের আত্মীয়-স্বজন গণিয়া ঠিক করা উভয়ই অসম্ভব। দেখিয়াছি, দরিদ্র অবস্থায় যখন আমার আহার জুটিতনা, তখন আমি মরিলেও আমার সম্মুখে কেহ দর্শন দেয় নাই। বাল্যকালে যখন একদিন আমাকে অনাহার-ক্লিষ্ট দেখিয়া, মা খুল্লতাতের গৃহ হইতে, একসের চাউল আহরণ করিতে যাইয়া বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং আমার দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, আমার বেশ মনে পড়ে, তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "কেন মা! শুনেছি আমার এক মাসী মা আছেন, তার কাছে চিঠি লিখনা কেন?" মা তদুত্তরে আমতা আমতা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার আবার মাসীমা?" তাহাতে আমি সে সময় ঠিক করিয়া-ছিলাম, মাসীমা-রূপিনী আমার কোনও আত্মীয়া নাই। তার পর, আমি স্বদেশ-ত্যাগী হইয়াছি। বিদেশে, নিতান্ত পরের সাহায্যে, আমার অর্থের সমাগম হইয়াছে। কিন্তু, রজতখণ্ডের কি চমৎকার আকর্ষণী শক্তি! চুম্বক যেমন লৌহ খণ্ডকে আকর্ষণ করে, উহা বুঝি তদপেক্ষাও সহস্রগুণ অধিক বলে আত্মীয়গণকে আকর্ষণ করে। আমি বাস করিতেছি পঞ্চনদের লাহোর নগরে, কিন্তু ইহার কল্যাণে, সুদূর পুণ্যভূমি বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট আত্মীয়-স্বজনের সমাগমে আমার গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। আর ঐ দেখ, আমার পরমারাধ্য স্বর্গগত পিতৃদেবের নাম লইয়া চীৎকার করিতে করিতে, মাঝে মাঝে পাঁচ সাতবার পরে এক একবার আমার নামটী সংযোগ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, আলুলায়িতকুন্তলা কে ঐ বর্ষিয়সী স্থূলকায়া শ্যামাঙ্গী রমণী অগ্রসর হইতেছেন?—আমার মাসীমা! অহো! আমার অদর্শন তিনি আর কত কাল সহ্য করিবেন?

মাসীমা? মাসীমাই বটে। দেখিলেননা, নতজানু হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে পঞ্চবিংশতিমুদ্রা রাখিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া লইলাম! মাসীমার শোকাবেগের অপশম হইল! ইহাকেই বলে, অর্থের মোহিনী শক্তি!

রাজবাটীতে কত লোকের বাস, তাহা আমি নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। রাজাবাহাদুর, রাণী, বুড়রাণী, দিদিঠাকুরাণিদ্বয়, বড় রাজকুমার, ছোট রাজকুমার, রাণীর বড় ভাই, মেজ ভাই, ছোট ভাই, মাসতুতো ভাই, মাসতুত ভাইর মামাত ভাই, তাহার খুড়তাত ভাই, তাহার শ্যালক, রাণীর ছোট ভাইর স্ত্রী, বড়ভাইর কন্যা, তাহাদিগের পুত্রকন্যাগণ, কন্যাগণের স্বামী, রাজার মেসো, রাজার শ্যালিকা ১নং, ২নং, ৩নং, ৪নং, ৫নং সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, রাজার পিসিমা, মাসীমা, খুড়িমা, দিদিমা (কোন্ সম্পর্কে ইহারা এত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তাহা বিদিত নহি), খুড়তাত ভাই, পিসতাত ভাই, মামা, মামাত ভাইর মামাত ভাই, তাহার শ্যালক পুত্র ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাহা ছাড়া দেওয়ানজী, খাতাঞ্জী, জমানবীশ, সুমারনবিশ, নিকাশনবীশ, তহশীলমোহরের, ঠিকামোহরের, গোমস্তা, গোমস্তার মোহরের, চাকর, বাকর, ঝি, ঠি, (যাহারা মাহিয়ানা পায় না) সকলের আদরিণী নিতম্ব-বিম্বে স্বর্ণমেখলাধারিণী, সর্ব্বত্র গমনশীলা, রাজার পেয়ারের দাসী নয়নতারা ইত্যাদি আরও অনেক।

এতগুলি লোকের সমাবেশ বশতঃ রাজবাটীটি সকল সময়ই গম গম করিত কিন্তু সুখ ও শান্তি তাহার ত্রিসীমানার ভিতরও ছিলনা, কেবল বিবাদ, বিসম্বাদ, অনাচার।

* * * * *

একদিন প্রাতঃকালে রাজবাটীর বহির্ব্বাটীতে স্বীয় প্রকোষ্ঠে বসিয়া দেওয়ানজী ত্রিলোচন মুন্সী বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় বিজয় ও আনন্দ সেখানে উপস্থিত হইল।

দেওয়ানজী মহাশয়ের বয়স হইয়াছে, চুল পাকিয়াছে। প্রায় সমস্ত জীবন এই রাজবাড়ীর কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। রাজাবাহাদুরের পিতার আমলের কর্ম্মচারী—বিশ্বাসী, কর্ম্মঠ। সকলেই তাহাকে ভক্তি ও মান্য করিত। এমন কি, রাজাবাহাদুর ও তাহাকে একটু ভয় করিয়া চলিতেন।

বন্ধুদ্বয়কেদেখিয়া "বসুন, কি চাই ?" বলিয়া তিনি কাণে কলম গুঁজিলেন।

বিজয় বলিল, মহাশয়! সংবাদ পেলেম, আপনাদের এখানে নাকি একটী প্রাইভেট টিউটারের কাজ খালি আছে।

দেওয়ানজী মহাশয় উত্তর করিলেন,—হাঁ।

বিজয় আনন্দমোহনকে দেখিয়া বলিল, ইনি সেই কাজের প্রার্থী। যদি আপনাদের মনোমত হয়, তা' হলে একে নিযুক্ত করিতে পারেন। ইনি বি, এ, পড়্ছেন।

দেওয়ানজী মহাশয়। বেশ ভাল কথা, দরখাস্ত রেখে যান।

ইহার পরে, তিনি বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে নানাপ্রকার আলাপ সালাপ করিতে লাগিলেন। কথা-প্রসঙ্গে আনন্দমোহনের পিতার কথা উঠিল। দেওয়ানজী মহাশয় বলিলেন, 'ভাল, আপনি নীলমাধব বাবুর ছেলে, এতক্ষণ বলেন নি? তাঁর সঙ্গে আমার কত আলাপ পরিচয় ছিল। এমন দেবতার মত লোক দেখা যায়না। আশা করি, এ সামান্য চাকরী আপনাকে যোগাড় করে দিতে পারব। কাল একবার আসবেন।"

তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া, তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। বিজয় তখনও তাহার দাদার সঙ্গে তাহাদের নিজ বাড়ীতেই থাকিত, আনন্দমোহন নিকটস্থ একটী ছাত্রমেচে বাস করিত।

বিজয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি লাভ করিয়াছিল। তাহার দ্বারাই আনন্দমোহনের অনেকটা পড়ার খরচ চলিত, কিন্তু, সে আর অধিক কাল বন্ধুবরের স্কন্ধে ভারস্বরূপ হইয়া থাকিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাই, বিজয়ের নিতান্ত আপত্তি সত্বেও উভয়ে এই প্রাইভেট টিউটারের যোগাড়ে বাহির হইয়াছিল।

চেষ্টা ফলবতী হইল! ত্রিলোচন মুন্সীর কল্যাণে আনন্দমোহন মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে রাজকুমারদ্বয়ের শিক্ষক ও গার্জিয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

তোমরা হয়তো মনে করিতেছ, ইহা অসম্ভব। এত বড় জমীদার, বার্ষিক প্রায় লক্ষ মুদ্রা আয়, তিনি কি ইচ্ছা করিলে পুত্রদ্বয়ের জন্য উপযুক্ত বেতনে একজন সুশিক্ষিত শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন না? আশ্চর্য্যের কথা কিছু নহে। তিনি তাহার আদরের অগ্রতবর্তী পরিচর্য্যার জন্য যে প্রকার চিন্তা করিতেন,

অথবা তাহার বারাঙ্গনার টিয়াপাখীটীর বিবাহোপলক্ষে যে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার শতাংশের একাংশ চিন্তাও অর্থ যদি তাহার স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণোদ্দেশে ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে তাহার গৃহ আজ স্বর্গধামে পরিণত হইত।

ক্রমশঃ।

---

# বিক্রমপুর আবিষ্কার।

বল্লালী বিক্রমপুর করিয়া বিজয়
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ক্ষত্রিয় নগেন
উত্তরিলা বর্দ্ধমানে—কাল মাটীগার
বিদ্যার বেহায়াপনা হেরিয়া লজ্জায়
উঠেছিল রাঙ্গা হয়ে। বিজয়ের করে
বিজিতে অর্পিতা শূর। তাহে পদ্মাপারে
বিষম বিভ্রাট বাঁধে। মাথে হাত দিয়া
ভাবে-রায় গেল বুঝি শ্রীবিক্রমপুর।
বৃথা শঙ্কা ইতিকথা নহে ইতিহাস
দেশ জয় নাহি হয় বৃথা বাক্য বলে।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ।
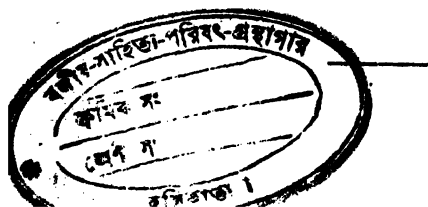
# চিকিৎসা।

## গল্প।

একটি একটি করে সীতেশ সন্দেশ ও কেকগুলি শেষ করিয়া ফেলিল, দেখিয়া নির্ম্মল হাসিয়া বলিল "তুমি বেশ আছ সীতেশ দা, তোমার শরীরে রোগের কোন লক্ষণ দেখিতেছি না।"

সীতেশ মুখে একেবারে চারিটা পান গুঁজিয়া দিয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে উত্তর দিল "তুইত ভারি বুঝিস্ তোর বিশ্বাস আছে যে খাইতে পারিলে মানুষ মরে না।"

এই সময়ে একজন রোগী আসিল, নির্ম্মল সিগারেট ধরাইতে যাইতেছিল তাহা ফেলিয়া দিয়া রোগীর নাড়ী টিপিতে বসিল। সীতেশ আরাম কেদারায় শুইয়া একমনে সিগারেট টানিতে লাগিল। রোগী দেখা শেষ হইল, নির্ম্মল সীতেশের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সীতেশ দা, ব্যাপারখানা কি বলত? আমি ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতে পারি তোমার দেহে রোগের লেশ মাত্র নাই। এটা কি তোমার একটা নূতন বাতিক নাকি?"

"কি?"

"রোগ, রোগ। খাস দখল দেখিয়াছ?"

"দেখ্ নির্ম্মল তুই লেখা পড়া শিখিয়াছিস বটে, কিন্তু তোর এখনও বুদ্ধি পাকে নাই। তুই নীলরতন বাবু, না হয়ত ডাক্তার দত্তকে ডাকিবার ব্যবস্থা কর।"

"আমিত পাগল হই নাই।"

বেহারা আসিয়া চায়ের বাসন সরাইয়া লইয়া গেল, গড়গড়ায় তামাক দিয়া গেল। নির্ম্মল নলহাতে করিয়া আবার সীতেশকে জিজ্ঞাসা করিল "সীতেশ দা, কি হইয়াছে, খুলিয়া বলনা? আমার কথা শোন, বুড়া বয়সে লোক হাসাইও না। আমি ভাবিয়াছিলাম তোমার বাতিক বৃদ্ধির ব্যারাম সারিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি তোমার ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ বাতিক আছে।"

"বাস্তিক নয় নির্ম্মল, আমার বুকের ভিতরটা যেন খালি হইয়া গেছে, কিছুই ভাল লাগে না, আমি যেন হাওয়ার উপর দিয়া চলি।"

"এ সকলত প্রেমের লক্ষণ। সীতেশ দা, বয়সটা একটু বেশী হইয়া গেছে এই যা দোষ, তা নইলে রোগের লক্ষণগুলি ঠিক ঠাক মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছ। দোহাই তোমার, আরসীতে একবার মুখখানা দেখিও, বুড়া বয়সে আর ঢলাইও না। আমার বয়সটা তোকে সামলাইতে সামলাইতে গেল।"

"তোকে কি আমি বিবাহ করিতে বারন করিয়াছিলাম? না আমারই তোর বিবাহ দিবার জন্য পাঁচ বৎসর ধরিয়া তোর খোসামোদ করিয়া মরিতেছি।

"তাহাতে তোমার বা বৌদিদির কোন ত্রুটী নাই, বরঞ্চ আমিই তোমার অবস্থা দেখিয়া বিবাহের ত্রিসীমানায় পদার্পণ করিতেছি না।"

"নির্ম্মল সে কাল আর নাই।"

"কেন কি হইয়াছে?

"আমার সুখের দিন কাটিয়া গিয়াছে।"

"এইত দেখিতেছি তোমার রোগের মূল। সুখের দিন কাটিল কেন? বৌদিদির দড়া গাছটিকি পুরাতন হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে?"

"তোমার বৌদিদির মতি গতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

নির্ম্মল বসিয়াছিল এই কথা শুনিয়া লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল "দেখ সীতেশ দা, আর যা বল তা সহ্য করিব কিন্তু আমার বৌদিদির অপবাদ সহ্য করিব না—"

সীতেশ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—না আমি কি তাই বলিতেছি, তবে—

নির্ম্মল সীতেশের মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল "আবার, সাবধান সীতেশ দা, তোমার পাপ জিহ্বা সংযত কর।" সীতেশ হাসিয়া কহিল "যখন সাধু ভাষায় কথা কহিতেছিস্ তখন নিশ্চয় রাগিয়া গিয়াছিস্।" নির্ম্মল বাক্স হইতে একটা সিগারেট মুখে দিয়া দেশালাই জ্বালিতে জ্বালিতে কহিল "যা বলিয়াছ তা বলিয়াছ, খবরদার আর অমন কথা মুখে আনিও না।"

নির্ম্মল, সত্যই উর্ম্মিলার মনের ভাব কেমন পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা নয়— "তবে কি?"

"আমার উপর তাঁর দয়া যেন একটু কমিয়াছে।"

"কেন? পান সাজিয়া দিতে বিলম্ব হয়? না খোকা কাঁদিলে উঠিয়া যাইতে হয়?"

নিৰ্ম্মল, খোকা হইবার পর হইতে উৰ্ম্মিলা যেন একেবারে পর হইয়া গিয়াছে।"

"সীতেশ দা, আমি জানিতাম তুমি মানুষ, এখন দেখিতেছি তুমি একটি আস্ত গাধা। আমি ভুল বুঝিয়া তোমার জন্য সাত জোড়া জুতা ক্ষয় করিয়াছিলাম, এবং তোমার মত জানোয়ারের সহিত এমন সুন্দরী, সাধ্বী, সতীর বিবাহ দেওয়াইয়াছিলাম।"

"সে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারত আর উপায় নাই—"

"তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, আমি সন্ধ্যা বেলায় বৌদিদির সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব। যদি নেহাৎ মাথা গরম হয়, তাহা হইলে কবিরাজের নিকট হইতে তেল আনাইও। আমাদের শাস্ত্রে তোমাদের মত রোগীর একমাত্র ব্যবস্থা আছে, সে পাগলা গারদ।"

সীতেশ ও নির্ম্মল এক সঙ্গে স্কুলে ও কলেজে পড়িয়াছে। নির্ম্মল শান্ত, ধীর ও পড়া শুনায় মনোযোগী। সীতেশ অস্থির, রাগী ও দুষ্ট। তথাপি উভয়েই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সীতেশ কবিতা লিখিত, বক্তৃতা করিত, সখের থিয়েটারে অভিনয় করিত, নির্ম্মল ততক্ষণ নোট লিখিত অথবা পড়িত। সীতেশ যখন সাহিত্য চর্চ্চা, দেশ উদ্ধার এবং রঙ্গাভিনয় শেষ করিয়া আসিত, তখন নির্ম্মল শান্ত হইয়া বসিয়া তাহার অসাধারণ প্রতিভার গল্প শুনিত। সীতেশ তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। সে কখনও নির্ম্মলকে তাহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিত না।

নির্ম্মল বুদ্ধিবলে ও পরিশ্রমে এবং সীতেশ অদৃষ্টের জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি পরীক্ষায় পাশ হইয়া গেল। নির্ম্মল যখন কলেজ ছাড়িয়া ডাক্তারী পড়িতে গেল, সীতেশ তখন কলেজ ছাড়িয়া বাণীর কুঞ্জে ব্রহ্মচারী হইল অর্থাৎ একমনে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিল। পুরুষদিগের জীবনে এমন একটা সময় আছে যখন তাহাদিগকে একাগ্রচিত্তে কবিতা সুন্দরীর আরাধনা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময়টা কিন্তু সকলের জীবনে এক সময়ে আসে না। এই লক্ষণ দেখিয়া যুবকদের অভিভাবকেরা বুঝিতে পারেন যে গৃহে একটি নোলকপরা বধূমাতার আবির্ভাবের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।

পুত্র ঘন ঘন কবিতা লিখিতেছে দেখিয়া সীতশের পিতা পুত্রের বিবাহ দিবার জন্ত বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন সীতেশ চন্দ্র দুত মুখে তাহার মাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে মনোমত সুন্দরী কন্তা পাইলে সে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে নতুবা নহে। সকলে মিলিয়া সুন্দরী পাত্রীর সন্ধানে বাহির হইল, পাত্রী অনেক মিলিল, কিন্তু নিখুঁত সুন্দরী মিলিল না। সীতেশ ঘন ঘন কবিতা লিখিতে লাগিল, নির্ম্মল নোট লেখা ছাড়িয়া, ঘটকের বাড়ী আশ্রয় লইল। মাসিক পত্রের সম্পাদক ও পাঠকবর্গ যখন সীতেশের কবিতার জন্ত দেশত্যাগে প্রস্তুত, তখন নির্ম্মল পরীর মত সুন্দরী এক পাত্রী আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, দেশ জুড়াইল।

যথা সময়ে সীতেশের সহিত উর্ম্মিলা দেবীর বিবাহ হইয়া গেল, তাহার পর সীতেশ কবিতা ত্যাগ করিয়া অন্দরে আশ্রয় লইল। নির্ম্মল সেই সুযোগে ডাক্তারি পাশ করিয়া ফেলিল। পৌত্রের অভাবে পৌত্রীর মুখ দর্শন করিয়া সীতেশের পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন. সীতেশ তখন অন্দর ছাড়িয়া, পৈত্রিক বৈঠকখানায় পিতৃদত্ত গড়গড়া ও তাকিয়া অধিকার করিল। নির্ম্মল ডাক্তারি করিতে প্রথম প্রথম নিত্যই সীতেশের বাড়ীতে আসিত, এবং বউদিদিকে আবিষ্কার করিয়াছিল বলিয়া অনেক দাবি দাওয়া করিত, পরে ভূরিভোজনে সন্তুষ্ট হইয়া সীতেশের কন্যার রসগোল্লার রসসিক্ত মুখের চুম্বন লইয়া মামলা মিটাইয়া ফেলিত। নির্ম্মলের পশার যেমন বাড়িতে লাগিল তাহার বন্ধু গৃহে গমন তেমনি কমিতে লাগিল। অনেক সাধ্য সাধনা না করিলে নির্ম্মলকে সীতেশদের বাড়ী পাওয়া যাইত না।

নির্ম্মল বিবাহ করে নাই, লোকে বলিত সীতেশের অবস্থা দেখিয়া নির্ম্মল শুনিতে পাইলে বলিত যা বলিতেছ তা কতকটা সত্য বটে, তবে দাদার অবস্থা এখনও তেমন সঙ্গীন হইয়া উঠে নাই। বিবাহের পরে দাদার গায়ে লোম বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া যায় নাই, কিংবা লেজ দেখা দেয় নাই। সে বলিত যে সীতেশের অর্থের অভাব নাই, সুতরাং তাহার অল্প বয়সে বিবাহ করা সম্ভব, কিন্তু সে দরিদ্র, অর্থ উপার্জ্জন না করিতে পারিলে, পরিবার প্রতি-পালন করিবে কেমন করিয়া। সুতরাং তাহার পক্ষে তখন বিবাহ করা অসম্ভব। যখন নির্ম্মলের পশার বাড়িল তখন তাহার আর বিবাহ করিবার অবসর রহিল না। এই সময়ে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে।

নির্ম্মল প্রতিদিন সকালে ও বিকালে কলিকাতার বড় রাস্তার উপরে একটী ঘরে রোগী দেখিত। তাহার পশার বাড়িয়া উঠিলে তাহাকে আর সকালে বিকালে পাওয়া যাইত না। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে সমস্ত দিনের পরিশ্রম শেষ করিয়া সন্ধ্যা বেলায় সেই ঘরটিতে আসিয়া বসিত, তাহার বন্ধু বান্ধব সেইখানে তাহার সাক্ষাৎ পাইত। সীতেশ প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা নির্ম্মলের রোগী দেখিবার ঘরে আসিয়া বসিত। কয়েক দিন ধরিয়া নির্ম্মল সীতেশকে বড়ই অন্যমনস্ক দেখিতেছিল, আজ সন্ধ্যাবেলা সে হঠাৎ সীতেশকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল। সীতেশ উত্তর দিল যে তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছে। সীতেশের মধ্যে মধ্যে এইরূপ কারণ বিহীন কঠিন পীড়া হইত, নির্ম্মল চিকিৎসা শাস্ত্রে সে রোগের লক্ষণ খুঁজিয়া পাইত না, সুতরাং সীতেশের কথা তাহার নূতন বলিয়া বোধ হইল না। সীতেশ চলিয়া গেলে সে এক খানা নূতন বই লইয়া পড়িতে বসিল এবং সীতেশের পীড়ার কথা ভুলিয়া গেল।

সেই রাত্রিতে তাহাকে এক ধনীর গৃহে ডাকিয়া লইয়া গেল। রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া নির্ম্মল সে রাত্রিতে আর গৃহে ফিরিতে পারিল না। সে পরদিন প্রভাতে গৃহে ফিরিয়া দেখিল যে সীতেশের বৃদ্ধ সরকার তাহার জন্য বসিয়া আছে। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল "সরকার মহাশয় কি হইয়াছে?" সরকার বলিল "বৌমা আপনাকে লইয়া যাইতে বলিয়াছে, রাত্রিতে দুই তিন বার ডাকিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি বাড়ী ছিলেন না।" সরকারকে বিদায় দিয়া নির্ম্মল চিন্তিত মনে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে গেল। সে জানিত বিশেষ বিপদে না পড়িলে উর্ম্মিলা কখনও তাহাকে ডাকিয়া পাঠান নাই।

নির্ম্মল সীতেশের গৃহে প্রবেশ করিয়া চাকরদিগকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কোথায়?" তাহারা উত্তর দিল যে রাত্রি হইতে তাঁহার অসুখ করিয়াছে তিনি অন্দরে শুইয়া আছেন। নির্ম্মল সীতেশের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে সদ্যস্নাতা উর্ম্মিলা পুত্র কোলে লইয়া উঠানে দাড়াইয়া আছেন। তিনি নির্ম্মলকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "ঠাকুরপো এলে? তুমি আস নাই বলিয়া সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারি নাই। তোমার দাদার বুকে কি রোগ হইয়াছে, তুমি একবার দেখিয়া যাও।" উর্ম্মিলা নির্ম্মলের সহিত শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল।

নির্ম্মল দেখিল সীতেশ ঘুমাইয়া আছে, সে অতি সন্তর্পণে তাহার ডান হাত

খানি উঠাইয়া লইয়া, নাড়ী পরীক্ষা করিল, ষ্টেথেস্কোপ দিয়া সীতেশের হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময়ে সীতেশ জাগিয়া উঠিল, সে জাগিয়াই বুকে হাত দিয়া একটা যন্ত্রনা-ব্যঞ্জক শব্দ করিয়া উঠিল, নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে ?" সীতেশ কহিল "তোকে বলিয়া কি হইবে ? তুইত আর আমার রোগ বিশ্বাস করবি না।"

নির্ম্মল সন্ধ্যার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল সে বলিয়া উঠিল "ওঃ—" বলিয়াই হঠাৎ উর্ম্মিলার মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। ভয়ে ও আশঙ্কায় উর্ম্মিলার সদ্য বিকসিত কমলের ন্যায় মুখখানি শুখাইয়া গেল। তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য নির্ম্মল সীতেশের হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ ফুস্ অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিল, এবং তাহার পর উর্ম্মিলাকে বাহিরে যাইতে অনুরোধ করিল। উর্ম্মিলা কক্ষান্তরে গিয়া খোকাকে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া, ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

উর্ম্মিলা চলিয়া গেলে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে ? বুড়া বয়সে খেপিলে নাকি ?" সীতেশ রাগিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল "তুই চলিয়া যা, আমাকে শান্তিতে মরিতে দে।" নির্ম্মল সীতেশের মরণের কথা শুনিয়া মুখে একখানি রুমাল গুঁজিয়া খুব এক চোট হাসিয়া লইল তাহার পর বলিল "তোমার মরিতে এখন অনেক বিলম্ব আছে, পৃথিবীর লোককে এখন অনেক জ্বালাইবে পোড়া-ইবে তবেত মরিবে।" সীতেশ রাগে ফুলিতে লাগিল। নির্ম্মল তখন হাসিতে হাসিতে বলিল "দেখ সীতেশ দা, তোমার খাতিরে এইবারটি মিথ্যাকথা বলিব, কিন্তু আর কখনও বলিব না। সীতেশ আরও রাগিয়া বলিয়া উঠিল "মিথ্যা কথা ?"

"রোগত তোমার বুকে নহে, রোগ তোমার মাথায়। এবার যা করিলে ফের যদি এমন কর, তাহা হইলে সকলকে ডাকিয়া তোমার গুণের কথা বলিয়া দিব।" সীতেশ কোন উত্তর দিলনা দেখিয়া নির্ম্মল শয়ন কক্ষের দুয়ারে দাঁড়া-ইয়া ডাকিল "বৌদিদি ?" চোখের জল মুছিয়া, খোকার ক্রন্দন থামাইয়া, মাথার চুল ও কাপড় ঠিক করিয়া আসিতে উর্ম্মিলার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গেল, সেই অবসরে নির্ম্মল বলিয়া লইল "দেখ সীতেশ দা, আমি ভিন্ন অন্য কোন ডাক্তার তোমার রোগ নির্ণয়ও করিতে পারিবেনা, চিকিৎসাও করিতে পারি-বেনা। আমি যে ঔষধ দিয়া যাইতেছি, তাহাতে তোমার বুকের বেদনা ও

মাথার গরম এখনই সারিয়া যাইবে, কিন্তু তাই বলিয়া এখনই যেন উঠিয়া বসিও না তাহা হইলে সকলেই তোমায় ধরিয়া ফেলিবে।

উর্ম্মিলা দেবী আসিলে নিম্মল বলিল দেখ বৌদিদি দাদার যেরূপ ব্যারাম দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহার শুশ্রূষা আবশ্যক, আপনি এখন অন্য কাজ ছাড়িয়া দিন কতক উঁহার সেবা করুন! আমি ঔষধ দিয়া যাইতেছি, উহা তিনঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবেন। আমি আবার সন্ধ্যার সময় আসিব।" এই বলিয়া সে সুগন্ধি সরবতের সহিত পান করিবার একটা দ্রব্য গুণহীন ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আসিয়া নিম্মল দেখিল যে তাহার ঔষধ ধরিয়াছে, সীতেশ চন্দ্র বারান্দায় আরাম কেদারায় শুইয়া গড়্গড়ায় তামাকু সেবন করিতেছেন, পাশে উর্ম্মিলা দেবী বসিয়া আছেন। নিম্মল জিজ্ঞাসা করিল "কেমন আছ ?"

সীতেশ কহিল "অনেকটা ভাল।"

"এইবার আমার কথা শুনিবেত ?"

"তোর কথা আবার কবে শুনি নাই ?"

"বৌদিদি দাদাকে এখন লুচি মাংস অথবা অন্য কোন গুরুপাক দ্রব্য খাইতে দিবেন না, তাহা হইলে রোগ আবার বাড়িয়া উঠিবে।"

সীতেশ তাহার কথা শুনিয়া রাগিয়া বলিল "যা, তোর আর ব্যবস্থা করিতে হইবে না।" উপবাস করিয়া সীতেশের মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, লুচি মাংস না পাইলে, রাত্রিতে তাহার আহার হইতনা, সুতরাং নিম্মলের নিষেধ বাক্য শুনিয়া সীতেশ হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল। সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে নিম্মল আসিলে, রাত্রির আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইবে। তাহার অবস্থা দেখিয়া নিম্মল হাসিয়া বলিল "আচ্ছা আজিকার মত লুচি ও মাংসের ঝোল খাইতে পার, কিন্তু ভবিষ্যতে আর নহে।" এই বলিয়া নিম্মল হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

দুই তিন দিন সীতেশকে না দেখিতে পাইয়া নিম্মল মনে করিল, হয় তাহার মস্তিষ্ক শীতল হইয়াছে। তিন দিনের দিন সীতেশকে হতাশ ভাবে তাহার বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নিম্মল বলিয়া উঠিল "আবার কি ?" সীতেশ কহিল "তোমার বৌদিদি আবার আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, চাল ডাল মাপিতে মন দিয়াছে।"

"তুমি কি বলিতে চাও যে বৌদিদি আবার কাঁচিয়া আটপাতা বা ষোলপাতা চিঠি লিখিতে ধরিবেন ?"

"দেখ নিম্ম ল, আমার বুকের ভিতরটা একেবারে খালি হইয়া গেছে।"

"লুচি পাঁঠা ছাড়িয়াছ ?

"না।"

"তবে আমার চিকিৎসায় তোমার রোগ সারিবেনা, তুমি হাওয়া খাইতে বিদেশে চলিয়া যাও। সীতেশ নিম্ম'লের কথা মত সপরিবারে বিদেশ যাত্রা করিল।

বিদেশে গিয়া সীতেশ প্রথমে নির্ম্মলকে ঘন ঘন চিঠি লিখিত। চিঠির সংখ্যা যত কমিতে লাগিল, নির্ম্মল ততই মনে করিতে লাগিল যে, সীতেশের বায়ু রোগ কমিয়া আসিতেছে। ক্রমে যখন চিঠি বন্ধ হইয়া গেল, নির্ম্মল তখন আশ্বস্ত হইল! কিছুদিন পরে নিম্ম'ল সীতেশের নিকট হইতে এক তার পাইল. সীতেশ লিখিয়াছে "বড় বিপদে পড়িয়াছি, শীঘ্র আইস।" তার পাইয়া নিম্ম'ল ভাবিল যে সময় বুঝিয়া বৌদিদি বুঝি আবার চাল ডাল মাপিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি বন্ধুত্বের অনুরোধে তাহাকে রোগী ও অর্থ উপার্জ্জন ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে হইল।

দুইদিন পরে নির্ম্মল যখন সীতেশের বাসায় পৌছিল, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, সীতেশ পুত্রকে কোলে লইয়া বিষণ্ণ বদনে বারান্দায় বসিয়া আছে। নিম্ম'লকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। নির্ম্মল যখন জিজ্ঞাসা করিল "কি হই-য়াছে ?" তখন সে বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "নিম্ম'ল উম্মি'লাকে হারাইতে বসিয়াছি, ডাক্তারেরা বলিয়াছে তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে!" বহুকষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া, নিম্ম'ল বৌদিদিকে দেখিতে চলিল।

নিম্ম'লকে রোগীর শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আর একটি রমণী অবগুণ্ঠন টানিয়া উঠিয়া গেলেন। নিম্ম'ল তখন বৌদিদির জন্য এতই ব্যস্ত যে সে নূতন স্ত্রীলোকটির কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেল! উম্মি'লার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া নিম্ম'লের মুখ শুকাইয়া গেল, সে স্থানীয় ডাক্তার ডাকাইয়া তাহার সহিত পরামর্শ করিতে বসিল।

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্ব্বেদ ও হাকিমী এই চারি রকমের চিকিৎসা ব্যতীত বাঙ্গালা দেশে আর এক রকমের চিকিৎসা আছে, সে চিকিৎসা অন্য দেশে আছে কিনা জানিনা, তবে বাঙ্গালা দেশে এখনও তাহার বিলক্ষণ পশার আছে। এই চিকিৎসা বহুবিধ, তাহার মধ্যে ভিজা কাপড়ে উপবাস, তারক নাথে হত্যা দেওয়া, আর ঠাকুর ঘরে মাথা কোটাই সর্ব্ব প্রধান। নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে সীতেশের কাল্পনিক হৃদরোগের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ণ ও স্ত্রী চিকিৎসা করাইতে গিয়া উর্ম্মিলার শীর্ণ দেহ যক্ষার আক্রমনের পথ প্রশস্থ করিয়া দিয়াছে। সীতেশের মানসিক ব্যাধি দূর করিতে গিয়া সে যে স্বয়ং উর্ম্মিলার মৃত্যুর কারণ হইয়াছে, এই কথা কষাঘাতের ন্যায় বার বার নির্ম্মলের মনকে আঘাত করিতেছিল, সে কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতে ছিল না। যাহার বুড়া বয়সের আবদারের জন্য সংসারের এই সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া, নির্ম্মল তাহাকে আর কিছু বলিতে পারিল না।

কলিকাতা হইতে ঔষধ পত্র আনাইয়া স্থানীয় ডাক্তার লইয়া, নির্ম্মল বৌদিদির চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে চিকিৎসা ও পরিশ্রমে যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে সে তাহার বৌদিদিকে মরিতে দিবেন না। উর্ম্মিলার রোগ শীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ মুখ খানি দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত শুকাইয়া যাইত, সীতেশ দাদার আবদার রাখিতে গিয়া সে তাহার স্নেহময়ী বউদিদিকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে, এই কথা ভাবিয়া দারুণ মর্ম্ম পীড়ায় সে অস্থির হইয়া উঠিত। কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইয়া সে আবার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিতে যাইত। সীতেশের তিন প্রকারের শাস্তি হইয়াছিল। প্রথম প্রকরণ মনের কষ্ট, সে যখন ভাবিত যে তাহার জন্যই উর্ম্মিলার এই দশা হইয়াছে, তখন সে নির্ম্মলের ন্যায় আত্মগ্লানিতে ছট্ ফট্ করিয়া বেড়াইত। দ্বিতীয় প্রকার সংসার চাল ডাল মাপিতে, এবং সংসার খরচের হিসাব লইতে লইতে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। তৃতীয় প্রকার খোকা, তাহার মায়ের নিকট যাইতে দেওয়া হইত না, সুতরাং সে এক দণ্ডের জন্য সীতেশকে ছাড়িত না। সীতেশ দীনান্তে একটি বারের বেশী উর্ম্মিলাকে দেখিতে যাইবার সুযোগ পাইত না।

তিন মাস পরিশ্রমের পর নির্ম্মল ও সীতেশের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল, উর্ম্মিলা দেবী বাঁচিয়া উঠিলেন। নির্ম্মল প্রায়শ্চিত্ত সারিয়া কলিকাতায় ফিরিল। উর্ম্মিলা দেবীর রোগ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সীতেশের পূর্ব্বভাব ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সে পূর্ব্বের মত কথায় কথায় চটিতে আরম্ভ করিল। তাহার সংসার খরচের হিসাব লওয়া ঘুচিল বটে, কিন্তু খোকা তাহাকে ছাড়িল না। নির্ম্মল যাইবার সময় সীতেশ যাহাতে সেখানে আরও তিনমাস থাকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া গেল।

নির্ম্মল যাইবার সময় সীতেশ তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল "এখানে ভাল তামাক পাওয়া যায় না, নির্ম্মল তুই আমাকে একসের ভাল তামাক পাঠাইয়া দিস।" নির্ম্মল বলিয়া গিয়াছিল "দিব।" সোমবারে নির্ম্মল গিয়াছে, শনিবার অবধি দেখিয়া সীতেশ তামাকের জন্ত তাহাকে পত্র লিখিতে বসিল। এমন সময়ে খোকা আসিল, সীতেশ বিরক্ত হইয়া কলম রাখিল। খোকা বলিল "কাকা এতেত্তে" সীতেশ অন্তমনস্ক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোন কাকা?" খোকা রাগিয়া বলিল "কাকা—বাবু গাগা" সে নির্ম্মলকে কাকা, গাগা পাগা বাবু ইত্যাদি নানাবিধ নাম ধরিয়া ডাকিত। সীতেশ বুঝিল নির্ম্মল আসিয়াছে। কিন্তু খবর না দিয়া নির্ম্মল হঠাৎ চলিয়া আসিয়াছে এ কথা তাহার বিশ্বাস হইল না। তাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া খোকা বলিল "বাবা এত" উত্তর না পাইয়া পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

সীতেশ বাহিরে আসিয়া দেখিল যে সত্য সত্যই নির্ম্মল আসিয়াছে, খুকী তাহার কোল অধিকার করিয়া লইয়াছে, এবং নূতন চাকরটা তাহার বুট খুলিয়া লইতেছে। সীতেশ জিজ্ঞাসা করিল "তুই আসবি তা খবর দিলি না কেন?" নির্ম্মল অপ্রতিভ হইয়া বলিল "মনে ছিল না।"

"বেড়াইতে আসিয়াছিস ত? না রোগী দেখিতে আসিয়াছিস?

তোমাকে তামাক পাঠাইতে ভুল হইয়াছিল বলিয়া, তামাক লইয়া আসিয়াছি।" নির্ম্মলের উত্তর শুনিয়া সীতেশ হাসিয়া উঠিল। নির্ম্মল বলিল "খোকার জন্ত মন কেমন করিতেছিল, তাই দেখিতে আসিলাম!"

এই সময়ে খোকা আসিয়া সকলকে অন্দরে ডাকিয়া লইয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে খুকী আসিয়া তাহার পিতার কানে কানে বলিল "বাবা মা ডাকিয়াছে, চুপি চুপি আসিও, কাকা যেন না জানিতে পারেন।" সীতেশ ব্যস্ত

হইয়া অন্দরে গিয়া দেখিল উর্ম্মিলা রন্ধনশালায়, তিনি খোকার পিতাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন "তোমাকে একটা ভারি দরকারী কাজের জন্ম ডাকিয়াছি।"

"কি হুকুম, খোদাবন্দ বান্দা হাজির।"

"আজ গোলামকে কড়া হুকুম তামিল করিতে হইবে।"

"ব্যাপার কি ?"

"ঠাকুরপোর বাতিক বৃদ্ধি হইয়াছে।"

"তুমি বুঝিলে কি করিয়া ?"

"রোজা না হইলে কি ভুত চিনিতে পারে।"

"উত্তম, হুকুম ?"

"আজ আমার বুকে ব্যথা হইবে, একটু একটু কাশী হইবে, তুই এক ফোঁটা রক্তও দেখা দিবে।"

"সে আবার কি ? দোহাই তোমার, আমার—থুড়ী—খোকার বাপের যে আর কেউ নাই ?"

"ভয় নাই, আমি অভয় দিতেছি, ইহা ভুত ঝাড়াইবার মন্ত্র !"

"দেখিও যেন শেষ রক্ষা হয়।"

"তুমি মন দিয়া রশ্মি কালিয়াটা খাইয়া দেখিও, এবং তাহার পরে তুই ঘণ্টা ফৌজদারী খালাখানার তামাক টানিও, তাহা হইলে সবদিক রক্ষা হইবে।

"দেবী, অধমের দিকে একবার কৃপা কটাক্ষপাত করিও ?"

"বেয়াদব শিগ্‌গির বাহিরে যাও, নতুবা ঠাকুরপো সন্দেহ করিবে !"

সীতেশ সুবোধ বালকের ন্যায় সুড় সুড় করিয়া বাহিরে আসিয়া বসিল।

*

রাত্রি দশটা সীতেশ ও নির্ম্মল আহারে বসিয়াছে, উর্ম্মিলা দেবী পরিবেশন করিতেছেন। আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, এই সময়ে উর্ম্মিলা দেবী নির্ম্মলকে বলিলেন "ঠাকুরপো আমার একটি কথা রাখিবে ?" নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল কি কথা ?"

"যদি রাখ তবে বলি ?

"কি কথা আগে বলুন ?"

"তবে তোমার রাখিয়া কাজ নাই ?

"রাগ করিলেন ?'

"আমার রাগে আর তোমার কি আসে যায় বল ?'

"ভাল রাখিব, কি কথা ?

সীতেশ বলিল "নির্ম্মল বৌদিদির উপর তোর টানটা বড়ই বাড়িয়া গেল।" বৌদিদি কুটিল কটাক্ষপাত করিলেন, সীতেশ শান্ত সুবোধ বালকটির মত মাথা নিচু করিয়া রগ্নি কালিয়ায় মনঃ সংযোগ করিল। নির্ম্মল আবার জিজ্ঞাসা করিল "বৌদিদি কি কথা ?"

"ঠাকুরপো একটী বিয়ে কর।"

"ওইটি মাপ করিতে হইবে।"

"তুমি কি ব্রজেশ্বর নাকি ?"

"সে আবার কি ?"

"বলি তোমার কি একটি নয়ান বৌ আছে নাকি ?"

"আপনার সঙ্গেত কথায় পারিব না। আর যা বলিবেন তা করিব, কেবল ওইটী বাদ।"

ঊর্ম্মিলা দেবী ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়াই কাশিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মুখে কাপড় দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, সীতেশ ও নির্ম্মল আহার শেষ করিয়া উঠিল। এমন সময় খুকী আসিয়া সীতেশকে বলিল "বাবা শিগ্‌গির এস, মার বুকে ব্যথা ধরেছে।" সীতেশ ও নির্ম্মল ব্যস্ত হইয়া খুকীর সঙ্গে গেলেন। নির্ম্মল দেখিল ঊর্ম্মিলা শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতেছেন। সীতেশ বলিল এখন কেমন আছ ?" ঊর্ম্মিলা বহু কষ্টে কহিলেন "কাশীটা বড় বেড়েছে বুকে ব্যথা ধরেছে।" ভয়ে নির্ম্মলের মুখ শুখাইয়া গেল, সে জিজ্ঞাসা করিল কাশীত সারিয়া গিয়াছিল, আবার কতদিন হইয়াছে ? সীতেশ উত্তর দিল "দুই তিন দিন।"

"আমাকে খবর দাও নাই কেন ?"

"আমরা ভাবিয়াছিলাম স্নান করিলে, খাইলে সারিয়া যাইবে।"

এমন সময়ে ব্যস্ত হইয়া একটি কিশোরী সীতেশের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং ঊর্ম্মিলার বুকের উপর পড়িয়া কাতর কণ্ঠে কহিল "দিদি আবার নাকি ব্যথা

ধরেছে ?" পরক্ষণেই নির্ম্মলকে দেখিতে পাইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিলেন। নির্ম্মল লজ্জায় জড় সড় হইয়া দুয়ারের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঊর্ম্মিলা কহিলেন ব্যথা ধরিয়াছিল, এখন একটু ভাল আছি।"

অল্পক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া ঊর্ম্মিলা নির্ম্মলকে ডাকিয়া বলিলেন "ঠাকুর পো আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আমি আর অধিকদিন বাঁচিব না। আমার একটি শেষ অনুরোধ রাখিবে কি ?"

"নিশ্চয় রাখিব।"

"এই স্নেহ ভগিনীর মত আমার শুশ্রূষা করিয়াছিল, তুমি যদি ইহাকে বিবাহ কর তাহা হইলে আমি সুখে মরিতে পারি। বল আমার কথা রাখিবে ?

নির্ম্মল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "রাখিব।"

তখন ঊর্ম্মিলা হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বসিলেন এবং খুকীকে কহিলেন বামুন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করত, তোর মাসীমার লুচিভাজা হয়েছে কি না ?

"নির্ম্মল ব্যস্ত হইয়া কহিল উঠিলেন কেন ? ও সকল ভাবনা এখন ভাবিবে না।"

"ঠাকুর পো তোমার কথা শুনিয়া ব্যথা সারিয়া গিয়াছে।"

"কি রকম ?"

এই সময়ে খুকী বলিল "মা ঠাকুরকে মাসীমার লুচি ভাজিতে বলিয়া, আমাকে দিয়া মাসীমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে তাহার বুকে বড় ব্যথা ধরিয়াছে।" ঊর্ম্মিলা বলিলেন "ঠাকুর পো, তোমার দাদার মত তোমার একটু বাতিক বৃদ্ধি হইয়াছিল দেখিয়া, একটু চিকিৎসা করিলাম। ইহা তোমার দাদার বখ্‌শিস। দেখিও যেন কথা ফিরাইয়াও না।'

সীতেশ বলিয়া উঠিল "সে ভয় করিও না। তুমি কি ভাবিতেছ, নির্ম্মল আমার জন্য তামাক লইয়া আসিয়াছিল ? সে নিশ্চয় পিপাসিত চকোরের ন্যায়——"

নির্ম্মল উর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে পলায়ন করিল, স্নেহ জড় সড় হইয়া কোণে গিয়া দাঁড়াইল, ঊর্ম্মিলা দেবী পুনরায় কুটিল কটাক্ষপাত করিলেন, সীতেশ হতাশ ভাবে কহিলেন "ওরে তামাক দিয়ে যা——"

শ্রীকাঞ্চন মালা দেবী

# কালিদাস।

আজি ওগো মহাকবি তব সিংহাসন,
সুরকবি কুল মাঝে শোভে অমরায়,
আজি তব গীতিসনে কিন্নরী নর্ত্তন,
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা শিষ্যা তব পায়!
কুমার, জয়ন্ত, বুধ, ত্যজি শরাসন
শিখিছে তোমার পাশে বাজাইতে বীণা,
যক্ষনারী করিয়াছে তোমার বরণ
তন্বীশ্যামা মধ্যক্ষামা আজি নহে দীনা।
কঞ্চুকী সমান দেব শুদ্ধান্তের গেহে,
ঔশীনরী, ইন্দুমতী, শকুন্তলা, সীতা,
যথায় জননী কিম্বা ভগিনীর স্নেহে
করিছে তোমার সেবা প্রীতিপুলকিতা।
অকাল বসন্তে যার দুঃখে কেঁদেছিলে
বসন্তের পুষ্পরাশি সে আজি যোগায়,
নব বরষায় যারে হৃদয়ে ধরিলে,
সে আজি পরায় হার তোমার গলায়।
পুরুরবা ধরে ছত্র তব শীর্ষ'পর,
দুষ্মন্ত করিছে তব চামর ব্যজন।
তোমার আদেশে বাণ ছাড়ে পঞ্চশর,
পুষ্কর দৈত্যের কাজ করে অনুখন,
আজো যেন শিশু আছে, সে সর্ব্বদমন,
ঘুরিতেছে যেন তব ধরিয়া অঙ্গুলি,
করিছ বাল্মীকি সাথে বাণীর পূজন,
ষড় ঋতু-জাত-পুষ্প একই কালে তুলি'।
কহিতে যাদের কথা মর্ত্ত্যের প্রবাসে
আজি তারা সকলেই আছে তব পাশে।

শ্রীকালিদাস রায়।

# সেবা ব্রত।

সেবা ব্রত বড় উচ্চ ব্রত! সেবার মত ব্রত নাই, সেবা উচ্চনীচ ধনী দরিদ্র সকলেই সমভাবে করিতে পারেন। সেবাকে কেহ যেন দাসত্ব মনে না করেন। রমণীর মহৎব্রত সেবা, সেবাতেই রমণী চরিত্রের দয়া, স্নেহ, মমতা, প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ সাধন হয়। অনেক মহিলা হয়ত মনে করিতে পারেন আমরা যে সংসারে কত খাটি তাহা পুরুষের দাসীত্বের মত। ইহা যদি আমরা কেহ মনে করি তাহা হইলে ভ্রম হইবে। বাস্তবিক সংসারের প্রত্যেক কার্য্য আমাদের অতি প্রধানতম কর্ত্তব্য। লেখা পড়া, জ্ঞান, বিজ্ঞান ধর্ম্মালোচনা যেরূপ কর্ত্তব্য, সেইরূপ গৃহস্থালীর কর্ম্ম সকলও অবহেলার কর্ম্ম নহে। রমণী পুরুষের সমকক্ষ হইলেও তাহার কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন; পুরুষগণ বহির্বিষয়ে সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিবেন। রমণী অন্তঃপুরের সকল বিষয়ে শান্তি ও সুশৃঙ্খলতা সম্পাদন করিবেন। একটী সাম্রাজ্য শাসন করিতে যত ধৈর্য্য, স্নেহ, প্রেম, সহিষ্ণুতা তেজস্বীতার দরকার, এই পরিবার শাসন করিতে তাহার একটীও না হইলে পরিবার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

বিবাহের মন্ত্রে আছে শ্বশুরের গৃহে সাম্রাজ্ঞী হও। সুতরাং ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে গৃহ সাম্রাজ্য অপেক্ষা নূতন নহে। আমরা যাহাকে গৃহের সামান্য কর্ম্ম বলি তাহা অতি ধীর এবং বিবেচনার সহিত না করিলে তাহা হইতে অনেক কুফল উৎপন্ন হয়। এই রন্ধন। ইহা মানব জীবনের উপর নির্ভর করে। তাহা বিদুষী মহিলা নব নব চিন্তা দ্বারা নূতন নূতন খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারেন। সেবাতে যে কি আনন্দ তাহা যাঁহারা একবার সেবা করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন। জাপানের পরিবারের গৃহিণী বাড়ীর প্রধান পরিচারিকা বলিয়া অভিহিত হন।

সেবা পুণ্য সলিলা ভাগিরথীর মত সমস্ত বিশ্ব যে সুন্দর করিয়া বিশ্ব প্রেম মহাসাগরে গিয়া মিলিয়াছে। নারী সেবা রূপিনী। ধান্য হইতে চাউল বাদ দিলে যেরূপ খোবা বই আর কিছুই থাকে না; সেইরূপ নারী জীবন হইতে সেবা বাদ দিলে তাহার সারত্ব কিছুই থাকে না। বিশ্বজগতে যত মাহাত্ম্য

সমাজনীতি এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জগতের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং করিতেছেন।

সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তী অরুন্ধতী প্রভৃতি মহিলাগণ যে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া স্বীয় মানসিক উন্নতি করিয়াছেন তাহা নহে, তাঁহারা তাঁহাদের চরিত্রদ্বারা আমাদের আজও সেবা করিতেছেন। মহাসতী সতীদেবী সতীত্বের উজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়া প্রাণত্যাগ করেন; তাহা আজও ভারতের শত শত নারী চরিত্রকে গঠন করিয়াছে এবং আকর্ষণ করিতেছে। ইহাও একটী মহতী সেবা। এরূপ নিস্পৃহা গ্রহণ করিয়া ধরিত্রী ধন্যা হইয়াছেন। সেবা অনেক প্রকার আছে। শরীর দ্বারা, মনদ্বারা, আদর্শ চরিত্রদ্বারা, জনসমাজের সেবা করা যাইতে পারে। যোগাযাগ্য শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকারে এখনও শত শত নরনারীকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতেছে। মহাত্মা বুদ্ধদেবের সর্ব্বজীবে মৈত্রী এবং সাধনা কত অসভ্য জাতিকে সভ্যতা প্রদান করিয়াছে এবং জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট তাঁহার ক্ষমা এবং প্রেমের গুণে জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রইয়াছেন। প্রেমিকবর শ্রীচৈতন্য দেব ভক্তি এবং প্রেমের বন্যা দ্বারা কত নর নারীকে মাতাইয়াছেন। আধুনিক যুগে রাজা রামমোহন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, সাধক রামকৃষ্ণ, ভক্ত কেশবচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাত্মাগণ, জীবনদ্বারা আমাদের কত সেবা করিয়াছেন। ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই, রাণী ভবানী, অহল্যাবাই, রাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎসুন্দরী প্রমুখা তেজস্বিনী, দয়াবতা দানশীলা, নিস্পৃহবিত্তা মহিলাগণ আমাদিগকে তাঁহাদের দেবীসমা প্রকৃতি দ্বারা কত সেবা করিতেছেন এবং কেবল যে আমাদের স্বদেশীয়া মাহিলাগণ আমাদের সেবা করিতেছেন তাহা নহে বিদেশীয়া ভগিনী তপস্বিনী দেবী রাবেয়া, মেরী কার্পেণ্টার ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি মহিলাগণ কত সেবা করিয়াছেন।

শাস্ত্রে আছে পূণ্যং, পরোপকারেণ পাপঞ্চ পরপীড়নে ব্রত তপস্যা প্রভৃতি হইতে পুণ্য পরোপকার। এই সেবাদ্বারা পরোপকার করা যাইতে পারে। রজনী যেরূপ চন্দ্রদ্বারা শোভিতা হয়; কমলিনী সেরূপ দিনমনি দ্বারা বিকশিতা হয়; সেইরূপ স্নেহময়ী রমণী সেবাদ্বারা অলঙ্কৃতা হয়েন। মাহিমাময়ী রমণী

বলেন সেবা আমার হস্তের বলয়, সতীত্ব আমার মস্তকের মুকুট, শান্তি আমার কণ্ঠের হার, জ্ঞান আমার কুণ্ডল, সত্য ও প্রেম আমার নয়নের অঞ্জন। এই রূপে তিনি বিনা অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া থাকেন।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ভোগের ভূমি নহে, ত্যাগের ভূমি। চিন্তা করিয়া দেখিলে বড়ই ক্ষোভের বিষয় যে আমরা ত্যাগী যোগীদের রক্ত ধমনীতে লইয়া সামান্য স্বার্থের জন্য কত বিবাদ বিসংবাদ করিতেছি। পেটে ক্ষুধা থাকিলে যেরূপ কথায় পেট ভরেনা, সেইরূপ আমাদের শত শত অভাব ক্রটী দেখিয়া কেবল প্রবন্ধ লিখিলে উন্নতি হইবে না।

একজন মহাত্মা বলিয়াছেন 'জিহ্বাকে সংযত কর, কিন্তু সেইজন্য হস্ত পদকে বন্ধ করিও না অর্থাৎ নীরবে কার্য্য করিয়া যাও। এই ইউরোপ ব্যাপি যুদ্ধের সময়ে ইউরোপের শত শত মহিলা আপনাদের সর্ব্ব প্রকার বিলাসিতা দূরে রাখিয়া আহত সৈনিকদিগের সেবা এবং দেশের জন্য কত কার্য্য করিতেছেন। আর এই চিরদরিদ্র, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হতভাগ্য দেশে আমরা কি করিতেছি?

সেবার মূল প্রেম। ভালবাসা না থাকিলে সেবা হয় না। সাম্যভাব ও সমবেদনা ব্যতিরেকে প্রাণ দিয়া সেবা করা যায় না। আমি আমার একজন আত্মীয় অসুস্থ হইলে তাহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেবা করিতে পারিব কিন্তু একটী শ্রমজীবির ভার্য্যা পীড়িতা হইলে তেমন শুশ্রূষা করিতে পারিব না, কেন পারিব না কারণ আমার অহঙ্কার দূর হয় নাই ভেদজ্ঞান এখনও আছে। সত্য কথা ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। যদি ও আমরা সংসারী মানব; আমাদের তেমন হওয়া সহজ বা অনায়াস সাধ্য নহে কিন্তু যতদূর আমরা পারি চিন্তা, গবেষণা এবং সহৃদয়তা দ্বারা তাহা বিদূরিত করা কর্ত্তব্য। অনেক মহিলা আছেন যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া জাতিভেদের উল্লেখ করিয়া বলেন আমরা কিরূপে সেবা করিব? পরমভক্ত শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন;—তৃনাদপিসুনীচেনতরোরূপেসহিষ্ণুনা। অমানীনা মানদেন কীর্ত্তনীয়া সদা হরি।

এই মহাবাক্য সেবার প্রথম মূল মন্ত্র। নিজেকে বিস্মৃত হইতে হইবে। নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য বা অহঙ্কার রাখিতে হইবে না। বিশ্বপতি ভগবানের রাজ্যে ভেদবুদ্ধি নাই; তাঁহার সূর্য্য, চন্দ্র, ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে সমভাবে রশ্মি প্রদান

করিতেছে। তাঁহার মানব সন্তানগণ সমভাবে একই সূর্য্যের উত্তাপ একই চন্দ্রের জ্যোৎস্না এবং একই পবনের সুশীতল করস্পর্শে চিত্ত বিনোদন করিতেছে। কেবল ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করিতেছি আমরা অজ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ মানব। 'মহাভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অধুনা আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেমন দীন কৃষক সন্তান স্বীয় বুদ্ধি এবং অধ্যবসায় বলে প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়; সেইরূপ পুণ্যভূমি ভারতেও দাসী পুত্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি যে কোন বর্ণেরই হউক না কেন সে তপস্যা বলে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ হইতে পারিবে। জাতিভেদের মূল ভিত্তি যে কতদূর তাহা বিবেচনা করিয়া আমাদের সকল জাতিয়া ভগিনীদের সেবার জন্য কার্য্য করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ মন দ্বারা সেবা. যিনি সদ্গ্রন্থ রচনা করেন তিনি বাস্তবিক জন সমাজের হিতৈষী। যিনি মানবের মনে সদ্বৃত্তি সমুহের উন্মেষ সাধন করিতে পারেন; তিনিই জনসমাজের প্রকৃত সেবক এবং সেবিকা। যত প্রকার সেবা আছে সকলেরই উদ্দেশ্য মানুষকে মানুষ করা অর্থাৎ মনুষ্যত্ব দান করা। এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া নানা জনে নানা ভাবে সমাজের সেবা করিয়া যাইতেছেন। যিনি সদ্গ্রন্থ লিখিয়া মানবের মনে সুশিক্ষার বীজ বপন করেন, তাহাতেও সেবা এবং যিনি আলোচনা ও বক্তৃতা দ্বারা অন্যের সদ্বৃত্তির বিকাশ সাধন করেন, তিনিও সেবা করিতেছেন। কেহ অর্থ দ্বারা কেহ জ্ঞান দ্বারা কেহ কার্য্য দ্বারা, কেহ বা জীবন দ্বারা যে কোন কার্য্য করিতেছেন, সমস্তই সেবার ক্ষুদ্র এবং বৃহত্তম অঙ্গ।

যিনি সেবা করিবেন, তাঁহাকে ক্রমশঃ সেবার দ্বারা জগতের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে হইবে। শুনিয়াছি গাজিপুরে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন তাঁহার নিকট গিয়া কেহ হাসিলে, তিনি তাহারই মত অবিকল হাসিতেন এবং কেহ কাঁদিলে তাহারই মত কাঁদিতেন; কেহ পান খাইলে তিনিও পান খাইতেন। তাহা কোন বাহ্যিক অনুকরণ নহে বাস্তবিকই তিনি সেইভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতেন। তিনি কিভাবে সাধনা করিয়াছেন তাহা জানি না কিন্তু তিনি সে সকলের সহিত একাত্মতা সাধন করিয়াছেন তাহা সত্য। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে এরূপ সাধনা না হইলে, সেবা কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়া যাইবে না। একটী কথা আছে সাধু কার্য্যে ভগবান সবারি সহায়। ইউরোপে

একটী নারী সম্প্রদায় আছে তাঁহাদের মহিলাগণ, একটী চিত্র সম্মুখে রাখিয়া সাধনা করিতে করিতে যখন তাঁহারা হৃদয়ে সেই ছবির আভাষ পান অর্থাৎ যখন তাঁহারা ছবির মতন হইয়া যান; তখন তাঁহারা নিশান হস্তে দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে বাহির হন এবং তখন নিজেদের উপযুক্ত মনে করেন।

তদ্রূপ আমাদের এই সেবাব্রতের মহান্ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীভক্তিসুধা দেবী।

---

# নারী।

বড় ভালবাসি আমি হে নারি! তোমায়,  
সংসার-মরুভূ মাঝে তুমি ফল্গুধারা,  
সারা বিশ্ব বিকশিত তব মহিমায়  
সৃষ্টি তুমি হে রমণি! শত প্রীতিভরা।  
তুমি স্বর্গ;—নরকের তুমিই সোপান,  
তুমি দেবী;—রাক্ষসীর পুনঃ রূপান্তর,  
তুমি সুধা;—বিষভাণ্ড পূরিত পরাণ  
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে তুমি দীপ্ত মনোহর।  
বিধির বিচিত্র সৃষ্টি হে রমণী তুমি,  
তোমারে বুঝিতে পারি নাহিক ক্ষমতা,  
ভক্তি নম্র চিত্তে কভু তোমারে প্রণমি,  
কখনো ঘৃণায় বলি হায়রে বিধাতা!  
তবু তুমি হে শ্রেয়সী জগতের মাতা,  
স্নেহে প্রেমে অতুলনা মূর্ত্তিমতী দেবী,  
শোকে শান্তি, দুঃখে প্রীতি শোক-দুঃখ-ত্রাতা,  
বিশ্বের দুয়ারে তুমি অপূর্ব্ব মানবী।

মানবের ভাগ্যাকাশে সুখ চন্দ্র সম,
হে রমণি! এ ধরায় তুমি বিরাজিত,
শোকের দহনে যবে জ্বলে চিত্ত মন
সে কালে সান্ত্বনা রূপে তুমি প্রকাশিত।
দুঃখী দরিদ্রের অশ্রু করিতে মোচন,
ক্ষুধার্ত্তেরে অন্নদানে তুমিই কমলা,
পীড়িতের সেবা বল তোমার মতন
কে পারে করিতে এত প্রীতি প্রেম ঢালা?
যখন ভীষণ ঝঞ্ঝা গাঢ় নিশীথিণী
বজ্রের বিকট হাস্য সাথে নিয়ে আসে,
পথ হারা পান্থ কাঁদে কোথা মা জননি!
তখন দেখিতে পাই তব মধু হাসে
উজ্জ্বলিত দশ দিশি, উৎসাহের বাণী,
হৃদয়ে তুলিয়ে দেছে নবীন ঝঙ্কার,
চলেছে পথিক পুনঃ উল্লাসেতে ছুটি
নবীন উদাম তার হৃদয় মাঝার।
পথ ভুলে পাপ পথে যদি নারী যায়,
ক্ষমা করো হে মানব স্মরিও তখন
জননীর শত স্নেহ-প্রিয় ললনায়
তোমার হৃদয়ে যারা উজ্জ্বল রতন।
নারী নহে হেয় ঘৃণ্য চরণে দলিয়া
হেলায় ফেলিয়ে যাবে ধূলির মতন,
সে নহে গো! বিলাসের মিছা খেলা নিয়া
কলহাস্যে যার কথা করিবে চিন্তন।
নারী-দেবী চির পূজ্যা; জগতের দুঃখে,
বিধাতার দান এযে মানবের বুকে।

শ্রীযোগানন্দ গোস্বামী।

---

# সংগ্রহ

## গোবর ও গোমূত্র সংরক্ষণ।

আমাদের কৃষকগণ কখনও উপযুক্ত রূপ গোবর রাখে না। গোমূত্র যে একটী বিশেষ সারক পদার্থ তাহা হয়ত অনেকের জানাই নাই। গোবর গুলি গোয়াল ঘরের নিকট অথবা অন্য কোনও অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া রাখে। রৌদ্রে শুকাইয়া বৃষ্টিতে ধুইয়া উহার সারাংশ প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে সারভাগ অত্যল্প কম। কাজেই এই ভাবে রক্ষিত গোবর যথেষ্ট ব্যবহার করিলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না সামান্য একটু যত্ন করিলেই কিন্তু এই ক্ষতি এড়াইতে পারা যায়। নিম্নে একটী সহজ উপায়ের বিবরণ দেওয়া গেল। এই উপায় অবলম্বনে অনায়াসে গোবর ও গোমূত্রের প্রায় সমস্ত সার রক্ষা করা যায়।

গোশালার মাঝে সমান করিয়া পিটিয়া একদিকে (যদি দুইসারি করিয়া গরু রাখা হয় দুই দিকেই) একটু ঢালু করিয়া লইবে। ঐ ঢালের পাদদেশ দিয়া নালা কাটিয়া দিবে এবং ঐ নালার অথবা নালা গুলির মুখ গোশালার বাহিরে একটী বড় মাটির গামলা বা অন্য কোন পাত্রে যাইয়া মিশিবে যেন গোমূত্র অনায়াসে সেই গামলায় বা পাত্রে জমা হইতে পারে। নিকটে গোবর ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য একটী বড় রকমের গর্ত্ত করিয়া উহার চারিধার ও তলদেশ খুব এটেল মাটি ও গোবর দ্বারা লেপন করিয়া লইবে যেন সহজে কিছু ভিতরে শুষিয়া না যায়। রক্ষিত সার রৌদ্র কিংবা বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঐ গর্ত্তের উপর এক খানা চালা উঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক। চতুপার্শ্বস্থ জমীর জল যাহাতে ঐ গর্ত্তের ভিতর আসিয়া না পড়িতে পারে সেই জন্য গর্ত্তের উপরে চারিধারে অনুমান এক হাত পরিমাণ উচ্চ করিয়া একটী দেওয়াল তুলিয়া দিবে। গর্ত্তের আয়তন গরুর সংখ্যা অর্থাৎ তদনুযায়ী গোবরের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। চালাও সেই অনুসারে বড় বা ছোট হইবে। একজন সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ৭ সাত হাত দৈর্ঘ্য ও ৪ চারি হাত প্রস্থ এবং দুই হাত গভীর একটী গর্ত্ত হইলেই প্রথম চলিতে পারে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোশালার গোবর খড়পাতা ও গৃহের অন্যান্য আবর্জ্জনা ঐ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে। তৎপর উপরোক্ত গামলার গোমূত্র ঐ আবর্জ্জনা মিশ্রিত গোবরের উপর ছিটাইয়া দিবে। ২।৪ দিন পর গর্ত্তস্থিত গোবর ও আবর্জ্জনা ইত্যাদি কোদালের সাহায্যে মিসাইয়া সমভাবে বিছাইয়া ও কোদালের পৃষ্ঠ দ্বারা পিটাইয়া চাপিয়া যথা সম্ভব সমতল ও দৃঢ় করিয়া দিবে। সার আল্‌গা ভাবে রাখিতে নাই, কেন না তাহা হইলে উহার মূল্যবান পদার্থ উড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দৃঢ় রূপে চাপা থাকিলে ঐ গুলি আস্তে আস্তে সমভাবে পচিয়া অতি উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়। গোশালার মেঝেতে অনেক পরিমাণ মূত্র শুষিয়া যায় বলিয়া উহার মাটি মাঝে মাঝে কোদালি দ্বারা তুলিয়া লইয়া ঐ গর্ত্তে ফেলিলে উহা হইতে ও যথেষ্ট পরিমাণ সার পাওয়া যাইতে পারে। আবার নূতন করিয়া মাটি দিয়া মেঝ পূর্ব্বমত প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ক্রমে যখন একটি গর্ত্ত পরিপূর্ণ হইয়া আসিবে তখন পূর্ব্বের ন্যায় আরও একটী গর্ত্ত করিয়া লইবে। সরকারের তরফ হইতে অনেক কৃষককে এই প্রণালীতে গোবর ও গোমূত্র সার রাখিতে দেখান হইতেছে ইহার খরচ এত কম এবং লাভের আশা এত বেশী যে আশা করা যায় শীঘ্রই বিস্তৃত ভাবে ইহার প্রচলন হইবে।

কৃষিগ্রন্থ গভমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

# গ্রন্থ-সমালোচনা।

**পূর্ব্ববঙ্গে পালরাজগণ।** শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর প্রণীত, ঢাকা নয়াবাজার হইতে শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভদ্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৹ আনা। ঢাকা সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংসিত ১০৪ পৃষ্ঠা।

আমরা অনেক দিন হইল এইগ্রন্থ খানা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। এত দিন ইহার সম্বন্ধে, কোনও রূপ মতামত প্রকাশ করিতে না পারায় গ্রন্থকারের নিকট অপরাধী ছিলাম। তরুণ লেখক পূর্ব্ববঙ্গের লুপ্ত প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ। ঢাকা জেলার—অন্তর্গত ভাওয়াল, কাশীমপুর, চাঁদপ্রতাপ, সুলতান প্রতাপ, এবং তালিপাবাদ, এই পাঁচটি পরগণার অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন ধ্বংসাবিশিষ্ট কীর্ত্তি স্থান সমূহ দর্শন করিয়া বঙ্গের খ্যাত নামা পাল রাজগণের কোন কোন শাখা যে পূর্ব্ববঙ্গে প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। রচনার ভাষা ঐতিহাসিকের উপযুক্ত ভাব-গাম্ভীর্য্যেএবং বর্ণনা নৈপুণ্যে পরিপূর্ণ, এক হিসাবে ইহা একটী ঐতিহাসিক ভ্রমণ-কহিনী মাত্র। লোক-চক্ষুর-অগোচরে গভীর অরণ্যানী-সঙ্কুল বিজন স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ এত কাল অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের চক্ষুর অগোচরে কেমন করিয়া আপনাকে গুপ্ত রাখিয়াছিল তাহা বস্তুতই ভাবিবার বিষয় বটে। এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সাহেবেরাই করিয়া আসিয়াছেন। আমরা আমাদের দেশের ঐতিহ্য তত্ত্ব জ্ঞাত হইবার জন্য গ্রাহ্য করি নাই;—শুভক্ষণে বঙ্কিমের 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল; শুভক্ষণে 'বাঙ্গালীর ইতিহাস বাঙ্গালীকেই লিখিতে হইবে, এই শুভ বাণীসুষুপ্ত বাঙ্গালীব কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করিয়াছিল তাই বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বত্র ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের সূত্রপাত।

আমরা বীরেন্দ্রনাথের বহি পাঠ করিয়া আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। যদি এইরূপ ভাবে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলিত হয় তাহা হইলে প্রাচীন বঙ্গ রাজ্যের এক খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস সঙ্কলনের

পথ শীঘ্রই প্রশস্ত হইবে। লেখক এমন অনেক স্থানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন যে ইতিপুর্ব্বে সে সম্বন্ধে কেহই কোনরূপ আলোচনা করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এক্ষণে আমরা গ্রন্থোক্ত কতিপয় বিষয়ের আলোচনা করিব। লেখক থাইডাডোসকা নামক এক রাজার পরিচয় দিয়াছেন এবং ঐ রাজার সম্পর্কিত একটী ভাটের গান উদ্ধৃত করিয়াছেন। গানটী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত 'ঢাকার ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃত। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ও উক্ত রাজার সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বীরেন্দ্র বাবু থাইডাডোসকা নমোৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা একান্তই হাস্যাস্পদ, আমরা থাইডাডোসকা রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান নহি, তবে ভাটের ছড়াটী যে নিতান্ত আধুনিক তাহা নিঃসন্দেহ। অনেক সময় কিংবদন্তীকে সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না! আর এক স্থলে লেখক লিখিয়াছেন "আমরা যে নৃপতি গণের বিবরণ পাঠক গণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহারা দ্বিসহস্র না হইলেও প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন"। এইরূপ উক্তি ঐতিহাসিকের উপযুক্ত নহে।

তারপর লেখক পাল রাজগণের জাতি সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন উহা সমীচীন হয় নাই। কেবল 'বিশ্বাস' দ্বারা ইতিহাস রচনা চলে না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজগণ কোন্ জাতির অন্তর্গত ছিলেন তাহা নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে! বৌদ্ধ প্রাধান্য সময়ে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিষ তাঁহার পরিচয়ে বলিতেছেন. "My father was a householder Upasaka. He was a great Bodhisattva. He practised the Tantra of the Matri class I obtained an Abhiseka consecration of one (of the Tantras) from him. There were two wives to my father, one a Brahmin & the other a khatriyani. I am the son of the former."

এখন দীপঙ্করকে কোন্ জাতি বলিব! সে সময়ে জাতিভেদ ত ছিলই না, বৈবাহিক আদান প্রদানের ও কোন রূপ বাধা ছিল না। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত রাজ বংশীয় দিগকে বর্ত্তমান কোনও জাতির অন্তর্গত করিয়া সপ্রমাণ করিতে যাওয়া হাস্যাস্পদ মাত্র। সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত 'রামচরিতে' ও ঘনরামের

'ধর্ম্ম মঙ্গলে' 'সমুদ্রের ঔরসে ধর্ম্ম পালের পত্নী বল্লভাদেবীর গর্ভে অজ্ঞাত নামা পুত্রের উৎপত্তি হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাহারা সদ্‌বংশসম্ভূত ছিলেন না। 'ধর্ম্মমঙ্গল' রচনা কালে সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিকৃত জনশ্রুতি বা প্রবাদ প্রচলিত ছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত 'রামচরিতে' সমুদ্রকুলে ধর্ম্ম-পালের উৎপত্তির কথা স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত না থাকিলে কেবল ঘনরামের উপর বিশ্বাস করিয়া পাল বংশের উৎপত্তি বর্ণনা বিজ্ঞান সম্মত হইত না; কিন্তু খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থে এবং অন্যূন সপ্তশত বর্ষের পুরাতন পুঁথিতে যখন এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন সমুদ্রকুলে পাল রাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।' বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসনের ২য় শ্লোকে আবার তাহাদিগকে 'বংশে মিহিরস্য জাতবান,' এইরূপ লিখিত আছে। আমাদের বিবেচনায় প্রথমে তাহারা হীন বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত হইলেও ক্রমশঃ স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ বিশেষণে বিশেষিত হইয়া সমাজের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে থাকেন! যেখানে ক্ষমতা ও অর্থ সেখানে স্তাবকের কখনও অভাব ঘটে না, তারপর যে যুগে জাতিভেদ ছিল না, সে সময়ে ক্ষত্রিয় বংশে বিবাহ করা বিচিত্র কি! বাধা দেয় কে! সবই সমান।' মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় বহু জাতি ভেদ ছিল না।' পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মত অত্যন্ত সুসঙ্গত। কাজেই পাল রাজাগণ কায়স্থ ছিলেন উহা প্রমাণ করিতে যাওয়া অতি বড় ভুল, তারপর তাহাদের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে যেরূপ গোলযোগ তাহাতে তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে গেলে কায়স্থ সমাজের কোনও রূপে গৌরব জনক হইতে পারে না। বর্ত্তমান কায়স্থসমাজ বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম ইত্যাদি কোন বিষয়েইত হীন নহেন তথাপি সেকালের একরূপে অজ্ঞাত কুলশীল পাল রাজগণের সহিত নিজেদেরসম্বন্ধ গ্রথিত করিবার জন্য এত ব্যগ্র কেন?

'আকবরের সুহৃদ ইতিহাসবেত্তা আবুল ফজলের উক্তির উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেহ কেহ গৌড়বঙ্গ মগধের পাল রাজগণকে কায়স্থ বলিয়া অনুমান করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আবুল ফজলের উক্তি বিশেষতঃ প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে, অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। তিনি আকবরের

সমসাময়িক ব্যক্তি, কিন্তু তৎসত্বেও আকবরের সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত উক্তিগুলি প্রকৃত ইতিহাস রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। তিনি পালবংশীয় দশজন রাজার নাম করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে দেবপাল ও রাজ্যপাল ব্যতীত অপর পাল রাজগণের খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায় না।"*

আমাদের ঐতিহাসিকগণ এ সকল প্রাচীন রাজগণের জাতিতত্ত্ব লইয়া মাথা না ঘামাইয়া যদি প্রকৃত নিরপেক্ষ ভাবে দেশের ইতিহাসানুশীলন করেন তাহা হইলেই দেশের মঙ্গল, নচেৎ যাহারা দেশ মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষ-বহ্নি সৃষ্টির জন্য ঘৃতাহুতি প্রদান করেন তাহারা দেশের কল্যাণকামী নহেন শত্রু। এ দোষেই বাঙ্গলা দেশ উচ্ছন্ন যাইতে চলিয়াছে। এই সংকীর্ণতার জন্যই শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আজকাল ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের নাম শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন। ঐতিহাসিকের স্থান জাতিগত সংকীর্ণতা, অতিরিক্ত অন্যায় ও অসঙ্গত দেশ প্রীতির বহু উর্দ্ধে অবস্থিত; কল্পনা জল্পনায় মনগড়া কথা প্রচারের স্থান ইতিহাস নহে।

বীরেন্দ্র বাবু অতি তরুণ বয়স্ক যুবক। শুভ্র উজ্জ্বল ভবিষ্যত তাহার সম্মুখে যদি তিনি এখন হইতে নিজের কর্ত্তব্য পথকে দৃঢ় করিয়া তুলিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে পদে পদে বিড়ম্বিত হইতে হইবে, এজন্যই এতগুলি কথা বলিলাম।

পূর্ব্ববঙ্গের পাল রাজগণ ভ্রমণ-কাহিনী হিসাবে, ইতিকথার হিসাবে অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইতিহাস হিসাবে নহে। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও ছবি সুন্দর। 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদ,' এই গ্রন্থ খানা প্রচার করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস

---

*শ্রীরাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

**প্রমীলা**—শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ প্রণীত। ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংসিত, ১৪৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এণ্টিক কাগজে লাল রংয়ের বর্ডারে এবং নীল কালিতে ছাপা। পাঁচখানি হাফ্‌টোন চিত্র সংযুক্ত। রেশমী কাপড়ে সুন্দর বাঁধাই ও স্বর্ণাক্ষরে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম শোভিত। মূল্য ১৲ টাকা ২৬নং কাঁসারি পাড়া রোড, ভবানীপুর, কলিকাতার, ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ভূমিকা বিশেষত্ব বর্জ্জিত। গ্রন্থকার অমর কবি মধুসূদন রচিত "মেঘনাদবধে'র 'প্রমীলা' চরিত্রকে আদর্শ করিয়া 'প্রমীলা' রচনা করিয়াছেন। ভাষা সুরুচি সঙ্গত। কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতির ন্যায় 'প্রমীলা'র ভাষারও একটা সরল প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। এখানে ভাষার একটু নমুনা দেওয়া গেল 'প্রমোদ কাননের মধ্যে এক সুরম্য রাজপুরী। শত শত স্বর্ণস্তম্ভ সমন্বিত সৌধমালায় অসংখ্য হীরক চূড়া। চতুর্দ্দিকে নন্দন কানন সদৃশ রম্য বনরাজি। বন-বৃক্ষের শাখায় শাখায় কোকিল দোয়েল ও শ্যামা প্রভৃতি কলকণ্ঠ পাখীকুল মধুর কণ্ঠে গান করিতেছে। পুষ্প সমূহে রাশি রাশি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ফুলে ফুলে অলি গুঞ্জরণ করিতেছে, স্থানে স্থানে নির্ঝরিণী কুলু কুলু নাদে প্রবাহিত।' আর এক স্থানে গ্রন্থকার প্রমীলার করুণার একটী দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন "প্রমীলা দুই তিন দিন পর্য্যন্ত পাখীটাকে কত আদরে যত্নে সেবা করিলেন। তারপর পাখীটী সম্পূর্ণ সুস্থ হইবামাত্র তিনি বনের পাখীটাকে বনে ছাড়িয়া দিলেন। পাখী বালিকার অপূর্ব্ব বিশ্ব-প্রীতির মধুর স্মৃতি বুকে লইয়া উধাও হইয়া উড়িয়া গেল!" গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এরূপ কোমল মধুর ভাষা পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের বিশ্বাস, পত্রাবগুণ্ঠিত সুগন্ধি ক্ষুদ্র যূথিকা পুষ্পের মধুর সুরভির ন্যায় এই গ্রন্থ পাঠে, প্রত্যেক বঙ্গীয় ললনা হৃদয় মধ্যে সতী রমণীর অনবদ্য তেজ-মাধুর্য্য অনুভব করিয়া গৌরবান্বিতা হইবেন।

**তাই তাই**—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্ত বি, এ প্রণীত। অত্যুৎকৃষ্ট আর্ট কাগজে সুন্দর করিয়া ছাপা। ছবি মোট ২৪ খানা। ডবল ক্রাউন ষোড়শাংসিত ২৪ পৃষ্ঠা। কবিতা আঠারোটি। বাঙ্গালাতে এ পর্য্যন্ত এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুরঞ্জিত চিত্রকলা নৈপুণ্য শিশুদের খেলার বহি বাহির হইয়াছে বলিয়া জানি না। বিলাতী উচ্চশ্রেণীর সচিত্র বহির সহিত ইহার তুলনা করা যায়। সুবিখ্যাত চিত্র শিল্পী কে, ভি, সেন কোম্পানী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সোল এজেণ্ট আশুতোষ লাইব্রেরী কলিকাতা ও ঢাকা মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

কার্ত্তিক বাবু বালক বালিকাগণের চিত্তরঞ্জনী গ্রন্থ রচনায় বর্ত্তমান সাহিত্য ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিও লেখক। তাই তাই র ছোট ছোট কবিতা গুলি যেন এক একটী গান। সে কালের ছড়া গীতি হয়ত অনেক নবীনা জননী জানেন না, কিন্তু তাহারা যদি কার্ত্তিকচন্দ্রের তাইতাইর সঙ্গীতগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া দুষ্ট খোকা খুকির ঘুম পাড়াইবার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে উহা যে মন্ত্রৌষধির ন্যায় কার্য্যকারী হইবে তাহা নিশ্চিত। 'তাই তাই' র সমালোচনা করা বড় কঠিন। কবিতা গুলির সহিত চিত্রের এতদূর ঘনিষ্ট সংযোগ যে একটী ছাড়িয়া আরেকটীর কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যদি চিত্রগুলির নমুনা দিয়া কবিতাগুলির সমালোচনা করিতে পারিতাম তাহা হইলে বোধ হয় পাঠকবর্গ ইহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন। তথাপি কবিতাগুলি কেমন সরল ও মধুর তাহা দুই একটী নমুনা হইতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

সংসারে জননীর স্নেহের সীমা নাই। স্নেহময়ী জননীর নিকট ক্ষুদ্র শিশুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, নিজ প্রাণাপেক্ষাও বেশী। খোকা কাঁদিতেছে, হয়ত কোন দুষ্টুমির খেয়াল টুকু মা পূর্ণ করেন নাই, তাই অভিমানী শিশু ক্রন্দন রূপ তীব্র বেদনার আঘাতে স্নেহময়ী জননীর হৃদয় বিচলিত করিয়া দিয়াছে। মা করুণ কণ্ঠে আদর করিয়া বলিতেছেন,—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কান্নাকাটী এই মুখে কি সাজে?
তুমি যে আমার হাসির মাণিক আধার কুঁড়ের মাঝে!
দুঃখরে তুই করবি হেলা,
কেনরে জল চোখের ফেলা?
কিসের অভিমান!
ফুটে উঠুক মুখ ভোরে তোর
হাসির দেশের গান!

গ্রন্থের কয়েকটী কবিতায় বিশেষ নূতনত্ব দেখিলাম। কেদার, প্রতাপ, মোহনলাল, সীতারাম প্রভৃতি বঙ্গবীরগণের নাম অতি সুকৌশলে বালক বালিকা গণের কণ্ঠস্থ রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যাহারা সাহিত্য বোঝেন, প্রকৃত সাহিত্য রসের মধ্য দিয়াও কেমন করিয়া সরলভাবে শিশুগণের মনমুগ্ধ করা যাইতে পারে তাই তাই পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি করিতে পাবেন।

সম্পাদক।

চিত্র-শিল্পী শ্রীহলধর রায়।

# চিত্র-পরিচয়।

সুদূর সুনীলাকাশে পূর্ণ শশধর,
আধ আঁধারে ঢাকা অবনী অম্বর।
ভিখারিণী শিশুকোলে হেথা পথহারা
অন্ধ ভিখারী স্বামী কোথা যাবে তারা।

চিত্র শিল্পী শ্রীযুক্ত হলধর রায় ভাগ্যকুল রায়পরিবারের একজন তরুণ বয়স্ক যুবক। ইঁহারা ক্রোড় পতি। এই তরুণ-শিল্পী নিজ চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে চিত্র-বিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন। ইঁহার অঙ্কিত মৌলিক তৈল চিত্র গুলি বিবিধ শিল্প-প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইয়া বিশেষ রূপে প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ইনি সিমলার চিত্র প্রদর্শনী হইতে সুবর্ণ পদক, সার্টিফিকেট ইত্যাদি ও প্রাপ্ত হইয়াছেন। হলধর বাবুর অঙ্কিত পদ্মানদীর দৃশ্য গুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

আমরা একে একে সে সকল চিত্র প্রকাশ করিব। "বিক্রমপুরকে" চিত্র সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া গৌরবান্বিত করিবার জন্য ইনি বিশেষ রূপে যত্নবান-হইয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ। বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্র খানার মর্ম্ম-কথা উদ্ধৃত কবিতাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। এই কবিতাটি শিল্পীর রচিত।

বীরতারা হাটস্থিত "সুবচনী" ও "ডঙ্করকালী" বৃক্ষ।
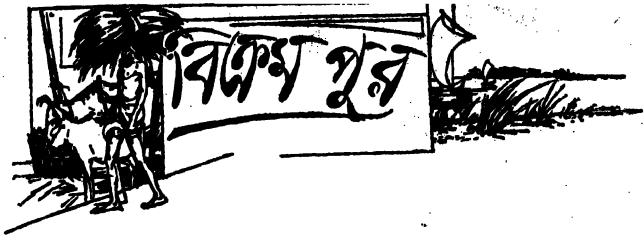
তৃতীয় বর্ষ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২। | দ্বিতীয় সংখ্যা।

# বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ

## বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ (১৩২০-১৩২১)

মঙ্গলময় বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া "বিক্রমপুর সম্মিলনী" আর এক বৎসরে পদার্পণ করিলেন। আমাদিগের সহস্র ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সম্মিলনী এক পা দুই পা করিয়া নিজ কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে যত্ন করিতেছেন এবং ক্রমশঃ বিক্রমপুরবাসীগণের স্নেহ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন ইহাই আমাদের একমাত্র আশা ও সান্ত্বনার বিষয়।

সম্মিলনীর জনৈক সহযোগী সভাপতি ও আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বিক্রমপুরের একটী উজ্জ্বল রত্ন ব্রাহ্মণগাঁ নিবাসী ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আমরা আলোচ্যবর্ষে হারাইয়াছি। ধীমান্ অঘোরনাথ এবং তাঁহার প্রতিভাশালিনী কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নাম ভারত-বিশ্রুত। গত বৎসর সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে এবং তৎপর কয়েক অধিবেশনেই অঘোরনাথ উপস্থিত থাকিয়া তরুণের ন্যায় উৎসাহে আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। সম্মিলনী ভগবানের নিকট তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা ও তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গের প্রতি হৃদয়ের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা প্রবাসী বিক্রমপুরের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চেষ্টায় ১২৮৬ সনের ৭ই আশ্বিন রবিবার ১৮৭৯ খ্রীঃ অঃ 'বিক্রমপুর সম্মিলনীর' প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তখন বিক্রমপুরের মহিলাদিগের শিক্ষা বিধানই সম্মিলনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

প্রায় বার বৎসর কাল পর্য্যন্ত সম্মিলনীর কার্য্য অতি সুন্দররূপে পরিচালিত হইয়াছিল এবং সম্মিলনী উদ্দেশ্যানুযায়ী যথেষ্ট কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশেষে নানাকারণে সম্মিলনীর কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। পুনরায় ১৩০৮ সনে বিক্রমপুরের কতিপয় যুবকের আগ্রহে উক্ত সভা ৩রা ভাদ্র শনিবার পুনর্গঠিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সভা পুনর্ব্বার গঠিত হইয়াও ৩।৪বৎসরের অধিক জীবিত ছিল না।

কতিপয় বৎসর হইল বিক্রমপুর সম্মিলনীর পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হওয়ায় বিক্রমপুরের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী অধিকতর মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ইহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা-কল্পে উদ্যোগী হ'ন। তদনুসারে বিগত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা কলেজ স্কোয়ার ষ্টুডেণ্টস্ হল গৃহে এই বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য একটী সভার অধিবেশন হয়। সভায় স্থিরীকৃত হয় যে কলিকাতাবাসী বিক্রমপুরের জনসাধারণ এবং বিক্রমপুরের হিতৈষী অন্যান্য ব্যক্তিগণকে লইয়া ৭ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত গৃহে একটী সাধারণ সভা আহ্বান করা হইবে। তদনুসারে শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ নাগ এবং শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের স্বাক্ষর যোগে প্রাথমিক সভার আমন্ত্রণ পত্র প্রচারিত হয়।

যথাসময়ে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত ষ্টুডেণ্টস্ হলে বিক্রমপুরবাসীগণের এক প্রাথমিক সভার অধিবেশন হয়। সভায় বিক্রমপুর-নিবাসী বহুসংখ্যক ভদ্রলোক এবং ছাত্রবৃন্দের সমাগম হইয়াছিল।

বিক্রমপুরসম্মিলনীর পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে মাননীয় সভাপতি মহোদয় একটী সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত প্রস্তাব-গুলি সভায় পরিগৃহীত হয়।

১। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহ লইয়া বিক্রমপুরসম্মিলনীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল।—

(১) গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান—

(ক) উপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা।

(খ) জল নিকাশের ব্যবস্থা।

( গ ) গ্রামে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।

( ঘ ) রাস্তা ঘাট খাল ইত্যাদির উন্নতি বিধান।

( ২ ) শিক্ষা—

( ক ) অন্তঃপুর মহিলাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত।

( খ ) বালিকাদিগের শিক্ষা বিধান।

( গ ) নিম্ন-শিক্ষার বিস্তার।

( ৩ ) শিল্প ও ব্যবসায়ের বিস্তার ও উন্নতি সাধনে বিক্রমপুরবাসীদিগকে প্রণোদিত করা।

( ৪ ) বিক্রমপুরবাসীদিগের মধ্যে সদ্ভাব বর্দ্ধন এবং তাহাদিগের সাধারণ হিতকল্পে যে সকল কার্য্য আবশ্যক এবং সুসাধ্য বিবেচিত হয়, তৎসমুদয় সম্পাদনে চেষ্টা করা। ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা হইতে পারিবে না।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধন করিতে সভা যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন, এবং প্রয়োজনানুসারে গভর্মেণ্ট, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোক্যালবোর্ড ও অন্যান্য রাজ-কর্ম্মচারীদিগের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

এই সভা সহরে মহকুমায় এবং গ্রামে শাখা-সভা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন।

অতঃপর স্থির হয় যে ১৯১৪ সনের ২১ এ মার্চ্চ তারিখে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সংগঠন করিবার জন্য সম্মিলনীর এক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

ঐ প্রস্তাব অনুসারে ১৯১৪ সনের ২১ এ মার্চ্চ ষ্টুডেণ্টস্‌হলে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিক্রমপুরসম্মিলনীর প্রথম সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী পঠিত ও পরিগৃহীত হইলে উপস্থিত সভ্যগণের নিকট সম্মিলনীর নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হয়, কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া সভ্যগণকর্ত্তৃক নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি পরিগৃহীত হয়। সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই বিক্রমপুর সম্মিলনীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন।

অতঃপর নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়—রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, কুমার প্রমথনাথ রায়, মিঃ রজতনাথ

রায়, বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অম্বিকাচরণ উকীল, বাবু বরদাকান্ত সরকার, বাবু চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, বাবু বসন্তকুমার বসু, মিঃ বিমলানন্দ নাগ, বাবু পরেশনাথ সেন, বাবু সত্যানন্দ বসু, বাবু বিনয়কুমার সরকার, বাবু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু রমেশচন্দ্র সেন, বাবু অতুলচন্দ্র সেন, বাবু হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত, বাবু হেমেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত, বাবু অবনীকান্ত সেন, বাবু বরদাকান্ত বসু, বাবু তরণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং সভাপতি, সহকারী সভাপতিগণ সম্পাদক সহকারী সম্পাদকগণ ও কোষাধ্যক্ষ।

সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার কর্ম্মচারী পদে নির্ব্বাচিত হন—স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ—সভাপতি। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর জানকীনাথ রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র লাল রায়, শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ, শ্রীযুক্তশশীভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ—সহকারী সভাপতি। শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায়—কোষাধ্যক্ষ। মিঃ জ্যোতিশচন্দ্র দাশ গুপ্ত—হিসাবপরিদর্শক। শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন, সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন<br>
,, ভবরঞ্জন মজুমদার<br>
,, কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় } সহকারী সম্পাদক।

অনন্তর স্থির হয় যে সম্মিলনীর সভ্যগণকে বার্ষিক অন্যূন ২৲দুই টাকা হারে চাঁদা দিতে হইবে। ছাত্র সভ্যগণের বার্ষিক চাঁদা ১৲টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

পরিশেষে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, রায় বাহাদুর জানকীনাথ রায়, মিঃ সতীশরঞ্জন দাশ এবং শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায় প্রত্যেকেই সম্মিলনীকে বার্ষিক ৫০৲পঞ্চাশ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হন।

তৎপর ২৬ শে জুলাই ( ১০ই শ্রাবণ ) রবিবার রিপণ কলেজ গৃহে বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশন হয় এবং তৎসহ কলিকাতাস্থ বিক্রমপুর বাসিগণের এক প্রীতি-সম্মিলনী হয়। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে সম্মিলনী সফলতা লাভ করিবেন তৎসম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা হয়। সঙ্গীত, পরস্পরের আলাপ সম্ভাষণ ও জলযোগের দ্বারা সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে অভিনন্দিত করা হয়। প্রায় ৩০০ লোক সমবেত হইয়াছিলেন। প্রীতি-

সম্মিলনীর আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্বতন্ত্ররূপে অর্থ সংগৃহীত হয়। কিঞ্চিন্যূন ৫০৲ টাকা ব্যয়িত হয়।

আলোচ্যবর্ষে ১লা এপ্রিল ১৯১৪ সন, ১৭ই চৈত্র ১৩২০, ৩০শে মে, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১১ই জুলাই, ২৭শে আষাঢ় ১৩২১; ১৯১৫ সনের ২১শে জানুয়ারী, ৭ই মাঘ; কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতীর মাত্র এই চারিটী অধিবেশন হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এই কয়েক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা হইয়াছিল।

১। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তালিকা প্রস্তুত।

২। কলিকাতাস্থ বিক্রমপুরবাসী ছাত্রগণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।

৩। চাঁদা প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুত চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা।

৪। আয় ব্যয়ের হিসাব পরিদর্শন।

৫। বজ্রযোগিনী নিবাসী শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার গুহ মহাশয়কে সহযোগী সম্পাদক নির্ব্বাচন।

৬। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে বিক্রমপুরের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের পদত্যাগে যোগেন্দ্র বাবুকে সহকারী সম্পাদকের পদে নিয়োগ করা।

৫। শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধান চেষ্টা এবং বিবিধ শ্রমজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পদ্রব্যের সংরক্ষণ।

বিক্রমপুরের রাস্তা ঘাট, খাল, পুষ্করিণী, বিদ্যালয়, রোগ ও তৎপ্রতিকারের উপায় এবং নৈতিক অবস্থাদি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য এক মুদ্রিত form (তালিকা) প্রস্তুত করিয়া বহুগ্রামে প্রেরণ করা হয়। কতিপয় গ্রাম হইতে ঐ তালিকা পূরণ করিয়া আমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সাক্ষাৎ ভাবে সংবাদ সংগ্রহ ও কয়েকটী প্রধান প্রধান গ্রামে শাখা সভা স্থাপন করা উদ্দেশে বিক্রমপুরের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে স্বতন্ত্র চাঁদা আদায় করিয়া পূজাবকাশের সময় বিক্রমপুরের কতিপয় গ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছিল। যোগেন্দ্রবাবু প্রদত্ত রিপোর্ট, পূর্ব্বোক্ত তালিকা ও বিক্রমপুরের মানচিত্র অবলম্বনে কয়েকটী রাস্তার বিশেষতঃ রাজাবাড়ী হইতে মুন্সীগঞ্জ

পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তৎসম্বন্ধে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে আন্দোলন করিবার অভিপ্রায়ে কতক কতক সংবাদ সংগ্রহ করা হইয়াছে। মুকুটপুরের দরজা নামে যে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাজবর্ত্ম বিক্রমপুরের কেন্দ্রস্থল দিয়া চলিয়া গিয়াছে গভর্মেণ্ট তাহার পুনরুদ্ধার কল্পে যত্নবান হইয়াছেন, সম্মিলনী ঐ বিষয়ে সাধ্যমত স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের সহযোগিতা করিবেন, তৎবিষয়েও আলোচনা হইয়াছে। পুরাতন দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী সংস্কার সম্বন্ধে কি কি বাধা বিঘ্ন আছে ও সেই সকল বাধা বিঘ্ন কি উপায়ে অতিক্রম করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে কতকগুলি কার্য্য প্রণালীর আলোচনা করা হইয়াছে।

মুন্সিগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট এবং ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের নিকট সম্মিলনীর উদ্দেশ্য জানাইয়া পত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে মুন্সিগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সম্মিলনীর উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া তাঁহার সাধ্যানুসারে আমাদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মুন্সিগঞ্জের অন্যতম সার্কেল অফিসার শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ বি, এ, মহোদয় ও তাঁহার সাধ্যানুযায়ী সম্মিলনীর সাহায্য করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং এক সভায় উপস্থিত থাকিয়া সম্মিলনীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন এজন্য সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেওয়া যাইতেছে।

যোগেন্দ্র বাবুর রিপোর্টের উল্লিখিত প্রস্তাব সমূহ মধ্যে একটী প্রস্তাব বিশেষ আবশ্যকীয় বিবেচিত হওয়ায় এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম। প্রস্তাবটী এই—প্রতি বৎসর বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্থানে বিক্রমপুরবাসী মিলিত হইয়া দেশের উন্নতি বিষয়ে আলোচনা ও প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবেন। এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হইবে।

আর একটী বিষয় উল্লেখ যোগ্য বিক্রমপুর সম্মিলনীর ন্যায় অন্যান্য জেলায় যে সকল সম্মিলনী সভা আছে তাহাদের নির্ব্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া একটী মণ্ডলী গঠন করা এবং ঐ সমস্ত সমিতি গুলি পরস্পরের পরামর্শে ও সহযোগিতায় যাহাতে বল লাভ করিয়া পুষ্ট হইতে পারে তৎবিষয়ে পরামর্শ জন্য মৈমনসিংহ সম্মিলনীর সম্পাদক ও আমাদের আহ্বান মতে একটী পরামর্শ সভা আহুত হয়। কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ এ সভার সভাপতিত্ব করেন।

বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যানন্দ বসু, বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বাবু ভবরঞ্জন মজুমদার ও বাবু গুণদাচরণ সেন এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আমাদিগের সম্মিলনীর উদ্দেশ্য, কার্য্যপ্রণালী এবং এ পর্য্যন্ত সম্মিলনী দেশহিতজনক যে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করেন।

বিগত বর্ষে সম্মিলনীর সভ্য সংখ্যা ১৫০ দেড়শত ও তাহাদের প্রতিশ্রুত চাঁদার পরিমাণ মোট ৪৭২৲ ছিল। ঐ প্রতিশ্রুত চাঁদা আদায়ের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করা যায় নাই কারণ আলোচ্য বর্ষে কেবল তত্ত্ব সংগ্রহ এবং কার্য্য প্রণালীর আলোচনা ও নিয়মাবধারণ ব্যতীত সম্মিলনী আর কিছু করিতে পারেন নাই। প্রাথমিক ব্যয়, প্রীতি-সম্মিলনীর ব্যয় ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে বিক্রমপুর পাঠাইবার ব্যয় জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে তাহা কয়েকজন সভ্যের নিকট হইতে এক কালীন দান স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। যে কিছু সামান্য চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা দ্বারা ছাপা খরচ ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আমরা বিশেষ কিছুই কার্য্য করিতে পারি নাই। এবার আমরা প্রধানতঃ বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য ও রাস্তা, ঘাট, খাল ইত্যাদির উন্নতি সাধনের ভার লইয়াছি তাহা আয়াসসাধ্য এবং অল্প সময়ের মধ্যে কোন বিশেষ সুফল প্রদর্শনের আশা করা যায় না। এক্ষণে আমরা পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করিতেছি, ক্রমে বল সঞ্চয় করিয়া এই পথে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিব এইরূপ ভরসা করার যথেষ্ট হেতু আছে. তাহা এই এক বৎসরে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। মুন্সীগঞ্জের সব ডিভিসন্যাল অফিসার বাহাদুরের সহানুভূতি-জ্ঞাপক চিঠি ও বিক্রমপুরবাসী যখন যেখানে যাহার সহিত দেখা হইয়াছে, তাঁহার সহিত আলাপে উৎসাহব্যঞ্জক ভাবের পরিচয় পাইয়া আশায় উৎফুল্ল হইয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় বিক্রমপুরের উপর লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েরই কৃপা প্রায় তুল্যরূপে বিদ্যমান আছে। সুতরাং আমাদিগের অর্থবল ও লোকবল কিছুরই অভাব হওয়া উচিত নহে। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিতেছি এই এক বৎসরে যে কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে তাহার জন্য যখন যাহার নিকট গিয়াছি কখনও নিরাশ হই নাই। দাতা হৃষ্ট চিত্তে ঈপ্সিতানুরূপ অর্থ

সাহায্য করিয়াছেন। অর্থ ও সভার জন্য স্থান এই দুটীর জন্য আমাদিগকে অভাব অনুভব করিতে হয় নাই। শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ নাগ মহাশয়কে. এবং রিপন কলেজের ও সিটি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে সভার জন্য হল ছাড়িয়া দেওয়ায় এবং Standard Cycle কোম্পানির স্বত্বাধিকারী মহোদয়কে সম্মিলনীর আফিসের নিমিত্ত একটী কক্ষ প্রদান করায় আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

'বিক্রমপুর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার পরিচালিত বিক্রমপুরপত্রে সম্মিলনীর কার্য্য বিবরণী প্রকাশ ও সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সাধনের সৌকর্য্যার্থ নানা বিষয়ের অবতারণা করিবার ব্যবস্থা করায় এবং মাসিক এক কপি পত্রিকা সম্মিলনীকে দান করায় সম্মিলনীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন (প্রাপ্ত)।

---

# অতিথি।

কে তুমি অতিথি ?—ভয়ে চমকিয়া বালা,
কম্পিত আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসিল বেগে,
কাঁপি করে সান্ধ্যদীপ ঢালি মৃদু জ্বালা,
তুষার প্রতিমা ছবি কুঙ্কুমের রাগে।
প্রাঙ্গণে দাঁড়ায় যুবা নীরব আঁধারে.
কি যেন ব্যাকুল ভাষা নয়নে তাহার,
দেখাইতে সান্ধ্যদীপ প্রতি গৃহদ্বারে
চমকি থামিল বালা রুদ্ধ কণ্ঠভার।
কে তুমি অতিথি! হেথা দীন ক্লান্ত বেশ
অর্গল নিবদ্ধ হায় স্মৃতির দুয়ার,
আঘাতিছে ধীরে ধীরে লভিতে প্রবেশ
আসিছ হে যোগমন্ত্রে নয়ন আসার।
ফিরেনা যে দেশে হ'তে একটী পরাণী,
মৃত্যুর মহিম তট কেমনে ত্যাজিয়া,

আসিয়াছ ছায়াময় ছলিতে দুঃখিনী!
ছায়ালোকে একি মূর্ত্তি এসেছ লইয়া!
সে তো দেব বহুদিন ভুলি শোক ব্যথা,
সুদূর প্রবাসে, মোরে গিয়াছে হে ফেলে,
সে তো ভুলিয়াছে যত অতীতের কথা
আমি শুধু পারি নাই তারে যেতে ভুলে।
কে তুমি আশ্রয়হীন দুয়ারে আমার,
আশ্রয় বিহীন যেন আকাঙ্ক্ষা প্রাণের
ঘুরিতেছে দিশে হারা, হয়েছে অঁাধার
ডুবে গেছে সুখ হাসি উল্লাস ভবের।
এমনি পরাণ মোর অঁাধারের ডালি,
ডুবে গেছে সান্ধ্যকর ক্ষীণ দুরাশার,
নাহি পারি উজলিতে ক্ষুদ্র দীপ জ্বালি
ক্ষণে নিবাইয়া দেয় ঝঞ্ঝা দুরাশার।
যেদিন শুনিনু গঙ্গা সাগরের স্রোতে,
ডুবিয়াছে তরী তব পড়িয়া তুফানে,
ডুবিল অতলে প্রাণ সেই দিন হতে
ওদারুণ বার্ত্তা ছাড়া পশেনি শ্রবণে।
পাঁচটী বছর আমি একেলা বসিয়া,
জীবনের দীর্ঘদিন গণিতেছি ভবে,
পাচটী বছর আজ তাহারে স্মরিয়া
মুছেছি তপত ধারা লুকায়ে নীরবে।
কত নিশি কাটিয়াছে আকুল রোদনে,
ভিজিয়াছে বক্ষ মোর উপাধান হায়,
বিজন কুসুম যেন দারুণ বর্ষণে
ছিন্ন শত দল রাজি ধূলায় লুটায়।
ক্ষম দেব কি কহিনু আপনা বিস্মরি,
শুনিলে যে মর্ম্ম ব্যথা করনা প্রচার,

কুলবধূ আমি আজি এবে পুররাণী
ও কথা স্মরিতে মোর নাহি অধিকার।
কি যেন বিষমাঘাতে কাঁপিল সে ছায়া,
বহিল একটী শ্বাস মথিয়া হৃদয়,
দুই তপ্ত বিন্দু হায় নয়নে গলিয়া
চুম্বিলেক যুবতীর ধীরে পদদ্বয়।
নিঃশব্দে সরিল ছায়া উদ্বেলিত চিতে,
ওকি এক শব্দ হায়! গেল উচ্চারিয়া,
সরিল ধরণী যেন পদতল হতে
অবসন্ন হৃদে বালা পড়িল মূর্চ্ছিয়া।

শ্রীমাখনলাল সেন।

---

# বিক্রমপুরের 'বনফুল'।

বিক্রমপুরে বন নাই অতএব বন ভ্রমণ ও নাই ও বনের শোভা দর্শন ও বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নহে। তবে তথায় গাছ লতা জঙ্গল কম বেশী সর্ব্বত্রই আছে ও লোকের বাড়ীর চারিদিকে ও বাগানে যে সমস্ত বৃক্ষাদি বিনা আদরে জন্মিতেছে ও বর্ত্তমান থাকে তৎ সমুদায় ফুলই 'বনফুল' সংজ্ঞার বুঝিতে হইবে।

বৈশাখে——

১। সোণাল—(কবিরাজদের সোনামুখী) সমস্ত বৃক্ষটী ফুলের একটী "ঝারের" মত দেখা যায়। দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রের সময় উহার সুন্দর শোভা কবিজনের চিত্ত মুগ্ধকর। ফুলের গন্ধ নাই কিন্তু তার বর্ণের ও পর্য্যায়ের সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। খুব সচরাচর বোধ হয় বিক্রমপুরে এই গাছ জন্মে না, তবে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। ইহার ফলগুলি লম্বা ছড়া ( legumes ), সাধারণ ভাষায় "কানাইলড়ী" বলে এবং তাহা হইতে গাছ গুলিও ঐ নামে অভিহিত হয় এই ছড়া গুলি ও গাছের কোন কোন অংশ কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

২। জারুল—এই বৃক্ষ অনাদরে বিস্তর জন্মে কিন্তু ইহার কাষ্ঠ খুব আদরের বটে কারণ তক্তার জন্য যত রকম বৃক্ষ বিক্রমপুরে আছে তন্মধ্যে জারুলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গাছ চট্টগ্রামে ও ত্রিপুরার পাহাড়ের প্রধান কাষ্ঠ। এই সময় ফুল ফুটিলে ছোট বড় জারুল গাছ গুলি কেমন সুন্দর দেখাযায়। বাড়ীতে বসিয়া দেখা যায় বা মাঠে বাহির হইলে কোন না কোন দিকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ফুল গুলি সাধারণতঃ গোলাপী রঙ্গের ও তদ্দ্বারা প্রায় সমস্ত বৃক্ষটী আবৃত হয় এবং ধরিয়া পরীক্ষা করিলে তুচ্ছ জারুল ফুল কি চমৎকার! calyk ছয়টী দাঁতযুক্ত একটী কারুকার্য্য বিশিষ্ট বাটি, ছয়টী পাপড়ী corolla কিসুন্দর অসংখ্য arthers এর একটী সুন্দর pistil তার নিম্নে বাটীটীর মধে overy টী সুরক্ষিত।

৩। হিজল—এই গাছ বাঙ্গালার অন্যান্ত অনেক স্থানে দেখিতে পাই নাই। বর্ষার জল প্রবাহে ইহার বীজ সঞ্চালিত হইয়া আপনা হইতে এই গাছ জন্মে। অতএবই স্থানীয় অবস্থামতে বিক্রমপুরে ইহার অধিকৃত এবং গড় খালের পাড়ে ও মাঠে ঘাটে জন্মিয়া থাকে। লম্ববান ছড়াতে ফুল হয় সাধারণতঃ গোলাপী রঙ্গের ফুল, কোন গাছের ফুল কম গোলাপী রঙ্গের ও কোনটাতে প্রায় সাদা মত হয়। যদি বাস্তবিক পুষ্পবৃষ্টি দেখিতে চান তবে এসময় হিজল গাছের নিকট যান অথবা তার নিম্নে দাঁড়ান মক্ষিকাগণ গুণ্ গুণ্ করিয়া আপনার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিবে। ফুল গুলি আপনা আপনি বা মক্ষিকারা বা বাতাসের স্পর্শ মাত্রে ঝরিয়া পড়ে। বৃক্ষের তল কি স্থল কি জল সুন্দর ফুলে একেবারে আবৃত থাকে।

৪। মোত্রা—এই 'গাছড়ার' বেতি দিয়া পাটী তৈয়ার হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইহাকে "পাটীপাতা" বলে। গড়ের পাড়ে ও কোলা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর জন্মে। ইহার ফুল গুলি খুব সাদা এই সময় প্রচুর পরিমাণে ফুটিয়া মোত্রাবনকে সুন্দর দৃশ্য করিয়া তোলে। এই ফুল পরীক্ষা করিতে Botanist দের খুব আনন্দ হওয়ার কথা।

৫। কচুরী—পানাজাতীয় একপ্রকার উদ্ভিদ। ২।৩ বৎসর যাবত বিক্রমপুরে আসিয়া ছাইয়া পড়িয়াছে এবং তথাকার জলপথ সকল নিতান্ত কষ্টজনক ও অনেক স্থলে প্রায় বন্ধ করিতেছে। এই গুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়িয়া

জলপথ বন্ধ করিয়া ফেলে, পুকুর ইত্যাদি আবৃত করিয়া ফেলে ও বর্ষা বেশী হইলে ধান ক্ষেত ইত্যাদি আবৃত ও নষ্ট করে। বাস্তবিক ইহা বিক্রমপুরের এক নূতন প্রবল শত্রু। আমার বোধ হয় অচিরেই ইহার দূরীকরণ জন্য লোকেল বোর্ড বা গভর্মেণ্টের চেষ্টায় নামিতে হইবে। যদিও নবাগত কচুরী গোলাপ এখন শত্রু (পূর্ব্বে এক রকম কচুরী এ দেশে ছিল, এখন ও আছে, তাহা এত বৃদ্ধি হইত না বা অনিষ্টকর ছিলনা) কিন্তু যখন কচুরী "বন" প্রস্ফুটিত হয় তখন দেখিতে খুব সুন্দর হয়। গুচ্ছে গুচ্ছে ফুলগুলি সবুজ পত্র মধ্যে দাঁড়াইয়া দর্শকের আনন্দদায়ক হয় ও কচুরীর অনিষ্টকারীতা ভুলাইয়া দেয়। প্রধানতঃ ফুলগুলি গোলাপী রঙ্গের তবে ভিন্ন ভিন্ন বনে ফুলের রঙ্গ একটু ভিন্ন ভিন্নও হয়।

শ্রীজগন্মোহন সরকার।

---

# বিক্রমপুর অঞ্চলের হালট।

এতদঞ্চলে প্রত্যেক গ্রামেই সাধারণের যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন দিকে বেশ প্রশস্ত পথ ছিল। অনেক গ্রামে এখনও আছে। এই সকল পথের নাম হালট। যে সকল হালট বাঁধান রাস্তায় পরিণত হইয়াছে তাহা কোথাও বা 'সড়ক' কোথাও বা 'দরজা' নামে পরিচিত। হালট শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? তাহা সহজ সাধ্য নহে। বঙ্গের অন্যত্র এই শব্দের প্রয়োগ আছে কিনা জানি না। ইহা সম্যক্ দেশজ শব্দ না সংস্কৃত হল শব্দের সঙ্গে ইহার কোন সংযোগ আছে তাহা আলোচনার যোগ্য।

এই অঞ্চলে হাল লাঙ্গল অর্থে ব্যবহৃত হয়—হালের গরু বলিতে ভূমি কর্ষণোপযোগী বৃষের কথা বুঝা যায়—হাল দেওয়া বলিতে হলকর্ষণ বুঝায়, কাজেই ইহা আশ্চর্য্য নয় যে, হালট বলিতে যে সব রাস্তা দিয়া হালের গরু লাঙ্গল প্রভৃতি লইয়া যাওয়া যাইত; সেই সব রাস্তাকে বুঝাইতহালের গরু লইয়া যাইবার যে রাস্তা তাহাই পরিশেষে সাধারণের রাস্তার এমন একটা

ঘনিষ্ট সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে যে, খুব আত্মীয়তা না থাকিলে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার-ভুক্ত স্থান দিয়া হালের গরু ও লাঙ্গলাদি লইয়া যাইতে দিতে অনেকের আপত্তি দেখা যায়। হালটের অস্তিত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের বলক্ষয় হইতেছে সে কথাটা একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করিলাম।

অতি পুরাকাল হইতেই হিন্দুগণ গোজাতির উপর কৃতজ্ঞ ও শ্রদ্ধাবান্। তাই গো-রক্ষা বিষয়ে তাঁহারা পূর্ব্বাপর যত্নশীল। গো সকল কিরূপে স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া দেহ পুষ্ট করিতে সক্ষম হয় তাহার উপায় ভাবিতেন। হিন্দুর শ্রাদ্ধ ব্যাপারে বৃষোৎসর্গের মন্ত্রাদিতেও তাহার ভাব সুপরিস্ফুট।

এই পরম হিতকারী গো সকলের চরিবার জন্য হিন্দু রাজা বা জমিদারগণ নিষ্কর ভূমি ছাড়িয়া দিতেন। পূর্ব্বে প্রত্যেক পল্লীর নিকটেই গোচারণের মাঠ থাকিত। সাধারণ কথায় উহা গোপাট নামে অভিহিত। এই অঞ্চলের লোক সংখ্যা বঙ্গের অন্যান্য স্থানের তুলনায় খুববেশী। তাই জমি নিয়া কাড়াকাড়ি বহুদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন কাড়াকাড়ির ফলে বহু গোচারণের মাঠ শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখন হালট গুলি গোচারণের একমাত্র অবলম্বন। কালক্রমে কৃষকেরা চাষের জমি বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছায় হালট কাটিয়া চাষের জিমর আয়তন বাড়াইতে লাগিল। ইহার ফলে এখন আর গরু চরাইবার মত স্থান নাই। এদিকে পাটের অতিরিক্ত চাষ হওয়াতে গরুর ঘাস দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। তাই সকলে হালের গরু দূরে থাকুক গাই গরু পর্য্যন্ত পুষিতে পারে না। কাজেই দুধ দুর্ঘট হইয়াছে। যেখানে টাকায় ষোল সের দুধ অবাধে পাওয়া যাইত সেখানে টাকায় সাত সের দুধ পাওয়াও কষ্টকর হইয়াছে। এমন কি কোন কোন গ্রামে টাকায় পাঁচ সের দুধ বিক্রয় হয়। এইরূপ দুর্ম্মূল্য দুধ কিনিয়া খাইতে পারে পল্লীগ্রামে এমন লোকখুব অল্পই আছে। বৃদ্ধদের কথা দূরে যাউক শিশুগণ পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ না পাইয়া দিন দিন রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যাহারা গরীব তাহারা অনেকেই ভাতের ফেন খাওয়াইয়া ছেলে বাঁচাইতেছে। আমাদের জীবন রক্ষার সঙ্গে হালটের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে তাহা বোধ হয় এখন কতকটা বুঝাইতে পারিয়াছি।

এই গুরুতর প্রয়োজনের কথা অনেকেই ভুলিয়া যান। যাহারা হালট

রক্ষার্থ ব্যস্ত তাঁহারাও যাতায়াতের সুবিধার কথাই ভাবেন—গোচারণের কথা একবারও ভাবেন না।

গ্রাম্য বৃদ্ধদের নিকট শুনিতে পাই যে পূর্ব্বে এক একটী হালট প্রস্থে তিন নল (২২।২৩ হাত পরিমিত) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহারা আরও বলেন যে ১০।১১ হাত পরিমিত লম্বা রজ্জু দ্বারা হালটের মধ্যস্থলে গাইগরু বাঁধিয়া দিলেও ইহারা কাহারও শস্যধ্বংস না করিয়া স্বচ্ছন্দে শ্যামল দূর্ব্বাদলে উদর পূর্ত্তি করিতে পারিত। এতদ্ব্যতীত হালটের দৃশ্য বড়ই রমণীয় ছিল। উহা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া অবশেষে নদীতীরে অথবা গ্রামের বহির্ভাগস্থ বিশাল মাঠে মিশিয়া যাইত। এইরূপ প্রশস্ত হালট গ্রামে থাকাতে গ্রামের দৃশ্য কিরূপ মনোহর ছিল তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন।

বর্ত্তমানে হালটের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে তাহা যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। যে হালট প্রস্থে ২২।২৩ হস্ত পরিমিত ছিল তাহা এখন কোন কোন স্থানে লুপ্ত অথবা এক হস্ত পরিমিত "আইলে" পরিণত হইয়াছে। কোন কোন হালটের দুইদিকে বসতি হওয়াতে হালট লোকের "পিছারায়" (খিরকির দ্বার) পরিণত হইয়াছে! এইরূপ হালটের উপর দিয়া যাওয়া আসা এক বিড়ম্বনা।

---

(১) বিক্রমপুরবাসী কৃষককুল সাধারণ ক্ষেত্রের সীমা নির্দ্দেশক স্থানকে "হাতাইল" বা "আইল" বলিয়া থাকে। বোধহয় হাতাইল বুঝিতে প্রস্থে একহাত পরিমিত স্থানই বুঝা যাইত। (হাত + আল)। সেই এক হাতের স্থানে আধহাত পরিমিত স্থানও সর্ব্বত্র দেখা যায় না। ইহার উপর কৃষককুল ক্ষেত্রগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য হাতাইলের দুইদিকেই মান্দার, বেত, মনসাকাঁটা প্রভৃতি দ্বারা বেড়া দেয়। একে এই অল্প পরিসর স্থানে দুই পা পাশাপাশি রাখা যায় না; আবার দুইদিকে কাঁটা গাছের বেড়া থাকাতে পথিককে কিরূপ সংশয় অবস্থায় চলিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন এতদ্ব্যতীত বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন ক্ষেতের পাট বড় হয় তখন বিক্রমপুর বাসীদের চলাফেরা কিরূপ কষ্টকর হয় তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মুখেও এই অসুবিধার কথা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু গভর্মেণ্ট তাঁহার কোন সুবিধার জন্য এযাবত চেষ্টা করিতেছেন না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

তারপর গ্রামে যাহারা নিয়ত বাস করেন তাঁহাদের রোপিত মান্দার সকলে রাস্তাঘাট একেবারে আঁধার করিয়াছে। বর্ষাকালে এই সকল রাস্তা দিয়া মাঝিগণ অক্ষত দেহে নৌকা বাহিয়া যাইতে পারে না। নৌকার আরোহিগণও একেবারে রেহাই পান না। কারণ মান্দার কি খেতের কাঁটায় তাহাদের শরীর নিশ্চয়ই ক্ষত বিক্ষত হইয়া থাকে। তথাপি গ্রামের অধিবাসিগণ তাহাদের সীমানার গাছগুলির অঙ্গস্পর্শ করিতে নারাজ। বর্ষাকালে যাঁহারা বিক্রমপুরের গ্রামের মধ্য দিয়া নৌকাযোগে ভ্রমণ করিয়াছেন তাহারা অবশ্যই গ্রাম্য রাস্তা গুলির দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া থাকিবেন।

এতদ্ব্যতীত হালট লইয়া সাধারণের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি ও অর্থ ধ্বংস ও অল্প হইতেছে না। হালটের কোন সীমানা না থাকাতে উভয় দিকের জমির অধিকারীর মধ্যে নিয়তই ঝগড়া বাঁধিতেছে। একে অন্যের প্রতি হালট ভাঙ্গিবার অভিযোগ করিয়া মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। এইরূপ ঘটনা নিয়তই দেখা যাইতেছে। এমন কি অনেক স্থানে লাঠালাঠিও হইয়া থাকে, যেখানে শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ সেখানেই গোলযোগ বাঁধিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সাধারণে মিলিয়া এসকলের প্রতীকারের জন্য কিছুই করিতেছেন না। ইহার কারণ এই যে, "এই দোষে" সকলেই কিছু না কিছু দোষী কাজেই কেহ কাহাকে কিছু বলিলে সে তাহাকে আরও দশটা দোষ প্রদর্শন করাইয়া জব্দ করিতে থাকে। এইরূপ রেষারেষীতে কোনই ফল ফলিতেছে না।

বিক্রমপুর অঞ্চলে যখন সেটেলমেণ্টের কার্য্যারম্ভ হয় তখন হইতেই সাধারণের যাতায়াতের গ্রাম্য পথের প্রতি সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সরকার বাহাদুরের এখন বিশেষ ইচ্ছা যাহাতে গ্রামের পূর্ব্বতন পথগুলি সুরক্ষিত হয়। গভর্মেণ্ট বিক্রমপুরের বড় বড় প্রাচীন রাস্তা গুলির সীমা যথাসম্ভব নির্দ্দেশ করিয়া তাহা লৌহদণ্ড দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিতেছেন। সরকার বাহাদুর বর্ত্তমান সময়ে শুধু ইতিহাস প্রসিদ্ধ বড় বড় রাস্তাগুলি চিহ্নিত করিতেছেন, কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে যে সকল ছোট ছোট রাস্তা আছে তৎপ্রতি মনোযোগ দিতে পারিতেছেন না। অথচ উহাদের অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে,

কোন ওপ্রবল পক্ষ উহাদের রক্ষায় মনোযোগী না হইলে অদূর ভবিষ্যতে উহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবার সম্ভাবনা। আশাকরি এ বিষয়ে প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসী নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেশের কল্যাণ কামনায় মনোযোগী হইবেন। বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্ত্তী।

---

# ফুলের মুকুট।

## গল্প।

১

অস্তমিত সূর্য্যরশ্মি পর্ব্বত কন্দরে প্রতিহত হইয়া স্বর্ণের কণাগুলি পাহাড়ের বক্ষে ছড়াইয়া দিতেছিল। শৈল-সমুদ্ভূত বনরাজি সেই স্বর্ণকণায় মস্তক রঞ্জিত করিয়া মলয় আবেগে একবার শিহরিয়া উঠিতেছিল। আর তাহারি দ্যুতিতে সমুজ্জ্বলা গিরিহ্রদের বক্ষ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৃত্যের লহর তুলিয়া দিয়া সেই শৈলমূলে আছাড়িয়া পড়িতেছিল। সেই হ্রদতটে প্রস্তরাসনে বসিয়া একটি যুবক ও একটি কিশোরী। কিশোরী একমনে পুষ্পমুকুট নির্ম্মাণে নিযুক্তা।

যুবক সবেমাত্র কৈশোরের সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। যৌবনের তেজ, আভা, কান্তি তাহার দীপ্ত নয়নে ও অঙ্গে সুন্দর রূপে প্রকাশিত। আর কিশোরী—সে সবেমাত্র যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীতা; দুই একটি যৌবনের লক্ষণ তখন ধীরে ধীরে তাহার অঙ্গে নিজ নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিল।

যুবক বলিতেছিল "শোন এলেন, প্রকৃতি তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য এই লোন্-ফেন্‌লি পাহাড়ে ঢালিয়া দেন নাই। এর চেয়ে ও সুন্দর যায়গা এই জগতে আছে। আমি নিশ্চয় করে বল্‌ছি আমি সেই সব যায়গায় যাব। কাল আমি এই পর্ব্বত চূড়ায় অধিষ্ঠিত মঠে মাতা মেলানিডের নিকট হাত দেখাতে গিয়াছিলাম। তিনি কি বলেছেন জান? তিনি বলেছেন যে বহির্জ্জগতের ধন রত্নরাজি আমাকে সাদরে আহ্বান কর্‌ছে—রাজেন্দ্র বর্গ আমার সম্মান করবে আর অপ্সরা-বিনিন্দিতা রমণী সকল আমাকে তাদের প্রেম-সুধা-সিঞ্চনে আমার মনোরঞ্জন করবে' বুঝ্‌তে পেরেছ?

একটা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় কিশোরী শিহরিয়া উঠিল। তাহার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল "কিন্তু এই যায়গার চেয়ে কি আর কোন সুন্দর যায়গা এই পৃথিবীতে আছে? দেখ দেখি, কেমন সুন্দর এই উপত্যকা, এই হ্রদ, এই বৃক্ষরাজি, এই সুন্দর পর্ব্বত, পাপিয়ার তান, কোকিলের প্রাণ-মাতোনো সঙ্গীত—কি বল সিভ্‌রিক্ এখানে আরও অনেক রকম সুখ আছে। ইহাতে কি তুমি সুখী নও?"

যুবক একটু হাসিল, তার পর কিশোরীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিল "সুখী যে তার কোন সন্দেহ নাই—যেমন এই পশুপাখীগুলি সুখী; কারণ এর চেয়ে যে অধিক সুখ থাক্‌তে পারে তারা তা জানেনা। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে এই যায়গাটুকুতে আবদ্ধ রাখ্‌বেন বলে সৃষ্টিকরেন নাই। আমি রত্নবিভূষিতা পৃথিবীর জন্য সৃষ্ট হয়েছি আমি তা নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। মাতা মেলানিড অসত্য বলেন নাই। আমি নিশ্চয় একজন বিখ্যাত লোক হব।"

কিশোরী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পুনরায় মালা গাঁথিতে মনোনিবেশ করিল। তাহার চম্পকাঙ্গুলির আঘাতে ফুলগুলি যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসি ফুটাইয়া তাহার সঙ্গীর মস্তকে মুকুটটি পরাইয়া দিল এবং বলিল "বন্যফুলের মুকুট ঘৃণা করবার জিনিষ নয় সিভ্‌রিক। স্বর্ণ মুকুটের চেয়ে এ অনেক গুণে সুন্দর।"

যুবক অসহিষ্ণুভাবে মস্তক হইতে মুকুট ফেলিয়া দিল। কিশোরী অতি কষ্টে নয়নের অশ্রু চাপিয়া ছিন্ন পাপ্‌ড়িগুলি নূতন করিয়া সাজাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল দেখ ত মুকুটটী একটুও খারাপ হয় নাই। আমার মনে

হয় গন্ধটা যেন আরও বেড়ে উঠেছে। যদিও তুমি অনাদর করে ফেলে দিয়েছিলে যদিও পাপ্‌ড়ি গুলি ছিড়ে গেছে তবু সৌরভত একটু ও কমে নি।"

যুবক অন্যমনস্কভাবে বলিল "আঃ এই বিশাল পৃথিবীতে বিখ্যাত হওয়া কি সুখের। প্রকৃত মনুষ্যের চিন্তাই এই।"

কিশোরী আস্তে আস্তে বলিল "ঠিক বটে। যদি তুমি চিন্তা কর কিন্তু চিন্তাটাকে নিজের উপর প্রভুত্ব না কর্‌তে দাও।"

যুবক লাফাইয়া উঠিয়া কিশোরীর সম্মুখে দাঁড়াইল। একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব তাহার দীপ্ত মুখে খেলিয়া গেল। অস্তমিত সূর্য্য কিরণ তাহার মুখ মণ্ডলে পতিত হওয়াতে তাহা এক অভিনব শ্রীমণ্ডিত হইল। তাঁহার চক্ষে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকশিত হইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল "আমিই স্বপ্নের উপর প্রভুত্ব স্থাপন কর্‌ব। এলেন! তুমি দেখবে আমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত কর্‌ব। তুমি বালিকা, তুমি আমাদের প্রতিজ্ঞার শক্তি বুঝতে পার্‌বে না। বাহিরের দিকে চেয়ে দেখ, কিরূপ নবজীবন ধনসম্পদ মান প্রকৃত মনুষ্যের জন্য রয়েছে। তারা শুধু আমাদের মত লোকের প্রতীক্ষা করছে। আহা! তাদের জন্য জীবন সংগ্রামে রত হওয়া কি সুখের। এরূপ সংগ্রামে ভীরুর মত পশ্চাৎ পদ না হয়ে আত্ম-বলিদান শতগুণে শ্রেয়স্কর।"

বোধ হইল যেন সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রকৃতিগত কবিত্বময়ী ভাব তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। তার সেই উৎসাহ পূর্ণ জ্বালাময়ী স্বর এত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল যে তাহার সঙ্গিনীটি চমকিয়া উঠিল।

আকাশে দুই একখানা কালো মেঘ তখন এদিক সেদিক করিয়া বেড়াইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে সেই পর্ব্বতের বক্ষে সায়াহ্নের আঁধারের মত ছায়ায় ঢাকিয়া ফেলিতেছিল; সম্মুখে,—পদপ্রান্তে হ্রদের নীল জল চপল হাস্যে উছলিয়া উঠিতেছিল। ধরিত্রী তখন সৌন্দর্য্যের পূর্ণভাণ্ডারটি তাহাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ হইল এক পশলা বৃষ্টি বিটপীশ্রেণীর পাতায় পাতায় মুক্তাবিন্দু সাজাইয়া দিয়াছে। মনে হইল যেন পৃথিবী মধ্যাহ্নে নিদ্রালসতা ত্যাগ করিয়া সূর্য্য কিরণ স্পর্শে সজীবতা লাভ করিয়া ছোট্ট শিশুটির মত হাসির বাহার খুলিয়া দিয়াছে।

কিশোরী পুনরায় বলিল "কিন্তু রিচ্‌রিক এখানে ত আমরা সুখে আছি।"

যুবক বিদ্রূপের সুরে বলিল "জ্ঞানহীন মূর্খেরা যেরূপ সুখানুভব করে।— কারণ এর চেয়ে বেশী সুখ কি তাত আমরা জানি না। আচ্ছা এলেন! এই ল্যানফেন্‌লি পাহাড় আমাদিগকে —তোমাকে এবং আমাকে—কি দিয়াছে?"

কিশোরী উত্তর করিল "আর কি দিবে! জীবন, আহার, বাসস্থান আর এই—সে ল্যেন্‌ফেন্‌লি পাহাড়ের রমণীয় দৃশ্যের প্রতি হস্ত বাড়াইয়া দিল— তার পর একটু দৃঢ়স্বরে বলিল "সিভ্‌রিক্‌! এর চেয়ে সুন্দর যায়গা এই পৃথিবীতে নাই।"

যুবক উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল তার পর বলিল "এলেন! ঐ গাভীগুলিও মনে কচ্ছে ঐ উপত্যকার সুমিষ্ট তৃণের মত সরস তৃণ আর অন্য কোন যায়গায় নাই। তুমি যেরূপ এই ল্যান্‌ফেন্‌লি পাহাড় ছাড়া অন্য কোন যায়গায় যাও নাই তারা ও সেরূপ এই পার্ব্বত্য তৃণ ছাড়া অন্য কোন তৃণের স্বাদগ্রহণ করে নাই— বুঝেছ?"

কিশোরী বলিল "কিন্তু আমি জানি ল্যানফেন্‌লিই পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বেশী সুন্দর। কত বিদেশের লোক এখানে সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে আসে— ঐ দেখ কয়েকজন এই দিকেই আস্‌ছে"—সে বহুদূরে পার্ব্বত্য রাস্তার উপরে একখানা গাড়ী দেখাইয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলিল "এঁরা বোধ হয় বেরোনিকের থেকে আস্‌ছে। সিভ্‌রিক! সত্যি কথা বল্‌তে কি, যখন আমি এই সকল ব্যস্ত প্রকৃতির লোকগুলিকে ভীত বিতাড়িত মেষগুলির মত এদিক্‌ সেদিক্‌ যেতে দেখি তখন মনে হয় এরা যেখান থেকে আস্‌ছে সে যায়গা গুলি বেশী সুন্দর নয়।"

"কেন নয়?"

"সে যায়গা যদি সুন্দর হ'ত তবে তারা এখানে আস্‌বে কেন? তা'হলে নিজেদের দেশেই থাকৃত।"

"সে কথা সত্য বটে কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত যায়গার সৌন্দর্য্যও এক নয়। তারপর একটু হাসিয়া সিভ্‌রিক বলিল "আমার নিকট কি সুন্দর জান? আমার নিকট সুন্দর অসংখ্য জন সমুদ্রের ভীষণ কল্লোল—সূর্য্য তেজহীনকারী জলজলে মুক্তোর স্তূপ—আর সূত্রগ্রথিত সুরভি স্নিগ্ধ গোলাপের রাশি। আমি যখন চোক বুঝে থাকি তখন আমার চোকের সামনে এই অসংখ্য

জনতা ভেসে উঠে—তাঁদের উৎসাহপূর্ণ চোকগুলি আমার মুখের উপর স্থাপিত হয়ে আছে মনে হয়! মনে হয় বাতাসের মধ্য দিয়ে তাঁদের নিক্ষিপ্ত ফুলগুলি আমার পায়ের নিকট এসে সজোরে আছ্ড়ে পড়্ছে—আমি—আমি—"

সে তাহার চক্ষু নিমিলিত করিল—যেন ঐ সমস্ত চিত্রপট সে মন্ত্রবলে উদ্ভাবন করিবে।

বালিকা পুষ্প গাঁথিতে গাঁথিতে বলিল "এখানেওত এই ফুল—তাজা ফুল—আছে আর এই বৃক্ষগুলি ও মনুষ্য হস্ত রোপিত নয়। সিভ্রিক যখন এই ফুলগুলি শুকিয়ে যাবে তখনও তাদের গন্ধ থাক্‌বে। যদিও তুমি এদের ঘৃণা করে ফেলে দিয়েছ কিন্তু দেখ এরা কত সুন্দর।" কিশোরী হস্তস্থিত ফুলগুলি সিভ্রিকের নয়ন সমক্ষে ধরিল।

যুবক তাহার কথার উত্তর না দিয়া বলিল "মাতা মেলনিড্ জ্ঞানবতী! তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য হয়। এলেন! তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে। তিনি কি বলেন নাই মাইফলি একজন ধনশালিনী যুবতীকে বিবাহ করিবে? তাহা কি সত্য হয় নাই?"

"তা সত্য বটে। কিন্তু তিনি কি ইহাও বলেন নাই যে এই বিবাহে বিষময় ফল ফলিবে এবং তাহাতে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে? তাহাও কি সত্য হয় নাই?"

কিশোরী মুখ ফিরাইয়া দূরে বক্রগতি রাস্তাটি—পাহাড়ের গায়ে যেখানে মিশিয়া গিয়াছে—সেইদিকে চাহিয়া রহিল। দুইজনেই নিস্তব্ধ। এমন সময় দূরে অশ্বখুরধ্বনি এবং চক্রের ঘর্ঘর শব্দ শ্রুত হইল।

সিভ্রিক মুখ উঠাইয়া বলিলেন "আমি প্রকৃত মানুষ। ঐ বহির্জগতের অত্যুচ্চ যশঃ, ধন, মান আমার হইবে। শোন আমি একটি গান রচনা করিয়াছি তাহাতে আমার সমস্ত সুখের কথা নিহিত রহিয়াছে।"

সে কিশোরীর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই গান আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার সুর ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার সেই জ্বালা-ময়ী বাক্যবিন্যাসে তাহার হৃদয়ের বাসনা সুন্দররূপে প্রকটিত হইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে সুর নিম্ন হইতে নিম্নস্তরে আসিয়া মিলিয়া গেল! বালিকার চক্ষু হইতে দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল।

যুবক বলিল "ইহাই আমার স্বপ্ন—আবার শোন।" আবার তাহার সুর উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। মনে হইল যেন পাহাড়ের পাখীগুলি ও তন্ময় হইয়া সেই গান শুনিতেছে। দূরে অশ্বপদ ধ্বনিও যেন নীরব হইল।

হঠাৎ কে যেন চীৎকার করিয়া বলিল "এ আবার কি—ওহে গাড়ী থামাও গাড়ী থামাও।—এ কি হে ?"

উত্তর হইল এইটে ল্যানফেন্‌লি পাহাড়।

"দূর নির্ব্বোধ এইটে কি যায়গা তা আমি জিজ্ঞেস করি নাই। আমি জিজ্ঞেস কচ্ছি কি শুন্‌ছি।"

এমন সময় ধীরে ধীরে একখানি গাড়ী সিড্‌রিফ্‌ ও এলেনের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল।

শকট চালক বলিল "ও আর কিছু নয়। একটি ছেলে গান গাচ্ছে। গান আপনি যেখানে সেখানে শুন্‌তে পাবেন কিন্তু এমন সুন্দর স্থান আর কোথাও দেখতে পাবেন না।" সে হাতের ছড়ি পাহাড়ের দিকে হেলাইয়া দিল।

গাড়ীর প্রধান আরোহী বলিলেন "সত্য সত্যই ল্যান্‌ফেনলিবাসিরা অদ্ভুত। এই সুন্দর শোভার মর্ম্ম তারা কিছুই অনুভব কর্‌তে পারে না। আহা কি সুন্দর সুর!"

একটী প্রাচীন বয়স্ক লোক গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন এবং দেখিলেন সিড্‌রিফ দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছে, আর তাহার পায়ের কাছে বসিয়া একটি কিশোরী পুষ্প গাঁথিতে গাঁথিতে সেই গান মনোযোগ দিয়া শুনিতেছে।

তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "আঃ! ঘোড়াটাকে আচ্ছা করে চাবুক দাও যেন আর না লাফায়, গানটা শুনতে দিলে না।

সিড্‌রিফ তখন পূর্ণ উৎসাহে গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি তন্ময় হইয়া সেই গান শুনিতে লাগিলেন।

গান থামিল। তিনি মুখ ফিরাইয়া গাড়ীতে উপবিষ্ট এক কিশোরীকে বলিলেন "কি সুন্দর ভাব! যদিও এরা অশিক্ষিত কিন্তু কি সুন্দর ভাবে গেয়ে যাচ্ছে। লীনা! তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি দেখে আসি।"

"আমিও আসি বাবা। বসে বসে আমার বিরক্ত ধরে গেছে। তার স্বরটা খিটখিটে এবং মেজাজটা রুক্ষ বলিয়া বোধ হইল।

মিষ্টার ষ্ট্রেড্লি তাঁহার কন্যাকে গাড়ী হইতে নামাইলেন এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রীতি প্রফুল্লভাবে হাস্য করিলেন। মনে হইল যেন এই প্রদেশের কবিত্বময়ী শক্তি তাহারও মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে।

এলেন হঠাৎ বলিল "দেখ সিড্রিফ গাড়ীটা এই খানেই থামিয়াছে। তারা এই দিকেই আস্‌ছে।"

"বোধ হয় রাস্তা ভুলে এই দিকে এসে পড়েছে।"

সেই অপরিচিতের স্বর শুনিয়া সিড্রিফের মনে হইল যেন বহির্জগতের স্বপ্নাতীত ধনসম্পদগুলি তাহার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। আবার তাহার মনে সেই উৎসাহপূর্ণ চক্ষুগুলি, দর্শকবৃন্দনিক্ষিপ্ত পুষ্পের রাশি সুন্দররূপে জাগিয়া উঠিল। ভাবের আবেগে তাহার মুখ রক্তিমাভাময় হইয়া উঠিল। তাহার চক্ষু হইতে এক অপরূপ জ্যোতিঃকণা বিস্ফুরিত হইল। আর সুবেশ ধারিনী সুরুচিসম্পন্না লীনা তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিল; দেখিয়া মুগ্ধ হইল। কিন্তু আবার যখন তাহারি সম্মুখে তাহার প্রতিদ্বন্দিনী সম সেই পাহাড়ী বালিকার সরল হাস্যময় সুন্দর মুখখানি দেখিল তখন তাহার মুখে বিজাতীয় ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল। সে মুখ ফিরাইয়া তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল আচ্ছা বাবা, ছেলেটিত বেশ সুন্দর কিন্তু পাহাড়ী ছুড়ীগুলা অত কুৎসিত কেন?"

যুবতীর পিতা তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, "ওহে ছোক্‌রা শুন্‌চ—তুমিই কি গান গাচ্ছিলে?"

যুবক ভয়কম্পিতস্বরে বলিল "আজ্ঞে হঁা। আমিই গাচ্ছিলুম। কিন্তু আমি যে অজ্ঞাতসারে আপনাকে বিরক্ত করেছি তাত জানি না। আমি শুধু একটু আমোদ করবার জন্য গেয়েছি।"

"বিরক্ত করেছ? সর্ব্বনাশ! আমাকে বিরক্ত করেছ? আবার গাও ছোক্‌রা। আচ্ছা এই গানটি গাও ত।" তিনি গলা ঝাড়িয়া একটি সুন্দর গান গাইলেন। সিড্রিফ প্রথমবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। দ্বিতীয়বার চেষ্টায় সুন্দররূপে সুর ভাসিয়া উঠিল। তৃতীয়বার সে পূর্ণ শক্তিতে মন খুলিয়া গাহিতে লাগিল। নবাগত ভদ্রলোকটি হাতে তাল বাজাইতে লাগিলেন।

"বেশ গেয়েছ যুবক। আমার সঙ্গে এস, আমি কোন আপত্তি শুনবনা তোমার নামটি কি ? তুমি কোন্ যায়গায় থাক ?"

যুবক বলিল "আমার নাম সিড্রিফ আর এর নাম এলেন। আমরা এই ল্যান্ফেনলি পাহাড়েই থাকি।"

এলেন বলিল, "এর বাপ এখানকার পোষ্টমাষ্টার—কিন্তু লীনার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে চুপ করিল। সেই গর্ব্বিতার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার আর কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল না।

ভদ্রলোকটি এলেনের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন "এস যুবক আমি আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু একটি অদ্ভুত জিনিষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সিড্রিফ এস—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমিই মিষ্টার ষ্ট্রেড্লি।"

সিড্রিফ দুই একবার অস্পষ্টস্বরে আবৃত্তি করিল "ষ্ট্রে—এড্—লি!" এই সুকণ্ঠ গায়কের নাম কে না জানে ? এই সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার নাম অজ্ঞাত ছিল না। সিড্রিফ বুঝিতে পারিল পৃথিবীর একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকের সাম্নে সে দাঁড়াইয়া। তাহার মস্তক নত হইয়া আসিল। খ্যাতিশালী সুগায়ক তাহার কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করিয়াছেন,—কিসে আনন্দ—কিসে সন্তোষ! যে কণ্ঠস্বর এলেন ব্যতীত আর কেহ শুনে নাই তাহাই আজ পৃথিবীর সর্ব্বজন বিদিত সুগায়ক প্রশংসা করিতেছে। সিড্রিফ ভাবিল সেজন্যই বুঝি মাতা মেলানিড্ বলিয়াছিলেন—পৃথিবীর যশ, ধন, মান তাহার পদতলে পড়িয়া !

"আমার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। এস সময় নষ্ট করিও না। না-না-তুমি এখন গান গেও না। এই সুন্দর জিনিষের আদর পার্ব্বত্য গো-মেষাদি বুঝিবে না। তুমি এত জোরে গাহিও না যুবক। তোমার সুরের মত এত মিষ্ট সুর আমি আর কোথাও শুনি নাই।" কথা বলিতে বলিতে তিনি সিডরিফকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। সিড্রিফ তাহার অনুসরণ করিল। সময়ের উত্তেজনায় সে এলেনের কথা বিস্মৃত হইল।—

মিষ্টার ষ্ট্রেড্লি গাড়ীতে বসিয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন; তিনি সিড্রিফের চোখের সামনে কল্পনাতীত পুরস্কারের ছবি ধরিয়া তুলিলেন। তিনি বলিলেন—যা'র এমন সুকণ্ঠ পৃথিবীতে তার অপ্রাপ্য কিছুই নাই। ইচ্ছা

করিলে সে সব পাইতে পারে। তারপর তিনি নিজের সফলতার কথা, সুখ্যাতির কথা সিড্‌রিফের নিকট বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে সিডরিফের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল—তাহার কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠিল তাহার মাথায় একটা উষ্ণ শোণিত-প্রবাহ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। মাতা মেলানিড্‌ত সত্য কথাই বলিয়াছেন। মিঃ ষ্ট্রেড্‌লি আবার সেই প্রলোভনের কথাই বলিতেছেন। যুবক আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল।

মিষ্টার ষ্ট্রেড্‌লি বলিলেন, "সত্য কথা বলিতে কি এখন আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক। আমার উপরে এখন পর্য্যন্ত কেউ উঠ্‌তে পারেনি। এমন কি অনেক সময়ে মনে হয়েছে যে আমি মরে গেলে আমার শিষ্যবর্গ কেউ আমার নামের যোগ্য হতে পারবে না; আর এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করেই বা শিষ্য গড়ে নেব, বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় পদার্পণ করেছি। এখন কিন্তু পৃথিবী আমার ভাল লাগছে আমি উপযুক্ত শিষ্য পেয়েছি। আজ মনে হচ্ছে যেন আমি নবজীবন পেয়েছি।"

শুনিতে শুনিতে সিড্‌রিফের শ্বাসরোধ হইয়া আসিল, সে অতি কষ্টে চিত্তবেগ দমন করিতে প্রয়াস পাইল। তাহার চক্ষে ল্যানফেন্‌লি পাহাড় এখন হইতেই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সে দেখিল তাহার উন্নতির পথ সম্মুখে অর্গলমুক্ত। স্বয়ং সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন তাহাকে বাহু প্রসারণ করিয়া আহ্বান করিতেছেন।

আর এলেন—অভাগিনী নবতৃণাচ্ছাদিত শৈলভূমির উপর পড়িয়া বাণবিদ্ধা হরিণীর মত ছটফট করিতে লাগিল। সে যে তাহার সমস্ত হৃদয়টুকু দিয়া সিড্‌রিফকে ভালবাসিয়াছে আজ সেই সিড্‌রিফ তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। পৃথিবী তাহাকে আহ্বান করিতেছে। এলেনকে ক্ষুদ্র এলেনকে কি তাহার মনে থাকিবে? সে যে তাহাকে সহজেই ভুলিয়া যাইবে তবে তাহার কি হইবে?

সিডরিফ মিষ্টার ষ্ট্রেডলিকে তাহার পিতার সমক্ষে লইয়া গেল। বৃদ্ধ তখন এক মনে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি তাহাদের আগমন জানিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ সিডরিফের উচ্চ কণ্ঠস্বর তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি তাহার চশমাঢাকা চোখদুইটা তাহাদের দিকে ফিরাইলেন, তারপর বলিলেন "কে সিডরিফ?"

তাঁহার মুখখানি বেশ শান্ত স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। দেখিলেই মনে হয় তিনি জীবনে খুব কমই দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন।

জীবনের মধ্যাহ্ন অতীত না হইতেই পরপার হইতে তাঁহার স্ত্রীর ডাক পড়িয়াছিল। একমাত্র পুত্রকে অবলম্বন করিয়া কর্ণধার হীন জীবন-তরণী তিনি এই সংসার সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছেন পুত্রের মুখ চাহিয়া তিনি পত্নী বিরহ-জনিত ব্যথা ভুলিয়াছেন। তাহারও পরপার হইতে শমন জারি হইয়াছে শুধু পোঁছান বাকি। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিয়া যাইতে পারিলেই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

"হ্যাঁ বাবা আমি। কয়েকজন বড় লোক আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছেন। খুব ভাল সংবাদ। আমি একজন খুব বড়—বড়—"

"আস্তে আস্তে বল সিড্‌রিফ। এখন একটা কাজকর। এই ভদ্রলোকদের ঐ ঘরে নিয়ে যাও।"

পাশের ঘরে মিষ্টার ষ্ট্রেড্‌লি তাহার সমস্ত ঘটনা সেই বৃদ্ধ বিপত্নীককে বলিলেন।

তিনি বলিলেন "মহাশয় এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর পৃথিবীর লোকে কখনও শুনিয়াছে কিনা সন্দেহ। আমি—ষ্ট্রেড্‌লি একথা বল্‌ছি। আমি আপনার ছেলেকে নিতে এসেছি। আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়িলেন।—তিনি বলিলেন "আমি শুনেছি যে ওস্তাদ রেখে গান শিখ্‌তে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। আমাদের অবস্থা তত সুবিধের নয়। আর আমিও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি,—একা এ সমস্ত কাজ আর দেখতে পারি না। সিডরিফকে আমার সাহায্য কর্ত্তে হবে, একে শিখাবার মত টাকা আমার নাই।"

ষ্ট্রেডলি অসহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "আঃ সে কিছু নয়। বালক আমার অধীনে থাকবে।

বৃদ্ধের সম্মানে আঘাত লাগিল; তিনি সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "না না মহাশয় তা হতে পারে না। সে এখানেই বেশ সুখে আছে। পোষ্টাফিস হতে যে মাইনে পাবে তাতেই তার চলে যাবে। আর গান—তা যখন তার ইচ্ছে হবে তখন সে গাবে।"

"আঃ—শুনুন্ না। আমি যে বল্‌লুম আপনার ছেলের যে রকম মিষ্টি সুর এরূপ সুর একটা শতাব্দীর মধ্যে এক জনের হয় কিনা সন্দেহ। আর আপনি যে মাইনের কথা বলছিলেন—সে কি রকম মাইনে? যে সে তার চাকরকে অল্প দিনের মধ্যেই দিতে পারবে। ঈশ্বরের দানকে অবহেলা কর্‌লে যে পাপ হয় তাকি জানেন না? শুনুন আমি আপনার ছেলেকে শিক্ষা দিব। আর যদি মনে করেন এতে আপনার সম্মানে আঘাত লাগবে,—বেশ—যখন আপনার ছেলে বড় হবে তখন সে আমার টাকা শোধ করবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীযামিনীমোহন সেন।

---

# প্রহেলিকা।

## দশম পরিচ্ছেদ।

বিজয়ের পিতা চন্দ্রনাথবাবু জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। দেখিতে স্থূলদেহ, লম্বোদর, দীর্ঘাকার, শ্যামবর্ণ। চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতিষ্মান, ললাট প্রশস্ত, মস্তকটী বড়। সুদক্ষ ন্যায়পরায়ণ কর্ম্মচারী বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। সত্যবাদী, মিতাচারী, মিতভাষী, নির্ম্মলচরিত্র। তবে, তাহার হৃদয়ের ভিতর নম্রতা, কোমলতা অপেক্ষা আত্মনির্ভরতা, সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহসিকতা ইত্যাদি পুরুষোচিত কঠোর ভাবগুলিই অধিকতর স্থান পাইত।

তাহার পিতা গভর্মেণ্টের অধীনে উচ্চবেতনে কাজ করিতেন কিন্তু মৃত্যুকালে তাহাকে একপ্রকার নিঃসম্বল অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এক প্রকার নিজের চেষ্টাতেই মানুষ হইয়াছেন।

পিতৃদেব দেব দ্বিজে ভক্তিমান, অতিথিসেবাপরায়ণ প্রাচীন আদর্শে গঠিত, আদর্শহিন্দু ছিলেন। চন্দ্রনাথ বাবু তাহার আমলের অতিথিসেবা একপ্রকার উঠাইয়া দিয়াছিলেন। দুর্গোৎসব করিতেন কিন্তু দুর্গা কিম্বা কালীতে তাহার বিশেষ বিশ্বাস ছিলনা। পিতা ইংরাজী জানিতেন না, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান রত্নবিশেষ ছিলেন। মিথ্যাকথন, শঠতা, প্রবঞ্চনা এ সব তিনি দুইচক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

লোকের সঙ্গে সচরাচর বড় বাক্যালাপ করিতেন না। তাহার আকৃতির সহিত এমন কি একটী গাম্ভীর্য্যের ভাব জড়িত ছিল, যে সাধারণ লোক সকল তাহার কাছে আসিলে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িত। পুত্রগণ তাহাকে দেখিলে ভয়ে কোথায় যাইয়া যে লুকাইবে, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিত না। তিনি বাহির বাটীতে আগমন করিলে, তাহারা ভিতর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইত। আবার, যদি তিনি ভিতর বাটীতে আসিতেন, তাহা হইলে বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির বাড়ীতে পালাইয়া যাইত। অথচ, কেহ তাহাকে কখনও কাহার প্রতি দুর্ব্বাক্যটী পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে শোনে নাই।

তাহার হৃদয় যে দয়া মায়া, স্নেহ প্রেম ইত্যাদি, মধুর গুণের আধার স্বরূপ ছিল না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব? ঐ যে সন্তানগণ, যাহাদিগকে তিনি আদর করিয়া এক দিনও কাছে আনিয়া বসাইতেন না, তাহাদেরই সুখ বিধানের জন্য তিনি অহরহঃ পরিশ্রম করিতেছেন। সুচারুরূপে স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া অর্থ ও যশোপার্জ্জন করা এবং পরিবার পরিজনের প্রতিপালন করা ইহাই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। কোনও সমাজনীতি কিম্বা রাজনীতির কূটপ্রশ্ন তাহার মনকে কখনও বিলোড়িত করে নাই। তাহার সময়, রাজনীতির কোন প্রশ্নও বিশেষভাবে বঙ্গসমাজকে আন্দোলিত করে নাই।

তাহার বাহিরাবরণটী একটু রূঢ় ছিল। কিন্তু তাহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রও জ্ঞানের গভীরতা ও হৃদয়ের মহত্বের বিষয় ভাবিয়া সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। কেমন করিয়া লোককে খোসামদ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। মহাতেজস্বী পুরুষ, জ্ঞানচক্ষে যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। নিঃসহায়ের সহায়, আর্ত্তজনের উদ্ধারকর্ত্তা, বিপদে এমন বন্ধু জগতে দুর্ল্লভ। তাহার সন্তানগণ দেখিত যে তিনি চরিত্রমাহাত্ম্যে এত উর্দ্ধে অধিষ্ঠিত, যে তাহারা তাঁহার

পাদস্পর্শ করিবার ও উপযুক্ত নহে। তাহারা তাহাকে দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিত।

বিজয় পিতা হইতে শারীরিক ও মানসিক উভয় শক্তিই লাভ করিয়াছিল। তাহারই ন্যায় তাহার দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠদেহ। তাহারই ন্যায় তাহার নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, ললাট তেজস্বীতাব্যঞ্জক। কিন্তু বদনের নিম্নভাগটী মাতার কোমল মুখের অনুরূপ। স্ত্রীজনসুলভ মধুর হাসি, শুভ্র সুন্দর দশনপংক্তিদ্বয় এবং বিম্বাধর লইয়া তাহার মুখ কমল গঠিত। বোধ হয়, এইজন্যই তাহার চক্ষুদ্বয় দিয়া পর্য্যায়ক্রমে পুরুষোচিত সাহসিকতা, আত্মনির্ভরতা এবং রমণীর দয়া ও স্নেহের ভাব ফুটিয়া উঠিত।

বাল্যকাল হইতেই, সে অতিশয় বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন বালক বলিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কি স্বীয় স্কুল ও কলেজ, কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, প্রতি বৎসরই সে প্রথম স্থান অধিকার করিত। এমন যে ভবানী মাষ্টার, সেও তৃতীয় শ্রেণী হইতে যখন বিজয় জন্মের মত হাতছাড়া হইয়া গেল, তখন বলিতে বাধ্য হইয়াছিল যে এমন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বালক এপর্য্যন্ত তাহার নয়নগোচর হয় নাই। ক্লাসে সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিল, কলেজের লিটারারীক্লাবের সে প্রধান বক্তা ছিল এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে সে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়ার ছিল। আবার, সহধ্যায়ীগণ মধ্যে কাহারও কলেরা, বসন্ত অথবা অন্য কোনও বিষম পীড়া হইলে, তাহার রুগ্নশয্যাপার্শ্বে অহর্নিশি উপবেশন করিয়া সেবাশুশ্রূষা কারতে কেহই এমন অগ্রগামী ও তৎপর ছিল না।

পিতার ন্যায় বাল্যকাল হইতেই তাহার জ্ঞানার্জ্জনের প্রতি তীব্র তৃষ্ণা ছিল। তিনি তাহাকে মাঝে মাঝে যে অর্থদান করিতেন, তাহা শুধু নূতন নূতন গ্রন্থ ক্রয় করিতেই ব্যয় হইত। কলেজ লাইব্রেরীর ভাল ভাল অনেক পুস্তকই সে পাঠ করিয়া ফেলিয়াছিল। যদি কেহ কখনও কোন সদগ্রন্থের কিম্বা শ্রেষ্ঠ লেখকের বা বৈজ্ঞানিকের কথা উল্লেখ করিত তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে যেন আনন্দ উছলিয়া উঠিত এবং তাহাকে তখন প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত, "সৎসাহিত্যের যত প্রচার হয় ততই মঙ্গল। বন্দুক, কামান, অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধিত হবে না। সাহিত্য দ্বারাই, সৎভাবের দ্বারাই কালে মিথ্যা, অবিচার, অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাবে এবং অবশেষে সাম্য ও মৈত্রীর বিমল আভায় পৃথিবী পূর্ণ হয়ে

উঠবে। মানুষের যে শক্তি আজ অজ্ঞানতা, বর্ব্বরতা, এবং অলসতার ভিতর ডুবে আছে, কেবল শিক্ষাদ্বারা, সৎসাহিত্যের দ্বারাই কালক্রমে তাহা পূর্ণ বিকশিত হয়ে, তার উন্নতির পথ প্রশস্ত করবে। ভাল বইর গুণ একমুখে প্রকাশ করা যায় না।"

কিন্তু, এমন যে পরসেবাপরায়ণ তেজস্বী বুদ্ধিমান বিজয়, সেও যেন বন্ধুবর আনন্দমোহনের কাছে তাহার হৃদয়ের ক্ষুদ্রতার বিষয় ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। তাহার সরলতামাখা, হাস্যময়, দুঃখসূচক মুখখানি দেখিলে তাহার প্রাণ কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভক্তিরস মিশ্রিত সুখেরভাবে বিভোর হইয়া উঠিত। বিজয়ের প্রাণটী সরল ও পবিত্র ছিল কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহার ভিতর ও যেন একটু সাংসারিকতার গন্ধ পাওয়া যাইত। ভাল হইবার জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, অন্য লোকে কি বলে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবার ইচ্ছা যেন তাহাতে লুক্কায়িত ছিল। আনন্দমোহনের হৃদয়ে এ সকল ভাব কখনও স্থান পায় নাই। নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও প্রেমময় প্রাণটী লইয়া সে প্রকৃতির উদ্যানে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। চরিত্রোন্নতি করিবার জন্য তাহার কখনও যত্ন করিতে হয় নাই। পাপ কি তাহা তাহার অবিদিত ছিল. মিথ্যা কথা কেমন করিয়া বলিতে হয় সে জানিত না। বিজয় তাহাকে ভালবাসিত, সেও বিজয়কে ভালবাসিত। কিন্তু বিজয় বুঝিত, সমুদ্র ও গোষ্পদের ভিতর গভীরতার যে পার্থক্য, আনন্দের ভালবাসাও তাহার ভালবাসায় বুঝি তেমনি পার্থক্য।

বিজয় তাহার পিতার মুখে কখনও ভগবানের নামটী পর্য্যন্ত ভালরূপে উচ্চারিত হইতে শোনে নাই। ভগবানে তাহার বিশেষ ভক্তিও ছিল না। লোকে কথায় কথায় ভগবান ভগবান করে, তাই সেও আপদে বিপদে তাহার নাম করিত। কেবল মাঝে মাঝে তাহার মাতা যখন ব্রত ইত্যাদি পালন করিতেন ও ভক্তিভরে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিতেন, তখন তাহার সেই ভক্তিসমুজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটী মধুর ভাব বিজলির মত তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া ক্ষণকালের জন্য ক্রীড়া করিয়া যাইত।

ধর্ম্মসংশ্রববিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে পরমেশ্বরের নামটী পর্য্যন্ত তাহার ভাল করিয়া দৃষ্টি গোচর হইত না। কিন্তু যৌবনসীমায় পদার্পণ করার সঙ্গে জীবনসমস্যা যতই দুর্ব্বোধ্য ও জটিলাকারে তাহার নিকট প্রকটিত হইতে লাগিল,

ততই যেন সে অনুভব করিতে লাগিল,—প্রেমময়, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান একজন মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ দয়ার্দ্রনেত্রে মানবের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন,—এ বিশ্বাস যাহার প্রাণে নাই, তাহার মত দুঃখী ও নিঃসম্বল জীব জগতে নাই। সে জ্ঞানের সাহায্যে, বিচারের দ্বারা ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, নিবিষ্ট-চিত্তে নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিল। যেখানে ধর্ম্মের প্রসঙ্গ হইত, সেখানে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতি রবিবার ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপবেশন করিয়া চক্ষু বুঝিয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে মনে মনে কত কি প্রার্থনা করিত। কিন্তু নির্ম্মম দেবতা তাহার শুষ্ক, বিজ্ঞানকঠোর হৃদয়ে বিন্দু পরিমাণ ও বিশ্বাস এবং ভক্তিজল নিক্ষেপ করিলেন না। দিন দিনই সন্দেহ যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে, তাহার প্রাণ ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িত, সে তখন ভাবিত, হায়! হায়! আমি কি শেষে নাস্তিক হইয়া পড়িলাম!

আনন্দমোহনের বাল্যকাল হইতেই ভগবানে অচলা ভক্তি। প্রকৃত ভক্তি এই প্রকারই অহৈতুকী। জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই উহা আবির্ভূত হয়। যাহার ভাগ্যে তাহা না ঘটিয়া ওঠে, তাহার পক্ষে বিশ্বাস ও ভক্তির কথা বলা বিড়ম্বনা বিশেষ। ভক্তি উপার্জ্জনের সামগ্রী নহে। আনন্দমোহন পাখীর গানে ফুলের সৌন্দর্য্যে, চন্দ্রকিরণের মাধুর্য্যে, পিতামাতার স্নেহে, প্রণয়িনীর প্রেমে, বন্ধুর ভালবাসায় মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার স্বরূপ অনুভব কারয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিত। স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় অথবা নির্জ্জন নিশীথে কলনাদিনী নদীর তীরে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে সে তাহার আরাধ্য দেবতার ভাবনায় তন্ময় হইয়া পড়িত।

বিজয় ও তাহার অনুকরণে মাঝে মাঝে তাহার সঙ্গে নদীতটে উপবেশন করিয়া জগতের অনস্তিত্বের ও ভগবানের মহিমার বিষয় কল্পনায় আয়ত্ব করিবার চেষ্টা করিত কিন্তু তাহাতে সে কোন প্রকার আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না। আনন্দকে দেখিলে সে প্রায়ই ধর্ম্মের কথা উঠাইয়া দিত ও তাহার সঙ্গে তর্ক যুড়িয়া দিবার চেষ্টা করিত। তখন সে হাসিয়া হাসিয়া বলিত, ভাই! তোমার মত আমি অত বই পড়ি নি। তর্কে তোমার সঙ্গে পারব না। তর্কে আমার প্রয়োজন নেই। মাথার উপর অনন্তনক্ষত্রখচিত আকাশ, আর নিজ

সন্তানধ্যে অসীমক্ষমতাপন্ন আত্মার অপূর্ব্ব লীলার প্রতি চাহিয়া ও কেমন করে তাতে বিশ্বাসবিহীন হয়ে থাকা যায়, তা আমি কল্পনা ও কর্ত্তে পারিনে। তখন ভক্তিবিহ্বলচিত্তে, সরল কবিত্বময় ভাষায়, ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে সে কাঁদিয়া ফেলিত। বিজয় বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত ও মনে মনে ভাবিত, আমি কি অধম।

বিজয়ের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি অতীব প্রখরা ছিল। সকল বিষয়েরই শেষ পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারিলে, সে প্রাণে শক্তি লাভ করিতে পারিত না। মানবজীবন নানাবিধ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের বোঝা লইয়া দিন দিন তাহার সম্মুখে বিকশিত হইয়া পড়িতেছিল। সে যে সামান্য প্রাণীবিশেষ নহে, তাহার উন্নতি অবনতির সঙ্গে যে তাহার পরিবারের, সমাজের, দেশের, এমনকি সমস্ত মানবজাতির উন্নতি অবনতি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত, এই ভাবটী প্রতিদিনই তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছিল। ভবিষ্যতে বড় হইবার একটী আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রাণে এখন হইতেই উকি ঝুঁকি মারিতেছিল। তাহার প্ররোচনায়, সে আপনাকে কখনও বা প্রধান বাগ্মী, কখনও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার, প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক বৈজ্ঞানিক অথবা নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তক রূপে কল্পনা করিয়া আনন্দ অনুভব করিত। নানাবিধ ভাবে তাহার হৃদয়াকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল। জীবনটী উপযুক্তরূপে কর্ত্তন করিতে হইলে, তাহার গূঢ় রহস্যগুলি যে পরিষ্কাররূপে অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক, তাহা সে সকল সময়ই অনুভব করিত। এই জন্য সে সকল বিষয়ই তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিত। এইমাত্র তাহার উনবিংশ বৎসর বয়স কিন্তু তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ও গভীরতায় কলেজের প্রফেসার ও সহপাঠিগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইত। অথচ, সে সকল সময়েই বিনয়ী ও নম্র এবং কাহারও কাছে স্বীয় বিদ্যার দৌড় দেখাইবার জন্য কখনও চেষ্টা করিত না।

সরল, বিশ্বাসী, ভক্তিপরায়ণ আনন্দের জীবন আর এক ভাবে চলিয়া যাইতেছিল। সংসার তাহার কাছে জলবুদ্বুদের ন্যায় অসার ও অনিত্য। বাল্যকাল হইতে লোকে যাহাকে সুখ বলে তাহার মুখ সে এক প্রকার দেখে নাই। পিতা পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার কাছে, সংসার অসার, জীবন অনিত্য, ভগবানই সার ইত্যাদি কথা সে কতবারই না শুনিয়াছে। পিতার

উপযুক্ত পুত্র সেও তাঁহারই ন্যায় জীবনকে তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করিত এবং সকলই ভগবানের লীলা মনে করিত। বিজয় যে সময় হিন্দু এবং বৌদ্ধ, গ্রীক ও জার্ম্মেন দর্শনশাস্ত্র পাঠে ব্যাপৃত থাকিত, তখন আনন্দমোহন মহাভারত, পুরাণ, ভাগবত ও বৈষ্ণবগ্রন্থাদি পাঠ করিতে করিতে ভক্তিগদ্‌গদ হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিত। সে মাঝে মাঝে বিজয়কে বলিত ভাই! এসব পড় প্রাণে শান্তি পাবে'। বন্ধুর কথায় বিজয় তাহার দুই একখানা লইয়া তাহার দুই এক পৃষ্ঠা পড়িয়া রাখিয়া দিত ও বলিত না ভাই! এ সকল পড়ে আমি সুখ পাই নে। এ সকল যুক্তিশূন্য বিচারভিত্তিবিহীন আজগুবি গল্পের বিষয় এখনকার বিজ্ঞানের যুগে কে বিশ্বাস করবে? আর মহাভারত রামায়ণ! সে সব পুস্তক তো শুধু ব্রাহ্মণের মহিমা কাহিনীতেই পূর্ণ। পড়্‌তে পড়্‌তে শেষে বিরক্তির ভাব এসে পড়ে। আমার মতে বাল্যকালে তো এসকল পুস্তক কারও হাতে দেওয়া উচিতই নয়। সে সময় হতে এসব পড়্‌তে পড়্‌তে আমাদের হৃদয় ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এবং জাতিভেদরূপ কুসংস্কারের ভাবে এমন পূর্ণ হয়ে ওঠে যে শেষে সারাজীবন ও তার হাত হতে আমরা মুক্ত হতে পারিনে। না ভাই! এ সব বই পড়্‌তে আমায় এখন অনুরোধ করো না।

জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যখন তাহারা কথোপকথন করিত এবং অলক্ষিতে একের ভাব অন্যে গ্রহণ করিয়া আত্মার পুষ্টি সম্পাদন করিত, তখন এক নির্ম্মল আনন্দের ভিতর তাহাদের সময়টি কাটিয়া যাইত। এই প্রকার জ্ঞানচর্চ্চামূলকবাক্যালাপে সুখানুভব করা, কৈশোর ও যৌবনের একটী প্রধান অধিকার। সংসারের মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-হিংসা-দ্বেষের ভিতর গঠিত জীবন বৃদ্ধের ভাগ্যে কদাচিৎ এ সুখ ঘটিয়া থাকে।

ভক্তিসুধাভরাপ্রাণ বন্ধুবরের বাক্যাবলী শ্রবণান্তে বিজয় যখন মুগ্ধনেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, অবশেষে তাহার নিজের জ্ঞানভাণ্ডার হইতে নূতন নূতন তথ্যসমূহ নির্গত করিয়া সমাজ, সংসার, জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তেজোপূর্ণ ভাষায় তাহার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে, থাকিত তখন তাহার উজ্জলনেত্রযুগলসমন্বিত, আশা ও আকাঙ্ক্ষার ক্রীড়াস্থল, সুন্দর বদনখানি এক অনৈসর্গিক আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। হয় তো ততক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে চারিদিক আঁধার হইয়া আসিতেছে। কেমন করিয়া তাহাদের অতর্কিতে

অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ সমূহ সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় পড়িয়া কতক্ষণ ঝক্ ঝক্ করিয়াছিল এবং তাহার তুই চারিটী রেখা আনন্দমোহনের ম্লান শ্যাম বদনের উপর পড়িয়া অল্প কতকটুক কালের জন্য তাহাকে দীপ্তিময় করিয়া তুলিয়াছিল, আবার কখনই বা শ্যামায়মানা সান্ধ্যপ্রকৃতি সেই রশ্মিসমূহকে ক্রোড়ভিতরে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল এবং স্বীয় বাসনাঞ্চলবিক্ষিপ্ত অন্ধকার রাশী দ্বারা পৃথিবীখানাকে ক্ষণকালের জন্য ব্যাপ্ত করিয়া তুলিল, উভয়েব কেহই তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর পায় নাই। বাহিরে ক্ষীণ আলো দেখা যাইতেছে কিন্তু ঘরের বারেন্দায় যেখানে চেয়ারে বসিয়া তাহারা কথোপকথন করিতেছিল, সেখানে সবই অন্ধকার। বন্ধুদ্বয় একে অন্যের মুখ আর দেখিতে পাইতেছে না। আনন্দ বলিল ও 'রাত হয়েছে।' সে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়ও উঠিল। উভয়ে সিঁড়ীর নিকট আসিল। উভয়েই আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ করিয়াছে। আনন্দ চাহিয়া দেখিল, এক মেঘখণ্ডের পশ্চাতে আর এক মেঘখণ্ড বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়াছে। কোথা হইতে জড়মেঘে এই শক্তি আসিল? চাহিয়া দেখিল, উপরে চন্দ্রিমা হাসিতেছে কাহার আলোকে এজড় পদার্থ আলোকিত হইল? মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণটী কোথায় কোন্ দেবাদিদেবের উদ্দেশে উড়িয়া চলিল। তখন সে বিজয়ের স্কন্ধদেশে আবেগভরে বাহুযুগল স্থাপন করিয়া আনন্দোজ্জ্বল বদনে গদগদভাবে বলিয়া উঠিল, ভাই! চেয়ে দেখ! চেয়ে দেখ! ভগবানের কি অপূর্ব্ব মহিমা! বিজয় উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং সেই মুহূর্ত্তে একটা যন্ত্রণাপূর্ণ দীর্ঘ-নিশ্বাস তাহাতে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বহির্গত হইয়া গেল।

ক্রমশঃ।

# গ্রাম্য বিবরণ।

## বীরতারা।

বীরতারা একটী ক্ষুদ্র পল্লী। ক্ষুদ্র হইলেও বীরতারা সম্ভ্রান্ত কায়স্থপ্রধান স্থান বলিয়া বহুকালাবধি পূর্ব্ববঙ্গে সুপরিচিত। বীরতারা শ্রীনগর থানার অন্তর্গত গ্রাম সমূহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। উত্তরে ও পূর্ব্বে ধলেশ্বরী, দক্ষিণপশ্চিমে পদ্মানদী, এই উভয় নদী হইতেই বীরতারা তুল্য দূরে—প্রায় ৮ মাইল ব্যবধানে। বীরতারা নদী গিরি বন রূপ কোন প্রাকৃতিক সীমা দ্বারা পরিবেষ্টিত কিম্বা বিভক্ত নহে। উত্তরে উমপাড়া, ছয়গাঁও, মজিদপুর ও দয়হাটার কিয়দংশ ;পূর্ব্বে মজিদপুর, দয়হাটা ও রক্ষিতপাড়ার কিয়দংশ; দক্ষিণে তিনগাঁও, শালেপুর ও পূর্ব্বদেল-ভোগের কতকাংশ এবং পশ্চিমে ষোলঘর—বীরতারা গ্রামের এই চতুঃসীমানা। শ্রীনগর হইতে মুন্সীগঞ্জ পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের যে রাস্তা গিয়াছে বীরতারা তাহা হইতে এক চতুর্থ মাইল উত্তরে এবং সিরাজদিখার ষ্টীমার ঘাট হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

উৎপত্তি—প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান শাসন কালে বীরতারার প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা ৺হরিনাথ মজুমদার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণানন্দের সহিত জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় পাইকপাড়ার পৈতৃক ভদ্রাসন ও স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরতারা আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। হরিনাথ মজুমদারের আগমনের পূর্ব্বে এই স্থানের অবস্থা কি ছিল সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই অবগত নহি। বীরতারার নাম সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে হরিনাথ মজুমদারের পাঁচপুত্র সকলেই বীরোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া লোকসাধারণ গ্রামটীকে 'বীরতারা' আখ্যা প্রদান করে। দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকগণ কিন্তু অদ্যাবধি গ্রামটীকে "বিলতারা" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহা অসম্ভব নয় যে অভ্যুদয়ের দিনে "বিলতারা"কেই গ্রাম্য পণ্ডিত-গণ "বীরতারা" এই শ্লাঘ্য অভিধানে ভূষিত করিয়াছেন। বিলতারা নামটীর স্বার্থকতা নাই বলিতে পারি না, বাস্তবিক বিস্তৃত আরিয়ল বিলের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রাম সমূহ হইতে বিলতারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। উক্ত বিল

অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে গেলে বিলতারা বহুদূর হইতে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। যাহা হউক, গ্রামটীকে যে নামেই পরিচয় দেওয়া যায় তাহাই অর্থসঙ্গত।

**মজুমদার বংশের পূর্ব্ব ইতিহাস**—বীরতারার বিবরণ লিখিতে হইলে বীরতারার বীর মজুমদার বংশের ইতিহাস লিখিতে হয়, কিন্তু মজুমদার বংশের ইতিহাস লিখা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সংক্ষেপে তাঁহাদের সামান্য পরিচয় প্রদান করা গেল।

এই বংশের আদিপুরুষ গণপতি দেব, যাঁহার নিম্নতম সপ্তম পুরুষ চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা ভরদ্বাজগোত্র দনুজমর্দ্দন দেব, রাজা দনুজমর্দ্দনের সর্ব্ব কনিষ্ঠ সহোদর বুরান দেব, বুরান দেবের পৌত্র ভাস্বর দেব ঢাকা জিলার অন্তর্গত আবদুলাপুর, সোণাকান্দা প্রভৃতি স্থানের আংশিক জমিদারী ক্রয় করিয়া পাইকপাড়া গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। ভাস্বর দেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র হরিনাথ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হরিনাথ বীরতারার সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি বীরতারায় আসিয়া রাজা চাঁদরায় কেদার রায়ের আত্মীয়া রূপমঞ্জরী দেবীর সাহায্যে সাতটী মৌজায় ৩৪৪৲ টাকা আরকাট জমায় পুত্র রমাবল্লভের নামে এক তালুক সৃষ্টি করেন। হরিনাথ অল্পকাল মধ্যেই একজন প্রতাপান্বিত জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইলেন, গ্রামে বিভিন্ন জাতীয় প্রজা বসিল এবং সত্বরই বীরতারা একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বলিয়া দেশ বিদেশে পরিচিত হইল। হরিনাথ মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহার পাঁচ পুত্রের জন্য দীঘি, পুষ্করিণী সমন্বিত ৫খানি সুরম্য বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দেন, অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজবংশসম্ভূত হরিনাথ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে রাজক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়াও রাজোচিত আচার ব্যবহার বিস্মৃত হইয়া ছিলেন না। দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন, পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি লোকহিতকর অনেক কার্য্য করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র পঞ্চরত্ন স্বরূপ ছিলেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহারাও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের জন্য ব্রহ্মোত্তর, ভোগোত্তর, শিববৃত্তি, নানকার, চাকরান প্রভৃতি নামে জমি বসৎবাটী ইত্যাদি দান করিয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র ও বৃত্তা সকল গ্রামে আনিয়া স্থাপন করেন। এইরূপে পুরোহিত সূত্রে ব্রাহ্মণগণ ও জামাতা, দৌহিত্র ভাগিনেয় সূত্রে বহু কায়স্থ বংশ বীরতারায় আনীত হন। হরিনাথের তৃতীয় পুত্র

কৃষ্ণজীবন মজুমদার মালখানগরের প্রসিদ্ধ দেবিদাস বসুর একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন এবং এই কর্ম্মক্ষেত্রে রাজা রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি পুত্র নরসিংহ মজুমদারের নামে এক তালুক সৃষ্টি করিয়া যান। এই তালুক এখন সিকিমি তালুকে পরিণত হইয়াছে, এবং নরসিংহ নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া দশশালা বন্দোবস্তের সময় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুর্গাপ্রসাদের নামে তালুক নামান্তরিত হইয়াছে। পথকরের কাগজ দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে সেই সময় এই তালুকের বার্ষিক আয় ৭৮৫৬৲ টাকা ছিল। এই তালুক দুর্গাপ্রসাদের হাওলা বিক্রমপুরবাসী অধিকাংশ জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণ আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছেন, যথা—পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান ধনী ও জমিদার ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় ও তাঁহার ভ্রাতাগণ, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মাধিকরণ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সাহিত্যরথী রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, রায় বাহাদুর অভয়চরণ মিত্র, বহরের প্রসিদ্ধ রায় চৌধুরীগণ, শ্যামসিদ্ধির তালুকদার চন্দ্রকান্ত মিত্র প্রভৃতি।

হরিনাথের যোগ্য বংশধরগণ পরবর্ত্তী সাতপুরুষ পর্য্যন্ত বিদ্যাগৌরবে, ধনৈশ্বর্য্যে, শৌর্য্যবীর্য্যে, পত্তাপাধিপত্যে, ক্রিয়াকলাপে, আচারনিষ্ঠায় পূর্ব্ব পুরুষের খ্যাতি প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। যে সকল কৃতী পুরুষ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের বিস্তারিত পরিচয় বিক্রমপুর পত্রিকার পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

বীরতারা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণের ও অপরাপর কায়স্থ বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও আগামীতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পরিতাপের বিষয় মজুমদার বংশের শৌর্য্য বীর্য্য আজ লুপ্তপ্রায়, পূর্ব্ব গৌরব ম্লান; তাঁহারা আজ আর্থিক অবস্থায় নিম্ন ও জনতায় হ্রাস হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপিও পূর্ব্ব পুরুষের পুণ্য বলে গ্রামে তাঁহাদেরই প্রাধান্য অদ্যাপি বর্ত্তমান, সর্ব্ব বিশয়ে তাঁহারাই প্রভুত্ব করিয়া থাকেন।

নিম্নে এই গ্রামের বর্ত্তমান সাধারণ অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

**লোকসংখ্যা**—বীরতারা গ্রামে বর্ত্তমানে অনুমান আড়াই সহস্র লোকের বাস—ব্রাহ্মণ ১৪ ঘর, কায়স্থ ৩৩, শূদ্র ৪৬, বারুই ২৯, গোয়ালা ২, ধোবা ৬,

নাপিত ৫, ভুঞ্জমালী ৪, নমঃশূদ্র ৪০, জোলা ৭, মুসলমান ● ঘর ; মুসলমানগণ গ্রামের পশ্চিম ও উত্তর প্রান্তে হিন্দু অধিবাসীদিগ হইতে একটু দূরে বাস করে।

সাধারণ অবস্থা—এই গ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম হইলেও ইহারা উন্নতিশীল। ইহাদের মধ্যে অনেকে পৌরোহিত্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অনেক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি ইহাদের যজমান। কাশ্যপ গোত্রাবলম্বী চাটাতি গাই চক্রবর্ত্তী বংশই বীরতারার আদি ব্রাহ্মণ। এই চক্রবর্ত্তী বংশে অনেক অধ্যাপক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে কেহ রাজকার্য্য, কেহ শিক্ষকতা, কেহ চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। কয়েক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন সম্প্রতি ইংলণ্ডের Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের "Greats" পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, ইনি এই গ্রামের কুলীন মুখোপাধ্যায় বংশসম্ভূত।

কায়স্থ দিগের মধ্যে এক ঘর কাঁঠালিয়ার দত্ত, এক ঘর বহরের বসু রায় চৌধুরী, দুই ঘর ঘোষ আছেন। সরকারপাড়ার ঘোষ বংশের অবস্থা আজ কাল উন্নত। একজন মুন্সেফ, একজন এম্, এ, বি, এল উকিল ও একজন এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের কার্য্য করিয়া অবস্থার উন্নতি সাধন ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

মাওয়া হইতে আগত বীরতারানিবাসী বলবংশ বহুকাল যাবত উচ্চ শিক্ষিত ও পদস্থ বলিয়া দেশে প্রখ্যাত। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ডাক্তার তারা নাথ বল, এল্, এম্, এস্, এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র আমেরিকা (America) হইতে Ph. C. M. S. হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন, আর এক পুত্র এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন হইয়াছেন, এই বংশের আরও ২।১ জন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বীরতারার নাজির উপাধিক আলীমানগোত্র দে বংশ বিক্রমপুর কায়স্থ সমাজে সুবিদিত। দুর্গোৎসবে প্রচুর ব্যয়, দানসাগর শ্রাদ্ধ এবং অন্যান্য বৃহৎ ক্রিয়া কাণ্ড করিয়া ইহারা যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আজ কাল এই বংশ পূর্ব্বের ন্যায় সদবস্থাপন্ন নহে। এই গ্রামের ধর ও কর বংশ ও পরিচিত, ধর বংশের বর্ত্তমান অবস্থা সচ্ছল। এতদ্ভিন্ন বসু, মিত্র, দত্ত ও পাল বংশ স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

শুদ্রদিগের অবস্থা আজ কাল মন্দ নয়, অনেকেই চাকুরি কিম্বা ব্যবসায় করে, দুই এক ঘর রাজমিস্ত্রির কার্য্য করে। ইহাদের একটী যুবক শিক্ষার্থ আমেরিকা গিয়াছে।

বারুইদিগের সাংসারিক অবস্থা মোটামুটী ভাল বলা যাইতে পারে। তাহাদের প্রায় সকলেরই মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব নাই। নমঃশূদ্রদের মধ্যে এক জন বিশেষ সম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের অনেকে সূত্রধরের কার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। মুসলমান দিগের অধিকাংশই কৃষি কর্ম্ম করিয়া কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিতেছে, ইহাদের মধ্যে কয়েক ঘর তাঁত দ্বারা বস্ত্র বয়ন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। মোটের উপর নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সাংসারিক অবস্থা শোচনীয়। গ্রামে সঙ্গত লোকের অভাব হওয়ায়, ক্রিয়া কাণ্ডের বিলোপ হেতু গ্রামস্থ নিম্ন শ্রেণীর লোকের দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। গোয়াল, ধোবা, নাপিত, ভুঞ্জমালী প্রভৃতি বৃত্তাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। আশঙ্কা হয় কিছু দিনের মধ্যে এই শ্রেণীর লোক গ্রাম হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইবে।

বিদ্যাচর্চ্চা—বিদ্যানুশীলনে বীরতারা কোন দিনই দেশের সমসাময়িক অবস্থার পশ্চাতে নহে। মুসলমান রাজত্ব কালে মজুমদার বংশের অনেকে পারশ্য ও আরব্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ৺ পার্ব্বতীচরণ মজুমদার পারশী ভাষায় একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাজ ভাষায় বিশেষ অধিকার ছিল বলিয়াই মজুমদারগণ অনেকে নবাব সরকারে উচ্চ পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নাজির বাড়ীর ভবানী দেব পারশী ভাষায় একজন বড় মুন্সী ছিলেন, তাঁহাকে লোকে "ভবানী পার্শি" বলিয়া সম্বোধন করিত।

সংস্কৃত চর্চ্চায় বীরতারার টোল এক সময় বিক্রমপুরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। দেশান্তর হইতে বিদ্যার্থীগণ এই টোলে শিক্ষালাভ করিতে আগমন করিত। পণ্ডিত ৺ রামকুমার ন্যায়ভূষণ, রামগঙ্গা তর্করত্ন, কালিদাস সিদ্ধান্ত, কালীকান্ত শিরোমণি, কালীকুমার বিদ্যারত্ন, অম্বিকাচরণ তর্করত্ন, প্রভৃতি অনেক অধ্যাপক এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ৺ রামগঙ্গা তর্করত্ন অমরকোষের টীকা লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন. বর্ত্তমানে ও গ্রামে তিন জন সংস্কৃতাধ্যাপক আছেন।

নর্ম্যাল স্কুলের সৃষ্টি হইলেই গ্রামের যুবকগণ অনেকে ঢাকা যাইয়া উক্ত স্কুলে প্রবেশ করেন এবং প্রায় সকলেই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কুলের শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। ৺ হরিশ্চন্দ্র মজুমদার ও ৺তারিণীচরণ মজুমদার কিছুদিন পণ্ডিতের কার্য্য করিয়া আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া উকিল হ'ন। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই ৺ অম্বিকাচরণ মজুমদার, ৺ রামকানাই বল প্রভৃতি যুবকগণ Junior Scholarship পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অম্বিকাচরণ কিছু দিনের জন্ত রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন, পরে ডেপুটি কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের Matriculation পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের ৫ বৎসরের মধ্যেই ৺গিরিশচন্দ্র মজুমদার (পরে প্রসিদ্ধ আচার্য্য) প্রবেশিকা পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হন। মেডিকেল কলেজের আদিযুগের ছাত্র এই গ্রামের ডাক্তার তারানাথ ও প্রসন্নচন্দ্র। মুন্‌সেফী পদের সৃষ্টি হইলেই ৺ রামহরি মজুমদার স্বীয় ক্ষমতা বলে ঐ পদ লাভ করেন। ৺ গুরুচরণ মজুমদার মুন্সেফী পদে, ৺ জয়চন্দ্র মজুমদার ও ৺শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী ডেপুটি কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠান করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বীরতারার অনেক শিক্ষিত সন্তান উচ্চ পদস্থ ছিলেন। গ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এম্, এ, এল্, এম্, এস্, উপাধিধারীর সংখ্যা বর্ত্তমানে নিতান্ত কম নহে। *

বহুদিন যাবত একটী মধ্য বাঙ্গালা স্কুল গ্রামে চলিয়া আসিতেছে, ছাত্র সংখ্যা অনুমান ৭০।৭৫ জন হইবে। নিকটবর্ত্তী তিনটী গ্রামে—ষোলঘর, হাসাড়া, বেলতলি-তিনটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় বর্ত্তমান থাকায় বীরতারায় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের অভাব অনুভূত হয় না, সুবিধানুসারে এই তিন স্কুলেই বীরতারার ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। বালিকাদের শিক্ষার জন্য দুইটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে একটী ১০৲ অপরটী ৫৲ টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিছুদিন হইল কয়েকটী শিক্ষিত যুবকের উৎসাহে Birtara Union Library নামে একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষিত গ্রামবাসীর সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে পাঠাগার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে।

---

* বীরতারার সাহিত্যসেবী গ্রন্থকার সংবাদপত্র সম্পাদক প্রভৃতির পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

**রাস্তা ঘাট ও স্বাস্থ্য**—মজুমদার বংশের আদিবাড়ী অর্থাৎ পশ্চিমের বাড়ী হইতে পূর্ব্ব প্রান্তে হাটখোলা পর্য্যন্ত লোক্যালবোর্ডের একটী অনতিপ্রশস্ত রাস্তা আছে, সংস্কার অভাবে উহা ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়াছে। স্থানীয় লোকগণ এ বিষয় একান্ত উদাসীন, তাহাদের কর্ত্তব্য এই অসুবিধায় প্রতি লোক্যালবোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। একটী "হালট" গ্রামের চারিদিক বেষ্ঠন করিয়া রহিয়াছে। উৎসবাদির দিনে এই রাস্তা দিয়া শোভাযাত্র বাহির হইয়া থাকে। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীর চারিদিকে পরীথা রহিয়াছে, বর্ষায় সেগুলি জলপূর্ণ হইলে নৌপথে পরিণত হয়। এই সময় নৌকা ভিন্ন যাতায়াতের অন্য কোন উপায় থাকে না। গ্রামে ছোট বড় অনেক দীঘি পুষ্করিণী আছে, সংস্কারের অভাবে সে গুলির অধিকাংশে "দল" জন্মিয়াছে। এই সমৃদ্ধ গ্রামের অধিকাংশ পুষ্করিণীর জল পানের অযোগ্য। গ্রীষ্মকালে পানীয় জলের অভাবে গ্রামে দুর্গতির একশেষ হইয়া থাকে। পরিস্কৃত জলের অভাবে মলিন, দূষিত জলপান করিয়া গ্রামবাসীরা উদরাময়, কলেরা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। পরিতাপের বিষয় এই যে গ্রামবাসীদের পরস্পরের মধ্যের দলাদলিই এই দুর্গতির মূল কারণ। তাঁহাদের মধ্যে একতা থাকিলে পুষ্করিণীগুলির সংস্কার অনায়াস হইতে পারে। মোটের উপর এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। গ্রামে চিকিৎসার কোনরূপ সুবন্দোবস্ত নাই, কোন দুশ্চিকিৎস্য ব্যধি উপস্থিত হইলে ঘোলঘর কিম্বা সিংহপাড়া হইতে ডাক্তার ও ঔষধ পত্রাদি আনিতে হয়। একজন কবিরাজ ভিন্ন গ্রামে বাস করে এরূপ চিকিৎসক বর্ত্তমানে নাই। এই অভাব দূরীকরণার্থ গ্রামবাসীর সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে এখানে শবদাহে বড়ই অসুবিধা হয়। গ্রামে একটী সাধারণ শ্মশান ভূমি আছে, কিন্তু তাহাও ঐ সময় জলনিমজ্জিত হইয়া যায়। অনতিবিলম্বে গ্রামের এ অভাব মোচন করা প্রয়োজন।

**বিবিধ**—গ্রামে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস আছে, নিকটবর্ত্তী টেলিগ্রাফ আফিস ২৷৷০ মাইল দূরে-কোলা গ্রামে। বীরতারার হাট প্রসিদ্ধ, সপ্তাহে ২দিন রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাট বসে। গ্রাম্য গৃহস্থের আবশ্যকীয় যাবতীয় সামগ্রী হাটে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ২খানা মুদী দোকান ও ১খানা মনোহারী দোকান গ্রামে স্থায়ীভাবে আছে। দৈনিক বাজার করিতে হইলে ২মাইল দূরে ঘোলঘর,

সিংহপাড়া কিম্বা হাসাড়ার বাজারে যাইতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে ৺রামচন্দ্র মজুমদার তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে এক বাজার বসাইয়াছিলেন কিন্তু নিকটবর্ত্তী ৩টী গ্রামে বড় তিনটী বাজার থাকায় বীরতারার বাজারের অস্তিত্ব অল্পদিনেই লুপ্ত হয়।

প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে একটী বড় মেলা হয়। এ মেল হইতে বীরতারাবাসী ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীগণ এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী মাল মসলা ক্রয় করিয়া রাখে। মেলায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। হুলির দিন গ্রামে একটী শোভাযাত্র বাহির হইয়া থাকে; এই শোভা যাত্রায় কোন্ বাড়ীর ঠাকুর পূর্ব্বে যাইবে, ইহা লইয়া মাঝে মাঝে বাদ বিষম্বাদ হইয়া থাকে। বিক্রমপুরের বহু গ্রামের স্থায় এখানে ও একটী বিবাহিত বট-অশ্বথ বৃক্ষ আছে, ইহা সুবচনী নামে সুপরিচিত, হাট খোলার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে দণ্ডায়মান। ইহার মাহাত্ম সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে, নানা স্থান হইতে হিন্দুরমণীগণ আগমন করিয়া বৃক্ষে তেল সিন্দুর বিলেপন করিয়া থাকেন। ডঙ্কুর কালী নামে আর একটী বটবৃক্ষ হাটের মধ্যভাগে অবস্থিত। মানত দিবার জন্ম ছাগ ইত্যাদি লইয়া বহুলোক ইহার পাদমূলে সমবেত হয়। হাটের মধ্যে বৃহৎ বট বৃক্ষদ্বয়ের দৃশ্য বড়ই নয়নাভিরাম। পশ্চিমের বাড়ীতে একটী রামচন্দ্রের প্রস্তর মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে ৺জয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সুয়াপুরের এক পুষ্করিণী খনন করিয়া এই মূর্ত্তিটী উদ্ধার করেন এবং স্বগৃহে আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনার পরেই তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মে এবং তাহার নাম তিনি রামচন্দ্র রাখেন।

শারীরিক শক্তি, সাহসিকতা ও ভোজনপটুতার জন্য বীরতারাবাসী চির প্রসিদ্ধ। তাহাদের শক্তি, সাহস ও ভোজনপটুতা সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আছে। ৺ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লুসাই যুদ্ধে রসদের কর্ম্মচারী হইয়া গিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে Bengal Ambulance Corps যোগ দিয়া শ্রীমান জ্যোতিরঞ্জন মজুমদার Mesopotamia গিয়াছে।

গ্রামের শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রামে অবস্থান না করায় গ্রামের নৈতিক অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে। এই জীবন-সংগ্রামের দিনে শিক্ষিত লোক-দিগের পক্ষে গ্রামে অবস্থান করা সম্ভবপর না হইলেও গ্রাম্য লোকদিগের নিকট একটা নৈতিক উচ্চ আদর্শ ধরিতে পারিলে কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। শিক্ষিত যুবকবৃন্দ গ্রামের যাবতীয় অভাব অভিযোগ দূর করিতে কৃতসংকল্প হইবেন আমাদের আশা আছে।

ক্রমশঃ

শ্রীভবরঞ্জন মজুমদার

# সংগ্রহ।

## পল্লীর উন্নতি।

"সভা ডেকে নাম সই করে একটা কৃত্রিম হিতৈষিতাবৃত্তির উপর বরাত দিয়ে আমরা যে পল্লীর উপকার করব এমন আশা যেন না করি। আজ এই কথা পল্লীকে বুঝতেই হবে যে তোমাদের অন্নদান জলদান বিদ্যাদান স্বাস্থ্যদান কেউ করবে না! ভিক্ষার উপরে তোমাদের কল্যাণ নির্ভর করবে এতবড় অভিশাপ তোমাদের উপর যেন না থাকে। আজ গ্রামে পথ নেই, জল শুকিয়েছে, মন্দির ভেঙে গেছে, যাত্রা গান সমস্ত বন্ধ, তার একমাত্র কারণ এত-দিন যে-লোক দেবে এবং যে-লোক নেবে এই দুইভাগে গ্রাম বিভক্ত ছিল। একদল আশ্রয় দিয়ে খ্যাতি ও পুণ্য পেয়েছে, আর এক দল আশ্রয় নিয়ে অনায়াসে আরাম পেয়েছে। তাতে তারা অপমান বোধ করেনি, কারণ তারা জানত এতে অপর পক্ষেরই লাভ পরিমাণে অনেক বেশী। কারণ মর্ত্তে যে-ওজনে দান করি স্বর্গে তার চেয়ে অনেক বড় ওজনে প্রতিদান প্রত্যাশা করি। এখন যখন সেই অপর পক্ষে পারত্রিক লাভের খাতা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং যখন তারা নিজে গ্রামে বাস করলে নিজের জল বিদ্যা স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হত তাও উঠে গেছে, তখন আত্মহিতের জন্ম গ্রামের আত্মশক্তির উদ্বোধন ছাড়া তাকে কোন মতেই কোনো দয়ায় বা কোন বাহ্যব্যবস্থায় বাঁচানো যেতেই পারে না। আজ আমাদের পল্লীগ্রামগুলি নিঃসহায় হয়েছে, এইজন্য আজই তাদের স ত্যসহায় লাভ করবার দিন এসেছে। আমরা যেন পুনর্ব্বার তাতে বাধা দিতে না বসি। আমরা যেন হঠাৎ সেবা করবার একটা সাময়িক উত্তেজনা নিয়ে সেবার দ্বারা আমরা তাদের দুর্ব্বলতা বাড়িয়ে তুলতে না থাকি।"

"আমার প্রস্তাব এই যে বাংলাদেশের যেখানে হোক্ একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তি সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট, তার ঘর, বাড়ীর পারিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চ্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগী-পরিচর্য্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ নিষ্পত্তি, প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি জরীপ ও রাস্তাঘাট

ড্রেনপুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিত মত চিকিৎসা, ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লীগ্রামে নানা স্থানেই দাতব্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে। যাঁরা পল্লীগঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এইরকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন, এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন তবে পল্লী সম্বন্ধে যে সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে একদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

# স্বাস্থ্যের উন্নতি

"আমাদের দেশের লোক স্বাস্থ্যোন্নতির প্রতি যে এত উদাসীন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। স্বাস্থ্যতত্ত্বে অধিকাংশ লোকই অজ্ঞ। আমাদের শিক্ষার মধ্যে স্বাস্থ্যভঙ্গের অনেক কারণ আছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার জ্ঞান অর্জ্জনের কোন কথাই নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ-উপাধি-প্রাপ্ত পুরুষগণকেও কোন দিন স্বাস্থ্যতত্ত্বের এক বর্ণও শিখিতে হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে আমাদের দেশীয় লোকেরা কতক শাস্ত্রীয় অনুশাসনে কতক অভ্যাসের বশে অনান্য অনেক দেশ অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ অনেক সময় আমরা অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করি। এরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা আমাদিগকে সজীব করিয়া তুলিতে পারে না। কাজেই যখন নূতন নূতন অবস্থার ভিতর হইতে নূতন নূতন সমস্যা আমাদের সম্মুখে

উপস্থিত হয়, তখন আমরা তাহা বুঝিতে একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়ি। আমাদের পুরাতন দেশ ও পুরাতন জাতি এখন নূতন নূতন অবস্থার ভিতর দিয়া প্রত্যহ অগ্রসর হইতেছে। কি নিয়মে আমরা এইসকল বিরাট পরিবর্ত্তনের ভিতর সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি, তাহা না জানিলে আমরা কিছুতেই এ জীবন-সংগ্রামে বাঁচিতে পারিব না।"

"বাঙ্গলা দেশের লোক সংখ্যা ৪,৫৩,২৯,২৪৭। ১৯১৩ সালে তন্মধ্যে ১৩ ৪৯,৭৭৯ জনের মৃত্যু হয়। প্রত্যেক হাজারে মৃত্যুসংখ্যা ৩০। জন্মের সংখ্যা গত বৎসর ১৫,১৯,৯২১ অর্থাৎ হাজারে ৩৩'৭৮। মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা ১, ৯৮,০৫৩ অধিক। শিশুদের মধ্যে ৩,২০,টির অর্থাৎ যত শিশু জন্মায় তাহাদের শতকরা ২০৯৫টির মৃত্যু হইয়াছে। এত অধিক শিশুর মৃত্যু অতি অল্প দেশেই হয়।

"উপরিউক্ত মৃত্যু সংখ্যার মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ ৯,৬৫,৫৪৬ (২১'৩০ হাজারকরা) মৃত্যুর কারণ জ্বররোগ। অর্থাৎ সমস্ত মৃত্যুসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭২টির কারণ জ্বররোগ। ইহাদের মধ্যে ২৫, ৬৬৭টি সহরে, বাকী ৯৩৩,৫২৪টি পল্লীগ্রামে। ৩৩,১৯৫টি মৃত্যুর কারণ উদরাময় ও অতিসার, ১০,০৬৩টির কারণ শ্বাসযন্ত্রের রোগ। এই জাতীয় রোগের সংখ্যা সহরে বেশী। ৭৮,৪৯৪টির মৃত্যুর কারণ কলেরা। এতদ্ব্যতীত বসন্তরোগে ৯,০৬২ ও প্লেগরোগে ৯৮৪টির মৃত্যু ঘটিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে মৃত্যুর প্রধান কারণ কলেরা, জ্বর, বসন্ত,প্লেগ, ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়া।"

"এদেশে কলেরার প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। এই রোগের অণুজীবের নাম কমা ব্যাসিলাস (comma bacillus) আহার্য্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রোগীর মল মিশ্রিত থাকিলে এই রোগ হইবার সম্ভাবনা। কোক্ (Koch) প্রথমে বেলেঘাটার একটি পুষ্করিণীর জলে এই অণুজীব প্রাপ্ত হন। কোন কলেরাগ্রস্ত রোগীর মল দ্বারা দূষিত কাপড় ঐ পুষ্করিণীতে ধোয়া হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌতে এক সৈনাদলের ফিল্টারের বালি পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বালি নদীতল হইতে আনাইয়া দেওয়া হয়। ঐ বালি কলেরা-মল দ্বারা দূষিত ঐ সেন্যদলে অনেকের কলেরা হয়। সকলে জানেন বড় বড় মেলার স্থানে অনেকের কলেরা হয়। পূর্ব্বে সেখানে কলেরা-বীজ থাকে না। কোন যাত্রী এই রোগ বহন করিয়া এই-সকল স্থানে যায়। মাছি ইহার আর-একটি বাহক। তাহারা যে কেবল পায়ে করিয়া এই অণুজীব মল হইতে লোকের আহার্য্য দ্রব্যে বহন করে তাহা নহে। তাহাদের নিজের মলেও এই অণুজীব অনেক পাওয়া যায়।

ক্রমশঃ।

সরস্বতী

[ বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্কর অতীষের বাসভূমি ( অধুনা নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ীরূপে পরিচিত ) সংলগ্ন টোলবাড়ীর মৃত্তিকা খননে প্রাপ্ত। ]

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

# বিক্রমপুর।

## বিক্রমপুর প্রসঙ্গ।

**ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব**—বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে নব ভাব ও নব চিন্তার প্রচার করিতেছিলেন তখন তিনি আমাদের দেশের ইতিহাস নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। যাহাতে শিক্ষিত বাঙ্গালী আপনার মাতৃভূমিকে চিনিতে পারে সে জন্য সকলকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, এখন সে দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন বঙ্গদেশে বহু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের উদয় হইয়াছে। ইহা দেশের সৌভাগ্যের কি দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার সময় এখনও আইসে নাই। ইতিহাস কি? একথার উত্তর বড় সহজ নহে। কেহ কেহ বলেন প্রকৃত ঘটনাবলীর অভিব্যক্তিই ইতিহাস। যাহা অতীতের গর্ভে লুকাইয়া গিয়াছে, যাহা বিস্মৃতির অতল তলে চিরনিমজ্জিত, তাহার পুনর্বিকাশের প্রচেষ্টা ও তাহার বিবৃতিই ইতিহাস। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের সামঞ্জস্য বিধান, অতীতের ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক বিবৃতি, প্রাচীন যুগের রাজা, রাজনীতি, সাহিত্য-বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য এসকলের কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা এবং অতীতের সহিত বর্ত্তমানের নিরপেক্ষ তুলনামূলক আলোচনাই প্রকৃত ইতিহাস, ইহাই বর্ত্তমান যুগের বহু পণ্ডিত ব্যক্তির অভিমত।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। প্রকৃতি চিরকাল একই ভাবে থাকিতে পারেন কিন্তু তাহার বক্ষে যাহাদের উদ্ভব তাহারা অক্ষয় অটুট ভাবে থাকিবে এরূপ অধিকার জগদীশ্বর তাহাদিগকে দান করেন নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই জগতে নানা পরিবর্ত্তন

ঘটিতেছে। গ্রীস, রোম, মিশর প্রভৃতি দেশের পূর্ব্ব গৌরব বৈভব সে যুগের রীতি নীতি পদ্ধতির এখন কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সহস্র বর্ষের পূর্ব্বের ভারতে ও বর্ত্তমান ভারতে কত প্রভেদ! পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালার ইতিহাসের কত পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তির মৃত্যুতেই যেমন জাতির মৃত্যু হয় না, তেমনি কালের পরিবর্ত্তনে অনেক কথা লোপ পায় বটে কিন্তু ইতিহাস একেবারে ধ্বংস পায় না। ইতিহাস অক্ষয় ও অমর। মানুষ মাত্রই ইতিহাস; কারণ প্রত্যেকের জীবনের ঘটনাবলী সংকলন করিলে তাহাদের ব্যক্তিগত মতামত আলোচনা করিলে কত শিক্ষা, কত জ্ঞান, ও আনন্দ লাভ করা যায় তাহার তুলনা নাই।

শুধু অক্ষর গণিয়া মিলাইয়া গেলেই যেমন কবিতা হয় না, তাহার মধ্যে প্রকৃত কবি-হৃদয়ের আবশ্যক হয়, দেখিবার বুঝিবার ও বুঝাইবার শক্তির প্রয়োজন করে, তদ্রূপ ইতিহাস জিনিসটাকে বুঝিতে হইলেও প্রকৃত ঐতিহাসিক হওয়া আবশ্যক। পল্লব-গ্রাহী হইলে চলিতে পারে না। তাহার মধ্যে প্রাণ থাকা চাই। কোনও একটা জিনিসকে পূর্ণভাবে আয়ত্ত না করিলে তাহার সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা হইতে পারে না, যাহা হয় তাহা শুধু পল্লবগ্রাহিতা হয় মাত্র। এইরূপ পল্লবগ্রাহিতার জন্যই আমরা প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান-কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছিনা।

একদিন ছিল যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থানুবাদদ্বারাই ইতিহাস চর্চ্চা চলিত। এখন সে দিন ক্রমশঃই অপসারিত হইতেছে, পাশ্চাত্য ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিগণের ন্যায় এখন হাতে-কলমে না খাটিলে চলিতে পারে না। এক্ষণে বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ; বারেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি, ঢাকা সাহিত্য-পরিষদ, মালদহ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ, প্রাদেশিক ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে রীতিমত উৎসাহ সহকারে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারি ফলে রাঢ়ের বিবরণ, বারেন্দ্রভূমের নানা কথা এবং বিক্রমপুর ধামরাই ভাওয়াল প্রভৃতি স্থানের প্রাদেশিক ইতিহাস বহুল পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু নূতন তথ্য বহু নূতন কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে তিল যে তাল বহুক্ষেত্রে হইতেছে তাহাও নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-প্রণালী বেশ একটু ধীরভাবে আলোচনা

করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার মধ্যে সংকীর্ণতার আবরণী যথেষ্ট আছে। তাহার দৃষ্টিও পশ্চিম বঙ্গের দিকেই সন্নদ্ধ। যদি বারেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি, ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদ প্রভৃতির সৃষ্টি না হইত তাহা হইলে আমরা বঙ্গের বহু স্থানের বহু ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতে পারিতাম না।

স্বাধীন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান চেষ্টা যে একান্ত গৌরবের কারণ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। শ্যামলা বঙ্গ-জননীর-স্নেহ-শীতল-বক্ষে ইতিহাসের উপকরণের অভাব নাই। বিক্রমপুর, বরেন্দ্র ভূমের নানা স্থান, গৌড়, সপ্তগ্রাম, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন ইতিহাসের বিবিধ উপকরণ স্তরে স্তরে বিদ্যমান। কাল-পরিবর্ত্তনে, প্রাকৃতিক বিপ্লবে অতীতের কত সুবিখ্যাত স্মৃতি-চিহ্ন. কত প্রাসাদ-বহুল দীর্ঘি-সরোবর-পরিশোভিত রাজার রাজধানী মৃত্তিকা গর্ভে নিহিত কে তাহার সংখ্যা করে? তারপর বঙ্গের নানা গ্রামে কত প্রস্তর মূর্ত্তি তক্ষণ শিল্পের অপূর্ব্ব নৈপুণ্য বক্ষে লইয়া বিরাজিত, নিবিষ্ট চিত্তে কে তাহার আলোচনা করে? হস্ত লিখিত পুঁথি, শিলা ফলক, তাম্র-ফলকেরও আমাদের দেশে অভাব নাই। কুলজী গ্রন্থ, সে'ত নানা জাতির নানা ভাবের বহুসংখ্যক বিদ্যমান আছে। গ্রাম্য ছড়া, পাঁচালী, ব্রত কথা, খেলা ধুলা গানের মধ্যেও বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসের উপকরণ লুক্কায়িত। প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে এ সকলের কিছুই উপেক্ষা করা চলে না।

অনেকে ইতিহাস বলিতে রাজা মহারাজাদের জীবন কথা বড় বড় যুদ্ধের বিবরণ তাহার সন তারিখ মনে করিয়া ঐ সকলের আলোচনাকেই ইতিহাসানুশীলন বলিয়া মনে করেন। আমরা তাহা মনে করি না। একটী কঙ্কাল দেখিয়া যেমন তাহার জীবিত কালের দেহ সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হয় না, তেমনি শুধু সন তারিখ বা রাজা মহারাজাদের রাজত্ব-কালীন মোটা মোটা কথা মনে করিয়া তাহার আলোচনা করিলেই ইতিহাস চর্চ্চা হয় না। উহা শুধু মূল মাত্র।

আমাদের বিবেচনায় সুদূর অতীতের মানব-সমাজের সহিত বর্ত্তমানের পারম্পর্য্য দর্শন, ঘটনার কার্য্যকারণ অনুশীলন, কাল-পরিবর্ত্তন, মানব-সমাজের অভিব্যক্তির বিবরণের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ এবং দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সে সকলের আলোচনা ব্যতীত ইতিহাস হইতে পারে না।

দাম্ভিকতা এবং অতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাস অন্য ক্ষেত্রে গৌরব বলিয়া বিবেচিত

হইলেও ইতিহাসের পক্ষে তাহা গৌরবের বলিয়া মনে হয় না। সহস্র বৎসরের লুপ্ত বিবরণী দু'একটী শিলালিপি বা তাম্রফলকের সাহায্যে আংশিক রূপে সত্যের দিকে অগ্রসর করিলেও উহা হইতে একেবারে একটা সঠিক মন্তব্য প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কোন ও নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তন্মুহূর্ত্তেই তাহা অসত্য বলিয়া গ্রহণ না করাও যেমন অন্যায় গ্রহণ করিতে গেলেও বিবেকের উপর অবিচার হয় বলিয়া মনে করি। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে 'কুলপঞ্জী' এবং তাম্রফলকের ঐতিহাসিকতা লইয়া সর্ব্বত্র আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ 'কুলপঞ্জীকে' আমলেই আনিতে চাহেন না, উহা শুধু মিথ্যা স্তুতি-গাথা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাম্রফলকই প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রমাণোপযোগী বস্তু এবং গ্রহণীয় বলিয়া মনে করেন। তাহারি ফলে অনেকেই আজ কাল 'আদিশূর' নামক রাজার অস্তিত্বে সন্দিহান। একথা মানিয়া লইতে হইবে যে 'কুলপঞ্জী' অতিশয়োক্তিতে পূর্ণ, কিন্তু তা বলিয়া তাহার মধ্যে এক বিন্দু ও সত্য নিহিত নাই এরূপ কথা বলিলে আমাদের কুল-গৌরবের গৌরব-দম্ভটুকু কোথায় থাকে? স্বীকার করি 'কুলপঞ্জী' রচয়িতাগণ অনেক সময়ে দাতার মনস্তুষ্টির জন্য নানারূপ মনোমুগ্ধকর ভাষার প্রয়োগ করিতে বিরত হন নাই, কিংবা যে যুগে মুদ্রিত গ্রন্থ ছিলনা, সে যুগে এক খানা গ্রন্থ দশজনে নকল করিতে যাইয়া স্বীয় স্বীয় ভ্রম ও স্বার্থ-সিদ্ধির সুযোগ করিয়াছেন, অতীতের কথা দূরে যাউক বর্ত্তমান যুগেও তাহার শত শত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আপনার শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করা, সেই শ্রেষ্ঠত্ব টুকু 'কুলপঞ্জীর' সাহায্যে যেরূপ সহজে মীমাংসিত হইতে পারে, অন্য কিছুতেই তদ্রূপ হয় না বলিয়াই কুলপঞ্জীর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন ক্রিয়াটা চলিত।

কিন্তু তাম্রফলকে এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে বলিয়াই প্রমাণের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে তাম্রফলকের আদর যে 'কুলপঞ্জীর' অপেক্ষা অনেক বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? মানুষ—মানুষ; দেবতা নহে। যিনি যত বড়ই হউন না কেন তাহার মধ্যে কোন না কোন দুর্ব্বলতা কিংবা প্রাদেশিক সংকীর্ণতা থাকা অসম্ভব নহে।

নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ঐতিহাসিক এখনও আমাদের দেশে জন্মে নাই, কবে জন্মিবে তাহাও ভবিষ্যত-গর্ভে নিহিত। এখন যাহারা ঐতিহাসিক, তাহাদের

প্রধান দোষ এই যে অনেকে পূর্ব্ব হইতেই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মনে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন, সেই সিদ্ধান্তটীকে দাঁড় করিয়া প্রমাণ প্রয়োগ গড়িতে থাকেন,—তারপর পুরাতত্ত্বের উপর সাধারণের অতিরিক্ত আস্থা-স্থাপনের নিমিত্ত জাল তাম্রফলক ও কুলপঞ্জী ও সাক্ষী সৃষ্টির বিড়ম্বনা, বাদানুবাদ এমনি বিরক্তিজনক হইয়া উঠিয়াছে যে এখন লোকে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণকে 'পেত্নীতত্ত্ববিদ্' বলিয়া উপহাস করিতেও ইতস্ততঃ করেন না। একটী মূর্ত্তীর নীচের সামান্য লেখা, স্থানের নামের সহিত নামের মিল দেখিয়াই আজকাল প্রত্নতত্ত্বের সৃষ্টি হয়। নূতন আবিষ্কারের ধূম পড়িয়া যায়, লেখক সদম্ভে প্রবন্ধ পাঠ করেন, নিরীহ পাঠকগণ একটু উচ্ছ্বাসের বাণী শুনিয়াই করতালিতে সভাস্থল প্রতিধ্বনিত করেন, অমনি বাহবা পড়িয়া যায়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নদীয়ায় যে বিক্রমপুর আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ন্যায় হাস্যাস্পদ ব্যাপার এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই। আবিষ্কারকেরা কিন্তু সহস্র বৎসর যাবত পরিচিত প্রাচীন বিক্রমপুরের কোথাও একবার পদার্পণ ও করেন নাই, বিক্রমপুর দেশটা মাটির কি সোণার তাহাও দেখেন নাই, তাহার অতি অল্পই সন্ধান রাখেন—ভয়, পাছে পদ্মার প্রবল তরঙ্গ তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। এত দিন যাহার গৌরব গরিমা জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, যে দেশের কৃতীসন্তানগণ সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের গৌরব, যাহার কৌলীন্য—গর্ব্ব লইয়া বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বত্র সমাদৃত, সেই বিক্রমপুর না দেখিয়া সে দেশের সামান্য অভিজ্ঞতা না লইয়াই বিক্রমপুর আবিষ্কৃত হইল! এ সব অদ্ভুত আবিষ্কারে দিন দিন লোকের ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অন্তর্হিত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশে এইরূপ অবিষ্কার করা বিশেষ কঠিন ও নহে। এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে, ক্রমশঃ বলিব।

* * * * *

বিবাহে পণ-প্রথা—সামাজিকশ্রেষ্ঠত্ব মিলনে,—একতায়,—পারিবারিক জীবনের শান্তিসুখ, প্রীতি ও ত্যাগে, যে পরিবারে প্রেম নাই—প্রীতি নাই, সেখানে শান্তি-সুখ থাকিতে পারে না। দারিদ্র্যদোষ অশেষ গুণ নাশক। আমাদের

সমাজ দিন দিন প্রীতি ও ত্যাগের অভাবে অধঃপতিত ও চিরকালের জন্য হীনতর হইতে চলিয়াছে।

শিক্ষা কি? শিক্ষার আদর্শ কি সে কথাটা বোঝা বড় কঠিন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভ করিলেই যে মানুষ শিক্ষিত সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইল—এ বিশ্বাস আমাদের নাই। বিশ্ববিদ্যালয় উপাধি দেয় কিন্তু মনুষ্যত্ব দেয় না, বৃথা অভিমান দেয় কিন্তু সাম্য-ভাব ও নিরহঙ্কারিতা শিক্ষা দেয় না, মোট কথা তাহাতে মানুষ গড়িয়া উঠে না। যদি গড়িয়া উঠিত তাহা হইলে সমাজে বৈবাহিক আদান-প্রদানে পণ-প্রথা হ্রাস পাইত। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মাতার হাহাকারে মেদিনী প্রতিধ্বনিত হইত না।

স্নেহলতার মৃত্যুর পর সংবাদ-পত্রে সভা সমিতিতে সর্ব্বত্র পণ-প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চলিতে লাগিল, যুবকদের প্রতিজ্ঞার কথা, কবিতায় আক্ষেপ এযে কত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই! তাহাদের প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কত কন্যার পিতা মাতা সুখ-স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এবার যখন যুবকদের প্রতিজ্ঞা তখন ভয় কি? হায়! অজ্ঞের দল, যুবকদের প্রতিজ্ঞা! সে কতটুকু স্থায়ী? তাহারা বক্তৃতা দেয়, কবিতা লেখে, স্নেহলতার ছবি টাঙ্গাইয়া রাখে ঐ পর্য্যন্ত, ব্যস্। জানি না কয়জন যুবক পিতা মাতাকে পণ-প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে উত্তেজিত করিয়াছে, কয়জনে বলিয়াছে—প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করিব না,—বিনাপণে বিবাহ করিব। নচেৎ বিবাহ করিব না। পুরুষ—পুরুষের মত কার্য্য করিব। সে তেজস্বিতাত দেখিতে পাই নাই, যে দু' চারিজন দেখাইয়াছে তাহারা বৃহৎ বাঙ্গলাদেশের পক্ষে কত মুষ্টিমেয়!

আমরা দেখিতেছি আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের আদর্শই হীন, উচ্চ আদর্শে অতি অল্প ব্যক্তির হৃদয়ই গঠিত। কন্যার পিতা চাহেন মেয়ের এমন স্থানে বিবাহ দিব যেন গায়ে দু' দশ ভরি সোণা দানা থাকে, বামুন রাঁধে,—কন্যা ঠাকুরুণ হ'য়ে বসিয়া থাকেন। স্বামী চাহেন ধনী হইয়া স্ত্রীর গায়ের অলঙ্কার দিতে পারিলেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব।

ধনী বল, নির্ধন বল, শিক্ষিত বল, অশিক্ষিত বল, সর্ব্বত্র ঐ এক কথা, টাকা চাই! বৈবাহিক আদান-প্রদানের প্রথম কথাই কত টাকা পণ দিবে? টাকার সঙ্গে সঙ্গে গহনার কথা, দান-সামগ্রীর কথা, কৌলীন্যের তুমুল গর্জ্জন, আরো

কত কি যে ছাই মাথা-মুণ্ড আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কেহ কেহ নগদ টাকা লইবেন না বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া গহনার এমনি লিষ্ট দেন যে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সর্ব্বনাশ! ফলে ঋণের দায়ে, পেটের জ্বালায় দারিদ্র্য দোষে কত সংসার যেছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

সামান্য বেতনভুক্ ব্যক্তিগণের কন্যাদায় মৃত্যু-দণ্ড অপেক্ষাও কঠিনতর দণ্ড। একটী কন্যা বিবাহেই তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হয়। এ প্রথার বিরুদ্ধে বা সংস্কারে কি আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নাই? বোধ হয় প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন আছে। সভা সমিতি বক্তৃতায় উহা নিবারিত হইবে না, যুবকদের প্রতিজ্ঞায় (?) তাহা হইবে না, এ বিষয়ে অভিভাবকদেরই অগ্রগণ্য হওয়া উচিত। ছেলেরা প্রতিজ্ঞা করিলেও বিবাহের কথাবার্ত্তা কিংবা দেনা পাওনা যখন স্থির হয় তখন তাহারা সহসা এমনি পিতৃভক্ত হইয়া উঠে যে প্রতিজ্ঞার কথা একেবারেই ভুলিয়া যায়! তাহাদের সকল পণই ভুল হয়, কিন্তু পণ-প্রথার পণের কথা পিতামাতার ন্যায় তাহারাও বিস্মৃত হয় না।

পণ-প্রথার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে গুটি কতক বিষয় লইয়া আমাদের আলোচনা করা উচিত। (১) পণ-প্রথা কেন প্রচলিত হইল? উহা বর্ত্তমান সময়ে ছেলেদের শিক্ষার ব্যয় রূপে গৃহীত হয়। পুত্রের শিক্ষার জন্য কাহার দায়িত্ব? পুত্রের পিতার না কন্যার পিতার? নিজের ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে নিজের দায়িত্ব নহে কি? সে জন্য পিতা ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য অপরের সাহায্য লইবার প্রয়োজন কি? যদি পুত্রকে দীর্ঘকাল নিজ চেষ্টা যত্ন ও উদ্যোগ দ্বারা লেখা পড়া শিখাইতেই পারিলে, তবে শিক্ষার শেষ ভাগে কন্যার পিতাকে নির্য্যাতিত করিয়া অর্থ-গ্রহণের প্রয়োজন কি? অবশ্য পিতৃ মাতৃ-হীন অভিভাবক-বিহীন ছেলেদের কথা স্বতন্ত্র।

(২) অবস্থানুযায়ী সম্বন্ধ নির্ব্বাচন করা প্রত্যেক কন্যার পিতার পক্ষে সঙ্গত। নিজ অবস্থার অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ঋণদায়ে জর্জ্জরিত হইয়া কুলীন ছেলের নিকট মেয়ের বিবাহ দিতে যাওয়া সঙ্গত কি? কৌলীন্যের মর্য্যাদার জন্য—অর্থ দিতে যাওয়ার ন্যায় অন্যায় ও বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্য আর কিছুই নহে। তোমার বাড়ী হইতে তাহারা ফিরিয়া যাক্, ক্ষতি কি? এতটুকু তেজ মর্য্যাদা বা আত্ম-সম্মান যদি না দেখাইতে পার, এতটুকু হৃদয়ের জোর যদি না দেখাইতে

পার তাহা হইলে চলিবে কেন? পূর্ব্বের কৌলীন্ত প্রথা এখন চলিতে পারে না, এখন মিথ্যা কুলপঞ্জী বা ঘটককারিকার গৌরবে অজ্ঞ তুমি আত্ম-সম্মান বিসর্জ্জন দিও না।

(৩) কন্যার পিতার একটা আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কোন ভদ্রলোক যদি গ্রামের কোনও ভদ্রলোকের কন্যার সহিত সম্বন্ধের প্রস্তাব স্থির করিয়া সে গ্রামে কন্যা দেখিতে আসেন অমনি তাহাকে গ্রামে যত বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে সকলকে দেখাইবার জন্য অনুরোধ করা হয় এবং কোন কোন স্থলে একরূপ তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়া স্বীয় স্বীয় কন্যা দেখান হয়—এরূপ ভাব ভদ্র সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। যে জাতি নারীর মর্য্যাদা জানে না সে জাতির কখনও উন্নতি হয় না—যে পিতা-মাতা নিজ কন্যার সম্মান রক্ষা করিতে পারেন না, তিনি মনুষ্যত্ব সংস্কার বহির্ভূত।

প্রত্যেক বর্ণের পণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা উচিত।

* * * * *

দুর্ভিক্ষের কথা—এবার দেশে বড়ই অন্নকষ্ট। জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগে বন্যার প্লাবনে পাট ও আউস ধান্য নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কতক নষ্ট হইয়াছে কতক রক্ষা পাইয়াছে। চাউলের দর দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে এখনই মোটা চাউল ৫॥০ টাকা, বালাম ৬৷০ হইতে ৭৲, ৭৷০ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়াছে। বিক্রমপুরের বহু গ্রামে অন্নাভাবে হাহাকার উঠিয়া গিয়াছে। কোন কোন গ্রামে মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন ভদ্র পরিবারের আট দশজন লোক গৃহের তৈজস পত্রাদি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া উদর-জ্বালা নিবারণ করিতেছেন। মুন্সীগঞ্জের সেবাশ্রম নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অন্ন-কষ্ট-প্রপীড়িত দুই একটী ভদ্র পরিবারের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিতেছেন। মুন্সীগঞ্জের সর্ব্বপ্রধান উকীল শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘটক, শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দাস প্রভৃতি এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী।

'বিক্রমপুরসম্মিলনীর' এ সময়ে জনসেবার জন্য অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া গ্রাম্য অবস্থা জ্ঞাত হইয়া যথাসাধ্য অর্থ-সংগ্রহ ও সাহায্যের জন্য চেষ্টা করা উচিত। মুন্সীগঞ্জ সেবাশ্রমের একটী কার্য্য-বিবরণী পাইলে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা পত্রস্থ করিব।

সৎকার্য্য—শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিবাস নশঙ্কর নামক গ্রামে। রমণী বাবু অর্থশালী ব্যক্তি বা তরুণ যুবক। কিন্তু তাঁহার দেশ-প্রীতি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। তাঁহার নিজ গ্রামে জল পুষ্করিণীর অভাবে গ্রাম্য জন-সাধারণ বিশেষ রূপে জল কষ্ট ভোগ করিতেছিল তিনি উহা উপলব্ধি করিয়া নিজ গ্রামে একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিয়াছেন। মালখা গ্রামের কালীবাড়ী একটী প্রসিদ্ধ স্থান; পূর্ব্ব বিক্রমপুরবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলেই ঐ স্থানকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। কালীর মন্দিরটী সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল,—রমণী বাবু ঐ মন্দিরটী পুনর্গঠনে মননিবেশ করিয়াছেন।—ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যদি নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি কল্পে অর্থ ব্যয় করেন তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেই দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

---

## নবাবিষ্কৃত ( বিক্রমপুরের ? ) ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

---

নদীয়া জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর গ্রামে মহারাজ বল্লালসেন প্রমুখ সেন বংশীয় রাজগণের এবং শ্যামল বর্ম্মা প্রমুখ বর্ম্ম বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল এবং বাঙ্গাল দেশীয় অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে উক্ত নরাধিপগণের রাজধানী থাকার উক্তি অলীক, এই দুইটি তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া রাঢ় অনুসন্ধান-সমিতির সহকারী সম্পাদক দেশ-বিখ্যাত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব মহাশয় বাঙ্গলাদেশে বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গের কোনও কোনও সম্প্রদায়ের লোকের নিকট বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। শুনিতেছি, এই তত্ত্বটী সংগ্রহ করায় রাঢ়-অনুসন্ধান-সমিতি ও নগেন্দ্র বাবু ধন্য হইয়াছেন এবং বাঙ্গলার ইতিহাস এতদ্দিনের পর মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-মালার প্রচণ্ড ও প্রোজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল! "মহারাজা-

ধিরাজ আদিশূর, বল্লাল সেন, হরিবর্ম্মা, শ্যামল বর্ম্মা প্রভৃতি প্রবল প্রতাপান্বিত হিন্দুরাজগণের রাজধানী বাঙ্গালদেশে কিরূপে হইতে পারে ?"—চিরকাল আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে এইরূপ একটা ঘোরতর সন্দেহ, তমসাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ; আজ নগেন্দ্র বাবুর অশ্রুত-পূর্ব্ব অত্যদ্ভুত গবেষণালোকে আমাদের সেই অধিকার অকস্মাৎ তিরোহিত হইল। তিনি আমাদিগকে "অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়া" আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরস্থ চির অন্ধকার বিদূরিত করিয়া দিলেন।

এই নদীয়া জিলার বিক্রমপুরের মাহাত্ম্যের উপর একটা পাহাড় চাপা দিয়া, বাঙ্গালগণ, বাঙ্গাল দেশের বিক্রমপুরের কতই না গৌরব করিতেছিল ?

কিন্তু :— "কতক্ষণ থাকে শিলা শূন্যেতে মারিলে
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে ?"

এতদিন এমন তত্ত্বটা "নিহিতং গুহায়াং" ছিল, আধুনিক গবেষণার প্রবল-স্রোতে তত্ত্বটা অকস্মাৎ লোক-লোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। এইরূপ দুই চারিটি ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও সত্য আলোকে আসিলেই বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে। বাঙ্গালদের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। এত বড় কথাটা কিরূপে সহস্র বৎসরাধিক যাবত চাপা দিয়া রাখিয়াছিল ? একটা প্রচলিত কথা আছে, "কাণা পুত্রের নাম পদ্মলোচন," হরি, হরি, এই নদীয়া জিলায় বিক্রমপুর গ্রামের নাম অনুসারে নিগুর্ণ বাঙ্গালগণ তাহাদের এক পরগণার নামই বিক্রমপুর রাখিয়াছে !

শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহোদয়ের এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্বের সম্পূর্ণ যুক্তি ও তথ্য সাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের এতৎ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তরাশি অচিরে লোক-লোচনীভূত হওয়ার আশা করা যায়। ঐ সমুদয় রহস্য নিশ্চয়ই তাম্রশাসনাদি দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হইবে ! সুতরাং তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি আলোচনা করা অসাময়িক ও পণ্ডশ্রম মাত্র বিবেচিত হইতে পারে। যাহা হউক তথাপি বর্ত্তমানে এইরূপ আলোচনা দ্বারা ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা প্রকাশ পাইবে বুঝিয়াও আমাদের মনে কয়েকটা সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় পাঠক মহাশয়দিগকে ঐ সন্দেহের কথা কয়টা জানাইয়া রাখিতেছি।

"বল্লাল-চরিত" এক খানা ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থ খানা রাঢ়

অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত কাশারু গ্রামবাসী "দাক্ষিণাত্য দ্রাবীড়" বংশীয় পণ্ডিত আনন্দ ভট্ট ১৪৩২ শকাব্দে ( ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ) নবদ্বীপাধিপতি বুদ্ধিমন্তখাঁয়ের প্রীত্যর্থে প্রোক্ত নরপতির জন্ম বাসরোৎসবে পাঠ করেন। গ্রন্থখানির বয়স ৪০৫ বর্ষ।

ভট্ট মহাশয় বলিয়াছেন,—

"নবদ্বীপ পতেঃ শ্রীমদ্বুদ্ধিমন্তস্য ভূভুজঃ
সভাসীনস্য সম্বুদ্ধেরগ্রে পঠন পূর্ব্বকং।
শাকে চতুর্দ্দশ শতে মনুষ্য রদনা যুতে
পৌষ শুক্ল দ্বিতীয়ায়াং তজ্জন্ম তিথি বাসরে॥"

মাননীয় শাস্ত্রী মহাশয় ও প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় উভয়েই এই গ্রন্থ খানিকে প্রামাণিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, "No doubt is left in my mind that Ananda Bhatta's Ballal charit is a historical record of the leading events of Balla's reign."

মহারাজ বল্লালসেনের সহিত নীচকুলোদ্ভবা অসামান্য রূপ-লাবণ্য সম্পন্না পদ্মিনীর যে দিন প্রথম দর্শন হয়, বল্লালসেনের সে দিনকার ভ্রমণ-প্রসঙ্গে আনন্দ ভট্ট লিখিয়াছেন,

একদারুহ্যজবনমশ্বং রাজা যদৃচ্ছয়া।
প্রযযৌ ধবলেশ্বর্য্যা স্তীরং রুচিরকাননং॥

আবার বল্লালাত্মজ মহারাজ লক্ষ্মণসেনের দুর্ব্বাক্যে ক্রোধান্বিতা পদ্মিনী মান-মন্দিরে ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইলে মহারাজ বল্লালসেন স্বীয় প্রেয়সী মহিষীকে তদবস্থ দর্শনে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন পদ্মিনী বলিতেছেন,

"ধনাদৌ নাহি মে কার্য্যং কিমলঙ্কারণাদিনা।
পতিতা ধবলেশ্বর্য্যাং নিমজ্জেয়মহং ধ্রুবং॥"

ঢাকা জিলার বিক্রমপুরস্থ বল্লালের রাজধানী রামপাল নগরী ধবলেশ্বরী ( ধলেশ্বরী ) নদীর তীরে অবস্থিত। এই ক্ষণ-চড়া পড়িয়া নদী অর্দ্ধ মাইল দূরে

সরিয়া পড়িয়াছে মাত্র। উপরি উক্ত কবিতা দুইটীতে যে ধবলেশ্বরী ( ধলেশ্বরী ) নদীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা কি নদীয়া জিলায় না রাঢ় দেশে? সকলেই জানেন ধবলেশ্বরী নদী ঢাকা জিলায় অবস্থিত। বল্লালের রাজধানী নদীয়া জিলার বিক্রমপুর হইলে বল্লালসেন "একদা অশ্বারোহণে ধবলেশ্বরী নদীর তীরে রুচির কাননে" ভ্রমণ করিতেন না এবং পদ্মিনীও "দারুণ মানের ভয়ে" নদীয়া জিলার গঙ্গাতীর ছাড়িয়া মান-গৃহ হইতে ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের ধবলেশ্বরী নদীতে প্রাণ-বিসর্জ্জনের সংকল্প প্রকাশ করিতেন না। সে কালে এ দেশে রেলের রাস্তা হয় নাই সুতরাং অকস্মাৎ মহিষীর মনে ধবলেশ্বরী নদীতে নিমজ্জনের বলবতী বাসনার উদয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে—মহারাজের ও অশ্বারোহণে উক্ত নদীতীরে ভ্রমণের সুযোগ কিরূপে ঘটিতে পারে সুধিগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

ভট্টকবি অন্যত্র বলিতেছেন,—

"রাজন্ জানাসি ভদ্রংস্তে ইয়ং শিবজলাশুভা।
কীর্ত্তিশেষং গতবতঃ কীর্ত্তিংবদতি দীর্ঘিকা॥

এই দীর্ঘিকা রামপালের সেই অন্ততঃ এক মাইল ব্যাপী দীর্ঘ এবং প্রায় ১৫০০ হস্ত প্রস্থ দীর্ঘিকা নয় কি?

প্রশ্ন হইতে পারে আনন্দভট্ট ৪০৫ বর্ষের পূর্ব্বের ব্যক্তি হইলেও বল্লালসেনের ৪০০ বৎসরের পরের ব্যক্তি; সুতরাং আনন্দভট্টের গ্রন্থ খানিকে একেবারে প্রামাণিক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে কি না? তদুত্তরে আমরা শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি এবং স্বয়ং বিদ্যার্ণব মহাশয়ও ঐ গ্রন্থ খানিকে অপ্রামাণিক বলেন নাই। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের পথ অতি দুর্গম ও পিচ্ছিল বিধায় পদে পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা। তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচারের নিকট শত শত মনীষির মত প্রতিদিন খণ্ড-বিখণ্ড হইতেছে ও নিত্য নূতন সত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। আমাদেরও সুতরাং এ ক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বন অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং আমরা বাঙ্গলার বর্ত্তমান যুগের এই দুই জন মহামহোপাধ্যায়ের মতামতের উপর শুধু নির্ভর না করিয়া গ্রন্থকার আনন্দ ভট্টের সমসাময়িক অবস্থা ও পৃথক তথ্য জানিবার ঐ সময় কিরূপ অনুকূল ছিল, তাহা দেখিতে প্রয়াস পাইব। আশা করি ইহা হইতে তদীয়

গ্রন্থ ঐতিহাসিক সত্যের উপর কত দূর প্রতিষ্ঠিত তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উক্ত গ্রন্থ খানির বয়স ৪০৫ বৎসর। সুতরাং যে সময় আনন্দ ভট্টের "বল্লাল-চরিত" রচিত পঠিত এবং সর্ব্বত্র সাদরে গৃহীত হয়, তৎসময় বাঙ্গলা দেশে অনেক প্রতিভাসম্পন্ন মনীষির আবির্ভাব হইয়াছিল। সমাজ-সংস্কার, শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্মান্দোলন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতির দিকে বাঙ্গলা দেশ তখন বড়ই অগ্রসর হইয়াছিল। বাঙ্গলার সেই চিরস্মরণীয় যুগে ধর্ম্মজগতে প্রেমাবতার চৈতন্য দেব, ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ রঘুনন্দন, দর্শনশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি ও বাসুদেব সার্ব্বভৌম, তন্ত্রশাস্ত্রে সাধক প্রবর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীস, সমাজ-তত্ত্বে সুনিপুণ ধ্রুবানন্দ মিশ্র, দেবীবর ঘটক ও রঘুনাথ বাচস্পতি প্রভৃতি মনীষিগণ অসাধারণ প্রতিভা, কৃতিত্ব ও কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় প্রদান করেন। বাঙ্গলা দেশ তখন ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত মণ্ডলীর লীলাভূমি। ঠিক এই সময়ে চৈতন্যধর্ম্মানুরাগী, পরম বৈষ্ণব ও বিভবশালী জমীদার বা রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁ প্রাদুর্ভূত হন। তিনি এরূপ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন যে কবি আনন্দ ভট্ট তাঁহাকে "নবদ্বীপাধিপতি" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গবাসী মহাত্মাগণ বাঙ্গালগণকে বর্ত্তমান সময়ের পশ্চিম বঙ্গবাসী হইতে ভিন্ন চক্ষে দেখিতেন এরূপ অনুমানের কারণ নাই। নদীয়া জিলায় বল্লাল সেনের প্রকৃত রাজধানী হইলে সোনার গাঁয়ের বাঙ্গাল আনন্দ ভট্ট নদীয়ার বিক্রমপুর বল্লালের রাজধানী থাকা স্থলে ধবলেশ্বরীর তীরে ঢাকার বিক্রমপুরের বল্লালের রাজধানী থাকা লিখিতে এবং প্রকাশ্যরূপে এই গ্রন্থ বুদ্ধিমন্ত খাঁকে উপহার দিতে সাহসী হইতেন না, অধিকন্তু বিনা প্রতিবাদে এই গ্রন্থ সাদরে গৃহীত ও হইত না।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় স্বগৃহীত বা স্বপ্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" নামক বহু তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের বৈদিক প্রকরণে লিখিয়াছেন, "হরি বর্ম্মদেবের তাম্র শাসন হইতে জানা যায় যে বঙ্গান্তর্গত বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। কোটালী পাড় প্রাচীন বিক্রমপুরের অন্তর্গত। এই বিক্রমপুরে গিয়া গঙ্গাগতি, হরিবর্ম্মদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাহা ঐতিহাসিক কথা।" ভাল এইটী যদি ঐতিহাসিক সত্য হয় তবে বিদ্যামহার্ণব মহাশয় কি

বলিতে চাহেন ঢাকা বিক্রমপুরে, বর্ম্ম রাজগণের রাজধানী হইলেও তথায় বল্লাল সেন প্রমুখ সেন বংশীয় রাজগনের রাজধানী ছিলনা? বিদ্যামহার্ণব মহাশয় হরিবর্ম্মার রাজধানী বঙ্গে ছিল লিখিয়াছেন, রাঢ়ে থাকা লিখেন নাই এবং কোটালীপাড় নদীয়া জিলায় নহে; তাহা পূর্ব্বে ঢাকা জিলার অন্তর্গত ছিল, সম্প্রতি ফরিদপুর জিলা ভুক্ত হইয়াছে। একদা ঢাকা বিক্রমপুরে হরি বর্ম্মার রাজধানীতে নানা শাস্ত্র বিশারদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কোটালী-পাড়া নিবাসী রাজমন্ত্রী বাচস্পতিমিশ্র মহোদয়ের সহিত গঙ্গাগতির সম্মিলন হইয়াছিল। বৈদিক কুল গ্রন্থে "গৌড়ান্তর্গত কান্ত বিক্রমপুরোপান্তে পুরীং নির্ম্মমে" প্রভৃতি শ্লোকে গৌড়ান্তর্গত কান্ত বিক্রমপুর উপান্ত ভাগে মহারাজা ধিরাজ শ্যামল বর্ম্মা রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। হরিবর্ম্মা দেবের তাম্রশাসনে "ইহ খলু বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জায়া স্কন্দাবারাৎ" আবার শ্যামল বর্ম্মার তাম্র শাসনে "ইহ খলু বিক্রমপুর নিবাসী কটকপতেঃ" ইত্যাদি স্থলে বিক্রমপুরের উল্লেখ আছে। হরি বর্ম্মার রাজ-ধানী যে ঢাকা বিক্রমপুর ছিল তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং পুর্ব্বোল্লিখিত বর্ম্মবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনোক্ত বিক্রমপুর যে ঢাকা বিক্রমপুর তদ্বিষয়ে বোধ হয় অণুমাত্র সংশয় নাই। আবার শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনে যে, বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর ভুক্ত্যন্তে পূর্ব্বে নাগর কুণ্ডা দক্ষিণে ধীপুর পশ্চিমে লঙ্কাচূয়া উত্তরে কুলকণ্ঠি চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পাঠক ত্রয়ঃ ভূমিঃ ইত্যাদি কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ঢাকা বিক্রমপুরান্তর্গত স্থান। যেহেতু শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনোক্ত বেজনীসার প্রভৃতি গ্রাম ঢাকা বিক্রমপুরে এখনও বিদ্যমান আছে।

বিদ্যামহার্ণব মহাশয় "বৈদিক কুলার্ণব" নামক বৈদিক গ্রন্থ হইতে বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন "গঙ্গার পূর্ব্বে মেঘনার পশ্চিমে লবণ সমুদ্রের উত্তরে এবং বরেন্দ্র ভূমির দক্ষিণে, ধর্ম্মশীল শ্যামলবর্ম্ম সেন বংশীয় রাজগণের করদরূপে রাজ্যশাসন করিতেন" বিদ্যামহার্ণব মহাশয় অন্যত্র লিখিয়াছেন, "তিনি (শ্যামল বর্ম্মা) পূর্ব্ব বঙ্গে গিয়া নিজ ভুজ বলে বিক্রমপুর অধিকার পূর্ব্বক তথায় রাজধানী স্থাপন ও ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃঃ অব্দে) রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন" অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্ম প্রভৃতি রাজবংশীয় গণের

একটা রাজধানী থাকা কি দৃষ্ট হইতেছে না?

বৈদ্যকুলতিলক কবিকণ্ঠ স্বরচিত "কবিকণ্ঠ হার" নামক বৈদ্যকুল শাস্ত্রে লিখিয়াছেন,

"আস্তে মৎ সন্নিধৌ কণ্ঠে রামপালেতি বিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥

বল্লাল জন্ম প্রসঙ্গে আদিশূরের পালিতা রামপাল নগরী যে সেন বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল তাহা স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। কবিকণ্ঠ হার অপ্রামাণিক গ্রন্থ নহে। বাঙ্গলা দেশের একটি অতি প্রধান ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং বিদ্বৎ-ভূয়িষ্ঠ জাতির ইতিহাস এই গ্রন্থে বিবৃত আছ এবং আজিও কবিকণ্ঠহার বৈদ্য জাতির বংশাবলীর প্রমাণ সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠতম প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। উক্ত গ্রন্থের বয়স এইক্ষণে প্রায় পাঁচ শত বৎসর। কবিকণ্ঠহারের লিখিত রামপাল কি নদীয়া জিলার অন্তর্গত?

"সম্বন্ধ-নির্ণয়" গ্রন্থ প্রণেতা লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, "মহারাজ আদিশূরের বিক্রমপুরস্থ রাজধানীতে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতার মতে আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বিক্রমপুরে আসেন নাই, গৌড়ে আসিয়াছিলেন,—এই আদিশূরের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল না, গৌড়ে ছিল। গৌড় শব্দের অর্থ তিনি গৌড় দেশ না করিয়া গৌড় নগর করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। "গৌড়ীয় বঙ্গ ভাষা" বলিতে গৌড় দেশীয় ভাষা বুঝায়, গৌড় নগরের ভাষা মাত্র বুঝায় না। "গৌড় জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি" ইত্যাদি স্থলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় গৌড় নগরের ব্যক্তিকে কেবল লক্ষ্য করেন নাই,—বাঙ্গালী জাতিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু সে তর্কের স্থল আর নাই। বিদ্যামহার্ণব মহাশয় ও বলিতেছেন, "আদিশূর, বল্লালসেন, শ্যামলবর্ম্মা হরিবর্ম্মা প্রভৃতি রাজগণের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। এইক্ষণ বিচার্য্য বিষয় এই যে ঐ বিক্রমপুর ঢাকা কি নদীয়া জিলার অন্তর্গত।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা আদিশূর সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, বল্লালসেন সম্বন্ধে বলেন, "বল্লালসেন বঙ্গান্তর্গত বিক্রমপুরে বাস করিতেন।" অন্যত্র

তিনি বলিয়াছেন "বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল গ্রামে দিঘীর উত্তর পারে যে গজারি বৃক্ষ আছে তাহাই পঞ্চ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অর্ঘ্যস্থাপন-বৃক্ষ। অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তৎকর্ত্তৃক মুদ্রিত "বেণীসংহার" নাটকের ভূমিকায় আদিশূরের রাজধানী বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী রামপাল নগরীতে ছিল এবং তথায় কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চক আগমন করেন বলিয়া লিখিয়াছেন। লঘুভাগবত-প্রণেতা গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মতে মহারাজ লক্ষ্মণসেন পিতার সহিত কলহ করিয়া নবদ্বীপে দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিলেও তাঁহার জন্ম রামপালেই হইয়াছিল। তিনি বলেন,

"তদানীং বিক্রমপুরে, লক্ষ্মণো জাতবান সৌ—

বঙ্গের কৃতী-সন্তান পরম পণ্ডিত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই, বাহাদুর পশ্চিম বঙ্গবাসী, খাটী কলিকাতার লোক হইয়াও একটা মস্ত ভ্রম করিয়াছেন! তিনি তাঁহার রচিত Hindoo civilization নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন "The chief seat of the sena family seems to have been Bikrampur near Dacca where the supposed ruins of Ballal's Palace are shown to travellers" দত্ত মহাশয় কলিকাতার লোক হইয়াও বাড়ীর নিকটবর্ত্তী বিক্রমপুর ছাড়িয়া ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে বল্লালের বাড়ী থাকা অনুমান করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কার্য্য ততোধিক অন্যায়। ভাল, বিদ্যানিধি মহাশয়ই বা এমন ভুল করিলেন কেন? বিদ্যানিধি মহাশয় খাটী পশ্চিম বঙ্গের ব্যক্তি। তিনি নিজ নদীয়া জিলার বিরোধী হওয়ার অন্য কারণ আছে। বিদ্যানিধি মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলের একজন প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয়। কন্যা বিবাহ দিতে হয় বিক্রমপুরে। বাঙ্গাল দেশের বিক্রমপুরে রাঢ়ীয় ঘটক, কুলীন শ্রোত্রীয়, বংশজের একটা প্রাচীন সমৃদ্ধ সমাজ। এমন কি আজ পর্য্যন্ত উদ্বাহাদি কার্য্যে তথায় সামাজিক প্রাচীন রীতি নীতি অনেকটা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় প্রতিপালিত হইতেছে। ঐ সমাজের ভয়ে হয়ত তিনি ঐরূপ অন্যায় করিয়া থাকিবেন। গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় অন্যত্র বলিয়াছেন,

"নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ।
তত্রাসীৎ রাম নামৈকো বৈদ্যরাজ মহাধনী।
তৎপালিতা নগরী সা রামপালেতি সংজ্ঞিতা॥

ইহাতেও রামপাল যে সেন বংশীয় রাজগণের রাজধানী ছিল, তাহা স্পষ্ট সূচিত হইতেছে।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় বলেন, "The chief seat of their Power was at Bikrampur near Dhaka where the ruins of Ballal's palace are still shown to travellers." পরলোকগত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ( যিনি পশ্চিম বঙ্গের 'প্রবাসীর' মতে বড় বঙ্গ সাহিত্যিকগণের মধ্যে গণ্য নহেন ) তাঁহার "ভক্তির জয়" গ্রন্থে যে বাঙ্গাল দেশের বিক্রমপুরে সেন রাজগণের রাজধানী থাকাও গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব রামপালে প্রথম সংঘটিত হওয়ার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা প্রমাণ স্থলে গ্রহণের তত যোগ্য নহে; কারণ সেত বাঙ্গাল দেশীয় বিক্রমপুর নিবাসী, নিজের পক্ষে নিজের এজাহার মাত্র। 'বিক্রমপুর ও ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতৃগণ সম্বন্ধে ও ঐ এক কথাই খাটে,—তাঁহাদের ও নিবাস তথা। তাঁহাদের মত গ্রহণ যোগ্য নহে। ইঁহারা উভয়েই ঢাকাই বাঙ্গাল। ইঁহাদের কথায় প্রত্যয় কি? ইঁহাদের বই গুলি যে কাটা যাইবে তাহাতে দুঃখই বা কি? কিন্তু স্বয়ং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের নিজ কৃত অগণিত অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের সাহায্যে সম্পাদিত ও সংগৃহীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" বিশেষতঃ "বিশ্বকোষ" যে এই নবাবিষ্কারের ফলে খণ্ড খণ্ড হইয়া কাটা যাইবে এই একটা সূচিবিদ্ধ দুঃখ মনে রহিল। আবার একটা কথায় বড় গোল বাঁধিয়া গেল। বাঙ্গালের "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" ভূমিকা লিখিয়াছেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসী। বিদ্যাভূষণ মহাশয় Jaode Barras নামক একজন পর্তুগিজ গ্রন্থকারের Da Asia নামধেয় গ্রন্থের প্রমাণ গ্রহণে লিখিয়াছেন, "খৃষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বিক্রমপুর, শ্রীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের বিবরণ উক্ত গ্রন্থে আছে। উক্ত গ্রন্থকার বিক্রমপুরবাসিগণকে বীর ও সাহসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিতেছেন, "ধনে, মানে, পাণ্ডিত্যে, জ্ঞান-গৌরবে একদিন যে দেশ বাঙ্গালার মুকুট-মণি ছিল যে পুণ্যপীঠে একদিন বঙ্গবীর কেদার রায়ের অপূর্ব্ব রণলীলা ও দেশহিতৈষিতা পূর্ণ বিকশিত হইয়া বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয়

প্রদান করিয়াছিল, যাহার অঙ্কে পাল বংশীয় রাজগণের রাজধানী গৌরবময় রামপাল নগর শোভা পাইত অতীতের সেই "বিক্রমে বিক্রমপুর" সকল সম্পদ হারাইয়া অতীতের গৌরব মাত্র নিয়া দণ্ডায়মান। চাঁদরায় কেদার রায়ের আত্মত্যাগের লীলাভূমি, বঙ্গীয় সেন ও পালরাজগণের গৌরবময় সমৃদ্ধিশালী রাজধানী বল্লালদিঘী, বাবা আদমের মসজিদ আজিও অতীতের স্মৃতি বুকে করিয়া কতইনা গৌরব সূচিত করিয়া দেয়। তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "বিক্রমপুর অদ্বিতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্করের জন্মভূমি; তাঁহার ন্যায় ধীশক্তি সম্পন্ন মনীষি তখন ভারতবর্ষে ও তিব্বতে ছিল না। ৯৮০ খৃঃ অব্দে গৌড়ীয় রাজবংশে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন।" অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রমাণ জন্য কতকগুলি গ্রন্থের নাম করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে ঐ তালিকা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করিলে ঐ তালিকা 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' ভূমিকায় দেখিতে পাইবেন। 'ঢাকার ইতিহাস' লেখক বলেন, 'সু প্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারের অধ্যাপক শীলভদ্র ৪৪৭ শকাব্দে রামপালে জন্মগ্রহণ করেন। পাঠকবর্গ অবগত আছেন ঐ সময় নালন্দার বিদ্যা-মন্দির একটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পৃথিবীতে তৎকালে জ্ঞান চর্চ্চার এমন আর দ্বিতীয় স্থান ছিল না বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হইবে না।

রামপাল নগরী ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অতি নিকটবর্ত্তী। রামপালের উপকণ্ঠ পঞ্চসার মুন্সীগঞ্জ সংলগ্ন স্থান। মুন্সীগঞ্জে এ পর্য্যন্ত যত উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও ঐতিহাসিক এবং সবডিভিসনেল (Subdivisional Officer) আগমন করিয়াছেন, তন্মধ্যে জ্ঞানপিপাসু এবং অনুসন্ধিৎসু প্রায় প্রত্যেকেই স্বয়ং রামপাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তৎসম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন এবং কিছু না কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। এস্থলে তাহার কিছু উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ৺পার্ব্বতী শঙ্কর রায় রামপাল সম্বন্ধে এক বিস্তৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থের নাম 'অম্বষ্ঠ নৃপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণ।" সে প্রায় ৪০ বৎসরের কথা। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিভুক্ পণ্ডিতবর ৺আশুতোষ গুপ্ত এম, এ মহোদয়, এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেলে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখেন। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ও রামপালের একখানা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখেন। ইহাঁরা সকলেই রামপাল পূর্ব্বতন রাজধানী থাকা স্বীকার করিয়াছেন। Stewarts History

of Bengal, Hunter's Statistical account of Bengal, Taylor's Topography of Dacca, Blochman's History and geography. রাজধানী ছিল তাহা অবগত হওয়া যায়। এই সব মনীষিবর্গের অনুসন্ধানও তথ্যসংগ্রহে স্বার্থপরতা-দোষ-দুষ্টভ্রম-প্রমাদের কোনই কারণ নাই। বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে; বিভিন্ন সুধিগণ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ আর কি হইতে পারে আমরা অবগত নহি।

যাহা হউক এইক্ষণ আমরা স্থানের প্রসিদ্ধি প্রাচীন কিংবদন্তী ও স্থানের অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহা দেখিতে যত্নবান হইব। নদীয়া জিলার বিক্রমপুরের কোন প্রসিদ্ধি নাই। এমন কি নদীয়া জিলায় যে বিক্রমপুর নামে একটা গ্রাম আছে তাহা অনেকেই জানেন না। অথবা ঐ বিক্রমপুরের অবস্থা এমন নহে যে তাহা দেখিয়া উহা একটা রাজধানী ছিল এমন অনুমান করা যাইতে পারে এই নবাবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এমন কি এখন পর্য্যন্তও তাহা অপরিজ্ঞাত ও অপ্রখ্যাতই রহিয়াছে। ইতিহাসপ্রিয় বর্ত্তমান রাজপুরুষগণ ও তাঁহাদের বংশধর অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ বঙ্গদেশের কি ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের অনুসন্ধান করিতে বিরত হন নাই; আজ পর্য্যন্ত তাহাতে কত লোক যোগমগ্ন তাপসের ন্যায় অবিরত নিবিষ্ট-চিত্তে রহিয়াছেন। কিন্তু নদীয়া জিলার বিক্রমপুর সম্বন্ধে এক টুকুরা কাগজেও পর্য্যন্ত কেহ কিছু লিখিয়া যান নাই। অবশ্য তজ্জন্য নূতন আবিষ্কারের পথ রুদ্ধ হইয়া থাকিবে এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু পূর্ব্বাপর একটা ধারাবাহিকতা কি প্রাচীন কিংবদন্তী কিছু না থাকিলে, নবাবিষ্কারের সহিত তাহার কোন একটা যোগ না দেখাইতে পারিলে একটা বিশিষ্ট সত্য দাঁড় হইতে পারে না ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্যানুসন্ধানের পক্ষে ঐরূপ প্রচেষ্টা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইতে পারে। কিন্তু তাহার মূল্য কতটুকু তাহা সুধিজনগণের বিবেচ্য। পক্ষান্তরে ঢাকা বিক্রমপুরে বল্লালসেন প্রমুখ রাজন্যবর্গের রাজধানী অবস্থিত থাকা সম্বন্ধে যেমন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, তদ্রূপ স্মরণাতীত কালের বহু কিংবদন্তী বর্ত্তমান আছে। নদীয়া জিলার বিক্রমপুর সম্বন্ধে কোন কিংবদন্তী শ্রুতি-গোচর হয় নাই। বিক্রমপুরে কোন ব্যক্তির নিবাস বলিলে তাহাকে ঢাকা

বিক্রমপুর বাসী বুঝায়, জিলা ঢাকা আর বলিয়া দিতে হয় না। নদীয়া বিক্রমপুরবাসী কোন ব্যক্তি বিক্রমপুর বাসী বলিলে তাহার চতুর্দ্দিকে একটা সীমা রেখা অঙ্কিত না করিলে উপায় নাই। বরং এই একটা অনুমান আসিতে পারে ঢাকা বিক্রমপুর বাসী কতিপয় ব্যক্তি, নদীয়া জিলার কোন অপ্রসিদ্ধ স্থানে বিষয়ান্তর উপলক্ষে বাসভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঐ স্থানের নাম বিক্রমপুর রাখিয়া থাকিবেন। আমাদের অনুমান যে সত্য অনুসন্ধান দ্বারা তাহাও আমরা জ্ঞাত হইয়াছি। সে সব কথা প্রয়োজন হইলে সময়ান্তরে বলিব।

ঢাকা বিক্রমপুরান্তর্গত পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ "বল্লাল বাড়ী হইতে এক প্রাচীন ও প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দক্ষিণাভিমুখে বজ্রযোগিনী, মাহাপাড়া, মহাকালী কাঠাদিয়া সেরাজাবাদ প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব ও মধ্য দিয়া রাজাবাড়ীর নিকট পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। অপর বর্ত্ম উত্তরে ধলেশ্বরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় প্রাচীন বর্ত্ম রামপাল হইতে কিঞ্চিৎ পশ্চিমাভিমুখে রঘুরামপুর সুখবাস-পুর, বজ্রযোগিনী, আটপাড়া, টঙ্গিবাড়ী, নয়নন্দ মুকুটপুর, রাওতভোগ, পাঁচগাও, গুণগাঁও প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব ও মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে পদ্মার তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই সকল রাস্তা গুলিই অতি প্রাচীন এবং এখন রাস্তাগুলি সমুদয়ই "রামপালের দরজা বলিয়া বিখ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে পদ্মা নদীর বিস্তার যেরূপ হইয়াছে পূর্ব্বে এরূপ ছিল না—অতি পূর্ব্বে এস্থানে পদ্মানদীর অস্তিত্বই—ছিল না। যাহা হউক তথাপি এখন ঐ প্রথম ও তৃতীয় রাস্তা দুইটার প্রত্যেকটার দৈর্ঘ্য ১৬।১৭ মাইলের কম হইবে না। প্রস্থ এখনও স্থানে স্থানে ৪০।৫০ হাত। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই রাস্তা গুলির প্রস্থ স্থানে স্থানে ৮০ হাত পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। পার্শ্বের কৃষকগণের অত্যাচারে বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থলে রাস্তার প্রস্থ খর্ব্ব হইয়াছে বটে, কোন কোন স্থলে বা রাস্তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তথাপি রাস্তাগুলি দেখিলেই ঐ রাস্তা যে অতি প্রাচীন কালেরই রাজ-বর্ত্ম ছিল তৎসম্বন্ধে বিন্দু মাত্র সন্দেহ হয় না।

রামপালের যে স্থানে মহারাজ বল্লালসেনের অন্দর খণ্ড ছিল, তাহা স্মরণাতীত কাল যাবৎ "বল্লাল বাড়ী" নামে প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানের অধিবাসিগণ এখনও নিজ নিজ ভদ্রাসনের পরিচয় দিতে যাইয়া "রামপাল বল্লাল বাড়ী" বলিয়া বলে ও লিখে এবং জমিদারী কাগজ পত্রেও ঐ রূপ নামই লিখিত

আছে। ঐ স্থানটীর চতুর্দ্দিক একটি বৃহৎ পরিখা পরিবেষ্টিত। ঐ পরিখাটীর পরিধি প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার হস্ত এবং প্রস্থ এখনও ২০০ হাতের অধিক। রামপাল নগরী ধ্বংস হওয়ার পরেও ঐ নগরের কতকগুলি বাজার ও পাড়ার নাম এখন ও পূর্ব্ব নামে পরিচিত;—যথা শাঁখারিবাজার, সুখবাসপুর কামারঅঙ্ক বা নগর, পানহাটা ইত্যাদি। ঢাকা নগরীতে ও বর্ত্তমান কালে শাঁখারিবাজার, কামারনগর নামধেয় বাজার ও স্থান গুলি এখনও বর্ত্তমান আছে। এইরূপ নামকরণের মূলে নিশ্চয়ই কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। সুধিগণ অনুমান করেন, প্রাচীন রামপাল নগরী ভগ্ন ও হতশ্রী এবং ভস্মীভূত হইলে ঐ সমুদয় বাজারের ব্যবসায়ীগণ নূতন সংস্থাপিত ঢাকা নগরীতে বাসস্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসস্থানের ও ব্যবসায়ের স্থানের নামকরণ করিয়া থাকিবে এবং এই অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয়।

প্রায় ৫০ বর্ষ কাল পূর্ব্বে রামপাল ও রামপাল নগরীর উপকণ্ঠ বজ্রযোগিনী, পঞ্চসার, জোড়াদেউল, প্রভৃতি গ্রামে মৃত্তিকা খনন সময়ে প্রাচীন এমারত, ইষ্টক-নির্ম্মিত-ঘাট, ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ, কোন কোন স্থলে বা অভগ্ন মন্দির ইত্যাদি উত্তোলিত হইতে আমরা দেখিয়াছি। ঐ অঞ্চলে অনেকে সোণারূপার অনেক তৈজস, দেবমূর্ত্তি, প্রাচীন কালের স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা প্রভৃতি ভূগর্ভ খনন সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের জ্ঞানাবধি অনেক সময়েই এইরূপ ঘটনা ঘটীতে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। এখনও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন সময়ে রামপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে সময় সময় ইষ্টক রাশি, দালানের ভগ্নাংশ ও পাকাঘাট ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। Taylor's Topography of Bengal নামক গ্রন্থে রামপালের বিবরণ উপলক্ষে লিখিত আছে, "A few years ago a rayat when ploughing a field in this place, found a diamond of the Value of Rs 70000/-; it afterwards gave rise to a Law suit before the Provincial Court of appeal." লৌহ জারিত করিয়া সংশোধন করিতে হইলে পুরাতন লৌহই প্রশস্ত। রামপাল কামার নগর হইতে মৃত্তিকা খনন করিয়া ভগ্ন ও প্রাচীন লোহার কড়াই ও নানারূপ লৌহ মুদ্গর ও সরঞ্জাম কবিরাজ মহাশয়গণ উঠাইয়া নিতেন; ইহাতে দেখা যায় এই স্থানে প্রাচীন কালে লৌহ নির্ম্মিত

দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের একটা বাজার ছিল। পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে অশীতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধগণের নিকট রামপাল সম্বন্ধে কতই না কিংবদন্তী শুনিয়াছি এবং নানারূপ ধন সম্পত্তি এমারত ইত্যাদি প্রাপ্তির ঘটনা শুনিয়া অবাক হইয়াছি। স্থানের অবস্থাদৃষ্টে যেরূপ দেখা যায় তাহাতে যে বর্ত্তমান রামপাল, বজ্রযোগিনী, পঞ্চসার, জোড়া দেউল, সুখবাসপুর দেওসার প্রভৃতি গ্রাম নিয়া যে রামপাল নগরী ও তাহার উপকণ্ঠ বিস্তৃত ছিল তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। বর্ত্তমান সময়ে মৃত্তিকা খনন এবং ইক্ষু, কলা, মূলা পাট ইত্যাদি চাষ উপলক্ষে অনেক ইষ্টকাদি ও প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষের নিদর্শন উত্তোলিত হইয়া গিয়া থাকিলেও পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন অবস্থা, নাম, রাস্তা দীঘি, ঘাট, দেউল, জাঙ্গাল, অট্টালিকা ইত্যাদির অস্তিত্ব দ্বারা রামপাল যে প্রাচীন কালে মহা-নগরীতে পরিণত ছিল তৎসম্বন্ধে আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

রামপালের দীঘি, কোদালধোয়া দীঘী, সুখবাসপুরের দীঘী প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকাগুলি দেখিলেই তাহা কোন না কোন রাজা কি তত্তুল্য অসাধারণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক খনিত বলিয়া বোধ হয়। বাবা আদমের মস্‌জিদ ও বাবা আদমের গদা বলিয়া একটা জিনিসের কথা কিংবদন্তী ও গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়; প্রথম বল্লাল বা দ্বিতীয় বল্লাল যাঁহার সময়েই বাবা আদমের যুদ্ধ হউক না কেন ঐ আদম বা বাবা আদম সম্বন্ধে কিংবদন্তী অতি প্রাচীন। আনন্দ ভট্ট বাবা আদম সম্বন্ধে লিখেন,

"বায়াছম্বঃ সৈন্যমধ্যে জগর্জ্জচললম্ফচ।"

এই বাবা আদমের গদা ও মস্‌জিদ নামক বস্তু দুইটি এখন ও রামপালে বর্ত্তমান আছে। এইরূপ নানা সাক্ষী রামপাল যে একদিন একটা রাজধানী ছিল তাহা প্রমান করিয়া দেয়। রামপাল দর্শন জন্য স্বদেশী ও বিদেশী বহু প্রধান ব্যক্তি তীর্থ যাত্রার ন্যায় রামপালে বরাবরই আগমন করিয়া থাকেন, এবং প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসবিশেষ দর্শনে সকলে মুগ্ধ হইয়া ইহার প্রাচীন লুপ্ত গৌরব ঘোষণা করিতেছেন বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত এই লোক-যাত্রা অব্যাহত রহিয়াছে।

নদীয়ার বিক্রমপুরের অবস্থা অশ্রুত পূর্ব্ব। উহার নাম বা অবস্থা ইতঃপূর্ব্বে অনেকেরই কর্ণগোচর হয় নাই। তবে শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের ও শ্রীমান যতীন্দ্রমোহনের কথায় যতদূর বুঝিয়াছি তাহাতে নদীয়া বিক্রমপুর কোন সময়ে একটা প্রকাণ্ড সহর ছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। অতঃপর

যখন নদীয়া বিক্রমপুর সম্বন্ধে তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত, আলোচিত ও পাঠ উদ্ধারিত হইবে তৎকালে দাখিলী দলিলাত ও প্রমাণ সহ সওয়াল জবাবে আমাদের মনের অন্ধকার একেবারে দূরিভূত হইবে। যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে তাহাতে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস, বাঙ্গালা দেশের প্রত্নতত্ত্ব এবং বাঙ্গালা দেশের তাম্রশাসন গুলি প্রতি পল্লীতে পল্লীতে একই বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগকে "ধাঁধায় ফেলিয়া দিবে এই একটা ভয় হইতেছে।

আমাদের সন্দেহ গুলির একদেশ মাত্র পাঠক মহাশয়দিগকে জানাইয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। বারান্তরে এ বিষয় নিয়া পাঠকবর্গকে ক্লেশ দেওয়ার একটা বলবতী বাসনা রহিয়া গেল।

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

---

# গান।

নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সইতে নারি বোঝার ভার,
( আমার ) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে ওঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার!
সেই যে শিরে মোহন চূড়া
সেই যে হাতে মোহন বাঁশী
সেই মুরতি হেরব বলে
পরাণ আজি অভিলাষী।
বাঁকা হ'য়ে দাঁড়াও হে
আলো করি কুঞ্জ-দুয়ার
এস আমার পরশ-মাণিক
বেদ-বেদান্তে কাজ কি আর!

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

# প্রহেলিকা।

—:-০-:—

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

—সহরের সদর রাস্তার ধারে ঐ যে লাল পাকা বাড়ীটী, উহাতে পরেশচন্দ্র ও বিজয়কুমার বাস করে। চন্দ্রনাথ বাবু যখন এখানে কার্য্যোপলক্ষে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন বাটীটি ক্রয় করিয়াছিলেন।

তিনি বিদেশেই বৎসরের অধিকাংশ সময় কর্ত্তন করিতেন। স্বগ্রাম নয়ানপুরে বড় যাওয়া ঘটিয়া উঠিতনা। সহরের বাটীটী ক্রয়ের পর হইতে বন্ধোপলক্ষে এখানেই আসিয়া বাস করিতেন। অনেকদিন হইতে স্বগ্রামের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তাহার নিকট সেখানকার জীবন বিশেষ প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইত না।

পরেশচন্দ্রের ক্ষুদ্র সংসার। সে, তাহার স্ত্রী অনুপমা—বিজয়ের স্নেহময়ী, মধুরভাষিণী বধূঠাকুরাণী—ও তাহাদের একমাত্র পুত্র ও কন্যা এবং বিজয়। তাহা ব্যতীত, রান্না করিবার জন্য বামনঠাকুর এবং একটী ভৃত্য।

বাড়ীটী দ্বিতল ও বড়। বাহির বাটীর নীচের তালায় একপার্শ্বের কক্ষে বিজয়ের পড়িবার ও শয়নের স্থান।

সন্ধ্যাকাল। ভৃত্য এইমাত্র সে গৃহে প্রদীপ জ্বালাইয়া গেল। গৃহাভ্যন্তরে ঐশ্বর্য্যের কোনও চিহ্ন নাই কিন্তু সবই এমন পরিপাটীরূপে ও শৃঙ্খলতার সহিত সজ্জিত, যে দেখিলে মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতে দক্ষিণপার্শ্বে একখানা তক্তপোষ। তাহার উপর একখানা সতরঞ্চি। তদোপরি, শুভ্র ধপ্ধপে একখানা বিছানার চাদর। একপার্শ্বে শুভ্র ওয়াড় সংযুক্ত একটী বালিস। বিছানার উপরে, একখানা নানারংবিশিষ্ট কম্বল বিস্তৃত। উপরে, একটী পরিষ্কার, চিকণ কাপড়ের মশারি।

তক্তপোষের অনেকটা সিধাসিধি দেয়ালের সম্মুখে একটী সেল্ফ। তাহার ভিতর অতি সুন্দররূপে বাঁধান কতিপয় গ্রন্থ শোভা পাইতেছে। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে পুস্তকগুলি সাজাইবার ভিতর বিশেষ একটী নিয়ম রক্ষিত হইয়াছে—পৃথিবীর মহাদেশানুসারে পুস্তক সমূহ কয়েক ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ও দ্বিতীয় সারিতে, মানবের আদি সভ্যতার বিশেষ নিদর্শন হিন্দুর চতুর্ব্বেদ, জ্ঞানভাণ্ডার উপনিষদ সমূহ, ষড়দর্শন এবং শ্রীমদ্ভাগবতগীতা। তৎপরে প্রেম ও জ্ঞানের অবতার শ্রীমৎ বুদ্ধদেবের পুণ্যকাহিনী সম্বলিত ত্রিপিটক, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবৎ, শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, মৃচ্ছকটিক, উত্তররামচরিত, কিরাতার্জ্জুনীয়, নৈষধচরিত, ভারতের গৌরব জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ পাণিনি, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য এবং মাধবাচার্য্যের বেদান্ত সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী মহাত্মা নানকের ও শিখগুরুগণের আখ্যায়িকায় ও উপদেশে পূর্ণ গ্রন্থ সাহেব, জৈনমহাজনগণের কাহিনী ও উপদেশ সম্বলিত গ্রন্থাদি, প্রেমিক কবীর ও তুকারামের দোঁহাবলী ও পদাবলী, মহাপ্রভু চৈতন্তের ভক্তি-মধুর অপূর্ব্ব জীবনী, বর্ত্তমান ভারতের সাম্য মন্ত্রের প্রধান উপদেষ্টা ও প্রচারক জ্ঞান-গরিয়াণ রাজা রামমোহন ও মহানুভব কেশবচন্দ্রের জীবনচরিত ও গ্রন্থাবলী, রাজপুতবীরগণের বীরত্বকাহিনীতে পূর্ণ রাজস্থান, ভক্তি ও প্রেমের মহা কবিত্রয় বাঙ্গালার মুকুটমণি জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী ও নব্যবঙ্গের বিজয়স্তম্ভ অমরকবি মধুসূধনের মেঘনাদ বধ কাব্য। উপরোক্ত গ্রন্থনিচয়ের পর পারসিকগণের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ জেন্দাভেস্তা, চীনদেশের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক লাওটজির ও কনফিউসিয়াসের রচিত গ্রন্থ সমূহ, মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের অপূর্ব্ব প্রেমের কাহিনী ও উপদেশ পূর্ণ বাইবেল, পুরুষশ্রেষ্ঠ হজরত মহম্মদের প্রচারিত কোরাণ, ফার্দ্দশী, সাদি, হাফেজ, ওমার খৈয়মের কাব্যগ্রন্থাবলী এবং কবিত্বের অনন্তভাণ্ডার জগদ্বিখ্যাত আরব্যোপন্যাস।

তৃতীয় ও চতুর্থ তাক যুড়িয়া ইয়ুরোপীয় লেখকগণের রচিত গ্রন্থাবলী। তাহাদের সর্ব্বাগ্রে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদিকবি হোমারের ইলিয়াড ও ওডেসি শোভা পাইতেছে। তাহার পরে, ভার্জ্জিলের ইলিয়াড, বিয়েট্রিস-প্রেমবিভামণ্ডিত দান্তের ধর্ম্ম ও প্রেমের উৎস ভুবনখ্যাত ডিভাইন কমেডি। তৎপরে, সক্রেটিস প্লেটো, এরিষ্টটল অন্যান্য গ্রীকদার্শনিকগণের জীবনী ও গ্রন্থাদি, এস্কাইলিস,

সফক্লিস ও ইয়ুরোপাইডিসের নাটক ও কাব্যসমূহ, প্লুটার্কলিখিত গ্রীক বীরগণের অপূর্ব্ব জীবনীসংগ্রহ,সেনেকা, এপিকটেটাস ও মার্কাস অরেলিয়াসের নীতিমূলক গ্রন্থত্রয় এবং প্রেমিক পেট্রার্ক, এরিয়ষ্টো ও টেসোর কাব্য গ্রন্থাদি। তৎপরে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব সেক্ষপীয়রের নাটকসমূহ, মার্লোর ফষ্ট, স্পেন্সারের মধুর ফেয়ারীকুইন, শক্তির উপাসক মহাকবি মিলটনের শক্তির আধার পেরেডাইজ লষ্ট ও পেরেডাইজ রিগেইণ্ড, মনটেশ, ডেকার্ট, কেণ্ট, হিগেল, দেবচরিত্র স্প্যাই-নোজা, সোপেনহর, বেকন, বার্কলি, হিউম, মিল, কম্পটে প্রণীত নীতি ও দর্শন শাস্ত্র সমূহ। তাহার পর, নিউটনের প্রিন্সিপিয়া, যুগাবতার রুসোর ছোসিয়াল কণ্ট্রাক্ট, ফোরিয়ার, সেণ্টসাইমন হেন্‌রি জর্জ্জ ও কার্ল-মেক্স লিখিত সমাজনীতি-মূলক গ্রন্থাদি, এমিয়েলের জার্নেল, বিবর্ত্তনবাদের প্রবর্ত্তক ডারউইন স্পেন্সার ও ওয়ালেসের পুস্তকাবলী, রেসিন ও মলিয়ারের নাটক সমূহ, বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক জার্ম্মেনকবি গেটের ফষ্ট এবং সিলারের লিখিত উইলিয়াম টেল, কিট্‌স, বাইরণ, কোলরিজ, টেনিসন ও ব্রাউনিংদম্পতীর কবিতানিচয়। ইহার পর স্কটের উপন্যাসাবলী, ডিকেন্সের পিকউইক পেপার, থেকারির ভেনিটি ফেয়ার, জর্জ্জ ইলিয়াটের রমোলা ও এডাম বিড, হিগোর লা মিজারেবল সার্লটি ব্রন্টির জেন আয়ার, টলষ্টয়ের রিছারেকসন, জোলার ডাউনফল, বসওয়েল লিখিত জনসনের, মূর লিখিত বাইরণের এবং লথার্ট লিখিত স্কটের জীবনচরিত এবং অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থ।

তাহার পরে নব্য আমেরিকার দার্শনিক ও পণ্ডিত প্রবর এমার্সনের গ্রন্থাবলী এবং লংফেলো, লাউএল ও হোমসের দুই চারিখানি বহি।

বিজয় বহুযত্ন করিয়া, বহুলোকের সহিত পরামর্শ করিয়া, এই পুস্তক সমূহ ক্রয় করিয়াছিল। সকল পুস্তকই অতি সুচারুরূপে বাঁধান।

এই গ্রন্থসমূহ তাহার কত না আদরের ও গৌরবের সামগ্রী ছিল। কথায় কথায় সে তাহাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আনন্দকে বলিত, উহারাই মূর্ত্তিমান দেবতা। মনে করে দেখ, যে দেশ ও যে জাতিতে সাহিত্যের আবির্ভাব হয় নি; তার কি দুরবস্থা। বড় দুঃখের বিষয়, এমন প্রকাণ্ড মহাদেশ আফ্রিকার নিগ্রোজাতির রচিত একখানা গ্রন্থ ও ইহাদের মধ্যে নাই। দক্ষিণ আমেরিকারও কোন জাতির নাই, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদির ও নাই। কি

অজ্ঞানান্ধকারের ভিতরই না তারা ডুবে আছে। তাদের এ দুর্দিন কি মোচন হবার নয়?

একদিন সুধীর বাবু প্রফেসার বিজয়দের গৃহে বেড়াইতে আসিয়া ঐ সেলফটীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঐ বইগুলি যে তোমার মাথার কাছেই রেখেছ, মাঝে মাঝে শুয়ে পড় বুঝি?

সুধীর বাবুর অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাতি ছিল। তাহার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিতে বিজয়ের প্রথমটা বড়ই সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ হইতেছিল। শেষে যখন দেখিল, সকল কথা খুলিয়া না বলিলে তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না, তখন সে উত্তর করিল, "হাঁ মাঝে মাঝে উহার দুই একখানা পড়ি। তবে প্রায়ই বুঝে উঠতে পারিনা। (একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া) বলতে গেলে, আরো একটি উদ্দেশ্য আছে।

বলিতে বলিতে সে লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল।

সুধীর বাবু ঈষৎ হাসিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, বল না, লজ্জা কি?

সে বলি বলি করিয়া দুই একবার আম্‌তা আম্‌তা করিয়া অবশেষে বলিতে লাগিল, ঐ পুস্তক গুলিতে পৃথিবীর যত মহাজনগণের অমর কাহিনী মিশে রয়েছে। মনে হয়, তাঁদের কাছে থাক্‌লে, তাঁদের সংস্পর্শে আমার প্রাণে নূতন শক্তি পাব, আমার আত্মা পবিত্র হবে, জ্ঞান ও প্রেমে আমার জীবন ফুটে উঠ্‌বে। সেই জন্যই পুস্তক কয়েকখানাকে ওখানে রেখে দিয়েছি, যেন প্রতি নিশ্বাসে তাঁদের ভাব আমার প্রাণে প্রবেশ করে, তাকে পুষ্ট ও সঞ্জীবিত করে তোলে।

সেই মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সে আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ সুধীর বাবুর চখে চখে পড়িয়া গেল এবং সে লজ্জায় মাথা নোয়াইল।

তিনি আবার সাদরে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, তোমায় দীর্ঘজীবী করুন। তোমার দ্বারা দেশের মহা মঙ্গল সাধিত হবে।

তাঁহার উৎসাহসূচক বাণী শুনিতে শুনিতে বিজয়ের মুখকমল ফুল্ল শতদলের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিল এবং তাহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় আরও উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল।

ঐ সেল্‌ফটীর দুইদিকে পাশাপাশি আরও দুইটা সেল্‌ফ। দুইটাই বিবিধ পুস্তকাবলীতে সজ্জিত।

কক্ষটীর বামপার্শ্বে একটী বড় জানালা। উহা তক্তপোষটীর অনেকটা সিধাসিধি ভাবে অবস্থিত। ঐ জানালাটীর বরাবর প্রকোষ্ঠটীর অপর দিকে আর একটী জানালা। খুলিয়া দিলে, ঘরে ফুর্ ফুর্ করিয়া বাতাস আসে ও আলোক-রশ্মিতে তাহা ভরিয়া উঠে।

ঘরে প্রবেশ করিবার দরজার বামদিকে উপরে দেয়ালের গায়, বড় একখানা দর্পণ, তাহার নিম্নে ছোট একখানা কাঠের ব্রাকেটের উপর চিরুণী ও ব্রাস। সেই দর্পণের কতকটুকু উপরে বন্ধুযুগলের ফটোগ্রাফ, একে অন্যের স্কন্ধে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ম্লানমুখ আনন্দমোহনের পাশে জ্ঞানদীপ্ত, উজ্জ্বলনয়ন, বিজয়ের সহাস্যবদন অতি সুন্দর দেখাইতেছে।

প্রকোষ্ঠের আর একপাশে বড় একটী জানালা। তাহার সম্মুখে বিজয়ের পড়িবার টেবিল, চেয়ার। তাহার উপর, একদিকে কলমদানিতে দোয়াত কলম, অন্যদিকে পাঠের কয়েকখানা পুস্তক, ছোট রেক্‌টীর উপর পরিপাটিরূপে সজ্জিত। পার্শ্বস্থিত বামদিকের দেয়ালের গায়, সেল্‌ফের ভিতর ক্লাসের পড়ার বই ও ডিক্‌সেনারী ইত্যাদি অন্যান্য গ্রন্থ। সম্মুখস্থ দেয়ালে পৃথিবীর একখানা মানচিত্র ঝুলান, তাহার নিম্নে ছোট একখানি ব্রাকেট। তাহার উপর সুন্দররূপে বাঁধান একখানা পুস্তক, উহা বিজয়ের ডায়েরী। তাহারই পার্শ্বে দেয়ালের গায় তাকের উপর ছোট এলার্ম ঘড়ীটি টীক্ টিক্ করিতেছে।

বিজয় মাঝে মাঝে ডায়েরী হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করিয়া আনন্দকে শুনাইত। প্রথম প্রথম দুই একদিন আনন্দ বলিয়াছিল, তেমন বড়লোক হতেম তো ডায়েরী রাখ্‌তেম। ভাই! আমাদের যে জীবন, আমাদের আবার ডায়েরী।

তদুত্তরে বিজয় বলিয়াছিল, কেন, আমরা ছোট লোক হলেম কিসে? আমরাও যে বড় লোক হব না, তার প্রমাণ কি? আমাদের জীবন কি জীবন নয়? যারা পৃথিবী ভরে একটা হৈ চৈ করে গেছে, তারাই একমাত্র মানুষ, আর তো কোটী কোটী লোক তাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর অহরহ জ্ঞান, গুণ, দয়া দাক্ষিণ্যের পরিচয় দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাহার কিছু নয়? এখন যদি

বল,তা হলে আমি বল্‌ব এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বালুকণা হতেও ক্ষুদ্রতর তোমার কথিত বড় লোকই বা কি? যার যার জীবন তার তার কাছেই অমূল্য। অহরহ জীবনের তুচ্ছতার কথা ভেবে, কার্য্যকরার প্রবৃত্তিটাকে লোপ করার দরকার কি? তাতে লাভ কিছু নাই, বরং অনিষ্ট যথেষ্ট।

এই ডায়েরিটার কল্যাণে বিজয়কে পরীক্ষার সময় রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে হয় নাই। সে আনন্দকেও তাহারই মত পূর্ব্ব হইতে কার্য্যানুসারে সময় বিভাগ করিয়া পাঠে প্রবৃত্ত হইতে বলিত। কিন্তু, তজ্জন্য যে মানসিক বলের প্রয়োজন, তাহা তাহার ছিল না। মাঝে মাঝে বিজয় হইতে তাড়না খাইয়া, সে তাহার মতানুসারে চলিতে চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রতিবারই বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছে। ভাবের বন্যায় যখন তাহার প্রাণ পরিপ্লুত হইয়া উঠিত, তখন সে সর্ব্ববিধ নিয়ম ভুলিয়া যাইত। সে সময়, তাহার নিজের উপর, তাহার কোন ক্ষমতাই থাকিত না।

কক্ষের মেজটা সিমেণ্ট করা। চক্‌চকে আলনার উপর শুভ্র কাপড় কয়খানা ও পিরাণ চাদর ঝুলিতেছে, চক্‌চকে টেবিল ও সেল্‌ফের উপর পুস্তক সমূহ সুবিন্যস্ত ভাবে রহিয়াছে, তাহারই কিয়দ্দূরে শুভ্র ধপ্‌ধপে বিছানাটী, দেয়ালের গায়ে বন্ধুদ্বয়ের হাস্যময় মূর্ত্তি, কেমন যেন একটা মধুর সৌন্দর্য্যেরভাব ক্ষুদ্র কক্ষটার ভিতর ছড়াইয়া রহিয়াছে! রজনীতে আলোক-সম্পাতে তাহা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত।

ক্রমশঃ

---

# ভাগ্যকুলের কুণ্ডু পরিবার (৩)

গুরুপ্রসাদ রায়ের দুই পুত্র মথুরামোহন ও প্যারীমোহন উত্তর কালে শিক্ষা, জ্ঞান ও দানশীলতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মথুরামোহন পরম ধার্ম্মিক ও দয়াশীল ছিলেন। তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগকেও কটুকথা বলিতেন না। তিনি ইংরেজী, বাঙ্গালা এবং পার্শী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের ব্যাখ্যাদি বিশদ রূপে করিতে পারিতেন। ১২৭৩ সালে যে বার ব্রহ্মপুত্রে বুধাষ্টমী যোগ হয়, সেইবার তাঁহার পালা ছিল, তদুপলক্ষে যাতায়াতে পঞ্চাশ হাজারের উর্দ্ধ লোককে পাঁচ ছয় রকমের সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, চিনি এবং বালকদিগকে দুগ্ধ দিয়া তৃপ্তি মতে ভোজন করাইয়াছিলেন। একদিন রাত্রিযোগে সেই সময় বৃহৎ ঝড় হওয়ায় তিনি পাগলের ন্যায় বাহির হইয়া সমস্ত অতিথিদিগকে সরিকগণ ও গ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয়গণকে অনুরোধ করিয়া গৃহমধ্যস্থিত দালান ও গ্রাম্য বিশিষ্ট লোকদিগের বাড়ীতে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এইরূপ নানা গুণে তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট উদার চরিত লোক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা প্যারীমোহন ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ প্রাজ্ঞ ছিলেন; এজমালী সময়ে জমিদারী কার্য্যের ভার তাহার উপরেই ন্যস্ত ছিল। তিনি এক পুত্র ও কন্যা রাখিয়া অতি অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহার পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায়। ইনি হাইকোর্টের একজন এটর্ণী।

চৈতন্যদাসের তিন পুত্র কিশোরীমোহন, গোপীমোহন এবং বৈকুণ্ঠ-মোহন। তন্মধ্যে কিশোরীমোহন ও গোপীমোহন উভয়েই বিশেষ ধর্ম্মশীল লোক ছিলেন। বৈকুণ্ঠমোহন অসাধারণ বুদ্ধিজীবি লোক ছিলেন এবং তাঁহারি চেষ্টায় উঁহারা নিজে বহু জমিদারীর মালিক হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তেজারতি কারবার দ্বারা তিন ভাই বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠমোহন অত্যন্ত মোকদ্দমাপ্রিয় লোক ছিলেন বলিয়া মামলা মোকদ্দমায় বহু টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। গোপীমোহনের পোষ্য পুত্র গিরিধারী রায় অতি অল্প বয়সেই

মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। তাঁহার উইলে ঢাকা জেলার হিন্দু বিধবাদের সাহায্যার্থ ৪০,০০০, টাকা এবং সেরাজদিখাঁ গ্রামে দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য আরও চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

কিশোরীমোহন, গোপীমোহন, ও বৈকুণ্ঠমোহন রায়ের মাতৃ শ্রাদ্ধে রূপার দান-সাগর, বৃষোৎসর্গ, একদৃষ্ট ইত্যাদি উৎকৃষ্ট রূপে সমাধা করিয়াছিলেন এবং ৪০০ চারিশত পণ্ডিতকে ৪০৲ চল্লিশ টাকা সহচাবে দান এবং বিদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে জুরিশাল দেওয়া হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে জুরি শাল দেওয়ার প্রথা রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুরই সর্ব্ব প্রথম প্রচলন করেন ঐ রীতিই অতঃপর অন্যান্যে অনুকরণ করেন।

এতদ্ব্যতীত অলীক ব্রাহ্মণ এবং কাঙ্গালীকে নানাবিধ মিষ্টান্ন দিয়া ভোজন করান এবং প্রত্যেককে এক একখানি করিয়া বস্ত্র আর সাধারণ ব্রাহ্মণকে ২৲ দুই টাকা এবং বোবা, কালা, অন্ধ, আতুরদিগকে ৪৲ চারি টাকা হারে দেওয়া হয়।

তৃতীয় ভ্রাতা চৈতন্যদাসের তিন পুত্র কিশোরীমোহন, গোপীমোহন এবং বৈকুণ্ঠমোহন। হরিপ্রসাদ অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ন। হরিপ্রসাদের বিধবা পত্নী পতির আদেশানুসারে আনুমানিক ১২২৭ কিংবা ১২৩০ সনে হরলাল রায়কে পোষ্য পুত্র রূপে গ্রহণ করেন। হরলাল অকালে কাল-কবলে নিপতিত হন।

তাঁহার বিধবা পত্নী পতির আদেশানুসারে ১২৭১ সনে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন—সেই পুত্রই দেশ-বিখ্যাত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়। যখন এই পরিবার পৃথগান্ন হ'ন, তখন গুরুপ্রসাদ কলিকাতাতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ঐ সংবাদে এতদুর মর্ম্মাহত হ'ন যে আর কখনও বাড়ীতে ফিরিয়া যান নাই। এইরূপ ভাবে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি চিরদিনের জন্য বৈষ্ণবদিগের পবিত্র তীর্থ শ্রীবৃন্দাবন ধামে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। গুরুপ্রসাদের বৃন্দাবন যাত্রার অব্যবহিত পরে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রেমচাঁদ রায় জ্বর ও আমাশয় রোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হ'ন। তাঁহার মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী বিবেচনা করিয়া কালীপাড়ার জমিদারবর্গ এবং লৌহজঙ্গের পাল বাবুগণ ও অন্যান্য বিক্রমপুরস্থ ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহাকে

শেষ দেখা দেখিতে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে ঢাকার সিভিল সার্জ্জন সিম্‌সন সাহেবের খুব নাম ও খ্যাতি ছিল। প্রেমচাঁদ রায়ের পুত্রগণ সিম্‌সন সাহেবকে ভাগ্যকূল আনিবার জন্য ঢাকায় লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিম্‌সন সাহেব আসিতে না পারিয়া তাহার বন্ধু রেজিমেণ্টের ডাক্তার হোয়াইট সাহেবকে ভাগ্যকূল প্রেরণ করেন। দৈনিক একহাজার টাকা ভিজিটে হোয়াইট সাহেব ভাগ্যকূল আসিয়া মাত্র একদিন একরাত্রি ছিলেন। তিনি রোগীকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ঢাকা লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। পিতৃ ভক্ত রাজা শ্রীনাথ রায় ডাক্তার সাহেবের আদেশানুযায়ী পিতা প্রেমচাঁদকে ঢাকা লইয়া যান,ডাক্তার সিম্‌সনের সুচিকিৎসায় একমাস মধ্যেই সম্পূর্ণ রূপে রোগ মুক্ত হন। রোগ মুক্ত হইয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া কয়েক মাস ভাগ্যকূলে অবস্থান করেন তৎপর সপরিবারে কলিকাত যাত্রা করিলেন।

১৮৭১ খৃঃ যে ভয়ঙ্কর ঝড় ওতুফান হয় তাহার অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে মাত্র তিনি নিরাপদে কলিকাতা পৌছিতে পারিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ কলিকাতা হইতে একবার জন্মের মত স্বীয় স্নেহময় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। গুরুপ্রসাদ প্রেমচাঁদে প্রমুখাৎ ভ্রাতুষ্পুত্র হরলালের মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাহার নিকট এই শোক-সংবাদ অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক হইয়াছিল। কিছুদিন বৃন্দাবন থাকিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ-বন্দনা করিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। এ যাত্রায় তিনি জয়পুর, ভরতপুর, রাধাকুণ্ড প্রভৃতি হিন্দুর পরম পবিত্র পুণ্য তীর্থ সমূহ দর্শন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় গুরুপ্রসাদ স্নেহময় সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিদায় দিতে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন প্রেমচাঁদ ও বালকের ন্যায় অশ্রু-[illegible] করিতে করিতে অগ্রজের চরণ বন্দনা করিয়া বৃন্দাবন ধাম পরিত্যাগ করিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রেমচাঁদের শকট দেখা যাইতেছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি একদৃষ্টে শকটের দিকে চাহিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ তীর্থ ভ্রমণের পর কলিকাতায় আসিয়া এক বৎসর অবস্থান করেন, তৎপর ১২৭২ সনের আশ্বিন মাসে ভাগ্যকূল প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১২৭২ সনের অগ্রাহয়ণ মাসে গুরুপ্রসাদ শ্রীবৃন্দাবন ধামে মানব-লীলা সংবরণ করেন। এই সংবাদ কয়েক দিন পরে ভাগ্যকূল পৌছিল, সেসময়ে ভাগ্যকূলে কোন

দানবীর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়,

জমিদার— ভাগ্যকুল।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

টেলিগ্রাফ আফিস ছিলনা। নারায়নগঞ্জের গদী হইতে এই দুঃসংবাদ বহন করিয়া লোক ভাগ্যকূল গিয়াছিল। বেলা প্রায় এক ঘটিকার সময় এই দুঃসংবাদ প্রেমচাঁদ এবং গুরুপ্রসাদের পুত্রদ্বয় জ্ঞাত হইল। এই সংবাদে প্রেমচাঁদ এবং গুরুপ্রসাদের পুত্রদ্বয় বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। তাহার মৃত্যু-সংবাদে কেবল যে ভাগ্যকূলবাসীর শোকের কারণ হইয়াছিল তাহা নহে, সমগ্র বিক্রমপুর বাসী এই দুঃসংবাদে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। গুরুপ্রসাদ প্রকৃত পক্ষেই দেশের একজন গৌরব স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার দানশীলতা, বিষয় কার্য্যে পারদর্শিতা বস্তুতঃই দেশবাসীর গৌরবের কারণ ছিল।

১২৭২ সালের পৌষ মাসে ইহার শ্রাদ্ধ কার্য্য মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। পূর্ব্ব বঙ্গে এইরূপ ব্যয়-বাহুল্য পূর্ণ শ্রাদ্ধ অতি অল্পই হইয়াছে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার নানা জিলার সুবিখ্যাত পণ্ডিত বর্গ এই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ইহাদের সংখ্যা অন্যূন পাঁচ শত হইয়াছিল। পাথের ব্যতিরেকে পাণ্ডিত্যানুযায়ী একশত হইতে দুইশত টাকা পর্য্যন্ত বিদায় দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক পণ্ডিতকে ৪০৲ হারে বিদায়, গরদের জোর বহু সংখ্যক কাঙ্গালী দিগকে ২৲ টাকা ও ৪৲ টাকা দেওয়া হয়। সাধারণ কাঙ্গালীদিগকে ১৲ এক টাকা এবং বোবা ও অন্ধ আতুর দিগকে ২৲ দুই টাকা দেওয়া হয় ও নানাবিধ মিঠাই সন্দেশ ইত্যাদি দিয়া প্রায় বিশ হাজার লোককে পরিতোষ মতে আহার করান হইয়াছিল।

মথুরামোহনের মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ও উপরোক্ত রূপ রূপার দান সাগর, বৃষোৎসর্গ, একবৃষ্ট, ষোড়শ ইত্যাদি হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

# বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ।

## কনকসার (২)

দীঘির দক্ষিণ পারস্থ ব্রাহ্মণ বসতির দক্ষিণ ভাগে খালের উত্তর পারে "নিদান ক্ষেত্র" নামে একটী স্থান আছে ; ঐ স্থানে বহু পুরাতন অথচ অনতি বৃহৎ একটী হিজল বৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রত্যেক বৎসর পৌষ মাসের শেষ শনিবার এখানে একটী মেলা বসিয়া থাকে। কনকসারস্থ ও চতুঃপার্শ্বস্থ বহু লোক সে সময়ে মেলায় সমবেত হইয়া থাকে। জনসঙ্ঘের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। মেলায় নানাবিধ সাধারণ প্রকারের জিনিষ পত্র খরিদ বিক্রী হইয়া থাকে। মেলার বিশেষত্ব এই যে মেলার দিন মেলায় যাত্রিগণ পারাবত উৎসর্গ করিয়া উড়াইয়া দেয়। উড্ডীয়মান পারাবত ধৃত করা উপলক্ষে সময় সময় বাদ-বিসম্বাদ এবং কখন কখন হস্তাহস্তি দণ্ডাদণ্ডিও হয়। এই নিদান ক্ষেত্রের সংলগ্ন দক্ষিণ ভাগ খালের স্রোত-বেগে কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং তত্র স্থানে মৃত্তিকা প্রোথিত ভগ্নাবশিষ্ট কতকগুলি ছোট ছোট ইষ্টক বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এতদ্ভিন্ন দীঘির দক্ষিণ পাড়ের কোন কোন স্থানে খনন উপলক্ষে ইষ্টক স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বারা বুঝা যায় বহু পূর্ব্বে কোন ধনাঢ্য লোক এখানে বাস করিতেন এবং বাসোপযোগী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল গৃহ কাল সহকারে ভগ্নস্তূপে পরিণত ও মৃত্তিকা প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।

দীঘির পশ্চিম পাড়ের মধ্য ভাগে পরলোক গত চন্দ্রমণি চট্টোপাধ্যায় ও পরলোক গত কালীকমল চট্টোপাধ্যায় ও হরিপ্রসাদ ও গৌরীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর উত্তর ভাগে এক ঘর কায়স্থ এবং দক্ষিণ ভাগে কয়েক ঘর জালজীবি বাস করিতেছে। চন্দ্রমণি চট্টোপাধ্যায় এক জন কর্ম্মক্ষম লোক ছিলেন। ইনি কয়েক বৎসর পরমিটে অর্থাৎ গভর্মেণ্ট লবণ বিভাগে দারোগা গিরি কর্ম্ম করিয়া প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া ; সেই অর্থ নানা শুভকার্য্যে ব্যয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন; তাহার প্রপৌত্র শ্রীমান

অমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, রাজসাহী কলেজের জনৈক প্রফেসার। কালীকমল চট্টোপাধ্যায় বহুকাল স্কুল ডিপুটী ইনিস্পেকটরি কর্ম্ম করিয়া পেন্সন ভোগান্তে, একমাত্র পুত্র উত্তরাধিকারি বর্ত্তমান রাখিয়া কয়েক বৎসর হয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত রামকমল চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান আছেন। রামকমল একজন কৃতবিদ্য সৎসাহসী জন-প্রিয় লোক। দীঘির দক্ষিণ পাড়ের অতি পূর্ব্বভাগে মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তৎ ভ্রাতা রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী। মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় বহুদিন পণ্ডিতি কার্য্য করিয়া বৃদ্ধ বয়সে বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমান সময়ে সেটেলমেণ্ট ডেপুটী। খালের সংলগ্ন উত্তর পাড়ে, দীঘীর অনতি দূর পশ্চিম দিকে ২।৩ বৎসর হইল একটী দাতব্য-চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং বহু লোক তদ্দারা উপকার লাভ করিতেছে। এই চিকিৎসালয় সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ও ব্যয় বহন কর্ত্তা দীঘীর পাড় নিবাসী ময়মনসিংহ জামালপুরের উকীল শ্রীযুত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার মাতার নামে চিকিৎসালয়টী চলিতেছে। শশি বাবু কায়মনোবাক্যে উদ্যোগ ও সমধিক ব্যয় বহন না করিলে চিকিৎসালয়টী সংস্থাপিত হইবার কোনই সম্ভাবনা ছিলনা। শশি বাবু সর্ব্ব সাধারণের ধন্তবাদার্হ সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসালয়টী সর্ব্বতোভাবে ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের কর্তৃত্বাধীন।

দীঘির পাড়ের পশ্চিমদিকে "পুরাণ বাড়ী" বা পুরাণ পাড়া এবং উত্তর পশ্চিম ভাগে "নয়া পাড়া" বা নয়াবাড়ী"। আচার্য্যসাগরী মেলের ৺রামদাস এবং রামনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষ পুরাণ বাড়ীতে বাস করিতেন। ইহারা অভগ্ন আচার্য্য সাগরী মেলের কুলীন ছিলেন কথিত আছে, কনকসারের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বংশের জনৈক বংশজ ব্যক্তি তাহার কন্তারত্নকে অভগ্ন কুলীন রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ-সূত্রে অর্পণ করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে রামদাস ও তাহার হিতৈষীবর্গ তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। প্রস্তাবকারী ইহাতে নিতান্ত অবমানিত ও সংক্ষুদ্ধ হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন ছলে বলে যে প্রকারে হউক, এই অবজ্ঞার প্রতিশোধ এবং রামদাসকে কন্তা-সম্প্রদান করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন।

যে সময়ে জ্যোতিষী বংশ ধনে জনে ও বলে নিতান্ত প্রতাপান্বিত ছিলেন। কন্যাকর্ত্তা ও তৎপক্ষীয় লোকজন রামদাসের অনুসন্ধানে রহিল; কোন মতে তাহাকে ধরিতে পারিলে তাহার অনিচ্ছাসত্বেও তৎকরে কন্যারত্ন সম্প্রদান করিবেন। দৈব ঘটনা ক্রমে একদিন রামদাস প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিতে একক মাঠে উপস্থিত হন, কন্যা পক্ষীয় লোক সেই সুযোগে রামদাসকে ধৃত করিয়া বাড়ী লইয়া যায় এবং সেই রাত্রেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। এইরূপে রামদাস অভগ্ন অবস্থা হইতে ভগ্ন কুলীনত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু তৎ ভ্রাতা রামনাথ পূর্ব্ববৎ অভগ্ন কুলীনই থাকেন। রামদাস অনিচ্ছা সত্বেও বংশজ কন্যা গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কন্যা কর্ত্তা তাহাকে ধনে ও ভূমিতে অনুরূপ যৌতুক প্রদানে পুরস্কৃত করিতে ত্রুটী করেন নাই। এই কন্যার গর্ভে রামদাসের ঔরষে ক্রমান্বয়ে ৬টী পুত্র জন্মে। এই পুত্রগণ ও তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণ সহ ভ্রাতা রামনাথের সহিত একত্র এক বাড়ীতে বাস করা নিতান্ত অসুবিধা ও কষ্টকর বিবেচনা করিয়া রামদাস এক নূতন বাড়ী পত্তন করেন এবং তথায় পুত্রগণ সহ বাস করেন। এই নূতন বাড়ীই ইদানীং "নয়াবাড়ী" বা নয়াপাড়া নামে খ্যাত। ভ্রাতা রামনাথ হইতে পৃথক হওয়ার সময় রামনাথ সম্পত্তি বিভাগ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ভ্রাতৃ-বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পরস্পর ভাগ বিভাগ স্থলে পৈত্রিক নারায়ণ 'দামোদর চক্র' আনীত হইলে রামদাস নিজভাগে নারায়ণ চক্র গ্রহণ করেন, কথা থাকে ঐ চক্র নিরত 'নয়া পাড়া' থাকিবে কখনো কেহ তাহা পুরাতন বাড়ীতে আনিতে পারিবে না। এই নিয়ম অবিচ্ছেদে এখনো চলিতেছে। দামোদর চক্র আপন অংশে গ্রহণ প্রযুক্ত রামদাস তাহার শ্বশুরদত্ত যৌতুক প্রাপ্ত ভূসম্পত্তির দশ আনা নিজে নেন এবং ছয় আনা ভ্রাতা রামনাথকে প্রদান করেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের সন্তান সন্ততিগণ ঐ রূপে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। রামদাসের ছয় পুত্র নয়াবাড়ীতে ৬টী বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া পৃথক ভাবে ছয় বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন। ইদানীং ঐ ছয় বাড়ী মধ্যে তর্কালঙ্কারের বাড়ী নির্ব্বংশ, ঐ বাড়ী অপর পাঁচ ভ্রাতার সন্তানগণ উত্তরাধিকারী সূত্রে সত্বাধিকারী হইয়াছেন।

রামনাথের সন্তানগণ এইরূপ পুরাণ পাড়ায় দুইটী বাড়ীতে ভিন্ন ভাবে বাস করিতেছে। উত্তরের বাড়ীর ব্রজচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ

পুত্র শ্রীমান দেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ ঢাকা কলেজের সংস্কৃত প্রফেসার এই বাড়ীর জনৈক আংশিক অধিকারি, পুত্র বর্ত্তমান না থাকায় তাহার দৌহিত্র সন্তানগণ উক্ত অংশের অধিকারী হইয়াছেন। কুমিল্লা সদর মুনসেফ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাড়ীর একাংশের মালিক সম্প্রতি পুরোহিত পাড়ায় নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ভিন্ন পুরাণ পাড়ায় সর্ব্বানন্দী মেলের চট্টোপাধ্যায় বংশ বাস করিতেছেন। ৺রামধন চট্টোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় বংশের পূর্ব্ব পুরুষ। রামধন কনকসার গ্রামে বাস স্থাপন করেন। তাহার তিন পুত্র যথা ক্রমে গৌরচন্দ্র, শিবচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র, পূর্ব্বে তাহারা এক বাড়ীতেই বাস করিতেন, পরে লোকাধিক্য বশতঃ এক সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস অসুবিধা জনক বিষয়ে, পাড়ার উত্তর ভাগে তিনটী বাড়ী প্রস্তুত করিয়া, উত্তরের বাড়ীতে কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধ্য বাড়ীতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দক্ষিণের বাড়ীতে গৌরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাস করিতে থাকেন। কৃষ্ণচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র ও আনন্দচন্দ্র নামে তিন পুত্র বর্ত্তমান আছে এবং পৈতৃক বাড়ীতে বাস করিতেছে। আর দুই পুত্রের মধ্যে রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় বহু কাল হইল পিতা ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্ত্তমানে পরলোকে গমন করিয়াছে। অপর পুত্র রামকুমার চট্টোপাধ্যায় তাহারা জীবমানে পৈতৃক বাড়ী ত্যাগ করিয়া বাঘিয়া প্রথম নূতন বাসস্থান স্থাপন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল তথায় বাস করিয়া প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র শ্রীমান হরলাল চট্টোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র চতুষ্টয় বর্ত্তমান রাখিয়া কয়েক বৎসর হইল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। শ্রীমান হরলাল কুমিল্লা জজকোর্টে ওকালতি করিতেছে, ঈশ্বর চন্দ্রের বর্ত্তমান ছয় পুত্র মধ্যে শ্রীমান শশিভূষণ কুমিল্লার জনৈক মোক্তার, অপর পুত্র শ্রীমান বসন্তকুমার ত্রিপুরা কোন গ্রাম্য স্কুলের মাষ্টার। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ঈশানচন্দ্র অপুত্রকাবস্থায় বহুকাল হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। অপর পুত্র আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাসোপযোগী স্থানের অভাব প্রযুক্ত প্রায় ১৫।১৬ বৎসর হইল পৈতৃক ভীটা পরিত্যাগ করিয়া বাঘিয়া গ্রামে নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন। তথায় আনন্দচন্দ্র দুই পুত্র শ্রীমান রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ও পৌত্র পৌত্রি বর্ত্তমান রাখিয়া ৩।৪ বৎসর হয় মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন। শ্রীমান রজনীকান্ত

চাঁদপুরের অনেক উকীল, হরিপ্রসন্ন মাহানাফল জমিদারী কাছারির নায়েব। পিতৃত্যাজ্য নায়েবি পদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে হরিপ্রসন্ন দীর্ঘকাল পোষ্টেল বিভাগে কর্ম্ম করিয়া, এখন পেন্‌সন পাইতেছেন।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

## সোনারঙ্গ (১)

সোনারঙ্গ উত্তর বিক্রমপুরের মধ্যে একটী সুপ্রসিদ্ধ ও বহু জনাকীর্ণ গ্রাম। এখানে বহু শিক্ষিত, গণ্যমান্য ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বসতি। এই গ্রামটী উত্তর বিক্রমপুরের একরূপ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে খিলপাড়া, পূর্ব্বে টঙ্গিবাড়ীর খাল, দক্ষিণে আমতলী ও পশ্চিমে আউটসাহী। এই গ্রামে একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, মধ্যম শ্রেণীর ডাকঘর, (Sub Post Office) টেলিগ্রাফ আফিস ও একটী বড় বাজার আছে। এই গ্রাম প্রাচীন বঙ্গ দেশের রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ রামপালের সীমানার অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রামে দুইটী দেউল বাড়ী আছে। 'দেউল' অর্থে দেবালয় বুঝায়। একটী দেউলবাড়ী সোনারঙ্গের পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত, উহার নিকটেই একটী প্রাচীন দীঘি। দীঘিটী পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত। হিন্দুর খনিত দীর্ঘিকা এইরূপ হয় না। জনসাধারণে ইহাকে 'মোগা' দীঘি কহে। এখন বর্ষার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে উহাতে জল থাকে না, যেখানে থাকে সেই স্থানটী ভীটে ভরা। যে দেউল বাড়ীর কথা বলিতেছি পূর্ব্বে এইখানে প্রচুর পরিমাণে ইষ্টকাদি পাওয়া যাইত। এক্ষণে গ্রাম্য লোকেরা নিজ নিজ প্রয়োজনে ঐ সমুদয় ব্যবহার করায় প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। এই স্থানে একটী সূর্য্য মূর্ত্তি, একটী বিষ্ণু মূর্ত্তি এবং কয়েকটী প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা ও নাকি চাষ করিবার সময় পাওয়া গিয়াছিল। জনশ্রুতি, পূর্ব্বে এই স্থানে একটী বিরাটা-কার দেবমন্দির ছিল, কথাটী অবিশ্বাস করিবার নহে। এখনও এই স্থানে যে

উচ্চ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায় উহা খনন করিলে বহু পুরাতত্ত্বের আলোচনার উপযুক্ত দ্রব্যাদি পাওয়ার সম্ভাবনা।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় :—স্কুলটী গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তে খালের পার বিস্তৃত মাঠের উপর অবস্থিত। এই স্কুলটী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নত হইয়াছে। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়টী তদানীন্তন ঢাকা জিলার স্কুলের ডেপুটী ইন্সপেক্টর স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে স্থাপিত হয়। সেই সময় বিক্রমপুরে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। বৈকুণ্ঠ বাবুর অক্লান্ত চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় প্রভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বিদ্যালয়টী বিক্রমপুরে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিদ্যালয়ের বালকগণের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি কল্পে ও অন্যান্য গ্রাম্যহিত-জনক অনুষ্ঠানের নিমিত্ত " আশা-সঞ্জীবনী " নামক একটী সভাও তিনি স্থাপন করেন। এই সভা যতদিন জীবিত ছিল ততদিন উহা দ্বারা গ্রামের বহু কল্যাণ সাধিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর গ্রাম্য ভদ্র মহোদয়গণের চেষ্টা ও যত্নের অভাবে সভাটী বিলুপ্ত হইয়া যায়। গ্রামের অন্যতম খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত বাবু শশীকুমার সেন বি, এল মহাশয়ের উদ্যোগে এই মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়টী ইং ১৯০০ সালে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইবার পর হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত উহার কার্য্য অত্যন্ত সন্তোষজনক রূপে পরিচালিত হইয়াছিল, কিছু কাল পরে স্বত্বাধিকারীগণের চেষ্টা যত্নের অভাবে বিদ্যালয়টীর অবস্থা দিন দিন হীনতর হইতে থাকে। অবশেষে যখন বিদ্যালয়টী প্রায় ধ্বংসোন্মুখ হয় তখন ঢাকা বিভাগের এসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু হারাণচন্দ্র দাশ গুপ্ত, প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিতাধ্যাপক বাবু হেমচন্দ্র সেন এম, এ ও বাবু অপূর্ব্বচন্দ্র সেন মহাশয়গণ স্বত্বাধিকারীগণের নিকট হইতে বিদ্যালয়টী গ্রাম্য সাধারণের হস্তে নিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা এ প্রস্তাবে রাজী হন না। অবশেষে বিদ্যালয়টী যখন প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হয় তখন বাবু অপূর্ব্বচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টাতে বিদ্যালয়টী পুনরায় নবীন ভাবে গঠিত হইয়া চলিতে থাকে এবং তাহার চেষ্টা ও যত্নেই বর্ত্তমানে বিদ্যালয়টীর পুনঃ শ্রীসাধন হইয়াছে; এই জন্য তিনি গ্রামবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। গ্রামের কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র যুবক

বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে বিশেষ স্বার্থত্যাগ করিয়া অল্প বেতনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এইরূপ স্বার্থত্যাগ বিশেষ প্রশংসনীয় এবং শিক্ষিত যুবক মাত্রেরই আদর্শ স্থল। বাবু অতুলচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বি, এ, তাহার স্বর্গীয় পিতামহ ৺পদ্মলোচন দাশ গুপ্ত, মুন্সেফ মহাশয়ের স্মরণার্থে প্রতি বৎসর একটী রৌপ্য পদক প্রদান করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগীতার ভাব সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাও প্রশংসনীয়। বিদ্যালয়-সংলগ্ন ময়দানে প্রত্যহ বিকাল বেলা স্কুল ও অপরাপর লোকেরা মিলিত হইয়া ফুটবল, ক্রীকেট, টেনিস ও বেড মিনটন ইত্যাদি খেলা করে। আমরা বিদ্যালয়টীর সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল কামনা করি এবং আশা করি গ্রাম্য ভদ্র মহোদয়গণ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

বালিকা বিদ্যালয়—গ্রাম্য বালিকা বিদ্যালয়টী প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ৺বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয়ের পত্নী কর্ত্তৃক উহা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়ে আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষার অধিক প্রচলন ছিল না। লেখা পড়া শিখিলে মেয়েরা 'বাবু' হইবে ও বিধবা হইবে এইরূপ বিশ্বাস জনসাধারণের হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল কিন্তু রায় মহাশয়ের পত্নী ৺শশীকলা দেবীর যত্ন প্রভাবে বিদ্যালয়টীর অবস্থা বিশেষ সন্তোষজনক হইয়া উঠিয়াছিল। মেয়েরা নিম্ন-প্রাথমিক শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পারিত। সেই প্রথম প্রতিষ্ঠাপিত বিদ্যালয়টীর অস্তিত্ব এখন ক্ষীণ ফল্গু ধারার ন্যায় অতি শোচনীয় ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ছাত্রী সংখ্যা অন্যূন ২৫।৩০টী। সোনারঙ্গের ন্যায় প্রসিদ্ধ গ্রামের পক্ষে ইহা আক্ষেপ জনক বলিতে হইবে। বিদ্যালয়টীর উন্নতি কল্পে গ্রাম্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিগণের ঔদাসীন্য বস্তুতই লজ্জার কথা। এই দিকে গ্রাম্য শিক্ষিত ব্যাক্তিগণের মনোযোগ আকর্ষিত হওয়া সঙ্গত। এই বিষয় আমরা "বিক্রমপুর সম্মিলনীর" ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

জনৈক গ্রামবাসী

---

# ফুলের মুকুট।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর। )

সেই বৃদ্ধ বিপত্নীকের হৃদয়ের অন্তস্থলে মাতৃস্নেহের ধারা সিডরিকের জন্য সযত্নে সঞ্চিত ছিল। তিনি মনোযোগ সহকারে ষ্ট্রেডলির সকল কথা শুনিলেন। পুত্রের ভাবী উন্নতির আশা তাহার হৃদয়ে অমৃত-রস সিঞ্চন করিল। আর সিডরিফ, সে নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া ষ্ট্রেড্লির বাক্য-সুধা পান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টি লীনার দিকে আবদ্ধ! কেবল তাহার পিতার মুখভঙ্গী পাঠ করিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে নয়ন ফিরাইতেছিল। তাও ক্ষণিকের জন্ত।

কিয়ৎক্ষণ পরে সিডরিফের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে আপনি একে নিয়ে যেতে চান?"

"কবে কি? এখনই। সময় নষ্ট করা আমার অভিপ্রেত নয়। দুই কি তিন বৎসরের মধ্যেই আমার জীবন-নাট্যের পরিসমাপ্তি হবে। আমার যায়গা পূরণ করবার জন্ত অন্ত একজনের পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত হওয়া দরকার। যদি আমি দেখতে পাই যে আমার অভাব পূরণের জন্য আর একজন প্রস্তুত হয়ে আছে তখন আমি হাস্তমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারব।"

"কিন্তু সময় বড় অল্প। এ অল্প সময়ের মধ্যে সিডরিফ নিয়ে যাবার সমস্ত জিনিষ পত্র যোগাড় করতে পারবে বলে বোধ হয় না। আর তার বয়স অল্প, মাত্র সতের।"

"সে জন্যে চিন্তা কি! জিনিষ পত্রের যোগাড় সহজেই হয়ে যাবে। আর সতের বৎসর ত নেহাৎ কম নয়। শিখবার পক্ষে এই উপযুক্ত বয়স।"

"তা হলে সিডরিফ আর এক বৎসর আমার নিকটে থাকুক।" বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর বেদনাপ্লুত।

সিড়রিফ ক্রোধ-সংবরণ করিতে পারিল না। খ্যাতি অর্জ্জন করিবার এই প্রকৃষ্ট অবসর আর পিতা কিনা তাহা এইরূপে নষ্ট করিয়া ফেলিবে? সে

রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "পিতা!"—সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল ট্রেড্‌লি তাহাকে হাত নাড়িয়া চুপ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।

তিনি পোষ্টমাষ্টারকে বলিলেন "আপনার হৃদয় এত কোমল কেন? শুনুন মহাশয়! আপনার ছেলের কণ্ঠস্বর এত কোমল যে এখন থেকে যদি একে শিক্ষিত না করেন তবে অচিরেই এ স্বর নষ্ট হয়ে যাবে! এরূপ সুযোগ আপনি আর পাবেন না। আর আপনার ছেলের উন্নতির পথে যে আপনি অন্তরায় হচ্ছেন তাতে ঈশ্বরের নিকট পাপেরভাগী আপনিই হবেন। দেরী করে কোন লাভ নাই। আর আপনি বলছিলেন যে আপনার কাজে সাহায্য করবে এ একটা কাজের কথা নয়। এ সাহায্য আপনি পাবেন কিন্তু অন্য রকমে। এমন দিন আস্‌বে যে দিন ঈশ্বরকে এজন্য প্রাণখুলে ধন্যবাদ দিবেন। বুঝেছেন?"

সিড্‌রিফ সজল নয়নে বিনীতভাবে বলিল "আপনাকে কিরূপে ধন্যবাদ প্রদান কর্‌ব জানি না।"

ট্রেড্‌লি বলিলেন "খুব পরিশ্রমের সঙ্গে কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন কর্‌বে। তুমি যে কাজে যাচ্ছ তাতে আলস্য কর্‌লে চল্‌বে না।"

সিড্‌রিফের যাওয়া ঠিক হইয়া গেল। সিড্‌রিফের পিতা ঠিক করিলেন সিড্‌রিফের শিক্ষায় যাহা ব্যয় হইবে তাহা তাহার উপার্জ্জন হইতে সে শোধ করিবে।

ট্রেড্‌লি বলিলেন "তা হলে আর দেরী করোনা সিড্‌রিফ। রাত্রিতে এ রকম গ্রামে থাকলে কত অসুবিধা ভোগ কর্‌তে হবে। আজ রাত্রেই আমরা লণ্ডনে যাচ্ছি তুমি ও আমাদের সঙ্গে চল।"

যখন গাড়ীতে সিড্‌রিফ উপবেশন করিল তখন তাহার স্বপ্নের সাফল্যের বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। বিশেষতঃ অতুলনীয়া সুন্দরী লীনা তাহার বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি সিড্‌রিফের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া মৃদু হাসিতেছিল। সিড্‌রিফ ভাবিতেছিল এই বুঝি স্বর্গ! কিন্তু যে দুঃখিনী ল্যানফেন্‌লি পাহাড়ের পাদদেশে ধূল্যাবলুণ্ঠিত হইয়া যান-চক্র-বিলোড়িত ঊর্দ্ধোত্থিত মণ্ডলাকার ধূলিরাশির দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছিল—তাহার সে চোখে যে কত করুণীয়তা কত স্নিগ্ধতা কত মধুরিমা ছিল তাহা হতভাগ্য অদৃষ্ট-বিতাড়িত

সিড্রিক বুঝিতে পারিল না। কিশোরী কাঁদিয়া বলিল "সিড্রিক যাবার বেলা একবার দেখা দিয়েও গেলে না!"

২

মিঃ ব্রেড্লি উন্মুক্ত বাতায়নপথে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির সান্ধ্য-শোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে সিড্রিককে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন।

তিনি বলিতেছিলেন "সিড্রিক। আজ তোমার সফলতা লাভ করবার সমূহ সুযোগ উপস্থিত। আজ যদি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পার তবে তোমার যশ চিরকালের জন্য সমুজ্জ্বল থাকিবে—মনে যেন থাকে। আজ রাজারাণী দু'জনেই এই থিয়েটারে সৌভাগ্যক্রমে উপস্থিত থাকিবেন। আজ তোমাকে "লোহেন্ গ্রিন্" এ প্রধান ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইতে হইবে। এরূপ সুযোগ ও সৌভাগ্য কখনও তোমার পক্ষে উপস্থিত হইবে কিনা সন্দেহ।"

বহুমূল্য পরিচ্ছদ শোভিত সিড্রিক একটু হাসিল। সে যে পরিশ্রম এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছে আজ আসন্ন বিজয়ের আনন্দে সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। সে আজ প্রধান ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবে। রাজ দম্পতি সেই নাটক অভিনয় দেখিবেন। দর্শক-দের আজ স্থান সংকুলান হইবে কি না সন্দেহ। তাহার আনন্দ আজ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহার স্বপ্ন সফল সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম আজ সুফল প্রদান করিয়াছে। আজ সে সিদ্ধিলাভ করিবে। আবার অসংখ্য জন-সমুদ্র ভীষণ গর্জ্জনে তাহারই সমর্থন করিবে। তারপর আরও কিছু আছে যাহার তুলনায় এ সকল পার্থিব সম্পদ অতি তুচ্ছ! অতি তুচ্ছ!

ব্রেডলি বলিলেন সিডরিক ঠিকভাবে আস্তে আস্তে করো! প্রথমেই সুর চড়িয়ে দিও না; তা হলে কিন্তু সমস্তই নষ্ট হবে।"

"না মাষ্টার মশাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

ব্রেডলিকে মাষ্টার মশাই বলিয়া ডাকিলে তিনি খুব খুসী হইতেন। যদিও তিনি এখন ভাল গাইতে পারেন না তথাপি তাঁহার আত্ম-সন্তোষ ছিল যে তিনি উপযুক্ত শিষ্য রাখিয়া যাইতেছেন আর সে তাহার নিজের হাতেরই তৈরী।

"তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে, আঃ এ আবার কে?

কাহার মৃদুচরণধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। ট্রেভলি দরজা খুলিয়া দিলেন। নলীনা আজ হীরা-পান্না-খচিত কুন্দুকোমল শুভ্র পরিচ্ছদে আপনাকে সজ্জিত করিয়াছিল। তাহাকে আজ স্বর্গ-লোক-বিহারিণী অপ্সরার মত সুন্দর দেখাইতেছিল। বহুমূল্য হীরকের হার তাহার বক্ষে দোদ্যুল্যমান। হস্তে একটি গোলাপের গুচ্ছ। সে ধীরে ধীরে সিডরিকের সম্মুখীন হইয়া বাহু বিস্তার করিয়া বলিল, "সিডরিক আজ সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তোমার মঙ্গল কামনা কচ্ছি।"

সিডরিক ধীরে ধীরে তাহার হাত দুইখানি ধরিল। তারপর তাহাকে সম্মুখে টানিয়া আনিয়া পলকহীন দৃষ্টীতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কতবার তাহার ইচ্ছা হইল তাহাকে আপনার বক্ষে টানিয়া লয়। কতবার ইচ্ছা হইল তাহার গর্ব্বিত গোলাপী অধরে তীব্র চুম্বনের রক্তরেখা টানিয়া দেয়। কিন্তু সময়ত এখনও আসে নাই। সমস্তই তাহার কৃতকার্য্যতার উপর নির্ভর করিতেছে। যখন সমগ্র ইংলণ্ড মুক্তকণ্ঠে তাহার যশোগান করিবে তখন সিড্রিফ তাহার হৃদয়ের সমস্ত কথা লীনার নিকট প্রকাশ করিবে এখন নয়। সাতবৎসর ধরিয়া সে লীনার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছে। তাহাকে আধফুটন্ত হইতে পূর্ণবিকশিত হইতে দেখিয়াছে। তাহার—তাহার সৌন্দর্য্য সিড্রিফকে পাগল করিয়াছে।

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আঃ কি করিলাম লীনা; তোমার সমস্ত ফুলগুলি যে নষ্ট হইয়া গেল।"

লীনা হাসিয়া বলিল "সেজন্য কিছু ভেবনা সিড্রিফ এ ফুল গুলি ভাল নয়। আজ রাত্রিতে অনেক ভাল ফুল তোমার মাথায় পড়্বে।"

সিড্রিফ দুই চক্ষু নিমীলিত করিল। একবার সে ভাল করিয়া অন্ধকার বিজয়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য কল্পনা-পথে আনিতে প্রয়াস পাইল! কিন্তু কোথায় সে জন-সমুদ্র? কোথায় সে হর্ষ ধ্বনি? কোথায় সে পুষ্প-অর্ঘ্য? তাহার সম্মুখে ধীর ধীরে একটি পার্ব্বত্য-চিত্র ফুটিয়া উঠিল, সে দেখিল সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গগুলি গলিত রজতস্তূপের ন্যায় শোভা পাইতেছে; আর সেই গিরি পাদমূলে সে দাঁড়াইয়া! তাহার চরণ তলে একটী বন্য ফুলের মালা—অযত্নে ধূলায় ধূসরিত; কিন্তু তখনও তাহাহইতে সুমিষ্ট সৌরভ উঠিয়া বায়ু স্তরে মিশিয়া

যাইতেছিল। আর এই লীনার হস্তের কমনীয় ফুলগুলি শুধু কৃত্রিমতা মাখান; সৌরভে মাধুর্য্য নাই সে যেন অতিক্ষণ স্থায়ী শোভার ভাণ্ডার মাত্র।

ব্রেডলি বলিলেন "তাড়াতাড়ি সিড্রিক। প্রথম বেল্ বেজে গেছে। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তুমি জয়ী হও। আমি বেশ আছি—বেশ ভাল করে—মনে থাকে যেন।"

মিঃ ব্রেডলি লীনার হাত ধরিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

সিড্রিক ধীরে ধীরে যাইয়া রঙ্গমঞ্চের পাশে দাঁড়াইল। এক মিনিট পরেই তাহার সুমিষ্ট স্বর-লহরী সেই নিস্তব্ধ গৃহের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। দর্শকগণ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহা এক মনে শ্রবণ করিতে লাগিল। সে কি মধুর! অকম্পিতভাবে তাহার স্বর ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, আকুল উচ্ছ্বাসে দর্শকদের হৃদয় অন্দোলিত হইতে লাগিল, কাহারো চক্ষে অশ্রু-প্রবাহ ছুটিল। ধীরে ধীরে যখন শেষ সঙ্গীতের করুণ ধ্বনি বাতাসের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া গেল, তখন ঝটিকা-বিক্ষোভিত সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় সেই জন-সমুদ্র ভীষণ হর্ষের ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সিড্রিফ্ এই সময়ে দর্শকদিগকে অভিবাদন করিয়া রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার দৃষ্টি সম্মুখবর্ত্তী বক্সে পতিত হইল। সে দেখিল লীনা তাহার জয়ে উৎফুল্ল হইয়া হাততালি দিতেছে। তাহার কপোলযুগল যেন অতিশয় আবেগে রক্তিমাভাময় হইয়া উঠিয়াছে। সিড্রিফের হৃদয় নাচিয়া উঠিল। এতদিন ধরিয়া সে লীনার উপাসনা করিয়াছে আজ সেই উপাস্য দেবী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে লীনা ও তাহাকে ভালবাসিয়াছে। গর্ব্বিত পাদক্ষেপে সে ভিতরে চলিয়া গেল।

মিঃ ব্রেডলি দ্রুতপদে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহার নেত্র-প্রান্তে অশ্রু-মুখে হাসি!

তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন "সিড্রিফ—সিড্রিফ আমি জানতুম এ হবেই। যে দিন তোমাকে সেই ল্যান্‌কেন্‌লির পাহাড়ে দেখেছিলুম সেই দিন হতেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম। যাক্ এখন মরবার সময় আমার কোন আক্ষেপ,—যাক্ বেশ। উপযুক্ত শিষ্য রেখে আমি মর্ত্তে পারব। সিড্রিফ এ রকম অভিনয় কখন হয় নাই—অন্ততঃ আমার জীবদ্দশায় ত কখন দেখিনি।"

সিড্‌রিক্‌ উত্তর করিতে পারিল না ধীরে ধীরে আবার সেই পার্ব্বত্য চিত্র তাহার নয়ন সমক্ষে আসিয়া উঠিল; কাহার একখানা বেদনা-ক্লিষ্ট মুখ তাহার পার্শ্বে ফুটিয়া উঠিল। সিড্‌রিক তাহাকে সবলে মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মূর্ত্তি যেন আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল।

অনেক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে সে আর দেশে চিঠি পত্রাদি লিখে নাই। তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। কার্য্য গতিকে পিতার অন্তিমকার্য্যেও সে যোগদান করিতে পারে নাই। সে রীতিমত লণ্ডনবাসী হইয়া উঠিয়াছে। বৎসরের অধিকাংশ সময় সে লণ্ডনে কাটাইয়া দেয়। অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চাল-চলনের ও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সেই পাড়াগেঁয়ে অসভ্য সিডরিক এখন আদব কায়দা দুরস্ত একজন মস্ত কাপ্তেন! তাহার আর কি জন্মভূমির জন্ম প্রাণ কাঁদবে?

কিন্তু আজ কেন জানি এলেনের কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। লীনার হাতে ফুলের থোকা দেখিয়া এলেনকে তাহার মনে পড়িয়াছিল। কিছুতেই তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। মনে মনে সে একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। যদিও সে আজ বহু সম্মানের অধিকারী কিন্তু প্রাণটা যেন শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সঙ্গীতে এত দক্ষতা আর কেহ কোন কালে দেখাইতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে আজ কেমন একটা করুণ-ক্রন্দন তাহার হৃদয় মধ্যে আছাড়িয়া পড়িতেছিল।

কিন্তু এ সম্মোহনতা ক্ষণিকের জন্ম। লীনা তাহার অতুল রূপ রাশি লইয়া ভেনাস্‌ মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সিড্‌রিকের হৃদয় টলিল। লীনা হাসিতে হাসিতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ফুলের স্তবক হইতে একটি ফুল ছিঁড়িয়া সিড্‌রিকের বুকে পরাইয়া দিয়া বলিল, "সিড্‌রিক আমি তোমাকে এই পুরস্কার দিলুম" সিড্‌রিক সযত্নে তাহার হাত দুইখানি ধরিয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ফুলটি মাটিতে পড়িয়া গেল। লীনা অসতর্কতায় তাহা মাড়াইয়া ফেলিল। ক্ষুদ্র ফুল ধূলায় মলিন হইয়া গেল।

এইখানেই ইহার পরিসমাপ্তি হইল না। একজন লোক আসিয়া তাহাকে "রয়েল বক্সে" লইয়া গেল। রাজ-দম্পতি তাহার অশেষ প্রশংসা করিলেন। রাজ্ঞী সহর্ষে তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন।

সিড্‌রিক ধীরে ধীরে, "ড্রেসিংরুমে ফিরিয়া আসিল। তখন পর্য্যন্ত ব্রেড্‌লির বদন হইতে প্রশংসা ধারা নির্গত হইতেছিল। তিনি বলিলেন "সিড্‌রিক। আজ হয়ত অনেকেই তোমাকে নৈশ-ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু আজ এসব প্রত্যাখ্যান কর্‌তে হবে। শুধু আমার আর লীনার সঙ্গে সামান্য কিছু ভোজন কর্‌বে। আর কিছুই নয়।" তাহারা গাড়ীতে উঠিল।

সিড্‌রিকের মাথা তখন পর্য্যন্ত ঘুরিতেছিল। সে যেন এক অপূর্ব্ব পরীরাজ্য হইতে এইমাত্র ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। মোহ জাল যেন এখনো টুটে নাই। লীনার দেহ সম্পৃক্ত সুগন্ধি এসেন্স তাহাকে অবসাদাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। লীনা তাহার দিকে একটু সরিয়া আসিয়া তাহাকে মৃদুস্বরে প্রশংসা করিতেছিল।

গাড়ী থামিল। সিড্‌রিক দৌড়াইয়া তাহার কক্ষে যাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এতখানি পরিশ্রম মানসিক উদ্বেগের পর তাহার পা যেন দেহের ভার বহনে অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি একখানি চিঠির উপর পড়িল। চিঠিতে লানফেনলির ছাপ ছিল। সিড্‌রিক ত্রস্তে চিঠি খুলিয়া পড়িল :—

প্রিয় সিড্‌রিক ?

তুমি বোধ হয় এতদিনে ল্যান্‌ফেন্‌লিকে ভুলিয়া গিয়াছ। শুনিলাম তুমি নাকি আজ লণ্ডনের বিখ্যাত সঙ্গীত-সমাজে সঙ্গীত করিবে। ঈশ্বর তোমাকে সফলতা প্রদান করুন। ল্যান্‌ফেল্‌লি তোমাকে পাইয়া গর্ব্বিত।

ইতি—তোমার এলেন

আবার পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া সিড্‌রিকের হৃদয় অধিকার করিল। গত জীবনের সমস্ত কথা ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়-পটে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সে পত্র হাতে করিয়া কতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু এ বিহ্বলতা অল্পক্ষণের জন্য। উন্মুক্ত জানালা পথে লীনার উচ্চ বাক্য ধ্বনি প্রবেশ করিতে ছিল। এ হাস্য ধ্বনির মধ্যে কেমন যেন একটা মাদকতা মিশ্রিত ছিল। সিড্‌রিক পত্র ফেলিয়া দিয়া ধীর পদে নীচে নামিয়া গেল।

সে আস্তে আস্তে যাইয়া লীনার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার ক্ষুধার্ত্ত চক্ষু দুইটি প্রাণ ভরিয়া লীনার রূপ-সুধা পান করিতে লাগিল। অব্যবস্থিত চিত্ত সিড্‌রিক লীনার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল" লীনা তুমি জান আমি তোমাকে

ভালবাসি। কত ভালবাসি তা বল্‌বার ও নয় দেখাবারও নয়। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে পর্য্যন্ত না আমি জীবনের ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি সে পর্য্যন্ত তোমাকে এইসব বিষয় কিছুই বল্‌ব না। আজ সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। লীনা প্রাণের লীনা! এখনত আমি তোমার উপযুক্ত হয়েছি এখন ত তুমি আমায় তোমার হৃদয়ে স্থান দিবে? বল আমার ভালবাসা উপেক্ষিত হবে না?"

লীনা মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—"সিড্‌রিফ? আমি ও সত্যি সত্যি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমি আগে বুঝি নাই যে তুমি অলক্ষিতে আমার হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে বসেছ। কিন্তু আজ যখন দেখ্‌লুম কি প্রশংসা ধ্বনি তোমার উপর বর্ষিত হচ্ছে। রাজারাণী পর্য্যন্ত তোমার মঙ্গল কামনা কচ্ছেন তখনই শুধু জানলুম এ হৃদয় রাজ্যের কতটা তুমি অধিকার করেছ। আমি এত চমৎকৃত হয়েছিলুম যে আমার ফুলটি পর্য্যন্ত তোমায় দিতে ভুলে গিয়েছি এই ত্যাখ্‌— এ শুকিয়ে গ্যাছে।"

সিড্‌রিফ ধীরে ধীরে লীনাকে বক্ষে টানিয়া আনিল। ধীরে ধীরে তাহার গোলাপী-রাগ-রঞ্জিত কপোলে চুম্বন রেখা টানিয়া দিল। বাহ্যজ্ঞানশূন্য প্রেমিক প্রেমিকা উভয়ের বাহু সংলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিড্‌রিফের যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিল লীনা নিকটে নাই। সে শুধু লীনাপ্রদত্ত শুষ্ক ফুলটি বক্ষে চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কঠিন পীড়নে ম্লান পুষ্প আরও ম্লান হইয়া গিয়াছে।

মনের আবেগে সে দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেল। দরজায় ঢুকিতেই দেখিল কে যেন এলেনের চিঠিটি শত খণ্ডে ছিন্ন করিয়া মেঝেতে ছড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহার বড় এদিকে লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না। সে লীনার ফুল্ল কুসুম তুল্য মুখখানা ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিল।

৩

আজ আবার মহা সমারোহ। আজ ইয়োরোপীয় সমস্ত নৃপতি বৃন্দ সিড্‌রিফের গান শুনিবার জন্য একত্রিত হইয়াছেন। এরূপ ভাগ্য লক্ষ জনের মধ্যেও এক-জনের হয় কিনা সন্দেহ।

ব্রেড্‌লি বলিলেন "সিড্‌রিক! আজ আর আমার কিছুই বলিবার নাই। তোমার অদৃষ্টই আজ তোমাকে চালিত করবে। আমি তোমার শুভ কামনা করিতেছি।"

সিড্‌রিক একটু ধীরভাবে বলিল, "আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।" আজ আর সে সহজ ভাবে কথা বলিতে পারিতেছিল না। একটা অজানিত আশঙ্কা তাহার হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কয়েক দিন হইতেই সে কণ্ঠ-নালীর মধ্যে কিরূপ একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল। একথা সে কাহাকেও জানায় নাই। গোপনে একজন ডক্তার দেখাইয়াছিল। সে বলিয়াছিল মিঃ সিড্‌রিক আপনি সাবধানে সুর সাধনা করিবেন। খুব বেশী পরিশ্রম করিবেন না। এরূপ একটি কণ্ঠ অসাবধানতায় নষ্ট হইয়া গেলে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে। আমি যতদূর দেখিতেছি আপনার গায়ে কিছুই হয় নাই।—বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগে ঐ রকম হয়েছে কিন্তু তবু সাবধান।"

আজ সেই ডাক্তারের কথাই তাহার মনে হইতেছিল আর ভয়ে সর্ব্বশরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল। একবার তাহার মনে হইল তাহার শিক্ষকের নিকট সমস্ত খুলিয়া বলে কিন্তু মনের ইচ্ছা মনেই চাপিয়া গেল।

শিক্ষক বলিলেন "লীনা একটু পরে আস্‌ছে। আজ সে মণ্ট্‌ফোর্ডদের নিমন্ত্রণে গ্যাছে। আজ যে হঠাৎ তোমায় "প্লে" কর্ত্তে হবে তাত সে জানে না। তা যাক্ তুমি আজ বেশ করে গেও কিন্তু—"

সিড্‌রিকের ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া আসিল। রাগে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। লীনা আজকাল মণ্টফোর্ডের সঙ্গে বড় বেশী মেশামেশি করিতেছে সে তাহার নিজের বাগদত্তা। তাহার আর অতটা বেশী কাহারো সঙ্গে ঘনিষ্টতা করা উচিত হয় না এটা কি লীনা বুঝে না। কিন্তু হাস্যময়ী চঞ্চলা লীনাকে যে পারিয়া উঠিবার যো নাই। সে সর্ব্বদাই নূতন আমোদ নূতন বন্ধু নিয়াই উন্মত্ত।

সেওত নিজে অনেক পরিচয় করিয়াছে। অনেক বন্ধুর সঙ্গলাভ করিয়াছে। অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার আলাপ হইয়াছে। অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরে আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছে। কতরকম উপহার পাইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এ সকল ত ক্ষণস্থায়ী! যদি কোন দিন কোন কারণে তাহার পতন হয়

তবে? তবে ত এ সকল লোকের সঙ্গে তাহার আর কোন পরিচয়ই থাকিবে না! কিন্তু সে জানিত এরূপ দুর্ভাগ্য লইয়া সে জন্ম গ্রহণ করে নাই। উপরন্তু বস্ এসব কিছুই চাহে না সে চাহে,—শুধু লীনার প্রেম—নিঃস্বার্থ ভালবাসা। তাহার ইচ্ছা হইল লীনা আজও আসিয়া তাহার শুভ কামনা করে।

"সিড্রিফ আজ আর লীনার উপর রাগ করিল না। সে বড় কোমলা; একটু আঘাতেই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। তাকেত তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি। যখন আমি এ ধরাধাম হতে চিরবিদায় গ্রহণ কর্‌ব তখন—"

ভৃত্য আসিয়া বলিল "গাড়ী প্রস্তুত," সিড্রিফের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে ললাটের স্বেদ-মোচন করিয়া কম্পিত পদে যাইয়া গাড়ীতে বসিল।

আজ আবার সেই গান সেই সুধাময়ী সঙ্গীত। প্রত্যেক সুরের নর্ত্তনে, মূর্চ্ছনায় দর্শকদের হৃদয়ে ভাবের আবেশ ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। আজ সে তাহার পূর্ণ শক্তিতে গাহিতেছে যেন আজ সে এই এক সুরের অভাবেই সমস্ত জগৎ জয় করিয়া ফেলিবে? কিন্তু যাহারা তাহার সম্মুখের আসন অধিকৃত করিয়াছিল তাহারা দেখিল যুবকের বদন পাংশুবর্ণ, ললাট বেদনাপ্লুত কি যেন একটা ভয়ে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত!

প্রথম অঙ্ক শেষ হইল। সিড্রিফ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিল। তাহার মাথায় আগুণ জ্বলিতেছিল। সঙ্গীত আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পরে লীনা "বক্সে" আপন আসন গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু তাহার সঙ্গীটিকে দেখিয়া সিড্রিফের হৃদয়ে বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য সে লীনাকে অবিশ্বাস করে না কিন্তু মণ্টফোর্ডের সঙ্গে লীনার অতটা মেশামিশি সিড্রিফের ভাল লাগে না। সে সংকল্প করিল যে প্রকারেই হউক শীঘ্রই তাহাদের বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিবে।

তাহার চিন্তা-স্রোত আবার অন্যদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মিঃ ব্রেড্লি এখনও কেন আসিতেছেন না? কেমন একটা অজানিত আশঙ্কা তাহার বুক চাপিয়া ধরিয়াছিল। তাহার কণ্ঠ-নালীর বেদনা যেন আজ বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার সুরের ত কোন বৈষম্য লক্ষিত হইল না। তাহ যেন আরও সুমিষ্ট হইয়াছে।

ড্রপ উঠিল। সিড্‌রিফ সকল ভয়কে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া "ষ্টেজ" এ অবতীর্ণ হইল। দর্শক-বৃন্দ করতালি দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল। আবার সিড্‌রিফ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। লহরে লহরে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রতি কম্পনে সুর ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে—আরও—ঊর্দ্ধে—তার পর একটা বিকট ধ্বনি সিড্‌রিফের বদন হইতে বহির্গত হইল, সমস্ত নীরব! সিড্‌রিফ আর একবার চেষ্টা করিল। কিন্তু একটা কর্কশ ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই বাহির হইল না। সিড্‌রিফ টলিতে টলিতে ষ্টেজ্ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ম্যানেজার দৌড়িয়া আসিল। সে উত্তেজিত ভাবে বলিল' সর্ব্বনাশ! একি কল্লেন মিঃ সিড্‌রিফ? আমাদের যে সর্ব্বনাশ করলেন আপনি। যান্—যান্—শীগ্‌গির গানটা শেষ করে আসুন।

এমন সময় একটি লোক আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "সর্ব্বনাশ হয়েছে ম্যানেজার! ষ্টলের একজন লোক মারা পড়েছে।

ম্যানেজার পাগলের মত হইল। সে চীৎকার করিয়া বলিল "হায়! হায়! আজ কুক্ষণে অমি "প্লে" আরম্ভ করেছিলাম। আবার কে মলো? মর্‌বার যেন আর যায়গা নেই।"

সিড্‌রিফ মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিল "কে এ ব্যক্তি!

ষ্ট্রেডলি ষ্টলে বসিয়া সিড্‌রিফের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন। যখন সিড-রিফের বদন হইতে বিকট ধ্বনি বহির্গত হইল, তখন তিনি সব বুঝিলেন—বুঝিলেন তাহার শিষ্যের পরাজয় নিকটবর্ত্তী। তাঁহার মনে হইল সকল অপ-মানের—অপদস্থের গুরুভার যেন তাঁহার মস্তকে পতিত হইবার জন্য তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। ষ্ট্রেড্‌লি চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। সকলে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল তাঁহার মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে রক্ত নির্গত হইতেছে।

ম্যানেজার আবার সিড্‌রিফের নিকট ছুটিয়া আসিল বলিল, মিঃ সিড্‌রিক যা' হইবার তা' হইয়া গিয়াছে। আসুন আর একবার চেষ্টা করুন, আমার মান রক্ষা করুন।

সিড্‌রিফ কেবল শুদ্ধ হাঁ করিয়া তাহার কণ্ঠ-নালী প্রদর্শন করিল। তাহার কথা বলিবার সামর্থ পর্য্যন্ত তখন ছিলনা।

ম্যানেজার স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সিড্রিক্ ছুটিয়া যাইয়া "গ্রীণ রুমে" প্রবেশ করিয়া তাহার পোষাক পরিধান করিল। তার পর এক খানা গাড়ী করিয়া ডাক্তারের বাড়ী উপস্থিত হইল।

ডাক্তারও সঙ্গীত শুনিতে গিয়াছিলেন। তিনি তখনও ফিরেন নাই। সিডরিক্ বাড়ী যাইয়া দেখিল ট্রেড্লির শবদেহ তথায় আনীত হইয়াছে। পিতৃ হারা কন্যা লীনা তাহার বুকের উপর পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে। সিড্রিক্ আস্তে আস্তে সেই খানে বসিয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

শ্রীযামিনীমোহন সেন।

——:-o-:——

# রথযাত্রায় নিবেদন।

রথে বসি জগন্নাথ কুরুক্ষেত্র রণে
যেই গীতা উপদেশ দিলেন অর্জ্জুনে,
মনে পড়ে আজি তাহা রথের উৎসবে।
নিঃস্বার্থ ধর্ম্মের তত্ত্ব, তৃতীয় পাণ্ডবে
শিখাইলা যেই জন, সেই জন আজ
আসিলেন রথে পুন আর্য্যভূমি মাঝ।
কপিধ্বজ রথে বসি গীতা উপদেশ
আবার কি দিবে প্রভু দেব হৃষীকেশ?
জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, দলি চরণেতে,
প্রেমের আদর্শ-রাজ্য পুন কি ভারতে

করিবে গো প্রতিষ্ঠিত ? আবার কি প্রভু,
ধন্য হব সমাপিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম কভু ?
পাপ, তাপ, হিংসা, দ্বেষ, নীচতা, হীনতা,
অনাচার, অত্যাচার আর সংকীর্ণতা
প্রাণধ্বংসী অন্নকষ্ট, ভীম মহামারী
হবে কি কখনো দূর ? হে কৃষ্ণ মুরারী,
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদে কখনো কি আর
জাগাইবে শিখাইবে মহিমা তোমার ?
জগতের গুরু প্রভু ভারত-বাঞ্ছিত,
শিখাও সকলে পুনঃ গীতা মহাতত্ত্ব,
পরাজিয়া লোভ মোহ আদি রিপুগণে
বিমল ধর্ম্মের সেবা করি গো কেমনে ;
কর্ম্মফল তব পদে করি সমর্পণ
কেমনে তোমার কর্ম্ম করিব সাধন।
আজি এই শুভদিনে তোমার চরণে,
করে নিবেদন, প্রভু, দীন হীন জনে।
পূর্ণ কর দয়াময়, সব মনসাধ,
দূর হ'ক শোক, দুঃখ, ঘুচুক বিষাদ ;
লোভ মোহ পরিহরি গাহি যেন নাথ,
তোমার পূজার গান করি প্রাণপাত।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাস।

——:o:——

# বিক্রমপুরের বনফুল (২)

——:o:——

১। অতি প্রথমে "কাঠজল্‌কী" গাছ ভরিয়া ফুল ফুটিয়াছে। ফুল অসংখ্য দেখিতে সাধারণ-চক্ষে সৌন্দর্য্য বেশী নাই, কারণ বর্ণ সুন্দর নয়; গন্ধ ভাল। কিন্তু ফুল গুলি উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ব-বিদের পরীক্ষার যোগ্য। ৪টী পুষ্পাবরণ (Sepals) মধ্যে ৯টী দণ্ড ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনেক সংখ্যক পুংকেশর (Stamens) বহন করিতেছে। ফুলের পাপড়ী ও গর্ভ-কেশর সাধারণ পরীক্ষায় দেখা যায় না।

২। লজ্জাবতী—"লতা লজ্জাবতী" উদ্ভিদ রাজ্যে চমৎকার সৃষ্টি। তাহার ফুল গুলি দেখিতেও খুব সুন্দর। গোলাপী রঙ্গের গোলাকার ফুলগুলি গন্ধশূন্য। এক একটী "ফুল" কিন্তু বাস্তবিক বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের সমষ্টি, কদম্ব ফুলের ন্যায়। লজ্জাবতীর ক্ষুদ্র নিবিড় বন বহু পুষ্প-কুটীরে বড় সুন্দর দেখায় ও নিকটে বসিলে মক্ষিকাগণ কেমন সুন্দর ভাবে আত্মকার্য্যচ্ছলে প্রকৃতির কার্য্য করিতেছে দেখিয়া পুলকিত হইবেন। লজ্জাবতীর পত্র ও পত্রদণ্ড গুলি স্পর্শে বা বাতাঘাতে জড়সড় হইয়া পড়ে, আবাল বৃদ্ধ সকলেই তাহা সকৌতুকে দেখে। কিন্তু ঐ লতার অন্য ভাগ ও ফুল ও ফুলের দণ্ড সেরূপ জড়সড় হয় না। ইহা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার উপযুক্ত বিষয়।

৩। কদম্ব—এ সময়ে সকল ফুলের শ্রেষ্ঠ কদম্ব। কদম্ব বোধ হয় ভারত বর্ষের কোন স্থানেই অপরিচিত নয়। যাহা হউক বিক্রমপুরে কদম্ব গাছ বহুল পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি সুবিধামত স্থানে হইলে সুদীর্ঘ ও সরল ভাবে বহু ডাল যুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হয় এবং যখন গাছ ভরিয়া ফুল ফুটে তখন দেখিতে নিতান্ত সুন্দর। ফুলগুলি সাধারণের চক্ষে বড়ই সুন্দর এবং উদ্ভিদবিদের নিকট ও তাহা খুব আদরের হওয়ারই কথা। এক একটী কদম্ব অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের সমষ্টি। তাহার উপরের একস্তর শুভ্র অসংখ্য শলা সদৃশ সুন্দর পুষ্প ভাগ, দ্বিতীয় পীতবর্ণ অংশ, তৃতীয় স্তর হরিতাভ পুষ্পভাগ ও চতুর্থ কেন্দ্র ভাগ দৃঢ়, একটী গোলা। কিন্তু তাহা ফুল বা বীজ নহে।

ফুলের গন্ধ মৃদু, রৌদ্রের দিনে গাছের নিকটবর্ত্তী স্থান গন্ধে আমোদিত হয়। ছেলে মেয়েদের খেলার ফুলের মধ্যে কদম্বই প্রধান। অতি বৃষ্টিতে ফুল নষ্ট হইয়া যায়, রৌদ্র হইলেও দিন পরিষ্কার থাকিলে ফুল বেশী হয়।

মাঠ ভ্রমণ—অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত সুবিধা মতে বেড়ান যায়। অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে মাঠ শুষ্ক হয় না বৈশাখের পরে বান্ধা রাস্তা না থাকিলে বর্দ্ধিত পাট গাছের গতিকে আর বেড়ান যায় না।

বিক্রমপুরের চাষী এখন খুব পরিশ্রমী, কিন্তু অধিকাংশের জমির পারিমাণ কম। প্রতি গ্রামে এখন অল্প লোকেরই হাল গরু আছে, কারণ এখন গরুর মূল্য বেশী ও ঘাসের অভাবে এখন গরু পালা অসাধ্য। গ্রামে গোচারণ ভূমি নাই; পূর্ব্বে রাস্তা ও আইল প্রশস্ত ছিল ও অনাবাদি কোলা ভূমি ছিল তাহাতে গরু চরিত। এখন সে সব কাটীয়া ক্ষেত্র সামিল করিয়াছে। এখন সমস্ত চাষী অসাধু বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পরের ক্ষেত্রের বা ভূমির এবং পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা বা আইলের অংশ ক্রমে ক্রমে নিজ ক্ষেত্রের সামিল করিয়া কাটীয়া নিতেছে। দেশে গ্রাম্য শাসন নাই, কেহ কাহারও কথা মানে না। চাষীদের মধ্যে পঞ্চাইত নাই যে এসব বিষয় শাসন করিবে সকলেই স্বার্থপর হইয়া এই দুষ্কার্য্য করিতেছে। রায়ত চাষী কি ভূমির মালিক চাষী সকলেই ঐরূপ করিতেছে। বাস্তবিক যার ঐরূপ করার প্রবৃত্তি বা সুবিধা নাই নিকটবর্ত্তী চাষী তাই বিক্রমপুরে ভূমি অন্যায় মতে কাটীয়া নিতেছে। পূর্ব্বে আইন ছিল অন্ততঃ এক হাত পরিসর স্থান "হাতাইল" বলিত। অনেক স্থলেই তাহা এক হাত হইতে অনেক বেশী থাকিত। এখন সে সব চাষীরা কাটায় একবারে কমিয়া যাইতেছে, কোন স্থানে একবারে অদৃশ্য হইয়াছে। এই গতিকে পরভূমি হরণ, সীমানার চিহ্ন লোপ ও রাস্তা গুলি খাট বা লোপ হইয়া দেশে এক ঘোর অশান্তি হইতেছে ও অনিষ্ট হইতেছে। ক্ষেত্রের কোণে যে "টেক" গুলি ছিল তাহাও দুষ্ট ভাবে কাটীয়া আত্মসাৎ করিতেছে। বাস্তবিক টেক কাটা ও আইল কাটা ও রাস্তা কাটার সন্ধান গুলি বিক্রমপুরের চাষীর একটী "বিদ্যা"র মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। যদি চাষীরা এসব অকার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া ও সময় নষ্ট না করিয়া চাষের কাজে বেশী মনোযোগ করিত তবে নিজেদের ও দেশের অধিকতর উপকার হইত। ভূমি খুব গভীর ভাবে চাষ বা কোপাইলে অধিক ফসল হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ এখানে ভূমি প্রায় উপর উপর চাষ হয় এবং যাহারা পরের হাল ভাড়া করিয়া চাষ দেয় তাহাদের ভূমির আর ও দুরবস্থা এবং অধিকাংশ ভূমিই কাজে ঐরূপ।

চাষের সময় ও বুননের সময় চাষাদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে যেমন ভাল বোধ হয় এবং যাহারা পূর্ব্বে বোঝেন নাই তাহারা জমীতে চাষীর স্বত্ব থাকার আবশ্যকতা তখন বেশ বুঝিতে পারেন। শস্য গজাইয়া উঠার পূর্ব্বে ভ্রমণকারীকে কিছু কাল ধুলাপূর্ণ বাতাসে কষ্ট ভুগিতে হয় কিন্তু যখন কিছু কিছু বৃষ্টিপড়ার পর ফসল গুলি গজাইয়া উঠে ও ক্রমে ক্ষেত গুলি "শস্য শ্যামল" হয় তখনকার দৃশ্য খুব মনোরম। আবার দেখিবেন প্রাতঃকালে ছোট পাট ও তিলগাছ গুলির মাথাগুলি পূর্ব্ব দিকে বাঁকা হইয়া রহিয়াছে ও সেইগুলি বৈকালে আবার পশ্চিম দিগ হইয়াছে অর্থাৎ ঐ সব গাছের অগ্রভাগ গুলি সূর্য্যের সঙ্গে ঘুরিয়া থাকে। এইটী একটী আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক রহস্য, আশা করি তৎসম্বন্ধে কোন বিজ্ঞানবিদ্ অনুসন্ধান করিবেন।

শ্রীজগন্মোহন সরকার।

---

# সংগ্রহ।

## স্বাস্থ্যের উন্নতি (২)

"বঙ্গদেশের প্রায় ৯,৬৫০০০ লোক প্রতি বৎসর জররোগে মারা যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের, অন্ততঃ অর্দ্ধেকের, মৃত্যুর কারণ ম্যালেরিয়া জর। অন্ততঃ পক্ষে দশজনের এই রোগ হইলে একজন মারা যায়। সুতরাং প্রায় ৫০ লক্ষ লোক অর্থাৎ এই দেশের প্রায় প্রত্যেক ৯ জনের মধ্যে একজন এই রোগে আক্রান্ত হয়।

"এই-সকল মৃত্যুতে লোকের কষ্ট ত আছেই। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক মানব-জীবনের একটা আর্থিক মূল্য এখন স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারিত করেন।

কোন্ ব্যক্তির উপার্জ্জন-ক্ষমতা কত এবং তাহার বাঁচিবার সম্ভাবনা কত দিন, এই দুইটি অঙ্ক লইয়া ঐ ব্যক্তির জীবনের আর্থিক মূল্য স্থির করা হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে মিঃ ফার ( Farr ) হিসাব করিয়াছিলেন যে একটি নবজাত কৃষকসন্তানের জীবনের মূল্য ৫ পাউণ্ড। আমেরিকার মিঃ ফিসার ( Fisher ) যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের জীবনের মূল্য গড়ে ৫৮০ পাউণ্ড এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। নিকলসন ইংলণ্ডের এক একটি লোকের জীবনের মূল্য স্বদেশের পক্ষে ১০০০ পাউণ্ড এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। আমরা কৃষ্ণবর্ণ হইলেও, মাতৃভূমির পক্ষে এক এক জনের জীবনের মূল্য গড়ে উহার ৩০ ভাগের একভাগ ধরিয়া লইতে বোধ হয় কেহ আপত্তি করিবেন না। ম্যালেরিয়াতে বৎসর বৎসর যে, ৪,৮০,০০০ লোক মারা যায়, তাহাতে আমাদের দেশের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা উপরিউক্ত অঙ্কগুলি হইতে গণনা করা যাইতে পারে। একটি জীবনের মূল্য ৫০০ টাকা ধরিলে ৪,৮০,০০০এর অর্দ্ধেক ২,৪০,০০০ উপার্জ্জনক্ষম লোকের জীবনের মূল্য বার কোটী টাকা প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া রোগ আমাদিগের নিকট হইতে হরণ করিতেছে।"

এই রোগের কারণ যে কি তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। এক রোগী হইতে এই রোগের বীজ অন্য রোগীতে সংক্রামিত হয়। কোন কোন জাতীয় মশা এই সংক্রামণে সাহায্য করে। ইহার কারণ কেবল যে ঐসকল মশা তাহা মনে করিলে চলিবে না। যে-কোন অবস্থা উহাদের দ্বারা এই সংক্রামণের সাহায্য করে সে-সকলই ইহার গৌণ কারণ। ছোট ছোট পুরাতন অপরিষ্কার পুষ্করিণী, ডোবা, খানা, বিল, নদীর কোল, পুরাতন নদীর স্রোতহীন অবশিষ্ট ভাগ, পুরাতন পাতকুয়া, এমন কি গামলার পচা জল ও ফুলগাছের টব, গোষ্পদের জল, এই-সকল মশার ডিম পাড়িবার স্থান, আর বন জঙ্গল, বা কোন অন্ধকারময় স্থান ইহাদের বাসস্থান। আমাদের পল্লীগ্রামের এক-একটি গোয়াল-ঘরে শত শত ম্যালেরিয়ার বাহন মশা পাওয়া যায়। তারপর আবার আমাদের এই উর্ব্বরা জমীতে জল নিকাশের বন্দোবস্ত ভাল না থাকায় বন জঙ্গল খুব সহজেই বাড়িয়া যায়; আর ছোট ডোবা খানা শীঘ্র শুকায় না। আবদ্ধ জল বন জঙ্গল, ম্যালেরিয়াকে বিশেষ সাহায্য করে। এইরূপ প্রত্যেক বাটীর নিকটে নানাপ্রকার ময়লা ম্যালেরিয়ার সাহায্য করে।

প্রদীপ হইতে যেমন প্রদীপ জ্বালা যায়, সেইরূপ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত এক রোগী হইতে মশা ম্যালেরিয়া-বীজ অন্য রোগীর শরীরে বপন করে মাত্র; ইহা আর কোথাও জন্মে না, আর মশাও নিজে কিছু ইহা প্রস্তুত করে না। সুতরাং পূর্ব্বকার এক রোগীই পরবর্ত্তী অপর রোগীর রোগের কারণ।

ম্যালেরিয়া নিবারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে হয়।

যাহাতে লোকের বসত-বাটীর সন্নিকটে অর্থাৎ ১০০ গজের মধ্যে ম্যালেরিয়া বাহক মশা ডিম পাড়িতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। এই সকল বাটীর নিকট যে-সকল ছোট ছোট ডোবা, খানা, গর্ত্ত, পানাপুষ্করিণী, পুরাতন পাতকুয়া প্রভৃতি থাকে, তাহাতে একটু জল জমিয়া থাকিলেই মশার ডিম পাড়িবার সুবিধা হয়। এজন্য এইগুলি ভরাট করিয়া জল নিকাশের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

২। বাটীর নিকটে যে-সকল ঝোপ জঙ্গল থাকে, তাহা মশাদের আশ্রয়স্থান। ইহারা কোন প্রকার একটু থাকিবার স্থান পাইলেই সেখানে আশ্রয় লয়। এজন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা আবশ্যক। জঙ্গল থাকিলে জমীর জল নিকাশ ভালরূপ হয় না।

৩। জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত। অনেক স্থানেই পল্লীগ্রামে নিকটস্থ খাল নদী মজিয়া যায়, এবং অনেক স্থানে জল আবদ্ধ হয়। নদী নালা খালের উপর দিয়া অপ্রশস্তভাবে রেলওয়ের রাস্তা বা অন্য কোন রাস্তা নির্ম্মিত হইলে জল আবদ্ধ হয়।

৪। ম্যালেরিয়ারোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে কুইন্যাইন সেবন করিতে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তাহাদের শরীর হইতেই বীজ অন্য শরীরে সংক্রামিত হয়। তাহাদের শরীরেই এই বীজ যদি নষ্ট করা যায় তাহা হইলে সংক্রামণের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া যায়। এ বিষয়ে কুইনাইন আমাদের প্রধান অস্ত্র। উহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করাইলে ম্যালেরিয়া দমন সুনিশ্চিত।

পল্লীগ্রামের পক্ষে যেমন ম্যালেরিয়া, সহরে তেমনি যক্ষ্মারোগ। নানা কারণে এই রোগ দিন দিন আমাদের ভিতর বদ্ধমূল হইতেছে। এই সহরে বৎসর বৎসর প্রায় ২।৩ শত লোক এই কারণে মারা যায়। একটি কথা

এই যে এই রোগ নির্ধন মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্র পরিবারের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নানাপ্রকার কারণ একত্র হওয়ায় এই কুফল ফলিয়াছে। তাহার মধ্যে কতক সামাজিক এবং কতক আর্থিক। নানা কারণে পল্লীগ্রাম হইতে অগণ্য লোক কলিকাতায় আসিতেছে। তাহাদিগকে যৎসামান্য আয়ে খুব কষ্টে বহুলোকপরিপূর্ণ ছোট ছোট অন্ধকারময় অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করিতে হয়। একে অন্নের অভাব, তাহার উপর আবার পরিষ্কার বাতাসটুকু নাই। প্রথমেই দেখা যায়, স্বার্থত্যাগ ও ধৈর্য্যের প্রতিমা-স্বরূপিণী আমাদের গৃহ-লক্ষ্মীদের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এ রোগ বড়ই বৈষম্যবাদী; ধনী ও দরিদ্র রোগীর প্রতি ইহার প্রকোপের বিশেষ তারতম্য আছে। যদি এই সমিতি চেষ্টা করিয়া আমাদের বঙ্গসমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকদিগের এই রোগ নিবারণের কিছু সদুপায়ও করিতে পারেন, তবে ইহার জন্ম সফল হইবে। কিন্তু এই প্রশ্ন কিছু জগতের সম্মুখে নূতন নহে। প্রত্যেক বড় বড় সহরেই এই প্রশ্ন আছে। লণ্ডন, পারিস, নিউইয়র্ক, বার্লিন, এ-সকল সহরে এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা কতই কমিয়া গিয়াছে। বোম্বাই সহরে গত দুই বৎসর হইতে এই রোগ নিবারণের জন্য সমবেত চেষ্টা হইতেছে। আমরা অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। ইহাতে অর্থের আবশ্যক আছে সত্য; কিন্তু সমবেত উদ্যম ও চেষ্টা এবং সর্ব্বোপরি বিশ্বাস মিলিত হইলে আর্থিক অভাব কোথায় চলিয়া যাইবে।”

এখন দেখা যাউক আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া নিবারণের কি কি উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আছে। ভারতগবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান সার্জ্জন জেনারেল সার্ পার্ডী লুকিসের এ বিষয়ে উৎসাহ ও উদ্যম যথেষ্ট আছে। কিন্তু এখানে স্বাস্থ্যবিভাগের কার্য্য সবে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৪৯ সালে ইংলণ্ডে একবার কলেরা রোগেও প্রায় ৩৫০০০ লোক মারা যায়। সেই সময় হইতেই ইংরেজেরা স্বাস্থ্যতত্ত্বের মূল্য বুঝিয়াছে। আমাদের প্লেগের মহামারিতে ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তবে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বৎসরে জল নিকাশের জন্য ও পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয় করেন। এতদ্ব্যতীত মিউনিসিপালিটি গুলি বৎসর বৎসর ৩৪।৩৫ লক্ষ টাকা কেবল স্বাস্থ্যের উন্নতির

জন্ম খরচ করেন। ইহাতেও গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য আছে। কিন্তু আমাদের ভার আমরা নিজে বহন করিতে চেষ্টা না করিলে কেহই আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারিবে না। এখন আমাদের ভাবিবার বিষয় বেশী নাই, করিবার অনেক আছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বন জঙ্গল পরিষ্কার করা চাই, বসত-বাটীর নিকটস্থ ( ১০০ গজের মধ্যে ) ডোবা খানা ভরাট করা চাই,—ছোট, ছোট পগার খাল পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে তাহাদিগকে একত্র করিয়া জল নিকাশের সুবিধা করিয়া দেওয়া চাই। এতদ্ভিন্ন যে সকল ভাইভগ্নীরা রোগগ্রস্ত হইবে, তাহাদিগকে যথাসাধ্য কুইনান সেবন করান চাই। কলেরা নিবারণের জন্য প্রত্যেক পল্লীতে পরিষ্কার পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা চাই এবং আহার্য্য দ্রব্য যাহাতে মক্ষিকা-স্পর্শে দূষিত না হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করা চাই। সহরে যক্ষ্মারোগ নিবারণের জন্য ধনহীন ভ্রাতাভগ্নীদিগের নিমিত্ত স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ ও যথেষ্ট পরিমাণে পরিষ্কার মাছ ও পুষ্টিকর আহারের বন্দোবস্ত করা চাই। বসন্ত ও প্লেগ নিবারণের জন্যও উপযুক্ত টীকা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করা চাই।

সর্ব্বোপরি এই সকল উদ্দেশ্যের সফলতা সমাজের লোকের শিক্ষার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সেবা সমিতি প্রতিজ্ঞা করুন যে স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞানের প্রচার তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইবে। একদিনে কিছু হইবে না, কিন্তু সমবেত হইয়া, বদ্ধ পরিকর হইয়া, আমরা কাজ আরম্ভ করিলে নিশ্চয়ই বিধাতার কৃপায় সফল হইব।

কর্ত্তব্যের ভার কখনও মানবের শক্তি অপেক্ষা অধিক হয় না। সেবা-ব্রতের শক্তির সীমা নাই। একবার ভারতের সেই অতীতের আত্মোৎসর্গময়ী শক্তির আরাধনা করিয়া, সকলে আপনাকে ভুলিয়া. সকলে একত্র হইয়া সমবেত সামর্থ্যকে পরসেবায় নিযুক্ত করিলে সব বাঁধা দূর হইয়া যাইবে। আমাদের স্বপ্ন ও বাস্তব-রাজ্যের মধ্যে নূতন সেতু নির্ম্মিত হইবে। প্রতিকূল ঘটনার খরস্রোতা পদ্মাও তাহা নষ্ট করিতে পারিবে না।

শ্রীনীলরতন সরকার।

# গ্রন্থ-সমালোচনা।

——:o:——

বৈদ্যজাতির ইতিহাস। শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত মূল্য ১॥০ প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

বসন্ত বাবু এই গ্রন্থখানি তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে তিনি বৈদ্যজাতির উৎপত্তি ও অভ্যুদয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বসন্ত বাবু ঋগ্বেদ, মহাভারত, রামায়ণ, মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ মন্থন করিয়া বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে ঐ সকল গ্রন্থে যাহা যাহা পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি দুইটি মত উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম মতে বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণ হইতে তৎকর্ত্তৃক বিবাহিত বৈশ্য কন্যার গর্ভে জাত অম্বষ্ঠ জাতির নামান্তর মাত্র। দ্বিতীয় মতে "অম্বষ্ঠ দেশীয় ব্রাহ্মণগণ" বৈদ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভারতের নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে তাঁহারাই অম্বষ্ঠ ও বৈদ্যনামে অভিহিত হইয়াছিলেন"। এই অধ্যায়ে বসন্ত বাবু আরও দেখাইয়াছেন যে বৈদ্যজাতি চিরকালই ধর্ম্ম-প্রবণতার জন্য বিখ্যাত। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বৌদ্ধযুগে শান্তরক্ষিত প্রভৃতির, বৈষ্ণবযুগে গোবিন্দদাস, নরহরিসরকার, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময়ে কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈদ্য রাজত্বের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মগধের গুপ্ত বংশীয় রাজগণকে, বর্দ্ধনবংশীয় রাজগণকে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক গুপ্তকে, পালবংশীয় রাজগণকে ও বাঙ্গালার সেন বংশীয় রাজগণকে বসন্ত বাবু বৈদ্য জাতীয় বলিয়া দাবী করিয়াছেন। গুপ্তবংশীয়ের ও বর্দ্ধন বংশীয় দিগের বৈদ্যত্ব সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কোনও প্রমাণ দেন নাই। বস্তুতঃ এই সকল রাজগণের জাতি নির্ণয় একটি মহাসমস্যার বিষয়। বসন্ত বাবু বলেন যে পাল রাজগণ সেনবংশীয় ও শক্তি গোত্র-প্রভব ছিলেন। বহুকুল গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে বৈদ্যদিগের মধ্যেও পাল উপাধি ছিল।

সেনরাজগণের জাতি সম্বন্ধে বসন্ত বাবু বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থগণের অধিকাংশ কুলপঞ্জিকার মতে আদিশূর ও বল্লাল প্রভৃতি নৃপতিগণ বৈদ্যজাতীয়। কিন্তু কোনও কোনও তাম্রশাসনের মতে সেনবংশীয়েরা কর্ণাট হইতে আগত ও চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। এ সম্বন্ধে বসন্ত বাবু বলেন যে সেনবংশীয় বৈদ্য জাতীয়ই ছিলেন কিন্তু তাঁহারা রাজাবলিয়া সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয়ত্বের ভাণ করিতেন। বল্লাল সেন স্বরচিত দানসাগর গ্রন্থে নিজেকে ক্ষত্রিয়াচারী বলিয়াছেন কিন্তু ক্ষত্রিয় বলেন নাই। মুলো পঞ্চানন বলেন :—

"আদিশূর রাজাবৈদ্য, বৈদ্যতার জাতি।
একছত্রী রাজাছিল ক্ষত্রবৎ ভাতি॥
বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
ভূপ হ'লে সবারি ইচ্ছা হয় ক্ষত্র।
গৌরব হেতু রাজন্য বলায় ক্ষত্র ক্ষত্র"॥

আর এক স্থলে মুলো বলেন—

"ভূপের ক্ষত্রত্ব হয়, শৌর্য্যের প্রকাশ।
নৃপমাত্র ক্ষত্রাচার কলিতে সহাস॥

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম্, এ মহোদয় তদীয় "লক্ষ্মণ সেনদেবের তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আর্য্য অবনতির মুখে প্রকৃত ক্ষত্রিয়গণ লুপ্ত প্রায় হইলে, অসভ্য অনার্য্যজাতি মাত্রেই রাজত্বের সহিত ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছে। নাসিকা বিহীন হুন হইতে প্রতীহার চাহমান, চন্দাত্রেয় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি। বর্ত্তমানকালে শ্যান দেশবাসী গো-খাদকগণও বিগত দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছে, উদাহরণ আসামের আহম জাতি ও মণিপুরের রাজবংশ।"

Vincent. A. Smith একস্থলে বলিয়াছেন যে 'মৌর্য্য বংশীয় শূদ্রজাতীয় নৃপতি মহারাজ অশোকও আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই।'

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ও অন্যান্য অধ্যায়েও বসন্ত বাবু বহু কুলপঞ্জিকার উল্লেখ করিয়াছেন। এই কুলপঞ্জিকাগুলির মধ্যে কোন্ খানা কত প্রাচীন, কোন্ খানার প্রামাণিকতা কতদূর, কোন্ খানা প্রকাশিত, কোন্ খানা অপ্রকাশিত

কিংবা কোথায় প্রাপ্তব্য তিনি তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। আশা-করি বসন্ত বাবু দ্বিতীয় সংস্করণে এসকল ত্রুটি দূর করিবেন।

গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বসন্ত বাবু বিস্তৃত আদি বৈদ্য সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রাজ, নন্দী, চন্দ্র, নাগ, আদিত্য, রক্ষিত, সোম, কুণ্ড, পাল, কর, ধর, দেব ও দত্ত উপাধিধারী বৈদ্যগণের বংশ পরিচয় দিয়া বৈদ্যজাতির একটি মহোপকার সাধন করিয়াছেন। প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ ইহাদের বিষয়ে প্রায় নির্ব্বাক্। গ্রন্থের ভূমিকায় বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন:— "বঙ্গদেশের সমগ্র বৈদ্যজাতির মিলন ও একীকরণ আমাদের লক্ষ্যস্থল। রাঢ়ীয়ও বঙ্গীয় সমাজের বৈদ্যগণ যাহাতে পরস্পর মিলিত হইয়া বৈদ্যজাতির লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে পারেন, তাহাই আমাদের চিন্তনীয়। বর্ত্তমান অবস্থায় সমগ্র বৈদ্যজাতির মিলন আমাদের নিকট অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। আমরা কুলপঞ্জিকাকারগণের বচন সমূহ অধ্যাহৃত করিয়া দেখিয়াছি যে পুরাকালেও রাঢ়ীয় বঙ্গীয় সমাজের আভিজাত বর্গ যৌন সম্বন্ধে পরস্পর আবদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়াছিলেন।" আশাকরি সমগ্র বৈদ্যজাতি আপনাদের কুসংস্কার বর্জ্জন করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইবেন এবং গ্রন্থকারের কামনার সফলতা বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে গ্রন্থখানি মোটের উপর খুব ভাল হই-য়াছে এবং যাহারা বৈদ্যজাতি সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন তাহারা এই গ্রন্থ পাঠে অত্যন্ত উপকৃত হইবেন।

শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত

# আমি কে?

## (সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত)

নহি আমি মনো বুদ্ধি, নহি আমি অহঙ্কার।
রসনা বা কর্ণ নহি, নহি চিত্ত ঘ্রাণ আর।
ব্যোম ভূমি তেজো বায়ু ইহা আমি কিছু নই
চিদানন্দ রূপ শিব আমি হই আমি হই।
পঞ্চ বায়ু একীভূত, নহি আমি সেই প্রাণ।
সপ্ত ধাতু পঞ্চ কোষ আমাকে না কর জ্ঞান।
নহি বাক্য, নহি পদ, গুহ্যোপস্থ আমি নই।
চিদানন্দ রূপ শিব আমি হই আমি হই।
নহি আমি দুঃখ সুখ, নহি আমি পুণ্য পাপ।
বেদ, যজ্ঞ মন্ত্র নহি, নহি তীর্থ নহি তাপ।
ভোজ্য, ভোক্তা, ভোজন বা কিছুইত আমি নই।
চিদানন্দ রূপ শিব আমি হই আমি হই।
দ্বেষ, রাগ, লোভ, মোহ, মদ মৎসরতা আর।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই নাহি আমার।
ইহার বাহিরে আমি সুদূরেতে সদা রই
চিদানন্দ রূপ শিব আমি হই আমি হই।
নাহিমম জাতিভেদ, নাহি মম মৃত্যু ভয়।
নাহিমম পিতা মাতা জন্ম মম নাহি হয়।
নাহি বন্ধু, মিত্র মম, গুরু শিষ্য মোর কই?
চিদানন্দ রূপ শিব আমি হই আমি হই।
নাহি যে বন্ধন মম, নাহি মুক্তি নাহি ভয়।
ইন্দ্রিয়ের বিভু আমি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময়।
নির্ব্বিকল্প, নিরাকার ইহা ভিন্ন আমি নই
চিদানন্দ রূপ শিব আমি হই আমি হই।

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

H. D. Ray, Artist
Bhagyakul.

ঝর ঝর ঝম্ ঝম্ ঝরে শুধু জল,
মেঘ ডাকে গুম্ গুম্ নদী কল কল।

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

# বিক্রমপুর।

## গান।



---
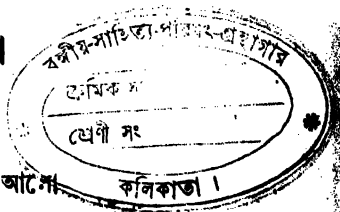
এস আমার চোখের আলো
এস আমার প্রাণের মণি,
এস আমার সাধের স্বপ্ন
এস আমার আশার ধ্বনি।
এত দিনের আশার আশে
নয়ন জলে বয়ান ভাসে
এস আমার সাধের স্বপ্ন
এস আমার হৃদয় মণি।
এস আমার সুখের সাগর
এস আমার দুঃখের খনি।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

# হরিদ্বারে কুম্ভমেলা।

যে দিন শুনিলাম এইবার হরিদ্বারে কুম্ভমেলা, সেই দিন হইতেই কি জানি কেন কুম্ভমেলা দেখিবার জন্য প্রাণের মধ্যে একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সাধু-সন্ন্যাসী আপামর সাধারণ যাহাকে পাইতাম তাহাকেই কুম্ভ মেলার কথা জিজ্ঞাসা করিতাম; যেখানে দু'চার জনে একত্রিত হইয়া মেলা প্রসঙ্গে আলোচনা করিত সাগ্রহে সেখানে যাইয়া যোগদান করিতাম। মনের মধ্যে নানারূপ জল্পনা কল্পনা গড়িয়া ভাঙ্গিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে চৈত্র মাস আসিল। শুনিলাম চৈত্র সংক্রান্তির দিনই হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইবে। বেলা বারোটার পর কুম্ভযোগে তথায় গঙ্গা স্নানের বিধি। মনে বড় সাধ বড় আশা সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব এবং কুম্ভযোগে গঙ্গা স্নান করিয়া জীবন সার্থক করিব।

কুম্ভমেলা সাধু সন্ন্যাসীর মেলা। প্রয়াগ, উজ্জয়িনী, নাসিক ও হরিদ্বার এই চারিটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে প্রতি তিন বৎসর অন্তর হয় অতএব পর্য্যায় ক্রমে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর ঐ কুম্ভযোগেব সংযোগ হয়। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হইয়াছিল পুনরায় দ্বাদশ বৎসর পর এইবার হরিদ্বারে কুম্ভ যোগ উপস্থিত। এই সুবিশাল আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী—যাবতীয় সাধু সম্প্রদায় হরিদ্বারে কুম্ভ মেলায় একত্রিত হইয়া থাকেন। এই শুভ সংযোগ এক কুম্ভ যোগ ব্যতীত অন্য কোন সময়েই উপস্থিত হয় না।

আমিও এই শুভ সুযোগ উপেক্ষা না করিয়া বহুদিনের সঞ্চিত প্রবল বাসনা বুকে করিয়া ৩রা এপ্রিল শনিবার রাত্রি ১১টার গাড়ীতে হরিদ্বার কুম্ভ মেলা দর্শনাভিলাষে রংপুর হইতে যাত্রা করিলাম; যাহা না হইলেই না হয় এইরূপ সামান্য জিনিসপত্র লইয়া সঙ্গী স্ত্রী—সহিত প্রাণ ভরা সুখ মনভরা আনন্দ বুকভরা উৎসাহে আমরা দুইটী মাত্র আরোহী ভাগ্যক্রমে মধ্যম শ্রেণীর একটী ক্ষুদ্র কক্ষ দখল করিয়া বিভিন্ন বেঞ্চে নিজ নিজ যত্নে রচিত সুখ-

শয্যায় আনন্দে গা ঢালিয়া দিলাম। সুখের নিশি প্রভাত হইল। আমরা বেলা আটটার সময় কাটিহার জংসন হইতে পশ্চিমগামী গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। হুস্ হুস্ শব্দে কালো ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ভীষণ লৌহ অজাগর সাঁ সাঁ করিয়া ছুটিয়া চলিল। এইরূপে অহোরাত্রি গাড়িতে থাকিয়া দ্বিতীয় দিবস বেলা ৯ টার সময় আমরা পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে পঁহুছিলাম। পূর্ব্ব পরামর্শানুসারে আমরা পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয়ের শিবালয়স্থিত ভবনে উপনীত হইয়া ধার্ম্মিক উদারচেতা দম্পতি কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া গঙ্গা স্নান এবং সুস্বাদু আহার্য্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া তৃপ্ত হইলাম। ভারতী মহাশয়ের সঙ্গে সদালাপ এবং তদীয় সারগর্ভ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে দুই দিন বিশ্রামের পর আমরা অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বেলা ৫টার সময় কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেষণ হইতে ট্রেণে উঠিয়া রাত্রি ৯টার সময় আমরা অযোধ্যা ষ্টেষণে পৌছিলাম। রাজপথানুবর্ত্তী হইতে না হইতেই পাণ্ডার দল উপর্য্যুপরি প্রশ্ন-বাণে আমাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন। কোন কোন লোভী পাণ্ডা যাত্রিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও তল্পী তল্পা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। নূতন স্থান পথ ঘাট লোক জন ইত্যাদি সকলই নূতন এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত বিবেচনা করিয়া ষ্টেষণস্থ বিশ্রাম গৃহে রাত্রিযাপন করাই সঙ্গত মনে করিলাম। নিশি প্রভাত হইতে না হইতেই পুনরায় ক্ষুধার্ত্ত পাণ্ডারদল নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধি-মানসে আমাদিগকে নানাবিধ মধুর বাক্য ছটায় প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। অগত্যা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তর জনৈক পাণ্ডার পশ্চাদনুসরণ করিয়া অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু হায়! একি দেখিলাম? এই কি রামের সেই অযোধ্যা! দেখিলাম রঘুবংশের প্রিয় নিকেতন নিত্যানন্দ—কোলাহল মুখরিত অযোধ্যা নগরী নিথর নিস্তব্ধ, দেখিলাম রঘুকুলতিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উত্তর কোশল রাজ্যের সমৃদ্ধা রাজধানী অযোধ্যা নগরী শ্রী-ভ্রষ্টা, শুনিলাম বালক বৃদ্ধ নরনারীর কণ্ঠে কণ্ঠে রামচন্দ্রের স্তুতি গাথা ও কীর্ত্তি-কথা উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু হায়! সেই ক্ষীণকণ্ঠোচ্চারিত রাম নাম ধ্বনি যেন রস-মাধুর্য্য হীন। আর কি দেখিলাম? আর দেখিলাম এক দিন শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-স্পর্শে পুলক-স্ফীতা সরযূসুন্দরী রাম-বিরহে যেন বালুকারাশি বক্ষে ধারণ করিয়া

ক্ষীণ কলেবরে দূরবর্ত্তিনী হইয়াছেন। অযোধ্যার নানা শ্রেণীর ভিখারীও ভিখারিণীগণের মুখে রাম নাম, রাম-স্তুতি, রাম-গীত, শুনিতে শুনিতে সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া রাম ঘাটে সরযূর পবিত্র সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক যথা শক্তি তীর্থ কৃত্য-সম্পন্ন করিয়া প্রধান প্রধান স্থানগুলি দর্শনান্তর বাসায় ফিরিতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়া গেল। সে দিনই সন্ধ্যা ছয়টার গাড়ীতে লক্ষ্ণৌ চলিলাম। রাত্রি এগারটার সময় লক্ষ্ণৌ পঁহুছিলাম, সেখানে রাত্রি কাটাইয়া পর দিন প্রত্যূষে তথাকার কালী-মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। অনতিবিলম্বে আমাদের গাড়ী দেবীর মন্দির-দ্বারে উপনীত হইল। এই স্থানে লক্ষ্ণৌ কালী মন্দিরের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। এই কালী-মন্দির এবং প্রতিষ্ঠিতা দেবী লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী বাঙ্গালী ভ্রাতৃগণের ধর্ম্ম প্রবণতার উৎকৃষ্ট পরিচয় এবং অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই মন্দিরে বাঙ্গালী ভ্রমণকারীগণ সাদরে আশ্রয় পাইয়া থাকেন। মন্দিরটী ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং মন্দির সংসৃষ্ট অন্যান্য গৃহাদি মৃত্তিকা দেউলে পরিবেষ্টিত খোলাঘর। মন্দির সম্মুখবর্ত্তী সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাকা পাইখানা এবং কলের জলের সুবন্দোবস্ত আছে। মন্দিরে মৃণ্ময়ী চতুর্ভুজা দেবী মূর্ত্তি, সেবা এবং পূজার জন্য একটী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নিয়ত নিযুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণ কুমার শিষ্ট শান্ত সুবিনীত এবং ভদ্র। নাম শ্রীযুক্ত হীরালাল ভট্টাচার্য্য। লক্ষ্ণৌ প্রবাসী বাঙ্গালী ভ্রাতৃগণের মাসিক চাঁদা এবং ভক্ত অতিথিগণের প্রণামী দ্বারা মায়ের পূজার্চ্চনাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া লক্ষ্ণৌ সহর দর্শনে বাহির হইলাম। অল্প সময়ের মধ্যে যত দূর সম্ভব একখানা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া ঘুরিয়া দেখিলাম। মোটামুটী যাহা দেখিলাম তাহাতে সহরের পারিপাট্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং বহু সৌধরাজির শোভাময় সমাবেশ দেখিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। আমাদের কালী মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বেলা অবসান হইল। আহারাদির পর রাত্রি নয়টার সময় ষ্টেষণাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। ষ্টেষণে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক বিরাট কাণ্ড কারখানা। অসংখ্য গাড়ীর শিকলী বাঁধিয়া হরিদ্বার-গামী ট্রেণ প্লেটফরমে অপেক্ষা করিতেছে। আমরা গাড়ীর নিকট যাইয়া দেখি সমস্ত গাড়ী গুলিই পূর্ব্ব সঞ্চিত যাত্রিগণে বোঝাই হইয়া রহিয়াছে। এদিকে তৃতীয় শ্রেণীর দ্বার উন্মুক্ত হইল। হুড় হুড়

দুর দুর করিয়া প্রবল বন্যার ন্যায় অসংখ্য যাত্রী প্লেটফরম ছাইয়া ফেলিল। আবার প্রমাদ গণিলাম। প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্নৌ ষ্টেষণ হইতেই হরিদ্বার কুম্ভ-মেলার জনতার যৎ কিঞ্চিৎ আভাস পাইতেছিলাম। যাত্রিগণ যে যেদিকে পারিল ছুটাছুটী করিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষ ভেদবিচার নাই। ঘেসাঘেসী ঠেলাঠেলী করিয়া যে যেখানে একটু স্থান পাইল বসিয়া কিংবা দাঁড়াইয়া রহিল। অঙ্গসঞ্চালন করে তেমন সুযোগ এবং স্থানাভাবে যাহারা তখনও গাড়ীতে উঠিতে পারে নাই এইরূপ সহস্র সহস্র নর নারী উদ্বেগ উৎ-কণ্ঠায় অস্থির হইয়া একবার এগাড়ী আবার ও গাড়ীতে উঁকাঝুঁকী মারিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এবং চতুর্দ্দিকে এক মহা গণ্ডগোল হুলু স্থূল হৈ চৈ রৈ রৈ ব্যাপার তদোপরি বিবিধ দ্রব্য-সম্ভার-বাহী ফিরিওয়ালাগণের নব রস সমন্বিত অপূর্ব্ব কণ্ঠ স্বরে কর্ণ কুহর বধির হইবার উপক্রম হইতেছিল, কোথাও দুষ্ট কুলীগণ ন্যায্য প্রাপ্যের চতুর্গুণ দাবী করিয়া যাত্রিগণের সঙ্গে অনর্থক বচসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর সৌভাগ্য ক্রমে একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী সংলগ্নমধ্যম শ্রেণীর গাড়ী দেখিতে পাইয়া বিদ্যুৎ গতিতে উঠিয়া বসিলাম। দেখিতে দেখিতে আমাদের মত আরও কয়েক জন লোক একে একে দর্শন দিতে লাগিলেন। ভাব গতিক বুঝিয়া আমিও সু—ভায়া মস্তকোপরি ঝুলান স্থানে নিজ নিজ শয্যা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। আমাদের নির্ব্বিবাদে নিদ্রায় নিশি ভোর হইল। যাত্রিগণের কলরবে জাগরিত হইয়া চাহিয়া দেখি আমাদের গাড়ী রায়বেরেলী ষ্টেষণে দাঁড়াইয়া আছে। বেরেলী ষ্টেষণে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল গাড়ী অপেক্ষা করিবে এই অবসরে আরোহীগণ কেহ পাইপের জলে মুখ প্রক্ষালন কেহ দন্ত ধাবন কেহ চা সেবন কেহ জল যোগ ইত্যাদি নানা কার্য্যে এক সঙ্গে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী অপেক্ষার নির্দ্ধারিত কাল অতিবাহিত হইল। গার্ডের হুইশেল বাজিল। সবুজ নিশান কাঁপিল, ইঞ্জিন ধূম উদ্গীরণ করিল। কলের গাড়ী সকলকে লইয়া আবার প্রবল বেগে চলিতে লাগিল। গাড়ী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল সূর্য্যের প্রখর কিরণ ততই অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন বেলা কয়টা বাজিয়াছে ঠিক মনে নাই। আমাদের গাড়ী ধামপুর নামক ষ্টেষণে উপস্থিত হইল। দেখিলাম গ্রামবাসিগণ দলে দলে সুশীতল পানীয় জল, ভারে ভারে বহন করিয়া আনিয়া তৃষাতুর যাত্রিগণের তৃষ্ণা

নিবারণ উদ্যোগে অযাচিত ভাবে গাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অকাতরে জলদান করিতেছে। তাহাদের জল দানে কি উৎসাহ! কি আনন্দ! কি স্ফূর্ত্তি! যদি দানে পুণ্য থাকে তবে ধামপুর পল্লীবাসী সাধুজনগণ সহস্র সহস্র তৃষাতুরের শুষ্ক কণ্ঠে সুশীতল বারি সিঞ্চন করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে ইহকালে না হউক পরকালে তাহারা নিশ্চয়ই পুরস্কৃত হইবে।

গাড়ী ছাড়িল। ইংরাজের পুষ্পক রথ দেখিতে দেখিতে বহু জনপদ নগর-নগরী-গ্রাম-পল্লী পশ্চাতে ফেলিয়া বৈকালে চারিটার সময় লুকসার ষ্টেষণে উপস্থিত হইল, হুড় হুড় দুর দূর করিয়া অগণিত নর নারী লম্ফে ঝম্পে ছুটাছুটী করিতে লাগিল। লুকসার একটী বড় জংসন ষ্টেষণ। এই জংসন হইতে সাহারাণপুর, মোরাদাবাদ, দেরাহুন প্রভৃতি স্থানের যাত্রিগণ গাড়ী অদল-বদল করিয়া থাকে আমরাও অতিশয় এস্ততার সহিত ব্যস্ত হইয়া হরিদ্বার গামী ট্রেণে উঠিবার জন্য ছুটিয়া চলিলাম। কিন্তু হায়! আমাদের মনের সাধ মনে উঠিয়া জল বুদ্বুদের ন্যায় মনেই বিলীন হইয়া গেল। বহু চেষ্টা অনেক সাধ্য সাধনা অশেষ কাকুতী মিনতি করিয়াও যখন হরিদ্বারের গাড়ীতে উঠিতে পারিলাম না তখন অগত্যা আমরা লুকসার ধর্ম্মশালার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ধর্ম্মশালায় ভারতের নানা দেশ-দেশান্তরবাসী নরনারীগণের একত্র সমাবেশ দেখিয়া পুলকে অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। পথ শ্রান্তি অনাহার অনিদ্রা-জনিত যাবতীয় দুঃখ যন্ত্রনা ভুলিয়া গিয়া এক অভূত পূর্ব্ব অত্যাশ্চার্য্য আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলাম। এই ধর্ম্মশালাটী সুবিস্তৃত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সিংহদ্বার উত্তীর্ণ হইলেই বৃহৎ প্রাঙ্গন। পাকা প্রাঙ্গনের চতুঃসীমায় পাকা কুঠুরী এবং কুঠুরীর সম্মুখে নানা জাতীয় ফুলের গাছ টবে সুশোভিত রহিয়াছে। এই সুচারু সুখসেব্য ধর্ম্মশালায় শত শত নরনারী সাধু মহাত্মা কেহ আসিতেছে কেহ যাইতেছে, কেহ রন্ধন করিতেছে, কেহ আহারে বসিয়াছে, কেহ নীরবে বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছে; কোথাও বা সঙ্গি ও সঙ্গিনীগণ একত্রে কুণ্ডলী পাকাইয়া কথোপ কথন করিতেছে, কোথাও বা কোন কোন মহা পুরুষ শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া স্বীয় সঙ্গের সাথী বিগ্রহের পূজা করিতেছে, কেহ মালা জপিতেছে আবার কেহ কেহ বা পরিতৃপ্তির সহিত তাম্রকুটী সেবন করিয়া ঊর্দ্ধ মুখে ধূমোদগীরণ করিতেছে। কোথাও বা ভিক্ষুক ভিখারিণী কোথাও বা অন্ধ

খঞ্জ কোথাও বা বিভূতী বিভূষিত সন্ন্যাসীগণ যাত্রিগণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিবিধ অঙ্গ ভঙ্গী সহকারে এবং বিভিন্ন স্বরোচ্চারণে ভিক্ষা যাচ্ঞা করিতেছে। কেহ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে কেহ পাকা প্রকোষ্ঠে কেহ বা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছে। কোথাও বা পঞ্চনদ নিবাসিনী মহিলাগণ সমবেত হইয়া ভক্তি-রসাযুক্ত বিভুগুণ গান স্বভাব-সুললিত কণ্ঠে করিয়া যাত্রীর মন প্রাণ দ্রবীভূত করিতেছে। কোথাও বা সন্ন্যাসীগণ হর হর বম বম নিনাদে দিগ্মণ্ডল বিকম্পিত করিয়া ভক্তিতে মন মাতাইয়া তুলিতেছে। সকলেই হরিদ্বার দর্শন প্রয়াসে পরম পুলকিত। আহা মরি! সে কি আনন্দময় দৃশ্য! কি উৎসাহ পূর্ণ প্রফুল্ল ভাব। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বণিক মাড়োয়ারী কুল-প্রদীপ শ্রীযুক্ত সুরযমল বাবু এই ধর্ম্মশালার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভারতের নানা স্থানে এইরূপ বৃহৎ আরও অনেক ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া উপার্জ্জিত অর্থের প্রকৃতই সার্থকতা করিয়াছেন।

আমরা লুকসার ধর্ম্মশালায় বিশ্রাম এবং আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সুস্থ হইলাম। দেখিতে দেখিতে দিনমণি সমস্ত দিন প্রখর কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া শ্রান্ত দেহে দিবা অবসানে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িলেন। একটি দুই করিয়া অসংখ্য তারকাকুল গগন মণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল। আমরা অবসন্ন-দেহে একটী কক্ষে নিজ নিজ শয্যা-রচনা করিয়া মহা আরামে নিদ্রাগত হই [illegible]। পরদিন প্রত্যুষে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনের পর—ধর্ম্মশালা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ষ্টেষণাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বহু ক্লেশে জনতা ভেদ করিয়া প্লেটফর্ম্মে যাইয়া দেখি হরিদ্বার-গামী একখানা স্পেশেল ট্রেণ প্রস্তুত রহিয়াছে। ব[illegible] বা[illegible] এই স্পেশেল ট্রেণখানি একখানা এঞ্জিন সংলগ্ন কতকগুলি মালগাড়ী ভিন্ন [illegible]র কিছু নহে। যাহা হউক আমরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটীর পর ব্যস্ততার সহিত ছ[illegible] অবস্থায় যে যে গাড়ীতে পারিলাম উঠিয়া পড়িলাম এবং অবিলম্বে আমা[illegible] [illegible]ত স্পেশেল ট্রেণ স্বভাবসিদ্ধ মৃদু মন্থর গমনে চলিতে লাগিল। অনুমান [illegible] পর আমাদের ট্রেণ হরিদ্বার ষ্টেষণে পঁহুছিল। আমরা গাড়ী হইতে অব[illegible] হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এত কষ্ট এত পথশ্রমের পর হরিদ্বা[illegible] পুণ্য ভূমিতে পদার্পণ করিয়া সত্য সত্যই যেন নব-জীবন লাভ করিলাম। প্র[illegible] রাজপথে প্রবেশ

করিয়া দেখি অবিরাম জন-স্রোত গমনাগমন করিতেছে। পথে-ঘাটে-মাঠে-ময়-দানে-দালানে-উদ্যানে-বৃক্ষতলে আনাচে-কানাচে যে দিকে নিরীক্ষণ করিলাম দেখিলাম কেবলই নরমুণ্ড, কেবলই জন-প্রবাহ। মনে হইল যেন সমগ্র ভারতের নরনারী আজ এই পুণ্য ভূমি হরিদ্বারে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। বহুদূর দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত বিবিধ পোষাক পরিচ্ছদ শোভিত বিভিন্ন ভাষী নর নারীগণের এইরূপ অপূর্ব্ব সম্মিলন বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে অবলোকন করিয়া প্রকৃতই পুলকিত হইয়াছিলাম। চতুর্দ্দিক হইতে উন্মত্ত আনন্দ ধ্বনি, সমাগত ভক্ত বৃন্দের হর্ষ কোলা-হল কর্ণ কুহরে এক অপূর্ব্ব শ্রুতি সুখ উৎপাদন করিতেছিল। বহু জনাকীর্ণ রাজ পথ অতিক্রম করিয়া আমরা কায়ক্লেশে জাহ্ণবী পুলিনে উপনীত হই-লাম। পাণ্ডা মহাশয়ের গৃহ বহুদিন পূর্ব্বেইযাত্রিগণে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। স্থানাভাব বশতঃ অগত্যা পাণ্ডার জনৈক কর্ম্মচারী আমাদিগকে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে লইয়া চলিল। আমরা একটি নৌ-সেতুপার হইয়া গঙ্গার পরপারে পঁহুছিলাম। পথ চলিতে চলিতে শ্রীসাধু বাবার আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। এই স্থলে শ্রীসাধু বাবার কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। শ্রীসাধু বাবা যে কোন্ সম্প্রদায় ভুক্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। দণ্ডী কি সন্ন্যাসী গৃহস্থ কিংবা উদাসী তাহার কার্য্য কলাপ সঠিক নির্ণয় করা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠিলনা। দেখিলাম সাজ সজ্জা মন্দ নহে, শিরে যত্নে রচিত দীর্ঘ জটাজাল, লাল টুকটুকে সিন্দুর প্রলেপে ললাট দেশ সুরঞ্জিত, বদন মণ্ডল আবক্ষ-বিলম্বিত শুভ্রশ্মশ্রুরাজী সুশোভিত, নানা রকম বিরকমের রুদ্রাক্ষ স্ফটিক প্রভৃতির মালা গলদেশে দোদুল্য-মান, গায়ে এবং পরিধানে রক্ত বর্ণ আলখোল্লা এবং বসন, বাম হস্তের মণি বন্ধন হইতে কনুইয়ের কিঞ্চিৎ নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত অনেকগুলি শঙ্খ বলয়, শ্রীচরণ যুগল বস্ত্র বিনামায় আচ্ছাদিত। তদুপরি দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলী সংলগ্ন অর্দ্ধ দগ্ধ সিগারেট তাহার তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত স্থূল অধরোষ্ঠে চুম্বিত হইয়া ঘন ঘন ধূম উদগীরণ করিতেছিল। সুধু তাহা নহে, রক্তবর্ণের সেমিজ এবং রক্ত বর্ণের বস্ত্র পরিহিত আলুলায়িতকেশা সতত অট্ট হাস্যময়ী একটি ভৈরবীকেও সন্নিকটে দেখিলাম, অনু-সন্ধানে জ্ঞাত হইলাম, উক্ত ভৈরবী নাকি শ্রীসাধুবাবার অঙ্কলক্ষ্মী পরিণীতা পত্নী এবং সহধর্ম্মিণী। এতদ্ভিন্ন শ্রীসাধুবাবার অন্যান্য আদব কায়দা নিতান্ত মন্দ নহে। বহু শিষ্য দেখিতে পাইলাম। শিষ্যগণের মধ্যে অনেককেই

নব দীক্ষিত বলিয়া মনে হইল, কেননা কেবল গেরুয়া বসন ভিন্ন জটা ইত্যাদি সাধু সন্ন্যাসীর অন্যান্য চিহ্ন তেমন কিছু দৃষ্টি-গোচর হইল না। তবে অনেকের মাথায় বড় বড় ঝাঁকড়া চুল দেখিয়া মনে হইল তাহাদের সে বাসনা ফলবতী হইতে বিশেষ বিলম্ব নাই। শ্রীসাধু বাবার অনুচরগণের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া মনে হইল তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঝল্ল-মল্ল রজক নমঃশূদ্রাদি সমাজ ভুক্ত ব্যক্তি। যাহা হউক আমরা এ হেন শ্রীসাধু বাবার আশ্রম-কুটীর শীর্ষ দেশে"শ্রীসাধু বাবা"এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া এবং শ্রীসাধু বাবা বাঙ্গালী এ কথা লোকমুখে শুনিয়া সাগ্রহে তাহার আশ্রম-সন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। নিকটে যাইয়া দেখিলাম আমাদের মত আরও অনেকগুলি আশ্রয় প্রয়াসী সন্ত যাত্রী দুয়ারে বসিয়া শ্রীসাধু বাবার সঙ্গে ঘর ভাড়া ইত্যাদির চুক্তি সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছে। আমরাও শ্রীসাধু বাবার আশ্রমসংলগ্ন ভাড়াটীয়া ঘরে থাকিবার সংকল্প প্রকাশ করায় শ্রীসাধুবাবা আমাদিগকে একটি ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর দেখাইয়া দিয়া ২৪৲ টাকা ভাড়া হাঁকিয়া বসিলেন। আমরা শ্রীসাধু বাবার ব্যবসা বুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম এবং ২৪৲ টাকা চুক্তিতে একটা বস্ত্রাবাসের অর্দ্ধাংশ ভাড়া লইয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

এই বার আমরা গঙ্গা স্নান করিতে বহির্গত হইলাম। নির্ম্মল-সলিলা জাহ্নবীর অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন এবং ব্রহ্ম কুণ্ড ঘাটে অবগাহন করিয়া মনে হইল যেন জীবনের সমস্ত পাপ-তাপ-রোগ-শোক-দুঃখ-কষ্ট এককালে বিদুরিত হইল। মনে হইল ধন্য ভারত ভূমি, যাহার বক্ষে এমন পতিতোদ্ধারিণী সন্ত কলুষ-বিনাশিনী-জাহ্নবী প্রবাহমানা।

গঙ্গার দৃশ্য অতি মনোরম। তটের সম্মুখে পতিত-পাবনী জাহ্নবী সুদীর্ঘ সোপানাবলী প্রক্ষালিত করিয়া খরতর বেগে সাগর-উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছেন! পশ্চাদ্ভাগে সৌষ্ঠব-সমৃদ্ধ শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা এবং দেব-মন্দির প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকায় গঙ্গার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ডে ক্রীড়াশীল মৎস্যগণের নির্ভয় সঞ্চলন আরও কৌতুকপ্রদ। মানুষ যেন তাহাদের কত আপনার লোক এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। জলচর এবং স্থলচরে এমন অপূর্ব্ব-সম্মিলন দর্শন, আমার জীবনে এই প্রথম বলিয়া কৌতুক এবং বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। হরিদ্বারের গঙ্গা প্রশস্ততায় ১৫০ হস্ত পরিমিত হইবে। গঙ্গার জল অতি স্বচ্ছ

এবং নির্ম্মল। আমাদের কলিকাতার গঙ্গার ন্যায় পঙ্কিল এবং মল-মূত্র-নিষ্ঠিবন এবং আবর্জ্জনাদি দুষ্ট নহে। জল এত শীতল যেন সদ্য তুষার রাশি দ্রবীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই গঙ্গার বেগ অত্যন্ত প্রখর। লক্ষ লক্ষ নর নারী সেই পবিত্র সলিলে কেহ স্নান, কেহ দান, কেহ মন্ত্র উচ্চারণ, কেহ পূজার্চ্চনায় নিরত রহিয়াছে। কোথায় বা ভক্তগণ ভক্তি গদগদ-কণ্ঠে গঙ্গা-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, কোথাও অগ্নিহোত্রীগণ যজ্ঞ করিতেছে, কোথাও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছে, কোথাও শ্রীভগবানের নাম-কীর্ত্তন হইতেছে, কোথাও পণ্ডিত মণ্ডলী একত্রিত হইয়া শাস্ত্রার্থের বিচার করিতেছেন। আহা সে যে কি নয়ন-মনোভিরাম চমৎকার দৃশ্য তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার দৃশ্য আরও মনোরম। পতিত-পাবনী জাহ্নবীর উদ্দেশ্যে যখন অসংখ্য দীপাবলী গঙ্গা বক্ষে ভাসমান হয়, তখন তরঙ্গে তরঙ্গে নৃত্যশীল সেই সমস্ত দীপ-মালার শোভা এমনই সুন্দর দেখায় যে তদ্দর্শনে ভক্ত-বৃন্দের মন প্রাণ পুলকে শিহরিয়া উঠে। হরিদ্বারের কুম্ভমেলা-প্রসঙ্গে প্রজা-বৎসল জন প্রিয় সদাশয় গভর্মেণ্ট বাহাদুরের সুবন্দোবস্তের বিষয় উল্লেখ না করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিশ কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজ-পুরুষগণ বিশেষ সাবধানতাবলম্বন করিয়া এই বহু জনতার মধ্যেও কর্ত্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হন নাই। গঙ্গা বক্ষে দশ বারটী সুদৃঢ় নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যেক সেতুর বিভিন্ন পথে যাত্রিগণের গমনাগমন নির্দ্দিষ্ট ছিল। পথে ঘাটে মাঠে ময়দানে আসিতে চলিতে এইরূপ প্রত্যেক স্থান বিদ্যুতালোকে উজ্জ্বলিত হইয়াছিল, মল-মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য গঙ্গার সুবিস্তীর্ণ চরা ভূমিতে বৃহৎ বৃহৎ পাইখানা নির্ম্মাণ করিয়া মেথরের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এমন কি পথে ঘাটে সামান্য আবর্জ্জনার সৃষ্টি হওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ সেই আবর্জ্জনা রাশি অপসারিত করিবার জন্য ঝাড়ুদারগণ সতত নিয়োজিত ছিল। রাজপথের নানাস্থানে মানচিত্র সহ সন্ন্যাসীগণের শোভা-যাত্রার কার্য্য বিবরণী লটকাইয়া দিয়া সন্ন্যাসীগণের শোভা-যাত্রা দর্শন এবং হরিদ্বারের প্রধান প্রধান স্থানে গমনাগমনের সুবিধা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। রুগ্ন জনগণের সুচিকিৎসার জন্য এবং পথ-ভ্রষ্ট ও নিরুদ্দিষ্ট বালকবালিকাগণের অনুসন্ধান সৌকর্য্যার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমাদের সদাশয় গভর্মেণ্ট

উদার হৃদয় রাজপুরুষগণের গুণে এই অত্যাধিক জনতার মধ্যেও যাত্রিদিগকে কোনরূপ ক্লেশ পাইতে হয় নাই। এতভিন্ন এলাহাবাদ এবং লাহোর সেবক সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণও যাত্রিগণের নানাবিধ সুবিধা বিধান করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ যত্ন এবং পরিশ্রম স্বীকার করিতে ক্রটী করেন নাই। এই সকল উদার হৃদয় পুলিশ কর্ম্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবক যুবকগণের শারীরিক পরিশ্রমের বিনিময়ে যে যাত্রিগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে এবং কতিপয় হতভাগ্য নরনারী পদ চালনে জীবন-লীলা সম্বরণ করিলেও অনেকের অমূল্য জীবন রক্ষা পাইয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মোটের উপর পুলিশের কর্ত্তব্যপরায়ণতা মিউনিসিপালিটার কর্ম্মপটুতা ভারতবাসী যুবকগণের পরোপকার-স্পৃহা এবং ধর্ম্মশীলতা সর্ব্বত্র সকল সময়ে এইরূপ সুনিয়মে প্রতিপালিত হইলে সুখের সীমা থাকে না।

৩০শে চৈত্র বেলা ১১টা হইতে বৈকাল ৩টা পর্য্যন্ত কুম্ভ-যোগ। এই সময় মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীগণ শোভা-যাত্রা করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে যাইবেন। আমরা যথা সময়ে গঙ্গা স্নান করিয়া সন্ন্যাসীগণের শোভা-যাত্রা দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পথে বাহির হইয়া দেখি লক্ষ লক্ষ নর নারী পথ ঘাট আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। অশ্বারোহী ও পদাতিক পুলিশ কর্ম্মচারীগণ শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে কাতারে কাতারে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে! ইংরাজ রাজ পুরুষগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। আমরা প্রখর সূর্য্য কিরণ উপেক্ষা করিয়া বহু জন পদোত্থিত বায়ু-সঞ্চারিত তপ্ত বালুকা রাশি সাদরে আলিঙ্গন করিয়া জন-সমুদ্রে মিশিয়া গেলাম। আমরা যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম সে স্থানে মিছিল পৌঁছিতে বেলা ১টা বাজিয়া গিয়াছিল। শোভা-যাত্রার আরম্ভেই দেখিতে পাইলাম সর্ব্বাঙ্গ পুষ্পমাল্যে সুশোভিত এক জন অশ্বারোহী উচ্চ পদস্থ ইংরাজ রাজ-পুরুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন তৎপশ্চাৎ অস্ত্রে-সস্ত্রে সুসজ্জিত একদল অশ্বারোহী সৈন্য, এইরূপ ক্রমে ক্রমে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ঐক্যতান বাদক দল আসাসোটা এবং বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত বহু মূল্য কারুকার্য্য-খচিত পতাকা উড়াইয়া এক দল পতাকাবাহী তৎপশ্চাৎ অশ্ব-গজ-উষ্ট্রারোহী বিভূতি-বিভূষিত কতিপয় উলঙ্গ সন্ন্যাসী। তাহার পর যাহা দেখিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। দেখিলাম দর্শক

গণের নয়ন-মন-বিমোহিত করিয়া অনুমান দুই সহস্র সংখ্যক ভস্ম-বিভূষিত উলঙ্গ সন্ন্যাসী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা যাত্রার অপূর্ব্ব শোভা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া ধীর গম্ভীর পাদ-বিক্ষেপে আগমন করিতেছেন। এইরূপে পর্য্যায় ক্রমে নাগা উদাসী, ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, স্বামী, তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী, গিরি, পুরী, ভারতী, পর্ব্বত অরণ্য, সমুদ্র, নির্ম্মল পন্থী বৈষ্ণব দাদুপন্থী গরীব দাস নাথ মহাত্মা কবীর পন্থী অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের মহাত্মাগণ সশিষ্যে সমাগত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বপশ্চাতে ৩।৪ তিন চার শত সন্ন্যাসিনী একত্রে দলবদ্ধ হইয়া ধীর মন্থর গতিতে আগমন করিলেন। তাহাদের সদ্য প্রস্ফুটিত কুবলয় মনোহর নেত্র, কান্তির অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দর্শন করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। শোভাযাত্রা গমনের সময় সাধু মহাত্মাগণ জলদ গম্ভীর নাদে মুহুর্মুহু "জয় মহাদেব কি জয়, জয় গঙ্গা মাই কি জয়, জয় শঙ্করাচার্য্য জী কি জয়, বল জয় সনাতন ধর্ম্ম কি জয়, জয় হিন্দু সন্তান কি জয়" বলিয়া যখন উচ্চৈঃস্বরে আনন্দ-ধ্বনি করিতেছিল তখন শ্রোতার মনের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বুঝান অসম্ভব।

এই মেলায় সমাগত লোক সংখ্যা বারলক্ষ পরিমিত হইবে অনুমান করা যায়। স্বনাম-ধন্য জন-প্রিয় কাশিমবাজারের অনারেবল মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সভাপতিত্বে হরিদ্বার ভীম গোড়ালে "All India Hindu Conference" নামক এক মহা সভা এবং মিঃ গান্ধীর সভাপতিত্বে গুরু-কুলের শাখা বিদ্যালয়ে আর এক সভা হইয়াছিল।

হরিদ্বার কুম্ভমেলায় অনেক রকমারী কাণ্ড-কারখানা নয়ন-গোচর হইয়াছে তন্মধ্যে একটী নূতন এবং উল্লেখযোগ্য দৃশ্য অরুণাচল আশ্রমের স্বামী দয়ানন্দের সশিষ্য কীর্ত্তনের দল। অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া কেবল এক পদ একই ধ্বনি শুনিতে লাগিলাম "প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ"। তাঁহার সম্প্রদায় এবং সংকীর্ত্তনে আর এক নূতনত্ব এই যে কীর্ত্তনীয়াগণের পরিধানে গৈরিক বসনের হাফপেণ্ট এবং গাত্রাবরণে গৈরিক আলখোল্লা, সংকীর্ত্তনের প্রধান বাদ্য-যন্ত্র খোল এবং রাম সিঙ্গার পরিবর্ত্তে ইংরাজী বাদ্য ড্রাম এবং বিগল। কি মনে করিয়া যে ইহারা করতাল যন্ত্রটীকে এখনও নির্ব্বাসিত করেন নাই সে সংবাদ আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর।

কোন্ কোন্ মহা পুরুষ হরিদ্বার কুম্ভমেলায় উপস্থিত ছিলেন সে সংবাদ জানিবার জন্য অনেকেই ব্যাগ্র একথা অস্বীকার করা যায় না। কোথাকার কোন্ মহাত্মা কি ভাবে কেমন করিয়া কোথায় ছিলেন এই বহু জনগণ মধ্যে আমরা সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। নিম্ন লিখিত মহা পুরুষগণের অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহাদের চরণ-দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি। কৃপানন্দ স্বামী রামকৃষ্ণ আশ্রম, কনখল, ভোলানন্দ গিরি হরিদ্বার, কেশবানন্দ ধামপাড়, স্বামী নিগমানন্দ পরম হংস লাইসোজা মহাল্লা, গম্ভীরানাথ হরিদ্বার, বিজ্ঞানানন্দ হরিদ্বার, ঠাকুর দাস বড় উদাসীর আখড়া কনখল। এই গেল হরিদ্বার কুম্ভমেলার মোটামুটী সংবাদ। এই মেলার সকল বিষয় বিশদ রূপে লিখিতে গেলে স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ হইয়া পড়ে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হরিদ্বারের প্রাচীন দেব-দেবীর মন্দির কয়টার নাম উল্লেখ করিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। ব্রহ্ম কুণ্ডের পূর্ব্বোত্তর ভাগ প্রবাহ-নিমগ্ন হরকি পেড়ি বা হরের যোগ-পীঠ। এতদ্ভিন্ন ভৈরবনাথ, ত্রিমস্তকধারিণী চতুর্ভুজা মায়া দেবী, সর্ব্বনাথ মহাদেব, বিশ্বকেশ্বর ললিতা দেবী, ভীমেশ্বর মহাদেব, পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি, নারায়ণের দশাবতার মূর্ত্তি, কালিকামাতার মূর্ত্তি, চণ্ডীদেবী। কনখলে সতীকুণ্ড এবং দক্ষেশ্বর শিব. এইখানে দক্ষরাজ-সুতা শিবরাণী জগন্মাতা সতী, পতি নিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়া জগতে সতী-ধর্ম্মের অতুল কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

---

# সংস্কৃত শাস্ত্রে বাঙ্গালী।

## সনাতন রূপ ও জীব গোস্বামী।

খৃঃ ১৪৮৫ অব্দে গৌরাঙ্গ প্রভুর জন্ম হয়। ২৪ বর্ষ বয়সে খৃঃ ১৫০৯ অব্দে গৌরাঙ্গ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৫৩৩ খৃঃ মহাপ্রভুর তিরোধান হয়। গৌরাঙ্গ প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর অন্তর্ধানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বহু মনস্বী পণ্ডিত ভাবুক এবং প্রকৃত ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গৌরাঙ্গ প্রভুর শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় বহু ধর্ম্ম গ্রন্থ ও জীবন-চরিত লিখিয়া-

ছেন। ঐ সমুদয় গ্রন্থ প্রকৃত পক্ষে তৎকালের বাঙ্গলার সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার ইতিহাস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বিখ্যাত ধর্ম্ম প্রাণ বৈষ্ণব, সনাতন ও রূপ গোস্বামী গৌরাঙ্গ প্রভুর জীবিত সময়েই গৃহত্যাগী হইয়া গৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। উঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী দার পরিগ্রহ করেন না ও ২০ বর্ষ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণে ব্রজবাসী হন এবং চির জীবন ধর্মালোচনা ও সদ্‌গ্রন্থ প্রচার পূর্ব্বক বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বী সাধুদের পরমোপকার সাধন করেন। অতি সংক্ষেপে আমরা এই প্রস্তাবে এই তিন সাধু গ্রন্থকারের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছি। জীব গোস্বামী তৎকৃত প্রসিদ্ধ "বৈষ্ণবতোষিণী" গ্রন্থে তাঁহার বংশ-পরিচয় দিয়াছেন, তৎদৃষ্টে দেখা যায় ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কর্ণাট রাজবংশ। এই রাজবংশীয়গণ যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ এবং কৃষ্ণ ভক্ত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এই বংশীয় রাজগণ যদ্রূপ রাজকার্য্য বিশারদ তদ্রূপ যজুর্ব্বেদের সর্ব্বশাখাজ্ঞ পরম নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই বংশের রাজা রূপেশ্বর তৎভ্রাতা হরিহর কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। এবং স্বরাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া দেশান্তরে অন্য রাজার আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। তৎপুত্র পদ্মনাভ যজুর্ব্বেদ ও উপনিষদ শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। দাক্ষিণাত্যে গঙ্গাহীন স্থানে পদ্মনাভ বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া গঙ্গাতীরে বাঙ্গলা দেশের অন্তর্গত নবহট্ট (বর্ত্তমান নাম নৈহাটী) নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন তদবধি পদ্মনাভের বংশীয়গণ বাঙ্গালী বলিয়াই পরিচিত। পদ্মনাভের বহু পুত্রের মধ্যে একজন মুকুন্দ। মুকুন্দ নবাব সরকারে চাকরী করিতেন এবং বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ইহার পুত্র কুমারদেব জমিদারী ও জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে বাক্লা-চন্দ্রদ্বীপে স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। কুমারদেবের পুত্র সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী এবং বল্লভ গোস্বামীর পুত্র জীব গোস্বামী। জীব গোস্বামী স্বকৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতা বল্লভাচার্য্য এবং জ্যেষ্ঠতাত রূপ-সনাতন ভগবানের কৃপা বশতঃই পূর্ব্ব পুরুষের সময় হইতে স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষের অর্জ্জিত রাজ্যে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এইরূপ হৃত রাজ্য বশতঃই তাঁহারা ভগবৎ কৃপালাভে সমর্থ হন। এবং তাঁহারা সাম্রাজ্য লাভ না করিলেও ধর্ম্ম রাজ্যের সম্রাট পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জীব গোস্বামীর নিজ জ্যেষ্ঠতাত সম্বন্ধীয় এই গৌরবাত্মিকা কথা সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছিল

সনাতন গোস্বামী ১৪৮৮ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫৩৪ খৃঃ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ৺বৃন্দাবন ধামে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। আজিও এই ধর্ম্মশীল বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্মৃতি ও সম্মান রক্ষা জন্য সহস্র সহস্র ভারতবাসী সম্মিলিত হইয়া আষাঢ়ী পূর্ণিমাদিনে শ্রীবৃন্দাবন ধামে ৺মদন মোহনের শ্রীমন্দিরে ধর্ম্মোৎসব করিয়া চরিতার্থ হইতেছেন।

সনাতন গোস্বামী, গৌড়েশ্বর বিখ্যাত হোসেনসাহার, প্রধান সচিব ছিলেন। তাঁহার যাবনিক উপাধি ছিল দবিরখাস। কার্য্যদক্ষতায় সনাতন, তাঁহার প্রভুর এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের ভূয়সী প্রসংসা লাভ করিয়াছিলেন। সনাতন অল্প বয়সেই প্রভূত জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জ্জন করেন এবং উচ্চ রাজসচিবত্ব পদ প্রাপ্ত হন।

রূপ গোস্বামী—সনাতন হইতে মাত্র এক বর্ষের কনিষ্ঠ। সনাতনের মৃত্যুর ৬ বর্ষ পূর্ব্বে খৃঃ ১৫৫৮, অব্দের শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রূপ গোস্বামীর তিরোভাব হয়। তাঁহার মৃত্যুর স্মৃতি জন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রাধা-দামোদর-বিগ্রহ-মন্দিরে বার্ষিক স্মৃত্যোৎসব হইয়া থাকে। জীব গোস্বামী খৃঃ ১৫৩৩ অব্দে পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয় দিবস জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবৃন্দাবন ধামে উক্ত রাধা দামোদর মন্দিরে প্রতিবর্ষে তাঁহার জন্মোৎসব হইয়া থাকে। খৃঃ ১৬১৮ অব্দে ৮৫ বর্ষ বয়ঃক্রমে জীব গোস্বামীর বৃন্দাবন প্রাপ্তি হয়। রূপ গোস্বামী ও হোসেন সাহার অধীনে একটী প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার যাবনিক উপাধি ছিল "সাকর মল্লিক"। হোসেন সাহা প্রথমে হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন, পরে হিন্দুদের সহিত বিশেষ সদয় ব্যবহার করিতেন। রূপ সনাতন উভয়েই সম্রাট হোসেনসাহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তৎকালে বাঙ্গলা দেশে রূপ সনাতন, ঐশ্বর্য্যে ও রাজ-পদ-গৌরবে, বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু রূপ সনাতনের হৃদয়ে ব্রহ্ম ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, যে ধর্ম্মালোকে তাঁহাদের অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত হইয়াছিল, পার্থিব ধন সম্পদ কোন রূপেই তাহা আবৃত করিতে সমর্থ হইল না। রূপ গোস্বামী রাজকার্য্য পরিত্যাগে প্রয়াগ ধামে শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে বৃন্দাবনবাসী হন ( ২৭ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করেন। এদিকে সনাতনের মনে

ক্রমশঃ বৈরাগ্য ভাব প্রকাশিত হইতে লাগিল। রাজকার্য্যে আর তাঁহার পূর্ব্ববৎ মনোযোগ ছিলনা; রাজকার্য্যের অবহেলা প্রযুক্ত এবং সনাতনকে সংসারী রাখার জন্ত সম্রাট, সনাতনকে কারারুদ্ধ করিলেন। কিন্তু সনাতন সংস্যারী হইতে আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। গোপনে কারারক্ষককে বাধ্য করিয়া পলায়ন করিলেন। একখানা কম্বল মাত্র লইয়া ৺কাশীধামে ৩৩ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণোপান্তে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর বলিলেন 'আবার কম্বল খানা কেন সনাতন?' তৎক্ষণাৎ কম্বলখানাও ত্যাগ করিলেন। এইরূপে মহাত্যাগী সনাতন গৌরাঙ্গ প্রভুর পদাশ্রয় প্রাপ্তিতে ধন্য হইলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া উভয় ভ্রাতা রাধা-কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে অবগাহিত হইতে লাগিলেন। জীব গোস্বামী বিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যোপার্জ্জন করতঃ সংসার ত্যাগী হইয়া ব্রজ ধামে জ্যেষ্ঠতাত দিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজকে শ্রীকৃষ্ণ চরণে বিকাইয়াছিলেন। এইরূপে এই তিন মহা-প্রাণ ব্যক্তি জীবন্মুক্ত অবস্থায় বৃন্দাবনে ভগবৎ সেবায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক শোভায় গোস্বামীত্রয় একেবারে মোহিত হইলেন। কালিন্দীর জল-কল্লোল, যমুনা পুলিনের সৈকত ভক্তি, শ্রীবন, মধুবন, কাম্যবন প্রভৃতি বন-শ্রেণীর মধুকর-গুঞ্জিত-সুগন্ধ-বহ-প্রসূণ-দাম-পরিশোভিতা-মলয় মারুতান্দোলিতা-নব কিশলয় যুতা লতার শোভা-সমৃদ্ধি, ঊর্দ্ধ পত্র, কৃষ্ণ স্তোত্র পরায়ণ আকাশোন্নত উচ্চশিরা তাল-তমাল-হিন্তাল-প্রভৃতি বৃক্ষ শ্রেণী, শ্যাম কুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের ত্রিতাপ নাশী পাপ-বিধৌত কারী সলিল রাশি প্রভৃতি প্রকৃতির সমুদয় সম্পদে, বৃন্দাবনের প্রতি ধূলি কণিকাতে ও তাঁহাদের উপাস্য রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতে লাগিলেন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন স্থান বৃন্দাবন ভূমিতে, সেই ভক্তি-মুক্তি-প্রদাতা বৃন্দাবনে, তাঁহারা যে অমৃত পান করিতেছিলেন সেই অমৃতের অংশ জগৎবাসীকে বিলাইয়া দিবার জন্ত তাঁহারা যে অমৃত ভাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে সমুদয় গ্রন্থরাশির প্রতি পংক্তিতে সেই পীযুষ-রাশি ক্ষরিত হইতেছে তাহা প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মূল্যবান সম্পত্তি তৎবিষয়ে কোন দ্বৈধমত হইতে পারেনা।

সনাতন গোস্বামী যে সমুদয় সংস্কৃত গ্রন্থ লিখেন তন্মধ্যে 'হরিভক্তি বিলাস' অতিশয় উপাদেয় গ্রন্থ, পরবর্ত্তী সময়ে অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ হরিভক্তি বিলাস হইতে অনেক প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন।

সনাতন গোস্বামী ভাগবতের একখানি টীকা গ্রন্থ লিখিয়াছেন জ্ঞান ও ভক্তি এতদুভয় মধ্যে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া ঐ টীকা লিখিত হইয়াছে। ঐ টীকার নাম 'দিকপ্রদর্শিণী'। ইহার রচিত ভাগবতামৃত রসময় কলিকা প্রভৃতি গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ আদৃত।

রূপ গোস্বামী সংস্কৃত ভাষায় বহু বৈষ্ণবী ভক্তি যুক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ সমুদয় গ্রন্থগুলি ভক্তির উৎস বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। রূপ গোস্বামীর গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া বাছিয়া অনেক শ্লোক 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। রূপ গোস্বামী নিম্ন লিখিত গ্রন্থ গুলি লিখিয়াছেন।

১। হংসদূত। ২। উদ্ধব সন্দেশ এক শ্রেণীর গ্রন্থ। হংসদূত গ্রন্থে নৈষদের একটুকু ছায়া আছে। দময়ন্তী যদ্রূপ নলের নিকট হংসদূত প্রেরণাভিলাষিণী হইয়াছিলেন ললিতাসঙ্গ রাধিকার পক্ষে কৃষ্ণ সমীপে তদ্রূপ হংসদূত প্রেরণ কল্পনা করা হইয়াছে। এইগ্রন্থে কৃষ্ণ-বিরহে রাধিকার মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে। উদ্ধবসন্দেশ গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা বিরহে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন তৎবিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণের তৎকালীন মনোভাব বর্ণিত হইয়াছে। বাল্যকালে ছিদামাদি সখা সহ এবং রাধিকা প্রভৃতি সঙ্গী সহ যে সমুদয় লীলা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা বিশদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ৩। ললিত মাধব নাটক ৪। বিদগ্ধ মাধব নাটক এই দুই খানিতে নাটকাকারে কৃষ্ণ রাধিকার মাহাত্ম বর্ণনা করা হইয়াছে। ৫। উজ্জল নীলমণি। ৬। নাটক চন্দ্রিকা। ৭। ছন্দোষ্টাদশ গ্রন্থ অলঙ্কার শাস্ত্র। শ্রীরূপ চিন্তামণি। ৯। শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলী স্তব। ১০। হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু। ১১। গোবিন্দ বিরুদাবলী। ১২। নন্দনন্দ নাটক। ১৩। চাটু পুষ্পাঞ্জলি। ১৪। লঘুভাগবতামৃত। ১৫। স্তবমালা। ১৬। প্রেমেন্দুসাগর। ১৭। প্রেমেন্দু কারিকা। ১৮। উৎকলিকাবলী। ১৯। রাগময়ী কণা। ২০। শ্রীযুক্তাখ্যচন্দ্রিকা প্রভৃতি ভক্তি ও উপাসনা গ্রন্থ। ২১। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু অতি বিস্তৃত ভক্তিরসাত্মক সারসংগ্রহগ্রন্থ। ২২। লঘু গণোদ্দেশদীপিকা। ২৩। বৃহৎ গণোদ্দেশ দীপিকা। ২৪। তুলস্যষ্টক। ২৫। বৃন্দদেব্যষ্টক। ২৬। মথুরা মাহাত্ম্য। ২৭। বৃন্দাবন ধ্যান। ২৮। স্তবমালা প্রভৃতি ভগবৎ স্তব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ একত্রিম ২৯। দানকেলি

কৌমুদী। ৩০। কৃষ্ণজন্মতিথিবিধি। ৩১। আনন্দ মহোদধি। ৩২। পদ্যাবলী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষ্ণব গ্রন্থ, রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। রূপ গোস্বামীর রচনা প্রাঞ্জল, লালিত্য পূর্ণ, ভাব বহুল এবং শব্দ-সম্পদ পূর্ণ। জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় অনুপ্রাসযুক্ত এবং গীতি কাব্যের ন্যায় শ্রুতি মধুর। রূপ গোস্বামীর কোন কোন গ্রন্থ আদিরসাত্মক কিন্তু আদির সের মানুষিক কাম গন্ধ ইহাতে নাই। কবিরাজ গোস্বামী এই সমুদয় গ্রন্থালোচনা করিয়াই বলিয়াছেন।

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ,
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ
অস্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম।
অতএব কাম প্রেম বহুত অন্তর
কাম অন্ধতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।

আমাদের উপরি উক্ত মত পোষকতায় রূপ গোস্বামীর দুইটী কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"যদা বৃন্দারণ্য স্মরণ লহরী হেতু রসণং
পিকানাং বেবেষ্টি প্রতিহরিত মুষ্টেঃ কুস্থরুতম্।
বহন্তে বাতাঃ স্ফুরতি গিরী-মল্লী-পরিমল
স্তুতৈবাস্মাবীণাং গিরমুপ হরেস্মামুরভিদি"

(হংস দূত)

"নবজলধরবর্ণং, চম্পকোদ্ভাসি কর্ণং।
বিকসিত নলিনাস্যং বিস্ফুরন্মন্দ হাস্যং।
কণককরুচিদুকুলং চারুবর্হাব চূলং
কমনিনিলিল সারং নৌমি গোপীকুমারং

(শ্রীমুকুন্দমুক্তাবলীস্তব)

রূপ গোস্বামীর গ্রন্থ মধ্যে উজ্জ্বল নীলমণি ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অতি বৃহত। উভয় গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৩০০০ হাজার। এই উভয় গ্রন্থের

টীকা তিনি নিজে লিখেন। উজ্জ্বল নীলমণির টীকার নাম "লোচন রোচনী" ভক্তি রসামৃতের টীকার নাম "দুর্গমসঙ্গমণি"। রূপ গোস্বামীর একখানা সংস্কৃত করচা গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে।

জীব গোস্বামীকৃত গ্রন্থরাজি মধ্যে (১) ষট্‌সন্দর্ভ প্রধান গ্রন্থ, এই গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ১৭০০০ হাজার। এই গ্রন্থ খানিতে ব্রহ্ম নিরূপণ, অবতার বাদ, মায়াবাদের ব্যাখ্যা সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যাখ্যা ভক্তির প্রাধান্য প্রভৃতি দার্শনিক ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণের অবতার, ভজনা, নাম মহিমা বৃন্দাবনাদির নিত্যতা প্রভৃতি ভক্তি বিষয়কতত্ব, সাত্বিক রসের উদ্দীপনা শান্তি, ভক্তি, দাস্য বাৎসল্য প্রভৃতি রসের ভাবুকতা অতি বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ হরিনামামৃত ব্যাকরণ জীব গোস্বামীর লিখিত। (৩) গোপাল চম্পু। (৪) ভাবার্থ চম্পু (৫) রসামৃত শোধ, (৬) কৃপাম্বু বিস্তর, (৭) সংকল্প কল্প বৃক্ষ, (৮) প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভক্তি গ্রন্থ, জীব গোস্বামীর লিখিত। কি ভাষা-সম্পদে কি ভাব-গাম্ভীর্য্যে এই সমুদয় গ্রন্থ সমূহ কোনরূপেই হীন নহে। ভাষা প্রভৃতি কতকগুলি টীকা গ্রন্থ ও জীব গোস্বামী কর্তৃক লিখিত হইয়াছে।

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

---

# ফুলের মুকুট।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

৪

"মিঃ সিড্‌রিক! ডাক্তারদের কাজ বড়ই নির্ম্মম—বড়ই কঠিন। অনেক সময়ে তাদের অপ্রিয় কথা বল্‌তে হয়। সেই জন্য আমায় মাপ কর্ত্তে হবে। আমার বিশ্বাস আপনি সঙ্গীতের শক্তি জন্মের মত হারাইয়াছেন। আমার ভুলও হ'তে পারে। আমার যা মত তাই আমি প্রকাশ কল্লুম। আপনি অন্য ডাক্তার দেখান তাঁরা কি বলেন দেখুন—"

সিড্‌রিক অস্পষ্ট স্বরে বলিল 'আপনি তাঁদের নাম আমায় বলে দিন। আমি সকলকেই জিজ্ঞাসা করব। আমার বিশ্বাস আমি জন্মের মত আমার সুর হারাই নাই। থাকবার মধ্যেত আমার শুধু এই আছে।"

ডাক্তার সমস্ত নাম লিখিয়া দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি জানিতেন এ অনুসন্ধানের ফল কি হইবে।

সিড্‌রিক উন্মত্তের মত ডাক্তারের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে বেড়াইতে বেড়াইতে উদ্যানাভিমুখে গেল। তখন সন্ধ্যার গাঢ় ছায়া পৃথিবীকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছিল। বিহগকাকলী-মুখরিত বৃক্ষশ্রেণী সান্ধ্য বাতাসে শিহরিয়া উঠিতেছিল। ভ্রমণ-বিলাসীরা ভ্রমণ করিতে করিতে হাস্য কৌতুক করিতেছিল। চারিদিকেই,-আনন্দ চারিদিকেই একটা সজীবতার লক্ষণ। আর সিড্‌রিকের হৃদয়? তাহা হইতে আজ আর কোন তান উঠিতেছিল না। সেখানে শুধু গাঢ় নিরাশা আপনার আধিপত্য সম্পূর্ণ ভাবে বিস্তার করিতেছিল।

সুরভিসিক্ত-শীতল-সান্ধ্য-বায়ুতে সিড্‌রিক কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইল। তারপর ধীরে ধীরে আপনার বাসাভিমুখে প্রস্থান করিল। বাসায় যাইয়া দেখিল লীনা সেখানে নাই। সে শান্তির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আপনার ট্রাঙ্ক গুছাইল। তার পর একখানা গাড়ী ডাকাইয়া লণ্ডনের সেই বিশাল জন সমুদ্রের মধ্যে মিশিয়া গেল।

কয়েক মাস যাবত সিড্‌রিক ইউরোপের সমস্ত যায়গা ঘুরিল। কত বড় বড় ডাক্তার দেখাইল। কিন্তু হায়! সকলেরই মত সুর ভাল হইবে না। এদিকেও টাকা ফুরাইয়া আসিল। সে রিক্ত হস্তে আবার লীনার দুয়ারে উপস্থিত হইল।

কিন্তু লীনা পূর্ব্বের বাসায় নাই। সে বাসা পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তাহার পিতার অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী এখন এক মাত্র সে! লীনা নিজের ইচ্ছামত বাসা খুঁজিয়া নিয়াছে।

সিড্‌রিক উন্মত্তের মত লীনার নূতন বাড়ীতে চলিল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল "যদিও আমার সব গিয়াছে কিন্তু প্রেমময়ী লীনা ত আছে। আমি সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া টাকা অর্জ্জন করিব তারপর দেখিব লীনাকে লইয়া সুখী হইতে পারি কি না!"

লীনার সঙ্গে দেখা হইল। সিডরিফ তাহার হাত ধরিয়া বলিল "লীনা আমি আসিয়াছি।—

লীনা জিজ্ঞাসা করিল "তোমার খবর কি? আমি শুনিয়াছিলাম তুমি নাকি তোমার কণ্ঠের চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলে। কণ্ঠস্বর ভাল হয়েছে ত?"

সিডরিফ্ দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া হতাশভাবে বলিল "না—লীনা। আমি জন্মের মত সে অমূল্য জিনিষ হারাইয়াছি। কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি লীনা। আমি সে কথা বলিতেই আজ তোমার নিকট আসিয়াছি।"

একটা বিদ্রূপের হাসি লীনার ওষ্ঠে অলক্ষিতে উঠিয়া আবার লয় পাইল। সে বলিল "ধন্যবাদ।"

সিডরিফ বলিল "লীনা আমি প্রাণপণ পরিশ্রম কর্‌ব। তোমার কিছুই অভাব হইবে না। বল লীনা তুমি আমায় ভালবাস? সেই আগেকার মত?

পাষাণী উত্তর করিল "আমি মিথ্যা কি করে বলি সিডরিফ? সত্যি আমি তোমাকে ভালবাসি না। হাঁ্যা, যখন তোমাকে সম্মান ভূষিত দেখেছিলুম— মিথ্যা বল্‌বনা—যখন তোমাকে জয়ী দেখেছিলুম তখন আমার মনটা একটু কেমন হয়েছিল। বোধ হয় তখন একটু ভালও বেসেছিলুম।"

সিড্‌রিফ ব্যাগ্রভাবে বলিল "কিন্তু পবিত্র ভালবাসাত সকল অবস্থাতেই সমান থাকে।"

"তা হলে বোধ হয় তা' ভালবাসা নয়। সামান্য একটা মোহ হবে। তা থাক্‌-আমি তোমার সেই পরাজয়ের দৃশ্য জীবনে ভুল্‌তে পারব না।"

সিডরিফ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "কিন্তু তুমি ত বলেছিলে যে তুমি আমাকে ভালবাস।"

"আমি এখন ঠিক বল্‌তে পার্‌ছিনা। কেন যে তোমায় সেই কথা বলে- ছিলুম তাও ঠিক্ মনে নাই। বোধ হয় তুমি যদি সেরূপ থাক্‌তে তবে আমার মোহ টুটে যেত না। এখন আমি মণ্টফোর্ডকে বিবাহ করিব বলে অঙ্গীকার করেছি, তোমাকে বিবাহ করে দরিদ্রতাকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত নই। ক্ষমা কর।"

সিডরিফ কত অনুনয় করিল কত তিরস্কার করিল। কিন্তু সেই পাষাণীর হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। সে বলিল "শোন সিডরিফ তুমি যদি বেশীদূর অগ্রসর

হও তবে আমার ধৈর্য্যের সীমা হয়ত, হারিয়ে ফেল্ ব।”

“কি বল্ বে ?”

“শোন সিড্ রিফ। তুমি ভবঘুরে! আর আমি অগাধ-সম্পত্তির অধি-কারিণী, তুমি কি মনে কর আমি একজন ভবঘুরের অঙ্কশায়িনী হব ?”

সিড্ রিফ আর কিছু বলিল না। এক হৃদয়-ভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, নয়নে দুই বিন্দু জল লইয়া সেই স্থান হইতে কম্পিত পদে চলিয়া গেল। সিড্-রিফের এভাবে কি জানি লীনা কেমন কেমন হইয়া গেল। সে বিস্মিত ভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

উন্মাদের মত সিড্ রিফ রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। শত শত চিন্তা তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইয়া তাহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। কতবার তাহার মনে হইল আর কেন ? এখানেই এই ঘৃণিত জীবনের অবসান করিয়া দেই। কিন্তু আবার ভাবিল, কেন মরিব! দেখি এই অবস্থার শেষ কোথায়!

তাহার ছাত্রবৃন্দ একে একে তাহাকে ত্যাগ করিল। একে একে তাহার শেষ সম্বল শেষ সঞ্চিত ধনরাশিও ব্যয় হইয়া গেল। সিড্ রিফের উন্মত্ততা আরও বাড়িয়া উঠিল! সে বলিল “কেন আমার এমন হইল ঈশ্বর!”

আজ সাতদিন পর সিড্ রিফ তাহার টেবিলে বসিয়া আহার করিতে বসি-য়াছে এমন সময় বাহিরের সিঁড়িতে খট্ খট্ শব্দ হইল। এ কে—বাড়ীওয়ালা ? ভাড়া চাইতে আসিয়াছে ? সে কি দিবে—তার এক কপর্দ্দকও আর নাই। তাহার হাত হইতে খাদ্য পড়িয়া গেল। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কম্পিত পদে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া গেল। কে যেন পরিচিত মোহন স্বরে ডাকিল “সিড্ রিফ তুমি কোথায় ?”

একি! এযে এলেন! ঠিক সেই পরিচিত ভাবে ডাকিতেছে “সিড—সিড্ রিফ।”

সিড্ রিফ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল। এলেন ধীরে ধীরে আসিয়া সিড্ রিফের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল “সিড্ রিফ অমন কর কেন ? তুমি কি তোমার এলেনকে ভুলিয়া গিয়াছ ? আমি ত তোমাকে এক নিমেষের জন্যও ভুলিতে পারি নাই। আমায় কে যেন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল যে তুমি

একদিন এ অবস্থায় পতিত হবে। সিড্‌রিফ আমি তোমায় নিতে এসেছি। তোমার পিতা একদিন এ অভাগিনীকে স্থান দিয়াছিলেন আমি তা কেমন করে ভুলব? তোমার পিতার মৃত্যুর পর তাঁর যা কিছু ছিল সমস্তই আমি পেয়েছি তুমি ত আর দেশে গেলে না। আমি সেই টাকা দিয়ে দেশে জমী কিনে যা কিছু অর্জ্জন করেছি তা সমস্তই তোমার। তুমি নাও,—নিয়ে তোমার এলেনকে ধন্য কর। এলেন শুধু তোমাকে পেলেই তার জীবন সার্থক মনে কর্‌বে।"

ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া সিড্‌রিফ চাহিল,—দেখিল আবার সেই উপেক্ষিতা অনাদৃতা এলেন যাহাকে সে নির্ম্মমের মত পরিত্যাগ—করিয়া চলিয়া আসিয়াছিল সেই আজ একা এই হৃদয়-হীন জগতের মাঝখানে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া! সকলে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে কিন্তু এক এলেনই তাহাকে ত্যাগ করে নাই। বিস্মিত বিমুগ্ধ সিড্‌রিফ বিস্ফারিত লোচনে দেখিল শত শত লীনার সৌন্দর্য্য যেন আজ এলেনে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সে দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে হৃদয়ে টানিয়া লইল। এলেন হাসি মুখে সেই দলিত শুষ্ক ফুলের মুকুটটী সিড্‌রিফের মাথায় পরাইয়া দিল।

সম্পূর্ণ।

শ্রীযামিনীমোহন সেন।

# পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী সংস্কার।

'গোবর অতি পবিত্র'—এইটুকু মাত্র জানিয়া হিন্দুরমণীগণ প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়াই প্রাঙ্গণে ও বাটীর চতুর্দ্দিকে গোবর-মিশ্রিত জলের ছড়া দেয়, উক্ত জলদ্বারা বাস্তগৃহের দরজার পুরোভাগস্থিত সিঁড়িতে লেপ প্রদান করিয়া থাকেন; যদি কখনও কোনও বাটীতে উহার অভাব দেখা যায়, তবে মুক্তকণ্ঠে রমণীগণ বলিয়া উঠেন—এইবার গৃহে অলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হইবে, অনাচার হেতু গৃহলক্ষ্মী পলায়ন করিবে, বাস্তভিটায় পিশাচের আবির্ভাব হইবে ইত্যাদি।' গোবর জিনিষটী হিন্দুর ভক্তি আদরের বস্তু;

পাড়াগাঁয়ে গোবর ব্যতীত হিন্দুগৃহিণীগণের এক দিনও চলে না। তাহারা কোনও কারণ প্রমাণ খোঁজেন না, তাহারা পুরুষ-পরম্পরা আচরিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই কারণ প্রমাণের যুগে যতদিন পর্য্যন্ত গোবর কি তুলসী বৃক্ষের ভিতর ম্যালেরিয়া রোগ প্রভৃতি কঠোর রোগের বীজ ধ্বংসের অত্যদ্ভুত শক্তি বিদ্যমানতার প্রমাণ না হইয়াছিল ততদিন পর্য্যন্ত তুলসীপূজা কি গোবর ছড়া ব্যাপারটী অপরের চক্ষে হিন্দুদের কুসংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসের ফল বলিয়াই বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। এইরূপ বহু সংস্কার হিন্দু সমাজ আবদ্ধ; কেবল হিন্দু সমাজ কেন, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে জগতের প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতির ভিতর এরূপ কোনও না কোনও সংস্কারের কম-বেশ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সংস্কার গুলি 'কু' কি 'সু' তাহার আলোচনা করা আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, উক্ত সংস্কার গুলি সংগ্রহ করিয়া সংরক্ষণ করিবার নিমিত্তই আমাদের এই আয়াস, হয়ত কালে গবেষণা দ্বারা যদি সংস্কার গুলির প্রকৃত তথ্য ও মুখ্যউদ্দেশ্য আবিষ্কৃত হইবে।

সংস্কার গুলি যদিও স্ত্রী পুরুষ এই উভয় জাতির মধ্যেই কার্য্যকরী দেখিতে পাওয়া যায়, তবুও উহাদের প্রভাব সাধারণতঃ রমণীবৃন্দের চিত্তেই বিশেষরূপে বদ্ধমূল রহিয়াছে,—লঙ্ঘন করিবার প্রয়াস পাইলে গৃহলক্ষ্মীদের তাড়নায় অস্থির হইয়া ক্ষুব্ধভাবে ফিরিয়া আসিতে হয়, তাই এই প্রবন্ধের নাম 'মেয়েলী সংস্কার'।

১। মায় দুধদিতে 'না' করবে না।

২। ডাইন হাতের তালু চুলকাইলে—টাকা আসে। ডাইন—দক্ষিণ।

৩। বাম হাতের তালু চুলকাইলে—টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা।

৪। দক্ষিণ মুখে মুখ করিয়া গরু বান্ধে না।

৫। যাত্রা কালে চুণ বলতে নাই, বলিতে হইলে বলে 'শবইথ'।

৬। দোকানী রাত্রিতে কঙ্কী বা সুঁচ বেচে না।

৭। রাত্রিকালে হলুদ কিনিতে হইলে বলিবে 'রাঙ্গাইল'—নতুবা দোকানী দিবে না।

৮। যাত্রা কালে সঙ্গে লেবু বা ঝিনুক লয় না।

৯। যাত্রা করিয়া লেবু খাইতে নাই।

১০। কলা বা পিঠা খাইয়া যাত্রা করিতে নাই।

১১। জ্যৈষ্ঠ মাসে পুত্রের মাতা সেলাই করে না।

১২। মায়ের নাম লইতে নাই ;—ঘাটের মুগুর হয়।

১৩। ধোপার নাম লইলে খাড়ে দেওয়া কাপড় ছাপ হয় না।

১৪। মল ত্যাগ করিতে বসিয়া কথা কইতে নাই,—ফোট হয়।

১৫। রাত্রিকালে একডাকে উত্তর দিতে নাই।

১৬। খাইয়া অমনি পেটে হাত বুলাইতে নাই—শক্তি হানি হয়।

১৭। মাগুর মাছের মাথা পুরুষের খাইতে নাই—স্ত্রী মরে।

১৮। ঘিয়ে দুধে একত্র করে না।

১৯। লেবু চুরি করিলে রোঁয়ায় ২ খসিয়া পড়ে অর্থাৎ কুষ্ঠ হয়।

২০। আউক ( ইক্ষু ) রুইতে আইস্যাচায় নতুবা মাগ মরে।

রুইতে—রোপন করিতে। মাগ স্ত্রী।

আস্য—বংশানুক্রমিক প্রথা।

২১। বুকে ভাত ঠেক্‌লে বলে=কি যেন নাম লয়।

২২। নষ্ট চন্দ্রদিনে চুরি করিয়া খাইলে পুণ্য হয়।

২৩। নিম্ব বা বেলের শিকড় ঘরের ভিটিতে প্রবেশ করিলে অলক্ষ্মীতে পায়।

২৪। পরিহিত কাপড় সেলাই করিলে সুঁচবাত হয়।

২৫। ভাদ্রমাসে গোপেরা নবনীত তোলে না।

২৬। ভেদা মৎস্য পুরুষের খাইতে নাই—ন্যাদা হয়।

২৭। হঠাৎ কাছা খুলে গেলে বলে—অতিথি আসিবে।

২৮। হঠাৎ কাছা খুলে গেলে বলে,—ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মৃত্যু হয়।

২৯। হরিদ্রাপাখী গৃহস্থের বাড়ীতে ডাকিলে বলে—কুটুম্ব আসিবে।

৩০। বানরের উচ্ছিষ্ট ফল খাইলে—কাশি যায়।

৩১। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিতে নাই।

৩২। তালুতে ভাত উঠিলে বলে=কে যেন নাম নেয়।

৩৩। খাবার কালে হাঁচি আসিলে একটু জল খাইয়া পরে খাইতে হয়।

৩৪। গরুর দড়ী ডেঁইয়া যায় না—মাড়াইয়া যাইতে দোষ নাই।

৩৫। পাঁঠার দড়ী ডেইয়া যাওয়া দোষ, মাড়াইয়া যাইতেও দোষ ধরে।

৩৬। বাপ মা থাকতে একাদশী করিতে নাই।

৩৭। হাতে হাতে ভিক্ষা দেয় না।

৩৮। কুলাতে করিয়া কিছু খাইতে নাই।

৩৯। খইএর মউল্কা পুরুষে খায় না।

৪০। নারিকেলের আঁটি বা চাউল মাপিবার 'পুরা' পাতিয়া বসে না—কুরও হয়।

৪১। বোঝার উপর বস্তে নাই—মাজা ব্যথা হয়।

৪২। ঘাড় বেদনা করলে বালিস রৌদ্রে দেয়।

৪৩। বাতির আগুণে 'মরা' পোড়েনা—পুড়লে বংশের কেহ থাকেনা।

৪৪। ছেলে পিলেকে খাওয়াইয়া মুখে তেল মাখিতে হয়—নতুবা ভূতে পায়।

৪৫। লিচু গাছ চতুঃসীমার ভিতর রাখিতে নাই।

৪৬। খাওয়ার শেষ ভোজন পাত্রে জল ঢালিতে হয়, অন্যথা যদি বিড়ালে চাটে তবে পিত্তশূল রোগ হয়।

৪৭। খাওয়ার শেষ উচ্ছিষ্ট লবণে জল দিতে হয়।

৪৮। শত্তুরেরেও একটা কিল দেয় না।

৪৯। গর্ভাবস্থায় নারিকেল জল খায় না—খাইলে সন্তানের চোক বিড়ালের চোকের ন্যায় হয়।

৫০। ছেলেপিলে কোলে থাকিলে নমস্কার লয় না।

৫১। নূতন ডুলা কিনিয়া মৎস্য ব্যতীত বাটীতে আনিতে নাই।

৫২। স্ত্রীর বামপাশে শুইলে আয়ু হানি হয়।

৫৩। এক জল দুইবার গরম করিয়া খাইতে নাই।

৫৪। সাপে কামড় দিলে বলে—কেউচ্ছায় ছুঁইয়াছে—নতুবা বিষ নামেনা।

৫৫। একই উচ্ছিষ্ট থালেতে ক্রমান্বয়ে তিনজনের খাইতে নাই।

৫৬। 'পুরাতে' করিয়া খাইতে নাই।

৫৭। অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে ধোপাবাড়ীতে কাপড় দিতে নাই।

৫৮। উক্ত তিথিতে ধান সিদ্ধ করিতে নাই,—থাড়ে কাপড় সিদ্ধ করিতে নাই।

৫৯। দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া পুত্রের পিতার খাইতে নাই।

৬০। দক্ষিণদিকে মুখ করিয়া পোয়াতী সন্তানকে দুধ দিবে না—দুধহাগা হয়

৬১। মাথায় হাত দিয়া থাকতে নাই।

৬২। গালে হাত দিয়া বসিতে নাই।

৬৩। ঘাড়ের পেছনে দুই হাত রাখিয়া দাঁড়াইতে নাই।

৬৪। তিন তরকারীর যোগে পুত্রবতী রমণীর তরকারী রাঁধ্‌তে নাই।

৬৫। সুধু ডাইল দ্বারা পুত্রের মাতা ভাত খায় না।

৬৬। গামছা হারান বড় দোষ, সেই দিনই নূতন কিনিলে দোষ সারে।

৬৭। এক ডুব দিতে নাই।

৬৮। কাছা খুলিয়া নদী পার হইতে নাই।

৬৯। লাফ দিয়া খাল পার হইতে নাই—আয়ুক্ষয়ে।

৭০। আগুণের উপর নূতন করিয়া আগুণ তোলে না।

৭১। রাত্রে চুণের হাঁড়িতে জল দেয় না,—অম্লরোগ হয়।

৭২। রাত্রে চুণের পাত্রে চুণ তোলে না।

৭৩। এক বাড়ীর বাতির আগুণ অন্য বাড়ী দিতে নাই।

( ক্রমশঃ )

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

# বিক্রমপুরের গ্রাম্য-বিবরণ।

## মধ্যপাড়া।

মধ্যপাড়া বিক্রমপুরের মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী গণ্ডগ্রাম। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় দেড় মাইল এবং প্রস্থও এক মাইলের অধিক হইবে। ইহার উত্তর সীমানায় ইছাপুরা গ্রাম, দক্ষিণে ধাইরপাড়া ও পোড়াগঙ্গার খাল, পশ্চিমে জৈনসার এবং পূর্ব্বে মালপদিয়া। মধ্যপাড়া গ্রামটীকে অনেকাংশে বিভক্ত করা যায়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিভাগগুলিই উল্লেখযোগ্য, যথা—ঘোষালটুনি, মাঁদারবন, বশিষ্ট-পাড়া, সেনপাড়া, পাড়ঝার, কৃষ্ণমঙ্গল, কুকির হাটখোলা, দত্তের বাগ, করার বাগ, কুণ্ডুপাড়া, রতন সেনের দিঘীরপাড়। এই সকল অদ্ভুত নামাবলীর কারণ সংগ্রহ করিতে না পারায়; আর উল্লেখ করিলাম না।

লোক সংখ্যা :—

এই গ্রামের লোক সংখ্যা অনুমান চারি হাজারেরও অধিক হইবে। তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, মালাকার, তেলি, কুম্ভকার, ধোপা, নাপিত, নমঃশূদ্র, ভূইমালী এবং বারুই। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা অনেক কম।

গ্রামটী খুব বড় না হইলেও এখানে শিক্ষিতের সংখ্যা যথেষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ,—উপাধিধারীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে।

দেবমন্দির :—

এই গ্রামের পূর্ব্বভাগে বহু প্রাচীন একটি "কালীবাড়ী" আছে। দেবী বড় জাগ্রতা। উক্ত "কালীবাড়ীর" সেবাইত শ্রীযুত রাজমোহন বশিষ্ট। তিনি প্রত্যহ মায়ের অর্চ্চনা করেন। মধ্যপাড়া এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা সময় সময় মায়ের নিকট ছাগ বলি ও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মায়ের মন্দিরের নিকটে মেলা বসিয়া থাকে। এ কালীবাড়ীর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা কে সে বিবরণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও জানিতে পারি নাই।

গ্রামের উত্তরাংশে শ্রীযুত জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীর উত্তর দিকের পুষ্করিণীর পূর্ব্বপারে একখানা ক্ষুদ্র মন্দিরে "কালীমাতার" প্রস্তরমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। উক্ত প্রস্তর মূর্ত্তিটী স্বর্গীয় কমল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা স্থাপিত। বর্ত্তমানে উক্ত মন্দিরের সেবাইত শ্রীযামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মন্দিরে দৈনিক পূজা হয় না, কোনও কোনও বিশিষ্ট তারিখে হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এখানেও বৈশাখ মাসের কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনে মেলা বসিয়া থাকে। প্রাচীনকালে উক্ত স্থানে রথযাত্রা ও মেলা বসিত। বর্ত্তমানে নানা কারণে উহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। এখন আর গ্রামবাসীর সেই উৎসাহ কিছুই নাই।

এই গ্রামবাসী শ্রীযুত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতেও একখানা "পটেরজয়কালী" স্থাপিত আছে। কথিত আছে উক্ত "পটেরকালী" চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মাতা স্বপ্নে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি তিনি উক্ত "পটের-জয়কালী" ও "ঘট" স্থাপিত করিয়া নিজেই পূজা দিয়া আসিতেছিলেন। এখন তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্ত্রী প্রত্যহ পূজা দিয়া থাকেন। প্রতি বৎসরই একদিন সমারোহের সহিত ছাগ মহিষাদি বলিদান পূর্ব্বক মায়ের অর্চ্চনা হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে সেই দিন ব্রাহ্মণ ভোজনও হয়। গ্রামবাসীরাও সময় সময় এখানে নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা দিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য—অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য বাড়ীতেই প্রত্যহ নারায়ণবিগ্রহ ইত্যাদি পূজা হইয়া থাকে।

স্কুল ও টোল ঃ—

বর্ত্তমানে এই গ্রামে ২।৩টী বালক পাঠশালা, একটী বালিকাবিদ্যালয় ও একটী উচ্চ প্রাইমেরী বিদ্যালয় আছে। এখান হইতে ইছাপুরা উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়টী সন্নিকটে বলিয়া এতদিন এখানে কোন স্বতন্ত্র উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমানে ইছাপুরা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছাত্রাধিক্য বশতঃ অনেক সময় নিম্নশ্রেণীতে ছাত্রেরা ভর্ত্তি হইতে পারে না। কাজেই দুই বৎসর যাবত এই গ্রামে একটী "মধ্য-ইংরেজী" বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

আশা করি মধ্যপাড়ার ন্যায় জন-প্রধান ও সমৃদ্ধিশালী গ্রামে এই চেষ্টা ফলবতী হইবে।

এই গ্রামে পণ্ডিত শ্রীযুত তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের একটী "টোল" আছে। বর্ত্তমান সময়ে টোলটীর অবস্থা বড়ই শোচনীয়; কারণ পড়ুয়ার সংখ্যা অতি কম। পূর্ব্বে বিদেশ হইতেও অনেক পড়ুয়া আসিয়া উক্ত টোলে অধ্যয়ন করিত। বর্ত্তমানে উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের টোলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না থাকায় টোলটীর অবস্থা এত হীন হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি শিরোমণি মহাশয় একটুকু যত্ন নিলে টোলটী উন্নতির পথে ধাবিত হইতে পারে।

পাঠাগার :—

এই গ্রামে সাধারণের পাঠের জন্ম বর্ত্তমানে কোন পাঠাগার নাই বলিলেই হয়। একবার কতিপয় শিক্ষিত যুবকের উদ্যমে "The friends' union" নামক একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে উহার অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে শীঘ্রই উহার অস্তিত্ব লোপ পাইবে। গ্রাম্য-যুবকগণের এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

ইহা ছাড়া গ্রামে আরও ২।৩টী ছোট রকমের পাঠাগার ছিল, যথা—"The Boys' Library", "Chaitanya Library" এবং "Sen family Library", বর্ত্তমানে এই সকল লাইব্রেরীর একটীও বিদ্যমান নাই। সমুদয়ই জল-বুদ্বুদের ন্যায় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

ক্রীড়া-কৌতুক :—

এই গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমানায় ইটখোলা নামক মাঠে একটী বটবৃক্ষ আছে। উহা সাধারণের নিকট "সিদ্ধেশ্বরী" নামে পরিচিত। হিন্দু রমণীগণ এই বৃক্ষটীকে খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকেন এবং দেবতাজ্ঞানে তৈল সিন্দুর বিলেপন ও দুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকেন। 'মানত' দিবার জন্য কেহ কেহ ছাগ মহিষ ইত্যাদি বলি দিয়াও পূজা দেন। বৈশাখ মাসের কোনও বিশিষ্ট তারিখে উক্ত মাঠে মেলা বসিয়া থাকে। পৌষ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত উক্ত মাঠে "ক্রিকেট" ও "ফুটবল" খেলা হয়। উক্ত ক্লাবটী "সিদ্ধেশ্বরীক্লাব" নামে পরিচিত।

এতভিন্ন গ্রামে আরও ২।১টী ক্লাব আছে, যথা :—"The North-west End Club", "The Senpara Tennis-Club". বর্ত্তমানে ক্লাবগুলির অবস্থা তত আশাপ্রদ নয়।

পূর্ব্বে বালকগণ দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট্, ডুগুডুগু, বৌয়াছি প্রভৃতি নানা প্রকার খেলা করিয়া আমোদ অনুভব করিত, কিন্তু এখন আর সে সমস্ত দেশীয় খেলার বড় একটা প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। বালকগণ এখন সে সমস্ত খেলার রুচি "ফুটবল" ও "ক্রিকেট্" খেলায় বরণ করিয়া লইয়াছে।

ছোট ছোট ছেলেপেলেরা এখনও চোক্-বুজানি, লোস্তালোস্তা, কুমইর-কুমইর, বুদ্ধিমন্ত, ডাঙ্গাগুটী, হৈলডুব প্রভৃতি খেলিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করিয়া থাকে।

মেলা ও আমোদ :—

প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে গোয়ালবাড়ীর নিকট "চড়কপূজা" হইয়া থাকে, এবং তথায় একটা বড় রকমের মেলা বসিয়া থাকে। এতদ্‌ভিন্ন বৈশাখ মাসে "কালীবাড়ী," "সিদ্ধেশ্বরী," "উত্তরপাড়া" প্রভৃতি স্থানে আরও ৩।৪টী "মেলা" বা "গলুইয়া" বসিয়া থাকে। এই সকল মেলা হইতে মধ্যপাড়া ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ এক বৎসরের ব্যবহারোপযোগী ধনিয়া, সরিষা, জিরা প্রভৃতি মাল মসলা ক্রয় করিয়া রাখে মেলায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয়। এই সমস্ত গলুইয়ায় জুয়াখেলার খুব বাহুল্য দেখা যায়।

দোলের 'হুলির' দিন এ গ্রামে একটী শোভাযাত্রা বাহির হয়। 'হুলির' দিন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিশেষ আমোদ অনুভব করেন।

এ গ্রামে ১২।১৩ খানা দুর্গোৎসব হইয়া থাকে ; এবং বর্ত্তমানে কতিপয় বৎসর যাবত জৈনসারের বাবুদের চেষ্টায় ভবানীপুর হাটের নিকট একটী দশহরা মিলে। তথায় মধ্যপাড়া প্রভৃতি গ্রাম হইতেও প্রতিমা নীত হয়। দশহরায় নৌকাবাইচ, আতসবাজী, গান-বাদ্য প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ হইয়া থাকে। পূজার নবমী গাওয়া ও 'লক্ষীরছড়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে গ্রীষ্মাবকাশে ও পূজার ছুটীতে গ্রামের যুবকগণ কর্ত্তৃক 'নাট্যাভিনয়' হইত, কিন্তু বর্ত্তমানে গ্রাম্য-যুবকগণের সেই উৎসাহ নাই।

চৈত্র মাসে 'চড়কপূজার' সময় গ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা "কালীরকাচ্" বাহির করে। ইহারা সন্ধ্যার পরে বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে বাড়ী বাড়ী যাইয়া নানা প্রকারের সাজ-সজ্জার সহিত অভিনয় করিয়া থাকে। প্রথমেই কালী নাচ হয়. তৎপরে 'বাইদা' প্রভৃতি নানা প্রকারের কৌতুকপ্রদ সং ও গীত হয়।

**পোষ্টাফিস ও হাট বাজার :—**

গ্রামে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিশ আছে। নিকটবর্ত্তী টেলিগ্রাফ আফিশ এক মাইল দূরে ইছাপুরা গ্রামে।

মধ্যপাড়ার হাট প্রসিদ্ধ। সপ্তাহে দুই দিন রবিবার ও বুধবার—হাট বসে। জামাই ষষ্ঠী, পৌষ সংক্রান্তি, শ্রীপঞ্চমী, মাঘী-সপ্তমী, চৈত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে এবং শীতকালে প্রত্যহ সকালে বাজারও মিলিয়া থাকে। গ্রাম্য গৃহস্থের আবশ্যকীয় যাবতীয় সামগ্রী হাটে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হাটে ৩ খানা মুদি দোকান, ২ খানা মনোহারী দোকানও এক খানা কাপুড়িয়া দোকান স্থায়ী ভাবে আছে।

হাটের সন্নিকটে শ্যামসিদ্ধির প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত মিত্র মহাশয়ের একটী কাছারী ঘর আছে।

দৈনিক বাজার করিতে হইলে ১ মাইল দূরে ইছাপুরার বাজারে যাইতে হয়। অনেক দিন হইতে এ গ্রামে একটী বাজার স্থাপনের কল্পনা-জল্পনা চলিতেছে। জনহিতৈষী উদ্যোগী ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিলে মধ্যপাড়ার ন্যায় জনপ্রধান ও সমৃদ্ধিশালী গ্রামে একটী বাজার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

**রাস্তাঘাটও স্বাস্থ্য :—**

এই গ্রামে ভাল রাস্তা-ঘাট নাই। তবে লোক্যাল বোর্ডের একটী সাধারণ রাস্তা কাকাল্দি হইতে মধ্যপাড়ার হাটখোলা পর্য্যন্ত গিয়াছে, দুঃখের বিষয় এই যে—বর্ষার প্রারম্ভেই ইহার অনেকাংশ জলমগ্ন হয়। আর একটী রাস্তা মধ্যপাড়া হইতে ইছাপুরা উচ্চ ইংরাজী স্কুল পর্য্যন্ত প্রস্তুত করা হইতেছে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ দুই বৎসর যাবৎ ইহার কাজ এক প্রকার কিছুই হইতেছে না।

তালতলা হইতে একটী রাস্তা মালখানগর ও মালপদিয়ার মধ্য দিয়া মধ্যপাড়ার হাটখোলা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ইহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেকটা ভাল। বলা বাহুল্য—বর্ষাকালে এই রাস্তাতেও যাতায়াতের সাধ্য নাই। লোক্যালবোর্ড এ বিষয় সদয় দৃষ্টি করিলে যথেষ্ট উপকার হয়।

মধ্যপাড়া হাটখোলার পূর্ব্ব-ধার হইতে একটী রাস্তা লোহজঙ্গ পর্য্যন্ত নিবার প্রস্তাব চলিতেছে এবং কার্য্যও অতি যৎসামান্য হইয়াছে। যদি প্রকৃতই উক্ত প্রস্তাব সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে কেবল মধ্যপাড়াবাসীর নয় সমস্ত উত্তর-বিক্রমপুরবাসীরই নিতান্ত সুবিধা হইবে।

এতদ্ভিন্ন গ্রামে ছোট বড় অনেক রাস্তা ও হালট্ আছে। মধ্যপাড়া হইতে বর্ষাকালে যাতায়াতের জন্য একটী ক্ষুদ্র খাল পোড়াগঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। বর্ষার সময় নৌকা ভিন্ন যাতায়াতের অন্য কোন উপায় থাকে না।

গ্রামে পুষ্করিণীর সংখ্যা নেহাৎ কম নহে—তন্মধ্যে বড় দীঘি ও রত্তনসেনের দীঘি' দুইটী উল্লেখযোগ্য। পুষ্করিণীগুলির সংস্কার না হওয়ায় অধিকাংশের জলই দূষিত—ঐ সকল দূষিত জল সেবনে ঋতুভেদে কলেরা, আমাশয়, জ্বর ইত্যাদি বিবিধ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। এই দিকে অধিবাসিবৃন্দের মনোযোগী হওয়া উচিত।

বিবিধ :—

বিগত ১২।১৩ দিন বৎসর যাবত এখানে একটী "হরিসভা" স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সভায় প্রতি শুক্রবার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৩।৪ দিন ব্যাপিয়া মহোৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠানও হয়।

প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ, পৌষ সংক্রান্তি, শ্রীপঞ্চমী, চৈত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি পূজা-পার্ব্বনাদি উপলক্ষে 'হরিসংকীর্ত্তনের' দল বাহির হইয়া গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া সংকীর্ত্তন করিয়া থাকে। উক্ত সভা হইতে দুঃখী কাঙ্গালীদিগকে কিছু কিছু সাহায্যও করা হয়।

কতিপয় বৎসর হইল এ গ্রামে শ্রীযুত বসন্তকুমার সরকার ডাক্তার মহাশয় "রামকৃষ্ণ-পরমহংস" মহোদয়ের পরম ভক্ত হইয়া আসিয়াছেন। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহোৎসবাদি ক্রিয়া, সভায় বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। এই সভার অধীনে একটী "রামকৃষ্ণ-লাইব্রেরী"ও স্থাপিত হইয়াছে এবং উক্ত লাইব্রেরীর ফণ্ড হইতে গরীব দুঃখীদিগকে কিছু কিছু সাহায্যও করা হয়।

মহিলা-বারব্রত ও খেলার বিবরণগুলি বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামে প্রায় একইরূপ।

গ্রামের শিক্ষিত-সম্প্রদায় গ্রামে অবস্থান না করায় গ্রামের নৈতিক অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছে। দেশের ছোট বড় সকলে সম্মিলিত হইয়া দেশের হিতার্থ মনোযোগী না হইলে—কোনরূপেই গ্রামের কল্যাণ হইবে না। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির দেশের হিতার্থ-মনোযোগী হওয়া উচিত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

# রাজা শ্রীনাথরায় বাহাদুর।

পৃথিবীতে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষের অপেক্ষা একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রায় সকলকেই কর্ম্মী, অনলস, সত্যবাদী ও চরিত্রবান্ হইতে দেখা যায়। অদ্য আমরা যাঁহারযের জীবন-কথা আলোচনা করিতে যাইতেছি তাঁহার জীবনেও উপরোক্ত সদ্গুণগুলি পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। রাজা শ্রীনাথরায় বাহাদুর ভাগ্যকূলের রায় পরিবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, ইনি যে কেবল ভাগ্যকূলও বিক্রমপুরের গৌরব তাহা নহে, সমগ্র বঙ্গদেশেরও একজন কীর্ত্তিমান পুরুষ। এ পর্য্যন্ত রাজাবাহাদুর ব্যতীত অপর কোন বিক্রমপুরবাসীই 'রাজা' এই সম্মান জনক উপাধি লাভ করেন নাই। ইহাও কমগৌরবের কথা নহে।

বাঙ্গালী চাকুরী-প্রিয়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই চাকুরী করিতে ভাল বাসে, একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে কেহই বড় একটা অগ্রসর হইতে চাহেন না, যদিই বা হন, তাহা হইলে দু' একবৎসরের মধ্যেই ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হইয়া ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় চাকরী করিয়াই কায়ক্লেশে জীবন কাটাইয়া দেয়। কিন্তু ভাগ্যকূলের রায়-পরিবার কেবলমাত্র ব্যবসায় ও বাণিজ্য দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী সমাজ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইঁহাদের মত অভিজ্ঞ পরিবার বাঙ্গালা দেশে আর নাই বলিলেই চলে।

রাজা শ্রীনাথ বাহাদুর বাংলা ১২৪৮ সনে বিক্রমপুরস্থ ভাগ্যকূল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে ইঁহার আরও কয়েক জন ভাই ভগ্নী জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে কাল-গ্রাসে নিপতিত হওয়ায় ইনি পিতা মাতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন। সন্তান সন্ততির মৃত্যুর পর তিনিও তাঁহার এক ভগ্নী মাত্র জীবিত ছিলেন। রায় জানকীনাথ ও সীতানাথ রায়বাহাদুর বহু পরে জন্ম-গ্রহণ করেন।

শৈশবে পিতা প্রেমচাঁদের সহিত ইনি নবদ্বীপ ধামে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে

গমন করেন এবং সেখানেই কেবল মাত্র সপ্তবর্ষ বয়সে ইঁহার হাতেখড়ি বা বিদ্যারম্ভ হয়।

সেখান হইতে দেশে আসিয়া সেকালের রীতি-অনুযায়ী গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা লেখা পড়া এবং টোলে থাকিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ সাহিত্য ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। ইঁহাদের পারিবারিক নিয়মানুযায়ী কেবল মাত্র একাদশ বর্ষ বয়সে ইঁহার শুভ-পরিণয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের পর ঢাকা ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তী হ'ন এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ অঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৫ খ্রীঃ অঃ এলে পরীক্ষা দেওয়ার সময় ইঁহার পিতৃদেব প্রেমচাঁদ রায় গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া পড়ায়, আর পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন এবং কলেজ পরিত্যাগ করিয়া পিতার অনুমত্যানুযায়ী বিষয় কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার হৃদয় দয়া প্রবণ, সে সময়ে জল খাইবার জন্য যে সামান্য পয়সা পাইতেন তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ অর্থ দ্বারা দীন, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতিকে দান করিয়া আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেন।

তাঁহার পিতৃদেব প্রেমচাঁদ রায় গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া ঢাকায় নীত হইলে তৎকালীন ঢাকার সুবিখ্যাত সিভিল্ সাৰ্জ্জন সিম্‌সন্ সাহেবের চিকিৎসাধীনে রহিয়া তাঁহার অপূর্ব্ব চিকিৎসা-নৈপুণ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগমুক্ত হন। তিনি রোগমুক্ত হইলে রাজাবাহাদুর ঢাকাতে এক বিরাট মহোৎসব করেন; উহাতে আখরাইধারী বৈষ্ণবদিগের প্রচুর রূপ ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সংসারে প্রবেশ করিয়া ইহাই তাঁহার প্রথম কার্য্য। ডাক্তার সাহেবের অনুরোধ ক্রমে সে সময়ে ঢাকা পাগলা গারদে প্রায় ২০০।৩০০ পাগলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন এবং তাহাদের তৃপ্তির জন্য ক্রমাগত চারি পাঁচবার ভোজ এবং তাহাদের তৃপ্তির জন্য বিবিধ আমোদ-প্রমোদের ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ডাক্তার সাহেবের সহিত বহুবার তিনি পাগলা গারদে গিয়া প্রায়ই পাগল দিগকে দেখিয়া আসিতেন। পাগলদিগের সহিত আলাপ করিতে এবং তাহাদের হাব-ভাব ও চাল চলন দেখিতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। তাহা-দিগকে চিকিৎসা করিয়া ভাল করিবার জন্য তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন

এমন কি ভাগ্যকূল ও নারায়ণগঞ্জে ১০।১২ জন পাগল রাখিয়া তাহাদের চিকিৎসার ব্যয় ভার বহন করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সে সমুদয় রোগ মুক্ত ভদ্র সন্তানগণ পরে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাসূচক যে সমস্ত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন সে সকলও তিনি অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতে তিনি বঙ্গদেশের বিবিধ দেশ-হিত-জনক অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ঢাকাতে যখন Economical museum স্থাপিত হয়, সে সময় তদানিন্তন magistrate, Lyall সাহেব তাঁহাকে উহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত করেন। রাজাবাহাদুর উহাতে দেশজাত বিবিধ দ্রব্য ও প্রায় ৬৫০ রকমের ধান্যের নমুনা প্রদর্শন করেন। এ সকল ধান কোন্ সময়ে বপন করিতে হয়, কখন কাটিতে হয়. সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ ও রিপোর্টে লিখিত ছিল এতদ্ব্যতীত নানাবৃক্ষের ছাল এবং গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বিবিধ দ্রব্যাদি উপহার দান করেন। তাঁহার এ বিষয়ে এতাদৃশ অনুরাগ ও সংগ্রহ দর্শনে গভর্মেণ্ট অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহার নিকট ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র প্রেরণ করেন।

সুবিখ্যাত পাদ্রী লং সাহেব যখন সংস্কৃত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের নিমিত্ত কলিকাতা হইতে ঢাকা আগমন করেন, সে সময়ে রাজাবাহাদুর গভর্মেণ্টের এই সাধু উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া তাঁহার নিজ বাড়ীতে যে সকল সংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল সে সকল এবং অন্যান্য বহুবিধ প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গভর্মেণ্টকে প্রদান করেন এবং এই মহৎ কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ২০০০৲ দুই হাজার টাকা অন্যান্য সরিকগণের সহিত ঐক্যতায় এক কালে প্রদান করেন। তদবধি যখনই সংস্কৃত গ্রন্থাদির সূচী বিলাতে প্রস্তুত হয় তাহার এক এক খণ্ড রাজাবাহাদুরকে উপহৃত হইয়া থাকে।

দানশীলতা ইঁহার স্বভাব-সিদ্ধ প্রকৃতি। উড়িষ্যায় যখন প্রথম দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সে সময়ে রায় পরিবার কলিকাতা ও দেশে অন্নসত্র খুলিয়া প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার লোকের আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেশবাসীরও গরীব দুঃখীর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন, পিতা প্রেমচাঁদ সর্ব্বাগ্রে কলিকাতাতে ইহার অনুষ্ঠান করেন, পরে রাজাবাহাদুর তাঁহার অনুমতিক্রমে সরিকানগণের

সহিত ঐক্যতায় দেশে উহা করিতে প্রবৃত্ত হন। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অন্ন সত্রের বিবরণ ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, গ্রামের দীন, দরিদ্র অধিবাসী দিগকে জন প্রতি প্রতিদিন অর্দ্ধসের পরিমিত তণ্ডুল বিতরিত হইত, আর প্রয়োজনানুরূপ বস্ত্রাদিও প্রদত্ত হইত। আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া রাজাবাহাদুর নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অতঃপর যতবার দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, ততবারই তিনি সরিকানগণের সহিত মিলিত হইয়া অন্নসত্র খুলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে চাউল খরিদ করিয়া অল্প মূল্যে ভদ্র-সমাজে বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে রাজাবাহাদুরের চরিত্র-মাধুর্য্য. মধুর ব্যবহারও দানশীলতার কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়ে; তদবধি যে কোন দেশহিতকর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে তিনি সে সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়া, নচেৎ অর্থ সাহায্য দ্বারা উহার কৃতকার্য্যতার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহার এ সমুদয় মহৎগুণ দীর্ঘ কাল সদাশয় গভর্মেণ্টের অজ্ঞাত রহিল না। তিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের স্বর্গীয়া প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন সাম্রাজ্ঞী উপাধি লাভ করেন, সে সময়ে certificate of honour প্রাপ্ত হন। উহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বদান্যতা, সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বিধান, Economical museum এর সভ্য রূপে বহুবিধ দ্রব্যাদির উপহার প্রদান, সর্ব্বোপরি তিনি যে অত্যন্ত উদার প্রকৃতি ও দানশীল মহাত্মা তাহারও বিশেষরূপে উল্লেখ ছিল।

সমাজ-সংস্কার, সমাজের উন্নতি বিধান, সামাজিক কুপ্রথা নিবারণ বিষয়েও তিনি চিরদিন যত্নশীল। সামাজিক যে কোন ব্যক্তি সমাজের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থী হইয়াছে, তিনি অমনি নিজ ইষ্টানিষ্টের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়াও নানাদিক্ দিয়া নানাভাবে তাহাদিগকে সে সকলের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া স্বীয় মহানুভবতা এবং চরিত্রের ঔদার্য্যতার পরিচয় দিয়াছেন।

তিনি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। ইহাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব। সকল কার্য্যেরই ভাল মন্দ দোষগুণ ফলাফল চিন্তা করিয়া, সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রত্যেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই শ্রেষ্ঠ গুণের জন্য তিনি দেশের

সকলের নিকট সমাদৃত, শত্রু, মিত্র সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই গুণের বিশেষরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গে যখন ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়, সে সময়েই তাঁহার এই মহৎ গুণের, বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। উক্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় লইয়া যখন প্রশ্ন উঠে, তখন তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনকারী বন্ধুবর্গকে বলিয়াছিলেন যে' এখনও আমরা স্বায়ত্ত-শাসন সম্পর্কে অনধিকারী এখনও এ বিষয়ে আমরা বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই, সুতরাং আমাদের এখন উচিত স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে Chairman বা **President** রাখিয়া আমরা তাঁহার অধীনে Vice president বা secretary স্বরূপ রহিয়া কার্য্য করি ; পরে আমরা যখন উপযুক্ত হইব তখন আপনা হইতেই গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ন্যায্য অধিকার প্রদান করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই মত সে সময়ে কেহই গ্রাহ্য করেন নাই, চারিদিক হইতে তাঁহার প্রতি শুধু বিদ্রূপ বাণী বর্ষিত হইয়াছিল, এমন কি তাঁহার 'কুশ-পুত্তলি' পর্য্যন্ত দাহ হইয়াছিল! কিন্তু পরে যখন বন্ধুবর্গের আন্দোলনকারী পরস্পরের মত বিরোধ হইয়া তাঁহাদের কল্পনা আকাশ-কুসুমে পরিণত হইল, এবং রাজাবাহাদুরের ভবিষ্যদ্বাণী সাফল্য লাভ করিল, তখন তাঁহারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রশংসা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঢাকা "সারস্বত সমাজ" রাজাবাহাদুরের মস্তিষ্ক-প্রসূত জীবনের একটী অক্ষয় অমর কীর্ত্তি স্তম্ভ। তাঁহার কৃত সমুদয় শুভানুষ্ঠানের কথা লোকে বিস্মৃত হইতে পারে কিন্তু এই মহা অবদানের কথা কেহ ভুলিবে না।

আমরা এখানে সারস্বত সমাজের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহা হইতে পাঠকবর্গ অনেক নূতন তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। রাজাবাহাদুর প্রথমে সমাজ সম্পর্কে একটী scheme গঠন করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বর্গীয় রায় সাহেব দীননাথ সেন মহাশয়ের নিকট উপস্থিত করেন, রায় সাহেব উহাতে ব্যয় বাহুল্য দেখিতে পাইয়া, উহার ব্যয় লাঘব করিয়া সর্ব্ব প্রথমে বার্ষিক মং ৬০০৲ ছয়শত টাকা ব্যয়ে কার্য্যারম্ভের প্রস্তাব করেন। পরে ফলাফল দেখিয়া অধিক অর্থব্যয় করা যাইবে তাঁহার এই মন্তব্য ন্যায়—সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় রাজাবাহাদুর তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। উহা প্রথমে

টোলের সংস্কৃত অধ্যয়নশীল ছাত্রবর্গের বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত body of sanskrit examination scheme নামে অভিহিত হইয়া, পরে উহা রায় অভয়াচরণ দাসবাহাদুরের প্রস্তাবানুযায়ী 'সারস্বত সমাজ' নামে অভিহিত হইল।

উহা তদানীন্তন এসিষ্টাণ্ট কমিশনার রায় অভয়াচরণ দাস বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিক্রমপুরের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত ৺সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত কালীচরণ তর্কালঙ্কার, অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কালীকান্ত শিরোমণি প্রভৃতির নিকট প্রস্তাব করায় তাঁহারাও ঐ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তিনিও উহার সমর্থন করিয়া ভাওয়ালের রাজাবাহাদুরের সাহায্য প্রাপ্তির আশা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কতিপয় সমাজের নেতা রাজা বাহাদুরের এই সাধু উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সাধারণে মত বিরোধ উপস্থিত করেন, তাঁহারা সাধারণকে বুঝিতে দিয়াছিলেন যে, রায় পরিবার ব্রাহ্মণ প্রধান বিক্রমপুরের পণ্ডিত সমাজের উপর নিজেদের প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্তই এই এক কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকে এই অসার মন্তব্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই, তাহারি ফলে দেশের সর্ব্বত্র এক গভীর আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, এমনকি প্রথম সভাধিবেশনের দিনে যাহাতে পণ্ডিতবর্গ সভাস্থানে উপস্থিত হইতে না পারেন তজ্জন্য বিপক্ষীয়েরা নানা স্থানে লাঠিয়াল পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, রাজাবাহাদুর পূর্ব্বে ইহার একটু আভাষ জানিতে পারিয়া পুলিস সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে তাহা জ্ঞাত করেন, তাহাতে আর কোনও উপদ্রব হইতে পারে নাই। সভার আহ্বানকারী ও পৃষ্ঠপোষক রাজাবাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র, সারদাচরণ ন্যায়রত্ন, অদ্বৈতচন্দ্র ন্যায়রত্ন অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুর প্রভৃতি নির্ব্বিঘ্নে বহু পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত সম্মিলিত হইয়া সভার কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। অতঃপর সভার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে থাকে। যাহারা এক সময়ে বিপক্ষ ছিলেন তাহারাও সভার ক্রমোন্নতি এবং সার্ব্বভৌমিক প্রীতি ও মহৎ উদ্দেশ্য দেখিতে পাইয়া একে একে যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই বৎসর পরে ভাওয়ালের প্রখ্যাতনামা রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ও এ সময়ে আনন্দের সহিত এই সভায় যোগদান করেন ও অর্থ সাহায্য করিতে থাকেন। গভর্মেণ্ট ভাগ্যকুল রায় পরিবারের এই মহৎ কার্য্যের জন্য গেজেটে ধন্যবাদ ঘোষণা করেন।

প্রথম হইতেই বার্ষিক পাঁচশত টাকা সাহায্য প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি রীতি হয় যে ঢাকায় যিনি যখন personal assistant to the Commissioner হইবেন, তিনিই সভার সহকারী সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত থাকিবেন! তদবধি এ পর্য্যন্ত রায় অভয়াচরণ দাস বাহাদুর, রায় অক্ষয়কুমার সেন বাহাদুর, মহিমচন্দ্র ঘোষ, রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, অন্নদাচরণ গুপ্ত প্রভৃতি উক্ত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষের সহিত কলহের সময় রায় অক্ষয়কুমার সেন বাহাদুর সভার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এমনকি রাত্রি ৩টা ৪টা পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া বিবিধ বিষয়ের পরামর্শাদি করিয়াছেন। Partition এর সময়ে নবগঠিত নিয়মাবলী হয় এবং মাননীয় ন্যাথান সাহেব ও রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের চেষ্টা যত্নে সারস্বত সমাজের বার্ষিক ২৪০০৲ টাকা সাহায্য গভর্মেণ্ট হইতে মঞ্জুর হইয়াছে।

সেই সময় হইতে সারস্বত সমাজের কার্য্য, নির্ব্বিঘ্নে ও বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তির সহিত চলিয়া আসিতেছে। সমাজের ক্রমোন্নতি দেখিয়া ত্রিপুরার মহারাজ বীরেন্দ্রচন্দ্র মাণিক্য ও পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য প্রখ্যাত নামা ভূম্যধিকারী বর্গ মহারাজ সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মহামনীষিগণ সকলেই সমাজের সাহায্যার্থ অর্থ ও বিস্তর স্বর্ণ এবং রৌপ্যপদক—সমাজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র দিগকে প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বার্ষিক ছয়শত টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের ক্রমোন্নতি ও ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যকূল রায় পরিবার বার্ষিক ২০০০৲ দুই হাজার টাকা হইতে ৫০০০৲ পাঁচহাজার টাকা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সারস্বত সমাজের কল্যাণের জন্য এপর্য্যন্ত প্রায় দশ বার লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ দানশীলতা ধনীমাত্রেরই আদর্শ স্থানীয়।

কিছুকাল পরে মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্রের সহিত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের সারস্বত সমাজের কর্ত্তৃত্ব লইয়া অত্যন্ত মতান্তর ঘটে, উহার মাত্রা এত দূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছিল যে ঐ বিষয়ের তদন্তের নিমিত্ত মহামান্য ডিরেক্টার মার্টিন সাহেব, রায় দীননাথ সেন সাহেবের নিকট আমূল বৃত্তান্তের রিপোর্ট তলব করেন, বলা বাহুল্য সেই রিপোর্টে পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন যে সভার সেক্রেটারী সেই সভাই আদি সভা এবং তাহাতে বহুপণ্ডিতের যোগ আছে

বলিয়া রিপোর্ট করায় তৎপর তাঁহার স্বলাভিষিক্ত পেডলার সাহেবের আসন পর্য্যন্ত টলিয়াছিল। রায় কালীপ্রসন্নঘোষ বাহাদুর নিজ পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্ত নানা স্থানে বহু দরবার করিয়াছিলেন। পেডলার সাহেবের সহিত এতৎ সম্পর্কে রাজা বাহাদুরের বিশেষ রূপ বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। সে সময়ে রাজা বাহাদুর যে তেজস্বীতা, নির্ভীকতা এবং মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবজনক; ঐ সকল উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। মার্টিন সাহেবের পদত্যাগের পর পেডলার সাহেব ডাইরেক্টার হইলে, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্তায়রত্নের সাহায্যে নবনিযুক্ত ডিরেক্টার বাহাদুরকে একে আর বুঝাইয়া দেন। উভয় পক্ষের গোলযোগ নিষ্পত্তির নিমিত্ত মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্রকে মধ্যবর্ত্তী নিযুক্ত করা হইল। অবশেষে পেডলার সাহেব এই গোলযোগ নিষ্পত্তির জন্ত ঢাকা গমন করেন। সেখানে যাইয়া রাজা বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পণ্ডিতদের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে রাজাবাহাদুরের ন্তায় বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে পণ্ডিত দিগকে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, পণ্ডিতেরা অর্থলোভী অর্থের প্রলোভন পাইলে ইহারা সব কার্য্যই করিতে পারেন, ইহাদের চরিত্রের কোন দৃঢ়তা নাই। বিশেষ রাজা বাহাদুরের ন্যায় সঙ্গতিশালী ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহারা যদি অন্যায় রূপে প্রশ্রয় পায়, তাহা হইলে কোন রূপেই নিষ্পত্তি হইতে পারেনা।" পেডলার সাহেবের কথায় ধীরভাবে রাজাবাহাদুর উত্তর করিলেন—"দেখুন, আমি তাঁহাদিগকে কখনও কোন অবৈধ প্রশ্রয় দেই নাই, দিবও না যাহাতে গোলযোগ নিষ্পত্তি হয় আপনি সে ব্যবস্থা করুন। আমরা পুরুষানুক্রমে কোন দিন ব্রাহ্মণ সমাজের উপর কোনরূপ আধিপত্য বিস্তার করি নাই। তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া বিনয় সহকারে কার্য্য নিষ্পন্ন করাই হিন্দু সমাজের চির-প্রচলিত প্রথা, তাঁহাদের যাহাতে মনঃকষ্টের কারণ হয় এরূপ কোনও কার্য্য আমরা করিতে অক্ষম। তবে যদি আপনার কিংবা গভর্মেণ্টের সমাজের চাঁদা বন্ধ করিবার মত হয়, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলে যে সমাজ এক্ষণে গভর্মেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, সেই সমাজ পূর্ব্ব রীত্যানুসারে নিজ নিজ টোলে অধ্যাপনার কার্য্য করিয়া ছাত্রদিগকে পূর্ব্বের ন্তায় টোল হইতে অধ্যাপকগণ উপাধি প্রদান করিবেন। পণ্ডিতগণ বড়ই স্বাধীনতা প্রিয় এবং

তেজস্বী তাঁহারা আমার সামান্ত অর্থসাহায্যের জন্ত কদাচ স্বাধীনতা লোপ করিবেননা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয় চটীজুতা পায় দিয়া লাট সাহেবের দরবার পর্য্যন্ত করিতেন।

পেডলার সাহেব কথা-প্রসঙ্গে রাজাবাহাদুরের এইরূপ দৃঢ়তাও তেজস্বিতা দেখিয়া বলিলেন—"পণ্ডিতেরা এমন কি যে আপনি তাঁদের সম্বন্ধে এতটা কথা বলিলেন। আমাদের মনে হয় যে তাহারা অতি সাধারণ শ্রেণীর লোক। তাহাদের মূল্য সাধারণ কুলি-শ্রেণীর অপেক্ষা বেশী নহে।" তদুত্তরে রাজা বাহাদুর স্বাভাবিক ধৈর্য্যও তেজস্বিতার সহিত পরুষ-কণ্ঠে কহিলেন—"আপনি যাহাদিগকে সামান্ত ব্যক্তি বলিতেছেন, তাঁহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন, তাঁহারা হিন্দুসমাজে অত্যন্ত পূজনীয়। আপনারা বিদেশী, আপনার যাহাই বিবেচনা করেন না কেন বাস্তবিক ভারতবর্ষের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলেই পণ্ডিত সমাজ। মণি-মাণিক্য বিভূষিত মুকুটধারী স্বাধীন রাজা মহারাজারা পর্য্যন্ত মুকুট দ্বারা ব্রাহ্মণের চরণস্পর্শ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। আপনি আমাদের রাজার জাতি,—সম্মানিত রাজ-পুরুষ এবং পাশ্চাত্য ভাষায় সুশিক্ষিত ব্যক্তি, আপনার মুখে এইরূপ উক্তি শুনিলে বস্তুতঃই দুঃখের কারণ হয়।"

ইহাতে ডিরেক্টার সাহেব রাগ করিয়া বলিলেন 'তবে আর আপোষ হইল না। আমি এই বিষয় কমিশনার সাহেবের নিকট Report করিব। ডিরেক্টার বাহাদুরের প্রেরিত Report পাঠ করিয়া কমিশনার সাহেব রাজাবাহাদুরকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। তদনুসারে তিনি কমিশনার সাহেবের নিকট যাইয়া তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা সম্বলিত একটী Report দাখিল করিলেন। সেই Report এর বিবরণের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া কমিশনার সাহেব আর কোনও কথা বলিলেন না, বরং উহাতে যে সকল প্রকৃত অবস্থা লিখিত হইয়াছে তাহা অনুসন্ধানে সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত এবং প্রকৃত জানিতে পারিয়া পেডলার সাহেবের Report সম্বন্ধে আর কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করিয়া নিষ্পত্তির চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন যে সহজে নিষ্পত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে, উভয় সমাজ হইতেই ছাত্রগণের পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে যদিও আদি সমাজেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যাধিক, তথাপি

কমিশনার বাহাদুর গভর্মেণ্ট বার্ষিক যে অর্থ সাহায্য করিতেন তাহা বন্ধ করিয়া দেন। ২।১ বৎসর মাত্র এইরূপ বন্ধ ছিল, পরে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ভাওয়াল ষ্টেটের পদত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমতিলাল, মহা-মহোপাধ্যায় প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত রাজা বাহাদুরের নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উভয় সভা একত্র হওয়া বাঞ্ছনীয় বিধায় ঐ ঘটনার ২।১ বৎসর পর যোগদান করেন এবং তদনন্তর গভ-র্মেণ্টের সাহায্য পূর্ব্ববৎ নিয়মিত পাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ বিষয়ে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁহার বরাবরই সবিশেষ আগ্রহ ও যত্ন আছে। ভাগ্যকুলের নিকটবর্ত্তী দোগাছী গ্রামে যে Shooting Star পতিত হয়, সে সময়ে বিনা মেঘে পুনঃ পুনঃ কামানের ন্যায় ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল, কোনও অলৌকিক কাণ্ড ঘটিতেছে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসী স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি এবং শঙ্খ ঢাক বাজাইয়া চারিদিকে একটা ভীতি-বিহ্বল ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। Shooting Star এর বহু খণ্ড প্রস্তর উক্ত দোগাছি গ্রামে নিপতিত হয়, রাজাবাহাদুর ঐ সকল প্রস্তর খণ্ড হইতে কয়েক খণ্ড সংগ্রহ করিয়া উহার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া Metereological Society র কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত সভার Director বাহাদুর, রাজাবাহাদুরের প্রেরিত দ্রব্যাদির ইতিহাস জানিতে পারিয়া তাঁহার এই সকল বিষয়ে আন্তরিক অনুরাগের নিমিত্ত বিশেষ রূপে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমতঃ শিক্ষাসমিতি ( Education Committee, Economical Museum Committee, Municipal Commiteeর সভ্য এবং তৎপরে ঢাকা ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কমিটীতে বহুকাল কার্য্য করিয়া গভর্মেণ্টের নিকট প্রত্যেক কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করায়, তিনি সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক ভাগ্যকুল Independent Benchএ Honorary Magistrate নিযুক্ত হন। পূর্ব্বে ঢাকা মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানেরও তিনি Honorary Magistrate ছিলেন। বিচার কার্য্যে তিনি অসাধারণ আইনাভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধি শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন এজন্য তিনি গভর্মেণ্টের নিকট হইতে বিশেষ প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হন। এমন কি ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট লায়েল সাহেব তাঁহার কার্য্যদক্ষতার পরিচয়

থাইরা Roadcessএর হিসাব পরিদর্শনের কার্য্যভার, পঞ্চাশ টাকা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত যাহাদিগকে Income tax দিতে হইত তাহাদের assesment এর appeal এর ভার পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াছিলেন। এইরূপ বিচারের ভার মাত্র অল্প কয়েক জন লোকের উপর অর্পিত হইয়াছিল। এ সকল কার্য্য তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকিয়া যে সকল বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন, সে সমুদয়ই appeal এ বহাল রহিয়াছে, মাত্র দুইটীর দণ্ড হ্রাসের আদেশ আসিয়াছিল। তিনি কাহাকেও শারীরিক দণ্ড বিধান করিতেন না। যতকাল Honorary Magistrate এর পদে নিযুক্ত ছিলেন, কাহারও প্রতি কয়েদের হুকুম দেন নাই, স্থল বিশেষে কম বেশী পরিমাণে অর্থ দণ্ড করিয়াই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতেন। এ প্রসঙ্গে তদানীন্তন ঢাকার খ্যাতনামা ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যানকিন (Jankin) সাহেবের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা বস্তুতঃই কৌতূহলোদ্দীপক।

বিচারের ভার গ্রহণ হইতে এপর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও কয়েদের হুকুম না দেওয়ায় জ্যানকিন্ সাহেব অনুযোগ দিয়া বলিলেন "আপনি যে সকল লোকের কয়েদ হইতে পারে তাহাদিগকেও কয়েদের হুকুম না দিয়া কেবল অর্থ দণ্ড কেন করেন? ইহাতে বুঝা যাইতেছে আপনি দেশের লোকদের খাতির করেন? আমি এ বিষয়ে গভর্মেণ্টের নিকট Report করিব। তাহাতে রাজাবাহাদুর বলিয়াছিলেন "এ সম্বন্ধে Prejudiceই বলুন, আর Principleই বলুন আমার বক্তব্য এই যে মনুষ্য মাত্রেরই বিচারের ভুল হইতে পারে। সন্দেহের ফল আসামীর ভোগ করা উচিত। আমরা বেতনভোগী নহি, মাত্র পুণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ রাজসেবার জন্য এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি। কাহারও প্রতি অন্যায় রূপ প্রীতি প্রদর্শন করিয়া কর্ত্তব্য-চ্যুত হওয়া আমার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম নহে। অথচ উকীল মোক্তারগণের কুহকে পড়িয়া ভ্রম বশতঃ কোনও আসামীর প্রতি শারীরিক শাস্তি বিধান করিলে, সে পাপ আমাকে ভুগিতে হইবে। বিশেষ নানা রূপ গুরুতর অপরাধের মূল হেতু অর্থ,—অর্থই সমুদয় অশান্তি ও বিপদের মূল কারণ। অতএব শারীরিক দণ্ড বিধান অপেক্ষা আমি আর্থিক দণ্ডবিধানই [illegible] সঙ্গত বলিয়া মনে করি, আমার মনের ভাব এই যে "শত শত দোষী

ব্যক্তি খালাস পা'ক, কিন্তু একজন নির্দোষী ব্যক্তিও যেন দণ্ড না পায়। Penal code এর মূল উদ্দেশ্য ও তাহাই। যদি আমার কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি পদত্যাগ করিতে সম্মত আছি। সাহেব একথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন "না—না-তাহা করিতে হইবে না। আমি আপনার মন বুঝিলাম। আপনি আপনার যেরূপ বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করিবেন।'

ন্যায়-সঙ্গত কার্য্য করিতে যাইয়া তাঁহার অনেকের নিকট বিরক্তিভাজন হইতে হইয়াছে, তথাপি তিনি কোনরূপ কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হন নাই। ওয়েষ্টমেকট সাহেব যখন ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন ঢাকার বক্‌লেণ্ড বাঁধের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত কোন নৌকা নঙ্গর করিতে পারিবে না, আরোহীগণকে নামাইয়া দিয়াই নৌকা অন্যত্র লইয়া যাইতে হইবে, এইরূপ Bye-law করিবার প্রস্তাব করেন। অনেক সভ্যই সাহেবের মত সমর্থন করে। কিন্তু রাজা বাহাদুর উহার প্রতিবাদ করেন এবং তিনটী ঘাটে নৌকা লাগাইবার এবং মালামাল তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া একটী Amendment প্রস্তুত করেন। উহা সভাস্থলে উত্থাপিত হইবার সময় কোন কোন সভ্যের পরামর্শে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দীর্ঘকাল রাজাবাহাদুর সভায় অনুপস্থিত বলিয়া Municipal সভ্যের board হইতে তাঁহার নাম Withdraw করিয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। সভার Secretary মহাশয় উঠিয়া বলিলেন "রাজা বাহাদুর বিদায়ের প্রার্থী হইয়া আমার নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ভ্রম বশতঃ তাহা দাখিল করি নাই, অতএব এই ত্রুটি রাজাবাহাদুরের নহে আমার। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি Municipal Secretaryর নিকট হইতে রিপোর্ট লইয়া গভর্মেণ্টের নিকট রাজাবাহাদুরের বিরুদ্ধে পেশ করিলেন। Secretaryর Reportএ লিখিত ছিল যে তিনি বড় useful member, বৎসর ৩০০০৲ হইতে ৫০০০৲ assesment ও অন্যান্য তদন্ত করিয়া থাকেন এবং অন্যান্য Memberদের assesment এর appeal দুই একটী Memberএর সহিত একত্র বসিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি করেন।

শীঘ্রই Magistrate সাহেবের রিপোর্টের উর্দ্ধতন আফিস হইতে মন্তব্য আসিল যে "I am directed by his Honour the Lt. Governor that as he ( Raja Bahadoor ) is very useful member to the Commitee, his services should be continued.   (ক্রমশঃ)

# শিল্পীর ভুল।

( ইউরোপীয় বেশে এক ভারতীয় তরুণীর চিত্র দর্শনে )

——:*:——

ব্রীড়াময়ী উষারে আজ
কে পাঠাল পূর্ব্বাসারে,
হিঙ্গুল মেঘের রক্ত নিচোল
বর অঙ্গ হতে কেড়ে।
নীলাকাশের জ্যোতি মাঝে
কে এল এ রিক্ত সাজে
অনবদ্য মাধুর্য্য সে
কোন সায়রে গেছে ঝরে।

কে ফুটাল এ নলিনী
রবির খর কিরণ ধারে
নগ্ন মৃণাল গর্ব্ব ভরা
পত্র-বিহীন বৃন্ত পরে।
শ্যামলিমার স্নিগ্ধ মেদুর
কোথায় পত্র পুঞ্জ প্রচুর
আর্দ্র বায়ে শীকর মাখা
শীতলতার সম্ভারে

অতল সিন্ধু শয়ন হতে
বায়ু ক্ষিপ্ত সিকতাতে,
কে আনিল এ মুকুতা
দ্বিপ্রহরের রৌদ্রপাতে।

লুপ্ত কোথায় শুক্তি-প্রভা
মরকতের অচল বিভা
স্বর্ণবাসের বর্ণ ছায়া
মূর্চ্ছাতুর সে মূর্চ্ছনাতে।

হায়রে শিল্পী ভুলে গেছে
কোথায় লভে পদ্ম কলি,
মন্থিত নীল সায়র হ'তে
রক্ত-মণির অলোক হোলী!
ফুল্ল বিশ্ব পদ্ম দলে
গোপন সে কোন পরিমলে
নিত্যকালের মানব-হৃদয়
গুঞ্জে মরে হয়ে অলি!

( ইউরোপীয় বেশে এক ভারতীয় তরুণীর চিত্র দর্শনে )

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

---

# ভাগ্যকূলের কুণ্ডু পরিবার (৪)

গুরুপ্রসাদের দুইপুত্র মথুরামোহন ও প্যারীমোহনের বংশধরগণও বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষায় এবং সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বঙ্গের নানাস্থানে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। মথুরামোহনের দুই পুত্র ব্রজলাল ও রাধিকালাল। ব্রজলালের তিন পুত্র শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায়, হলধর রায় ও শশধর রায়। মুরলী বাবু ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে একজন কৃতীব্যক্তি, ইনি কংগ্রেসের একজন অনুরক্ত ভক্ত। হলধর বাবু চিত্র-বিদ্যায় শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। শশধরের শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। রাধিকালালের চারি পুত্র শ্রীযুক্তসুরেন্দ্রকৃষ্ণ, উপেন্দ্রকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রকৃষ্ণ ও খোকা। প্যারীমোহনের তিন

পুত্র বিনোদী লাল, শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় ও শ্রীযুক্ত যশোদা লাল রায়। বিনোদীলালের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত তড়িৎভূষণ রায়। তড়িৎ বাবু কলিকাতা হাইকোর্টের এক জন এটর্ণী এবং বঙ্গীয় মহাজন সভার সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বাবু কলিকাতার জনৈক পোর্ট কমিশনার এবং বর্ত্তমান ভাগ্যকুল রায় পরিবারের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইনি সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং অমায়িক চরিত্রের লোক। ছেলেদিগকে উপযুক্ত রূপ শিক্ষিত করিবার জন্য ইনি সবিশেষ মনোযোগী। ইহাঁর চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ননীলাল এটর্ণী সিপ্-পরীক্ষা দিয়াছেন। তিনজনের এখনও শিক্ষা শেষ হয় নাই। যশোদা বাবু ও নন্দবাবু একান্নবর্ত্তী পরিবার ভুক্ত। ইহাঁদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের স্নেহ ও প্রীতি আদর্শ স্থানীয়। যশোদালাল বাবুর একমাত্র পুত্র পুলীনকৃষ্ণ, তাহার শিক্ষা এখনও শেষ হয় নাই।

---

# বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ।

বিক্রমপুরবাসীর কৃতিত্ব—শ্রীযুক্ত সুধাময় ঘোষ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এ স্সী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কেম্ব্রি-জের বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের ট্রাইপস্ ( বি, এ, অনার্স ) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আড়াই বৎসরের জন্য বার্ষিক ১২০০৲ টাকার গবেষণা বৃত্তি পাইয়াছেন। ভারতীয় কোন ছাত্রই এ পর্য্যন্ত এই পরীক্ষায় এইরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। তিনি কলিকাতা আসিবামাত্রই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মিঃ হ্যারিসনের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি এম এস্ সি ক্লাস পড়াইতেছেন। ছাত্রগণ তাঁহার অধ্যাপনা—প্রণালী ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতেছে। তিনি দুইমাস পরে ইংলণ্ডে গমন করিয়া সুবিখ্যাত কেভেণ্ডিস্ লেবরেটরীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন।

* * * * *

রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর—আজ কয়েক বৎসর হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। এখন আর তাঁহার সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ আলোচনা বড় একটা শুনিতে পাইনা। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গবাসী র ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের কথা আর কিছুই নাই। এক সময়ে 'বঙ্গদর্শন' যেমন পশ্চিম বঙ্গে সাহিত্য-প্রচারের সহায়-স্বরূপ ছিল, তেমনি রায় বাহাদুরের সম্পাদিত 'বান্ধব' বাঙ্গালার গৌরবস্তম্ভ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাঁহার 'চিন্তা' গুলির মত সন্দর্ভ পুস্তক এ পর্য্যন্তত আর বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকাশিতই হয় নাই। তাঁহার ভাষার ন্যায় গুরু গম্ভীর ও কবিত্বপূর্ণ সরস ভাষা বঙ্গসাহিত্য হইতে একরূপ চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়াছে।

ঘোষ বাহাদুরের জীবনবৈচিত্র্যময়। তাঁহার একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত প্রকাশিত হওয়া উচিত। যাঁহারা তাঁহার জীবনের খুঁটিনাটি জানেন এমন কোন লোকের এদিকে দৃক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। আমরা জানি চব্বিশপরগণা বার্ত্তাবহ' সম্পাদক শ্রীমান্ অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ শেষ জীবনে রায় বাহাদুরের একরূপ নিত্য সঙ্গী ছিলেন, কালীপ্রসন্ন বাবুও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। শিষ্য অবনীকান্তই কেন তাঁহার সাহিত্যাচার্য্যের একখানা জীবনী লিখিতে অগ্রসর হন না?

* * * *

শোক-প্রকাশ—এবৎসর বিক্রমপুরের কতিপয় কৃতী ব্যক্তি পরলোক গমন করিয়াছেন। (১) রায় বাহাদুর নিবারণচন্দ্র সেন (২) মহীমোহন ঘোষ ও (৩) কবিরাজ ভগবানচন্দ্র দাশ গুপ্ত। রায় বাহাদুর নিবারণ বাবু স্বীয় চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় প্রভাবে দার্জ্জিলিংএর শ্বেতাঙ্গ সমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-ছিলেন। দার্জ্জিলিংএ তাঁহার গৃহ একটী অতিথিশালার ন্যায় ছিল, অনেকেই দার্জ্জিলিংএ যাইয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। নিবারণ বাবুর ছেলেরা ও সকলেই কৃতী এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী।

মহীমোহন ঘোষ—পরলোকগত দেশগৌরব সুপ্রসিদ্ধ বক্তা এবং দেশ হিতৈষী মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের পুত্র। ইনি একজন সিভিলিয়ান ছিলেন।

মহীমোহনের মৃত্যুতে আমরা আমাদের দেশের গৌরবস্থলস্বরূপ একজন সিভি-লিয়ানকে হারাইলাম।

কবিরাজ ভগবানচন্দ্রের নাম পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। তাঁহার ন্যায় অশেষশাস্ত্রজ্ঞ ও আয়ুর্ব্বেদপারদর্শী ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালাপে ইনি অত্যন্ত আনন্দানুভব করিতেন। এই মহাপুরুষের মৃত্যুজনিত-অভাব পূর্ব্ববঙ্গবাসী শীঘ্র বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। ইনি নিদানের একখানি আদর্শ টীকাও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

আমরা এই তিনটী শোকার্ত্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

বিক্রমপুরে লর্ড কারমাইকেল—এবার বিক্রমপুরের দুইটী গ্রামে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহা যে বিক্রমপুরবাসীর পক্ষে কতদূর সৌভাগ্যের কথা, তাহা অধিক না বলিলেও চলে। গ্রামবাসীদের এমন সুযোগ আর কখনও হয় নাই। তাঁহারা বড় জোর মহকুমার হাকিমকে দেখিয়াই সাহেব দেখিবার সাধ মিটাইয়া থাকে। কাজেই পল্লীবাসী নরনারী গভর্ণর বাহাদুরকে দর্শন করিয়া যে আনন্দ ও প্রীতি লাভ করিয়াছে—তাহারা রাজপ্রতিনিধিকে দর্শন করিয়া যে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে, জীবনে সেকথা কখনও বিস্মৃত হইবে না। সহযোগী 'ঢাকাপ্রকাশ' যথার্থই লিখিয়াছেন, 'বঙ্গেশ্বরের এই পল্লীপরিদর্শন শাসক ও শাসিত উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পল্লী লইয়াই দেশ; পল্লীর অবস্থা প্রত্যক্ষ না করিলে, দেশের তত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। কাযেই এই পল্লীপরিদর্শন যেমন দেশের শাসনসুশৃঙ্খলা সম্পাদনের সহায় হইবে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজ-প্রতিনিধির মহিমা অবলোকন করিয়া প্রজাপুঞ্জও রাজ্যেশ্বরের সহিত শ্রদ্ধা ও প্রীতিবন্ধনে অধিকতর আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবে। বঙ্গের প্রথম গভর্ণর মহোদয় এইরূপ প্রজা-রঞ্জকতার পরিচয় দিয়া বস্তুতই দেশের এক কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিলেন।''

আমরা এখানে 'ঢাকাপ্রকাশের' প্রতিনিধি হরিহর বাবুর প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিবরণী উদ্ধৃত করিলাম।

গত ৬ই আগষ্ট শুক্রবার বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর, তদীয় প্রাইভেট

সেক্রেটারী মিঃ গোর্লে, ঢাকার কমিশনার মিঃ ফ্রেঞ্চ, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্ট, মুন্সীগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লোথিয়ান প্রভৃতি সহ বিক্রমপুরের অন্তর্গত শেখরনগর ও হাঁসাড়া গ্রামে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও শাসনকর্ত্তা বিক্রমপুরের কোনও গ্রামে গমন করেন নাই; সুতরাং গভর্ণর বাহাদুরের ঈদৃশ সহৃদয়তা বিক্রমপুরবাসীর পক্ষে যে বিশেষ সৌভাগ্যসূচক তাহার সন্দেহ নাই।'

'শেখরনগরের অধিবাসী মুক্তাগাছার মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের ম্যানেজার বাবু শ্রীনাথ রায় তাহার পিতার নামে "পূর্ণচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়", এবং পাঠশালাসমূহের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্পেক্‌টিং পণ্ডিত হাঁসাড়াবাসী শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ঘোষ তাঁহার মাতার নামে "জয়লক্ষ্মী দাতব্য চিকিৎসালয়" সংস্থাপন করিয়াছেন। এই উভয় চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করার জন্যই বঙ্গেশ্বর শেখরনগর ও হাঁসাড়া এই উভয় গ্রামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বেলা ঠিক ৮টার সময় গভর্ণর বাহাদুর ও তদীয় পারিষদবর্গ মোটর বোটে আরোহণ করিয়া শেখরনগর উপস্থিত হ'ন, এবং তাঁহাদের বোট দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইলেই ক্রমাগত গভীরনাদে বোমধ্বনি হইতে থাকে। বঙ্গেশ্বর চিকিৎসালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলে, বাবু শ্রীনাথ রায় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চিকিৎসালয়ের মধ্যে নিয়া গিয়াছিলেন; তৎপর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর যথারীতি চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর শ্রীনাথ বাবুর বাটীতে যাইয়া বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন; কয়েকটী বালিকা তখন অতি সুললিতকণ্ঠে একটী গান করে, বঙ্গেশ্বর তাহা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।'

'বাবু পদ্মলোচন ঘোষ হাঁসাড়া বাজারে "জয়লক্ষ্মী চিকিৎসালয়" সংস্থাপন করিয়াছেন। ডিস্পেন্সারীর প্রাঙ্গণে স্থানাভাব হেতু স্কুলগৃহে সভার স্থান করা হইয়াছিল। বাজার হইতে স্কুল প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যবধান হইবে; এই সমস্ত রাস্তার উভয় পার্শ্ব নানা বর্ণের পতাকাদ্বারা সুসজ্জিত, এবং বাজারের সম্মুখে ও চিকিৎসালয়ের প্রবেশদ্বারে দুইটী সুদৃশ্য তোরণদ্বার প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কালীকিশোর স্কুলগৃহও নানাবর্ণের পতাকা পুষ্প ও পত্রাদিদ্বারা সুসজ্জিত

করা হয়। মোটের উপর হাঁসাড়াবাসিগণ যে এই শুভ অনুষ্ঠানের সার্থকতা-সাধন জন্ম যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।'

'যথাসময়ে সপারিষদ বঙ্গেশ্বর জয়লক্ষ্মী চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হ'ন, এবং কতিপয় বোমধ্বনি দ্বারা তাঁহার আগমনবার্ত্তা বিঘোষিত হয়, ডিস্পেন্সারীর দ্বারে বাবু পদ্মলোচন ঘোষ, ঢাকার উকিল বাবু মহেন্দ্রকুমার ঘোষ ও অন্যান্য কতিপয় ভদ্রলোক সকলকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গভর্ণর বাহাদুর সভা-মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন; এখানেও তাহাদের আগমনসূচক বোমধ্বনি করা হইয়াছিল। স্কুলের বালকবৃন্দ পথের উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া বঙ্গেশ্বরকে অভিবাদন করিয়াছে। গভর্ণর বাহাদুর আসনে সমাসীন হইলে মিঃ লোথিয়ান অভিনন্দনপত্র পাঠের অনুমতি প্রার্থনা করেন; তৎপর বাবু মহেন্দ্রকুমার ঘোষ অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া সুদৃশ্য রৌপ্যাধারে সংস্থাপনপূর্ব্বক উহা বঙ্গেশ্বরের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন। অভিনন্দনপত্রে জিলাবিভাগের প্রতিবাদ, ইউনিয়ন কমিটী স্থাপন, ধলেশ্বরী হইতে পদ্মানদী পর্য্যন্ত বারমাস চলাচলোপযোগী খালখনন, সেরাজদীঘা হইতে হাঁসাড়া ও রাজানগর হইয়া শেখরনগর পর্য্যন্ত এবং হাঁসাড়া হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত, হাঁসারার টেলিগ্রাফ্ অফিস সংস্থাপন ইত্যাদি বহু বিষয়ের প্রার্থনা করা হইয়াছে। অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে বঙ্গেশ্বর এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে ঐ বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে।'

বঙ্গেশ্বরের বক্তৃতা।

সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ! আজ আপনারা আমাকে যেরূপ অভ্যর্থনা করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আর কোন গভর্ণর কোন গ্রামে আসেন নাই। এ প্রদেশ পূর্ব্বে লেফ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর কর্ত্তৃক শাসিত হইত; গভর্ণর অপেক্ষা তাঁহাদের কার্য্যভার অনেক কম ছিল। কাজেই তাঁহারা পরিদর্শন করার সময় পাইতেন। গভর্ণরের কার্য্য কত দায়িত্বপূর্ণ, তাহা বোধ হয় আপনারা অনুমান করিতে পারেন না। গভর্ণরের পক্ষে গ্রামপরিদর্শন সহজসাধ্য নহে। আমি আপনাদের ঐকান্তিক ঔৎসুক্য ও আগ্রহাতিশয্য নিবন্ধনই এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। বাবু

পদ্মলোচন ঘোষ ও বাবু শ্রীনাথ রায় যে সদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। আমি আশা করি, তাঁহাদের এই দৃষ্টান্ত অন্যান্য স্থানেও অনুসৃত হইয়া সত্বরই বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত হইবে।

আমার বন্ধু স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ী ষোলঘর গ্রাম এখান হইতে বেশী দূরবর্ত্তী নহে। তিনি এবং তাঁহার পিতা সেই গ্রামে পুষ্করিণী খনন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়া ঐ গ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য বহু গ্রামবাসী ব্যক্তিবর্গের পানীয় জলের এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আপনারা আর একজন সহৃদয় ব্যক্তির নাম করিয়াছেন; তিনি এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত বাবু কালীকিশোর সেন। ইঁহারা সকলেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। আমি আপনাদের রাজভক্তির বিষয় অবগত হইয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। আপনারা ভারতসম্রাটের ও তদীয় সাম্রাজ্যের মঙ্গলকামনায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন, এই সংবাদ তারযোগে মহামান্য ভারতসম্রাটের নিকট জ্ঞাপন করা হইবে।

জিলাবিভাগ সম্বন্ধে এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব করা হয় নাই। কোনও নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট সকল সময়ই জনসাধারণের মতামত গ্রহণ করিয়া থাকেন। জিলাবিভাগের প্রস্তাব প্রচারিত হইলে, আপনারা স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবেন। সকল শ্রেণীর মতামত বিবেচনা করিয়া গভর্মেণ্ট সাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক প্রস্তাবই গ্রহণ করিবেন। আপাততঃ ইউনিয়ন কমিটীগুলি কেবল পরীক্ষার্থ কোন কোন স্থানে প্রবর্ত্তিত হইবে। ঐ সকল কমিটীদ্বারা স্বায়ত্তশাসনপ্রথা প্রসারিত হইবে। ইউনিয়ন কমিটী সংস্থাপিত হইলে দেশবাসীর অনেক উপকার হইবে। ঐ সকল কমিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা ও সাধারণ কলহ প্রভৃতির মীমাংসা করিবেন, সুতরাং গ্রামবাসীদিগকে বেশী খরচান্ত হইতে হইবে না। আমি বিশ্বাস করি, অতি সত্বরই হাঁসাড়া, শেখরনগর ও রাজানগর-সৈদপুর ইউনিয়নে ঐরূপ ইউনিয়ন কমিটী গঠিত হইবে।

বিক্রমপুরের এই অংশ অত্যন্ত নিম্ন; বর্ষার সময় ইহার অধিকাংশ স্থান প্রায়ই জলমগ্ন থাকে। সুতরাং এস্থানে চলাচলের রাস্তা প্রস্তুত করা একটু

কুঁচিয়াধ্যা রাস্তার সম্বন্ধে আপনারা যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত হইলেও রাস্তা করা যাইবে কি না, তাহা সন্দেহজনক। যাহা হউক, আপনাদের কালেক্টর মিঃ হার্ট এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। আপনাদের প্রার্থনানুযায়ী রাস্তা প্রস্তুত করা যায় কি না, তিনি সেই বিষয় বিবেচনা করিবেন। খালগুলি দ্বারা যাহাতে বারমাস নৌকা চলাচল করিতে পারে, সেইরূপ কোনও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কি না, সেই বিষয়ও বিবেচনা করা হইবে। অদ্য প্রাতে মিঃ ফ্রেঞ্চ আমাকে বলিয়াছেন যে, হাঁসাড়া খালে একটী কাঠের সেতুনির্ম্মাণ জন্য ১০০০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। সাধারণের সুবিধাজনক ব্যবস্থা করার জন্য গভর্মেণ্ট সর্ব্বদাই প্রস্তুত। টেলিগ্রাফ দ্বারা সংবাদ আদান প্রদানের সুবিধা হয়। এই বিভাগের আয় দ্বারা ব্যয় সংকুলান হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেই গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস সংস্থাপন করিয়া থাকেন। আপনাদের এখানে টেলিগ্রাফ আফিস সংস্থাপন করার বিষয় বিবেচনা করা যাইবে। আমি পুনরায় বাবু পদ্মলোচন ঘোষ ও বাবু শ্রীনাথ রায়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এই বক্তৃতার পর পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে; গভর্ণর বাহাদুর পদ্মলোচন বাবুর প্রদত্ত ঘড়ী ও পুস্তকাদি প্রাইমেরী স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে বিতরণ করিয়াছেন। এই সকল অনুষ্ঠানান্তে বঙ্গেশ্বর ও তদীয় পারিষদবর্গের ফটোগ্রাফ গ্রহণ করা হয়; এবং পরে তাঁহারা ঢাকায় রওনা হ'ন। হাঁসাড়ায় বাবু পদ্মলোচন ঘোষ ও শেখরনগরে বাবু শ্রীনাথ রায় সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহাদের আদরযত্নে বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

আমরা গভর্ণর বাহাদুরের ইংরেজী বক্তৃতাটিও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

In reply to the address of welcome Lord Carmichael said: —Gentlemen of the Hashra, Shekharnagar and Rajanagar Syedpur Unions before saying anything else I desire to acknowledge your expressions of loyalty to the king—Emperor and your prayers for the success of the arms of the British Empire. These expressions will be conveyed to His Majesty's represntative in India. I thank you for the welcome you have accorded me. Your address rather seems to imply

that a Governor measures the warmth of his welcome by the number of outword signs of honour shown to him. You show me no inconsiderable number of such signs. But a Governor measures the extent of his welcome not much by the extent of outward show as by the warmth of heart expressed in the happy faces of the people. I like to think that I have brought even temporary happiness to some parts of the province by giving those who have never had the opportunity before a chance of seeing their Governor since that seems to please them. In past days you had Lieutenant-Governors who had early in their service many opportunities of visiting the homes of the people. The knowledge and the sympathies which they acquired in this way remained with them throughout life and no doubt stood them in good stead when they were called upon to rule the province but with a Governor it is different. He has to acquire this knowledge and this sympathy during his period of office while he is discharging numerous duties with which he is not familiar and which take a great deal of attention and the only opportunity he gets to do this is during the short visits which he pays to the villages in his presidency. You can imagine, therefore, how much I appreciate such an opportunity as this and you can understand and I hope forgive me if I show what may seem to be almost an inquisitive interest in your village customs. I am especiallly glad to have an opportunity of encouraging men to give of the means God has entrusted them with to help their fellow villagers. I can imagine no more noble example than that of my friend Pandit Padma Lochan Ghose, who after spending his life in educating the young now in the evening of his days turns back to his own village home to spend all the savings of his life time in building a dispensary for the relief of his suffering neighbours. May God bless him for his good deed. I wish also to acknowledge the liberality of Babu Srinath Roy who has provided for the welfare and

comfort of the people of his village by providing them with a dispensary and by digging a tank to supply them with pure drinking water and of the late Babu Kali Kishore Sen who rendered it possible to build a high school at Hashra. I hope others will be inspired by their noble example. It is I know not the first time such an example has been set. My friend Sir Chandra Madhab Ghose has his ancestral home not far from Hashra. I believe Shlaghar is only 3 or 4 miles away. He and I think his father before him have furnished that village with an excellent hospital with both in door and out-door department for both male and female patients. Sir Chandra Madhab Ghosh has also, I am told, had a large tank made in order to supply the villagers with pure drinking water. Deeds like this ought not to be forgotten and I am glad to speak of them with praise. In your address you refer to one or two matters affecting this sub-division. In the first you refer to the division of the Dacca District which has been suggested in the District Administration Committee's report. No definite scheme of partition has yet been considered by Government but when such a scheme is considered the interests of every part of the district will be fully gone into and the proposals will, you may rest assured, be published for criticism before any action is taken. You will, threfore, have plenty of time to put forward your views and I feel sure you will do so fairly. I have kept to the last the question of the establishment of Union Committees. This is a question in which I personally take great interest and I welcome the spontaneous request from the people of these three areas to put to the test the proposals made by the Bengal Administration Committee. I certainly will do all I can to help you and if you are in earnest you may rest assured I think that we shall not fail in our joint endeavours to improve Local Self-Government. After all what does local self-Government mean. It merely

means power to the people of a village to manage their own village affairs for the joint benefit of all. I believe that the establisment of union committees will go far to solve many administrative and executive problems. They will help us, I hope, to get pure water supply for the villages and to prevent the petty oppression of the people which I sometimes hear of and encourage a spirit of self-reliance which cannot but make for good administration. These three unions will I hope before long be welcomed as the pioneers of a new era. I shall watch your experiment. Our experiment I prefer to call it for I hope we shall work together. With the greatest personal interest and I hope it may be possible for me to return here before I leave India in order to see what progress you have made.

From Hashara His Excellency returned by launch to the "Rhotas." He sailed down the Dhaleswari and back to Dacca 'via' the Buriganga arriving at Wise Ghat at 4 p. m.

শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় মহাশয়ের ন্যায় দেশহিতৈষী ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গল। অর্থ অনেকেই উপার্জ্জন করেন, বিক্রমপুরে বড় লোকও সঙ্গতিশালী ব্যক্তিরও অভাব নাই, কিন্তু কয় জনের প্রাণ দরিদ্র পল্লীবাসীর ব্যথায় কাঁদিয়া উঠে? কয়জনে জন্মভূমির কল্যাণ-কামনায় উদ্বুদ্ধ হন? কয়জনে আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরের মঙ্গল-মন্দিরে স্বার্থকে বলি দিতে পারেন? যিনি পারেন তিনি ধন্য, তিনি পূজ্য, তিনি মানব-দেবতা।

দরিদ্র পণ্ডিত পদ্মলোচন নিজ গ্রামের কল্যাণ-কামনায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া যে অক্ষয়-কীর্ত্তি সঞ্চয় করিলেন তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এজন্য বিক্রমপুরবাসী জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবে। গভর্ণর বাহাদুর এই মহাপুরুষের স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয় উন্মুক্ত করিতে যাইয়া মহত্বের প্রতি যে আদর ও সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন যে সহৃদয়তা দেখাইলেন, তাহাতে বুঝিলাম যে সৎকার্য্যের ফলাফল ভগবান মানুষকে ইহলোকে এবং পরকালে উভয় স্থানেই দেন। আমরা পূর্ব্বেও পদ্মলোচনের মহত্বের কথা

প্রকাশ করিয়াছিলাম, আজ আবার মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিয়া আপনা দিগকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। গভর্ণর বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন

"I can imagine no more noble example than that of my friend pandit Padma Lochan Ghose, who after spending, his life in educating the young now in the evening of his days turns back to his own village home to spend all the savings of his life time in building a dispensary for the relief of his suffering neighbours. May God bless him for his good deed."

শ্রীনাথ বাবু সঙ্গতি শালী ব্যক্তি,—তিনি অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ভগবান এই দুই মহাত্মাকে দীর্ঘজীবি করুন. ইঁহাদের মহৎ আদর্শ, বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতে অনুসৃত হউক।

* * * *

দুর্ভিক্ষের কথা।— দেশ যুড়িয়া এবার কালের ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। ত্রিপুরা, নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, রংপুর ও আসাম-অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সম্প্রতি আসামে ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে। পার্ব্বত্য নদী জতিঙ্গায় বাণের জল ৪০ ফুট উঁচু হইয়া সমস্ত ধৌত করিয়া লইয়া গিয়াছে। মানুষ, গরু, বাছুর প্রভৃতি সামান্য জন্তুত দূরের কথা জঙ্গলের বড় বড় গাছপালা ও বন্য হস্তী পর্য্যন্ত স্রোতবেগে ভাসিয়া গিয়াছে। রেলের ১০০ ফুট লম্বা ও ৯০০ মণ ওজনের পুল পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। এই বন্যার প্রভাব পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তাহারি ফলে বর্ষার প্রাবল্যে ধান মারা গিয়াছে। সর্ব্বত্র অন্নাভাবে হাহাকার। গভর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সদাশয় মহাত্মা অনারেবল বিট্‌সনবেল দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থান সমূহে নিজে যাইয়া প্রজাদের সহিত আলাপ করিয়া অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ সহৃদয়তা প্রত্যেক রাজ-পুরুষের আদর্শ স্থানীয়।

দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত স্থান সমূহের অধিবাসিগণের সাহায্যার্থ নানাস্থানেই অর্থ সংগ্রহ হইতেছে। এ সমুদয় অর্থ যাহাতে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত নর নারীর সাহায্যেই

ব্যয় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। স্থানে স্থানে অর্থ সংগৃহীত হইয়া তাহার অপব্যবহারও হয় বলিয়া শুনা যায়, ইহা সত্য হইলে অতিশয় কলঙ্কের কথা। যাহারা দুর্ভিক্ষের নামে চাঁদা আদায় করিয়া নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করেন এবং হিসাব দিতে চাহেন না—তাহাদের সাধারণের কার্য্যে যোগদান করিতে যাওয়াই অসঙ্গত। দুর্ভিক্ষের জন্য সংগৃহীত অর্থের হিসাব প্রত্যেক সংবাদ পত্রে সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

এসময়ে সদাশয় গভর্মেণ্টের ন্যায় ভূম্যধিকারীবর্গেরও প্রজার হিত-কামনায় অগ্রসর হওয়া উচিত। অল্পসুধে টাকা ধার দেওয়া এবং অবস্থানুযায়ী খাজনা মাপ দেওয়াও তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে ভূম্যধিকারীরা প্রজাদের হিত কামনায় অগ্রসর হ'ন তৎসম্বন্ধে গভর্মেণ্টের দৃষ্টি থাকিলেই খুব ভাল হয়—কারণ আমাদের দেশের অনেক জমিদার প্রজাদের হাহাকারে বিচলিত না হইলেও কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূভঙ্গীতে বিচলিত হইয়া সৎকার্য্য করিয়া বসেন। কাজেই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত স্থান সমূহের সাহায্যের জন্য রাজ-কর্ম্মচারীগণের বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিলে সত্বর সুফল ফলিবে।

এবৎসর মধ্যবিত্তবাস্থাপন্ন ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা, সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর লোক অপেক্ষা অনেক বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা দুর্দ্দশায় পড়িলে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে তাহাতে তাহাদের সঙ্কোচের কোন কারণ নাই। মধ্যবিত্তবাস্থাপন্ন ভদ্রলোকের বিষম সঙ্কট, উপবাসে থাকিলেওত ভিক্ষা করা চলিবে না। তার পর তাহাদের আয় অধিকাংশস্থলেই চাকুরীর উপর নির্ভর করে। এবার চাকুরীরও সঙ্কটজনক অবস্থা। লাভের অঙ্ক শূন্য দেখিয়া অধিকাংশ স্থলেই কর্ম্মচারীদিগকে বরখাস্ত করা হইতেছে কিংবা অর্দ্ধ বা এক চতুর্থাংশ বেতন দেওয়া হইতেছে।

কি করিয়া এ সকল অভাব ও অভিযোগ দূর হইতে পারে তাহা ভাবিবারও বিষয় বটে। মানুষের স্বাস্থ্য ও ঘরে খাইবার না থাকিলে তাহার দ্বারা কোন কার্য্য চলিতে পারে না। অথচ কিরূপে অর্থসংগ্রহ হইতে পারে সেদিকে আমরা বড় বেশী চেষ্টা করি না। সেই একই পথে অলস ভাবে চলিতেছে।

'পাশ্চাত্য সুসভ্য দেশ সকলে যে দুর্ভিক্ষ হয় না, তাহার একটা কারণ এই যে তথাকার লোকেরা কেবল চাষের উপর নির্ভর করে না। নানা প্রকার

শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহারা স্বদেশেও বিক্রয় দ্বারা ধন উপার্জ্জন করে।' আমাদের দেশে ঐ প্রথা অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক। অর্থাগমের পথ যাহাতে নিত্য নিত্য নবীন ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারি, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। 'এখন পাশ্চাত্য কারখানার সঙ্গে আমাদের তাঁতি বা কামার প্রভৃতি টক্কর দিতে পারিতেছে না। সুতরাং চাষের সময় ছাড়া অন্য সময়ে তাঁতি কামার প্রভৃতি শিল্পীদিগকে বসিয়া থাকিতে হয়। কারখানার মজুরীতে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে চাষ করা চলে না। অতএব, যে-সব দেশে গৃহে বসিয়া শিল্পী শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করে, অথচ কারখানার নিকট তাহাকে পরাস্ত হইতে হয় না, সেই সব দেশের সমুদয় অবস্থা ও যন্ত্রাদির বিষয় অবগত হইয়া কোন্ কোন্ গৃহ-শিল্প ঐ প্রকারে আমাদের দেশে চলিতে পারে, তাহা স্থির করিয়া প্রচলিত করা কর্ত্তব্য।' ( প্রবাসী ৪র্থ সংখ্যা ১৩২২ )

* * *

ডাক্তার হেরম্বনাথ চাটার্জ্জী—বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ জগবন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র, ইনি বিলাত হইতে যক্ষা চিকিৎসাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন এবং ঢাকা নগরীতে থাকিয়া চিকিৎসা করেন। সম্প্রতি ইনি কলিকাতায় আসিয়া কয়েক সপ্তাহ ছিলেন, এই অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েকটী দুরারোগ্য যক্ষা রোগীর চিকিৎসা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে যক্ষা রোগটা আজকাল অতিশয় সংক্রামক রূপে দেখা দিয়াছে; উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা ডাক্তার চাটার্জ্জীকে দিয়া চিকিৎসা করাইলে সুফল পাইবেন বলিয়া মনে করি। আমরা স্বচক্ষে তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্য দেখিয়াছি। ইঁহার বর্ত্তমান ঠিকানা নায়েন্দা-ঢাকা।

* * *

মুন্সীগঞ্জে "বিক্রমপুরসম্মিলনী সভার একটী শাখা স্থাপিত হইয়াছে। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে যাহাতে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সাধিত হয় সেজন্য উক্ত শাখা মনোযোগী হইবেন। কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভার প্রেসিডেন্ট এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ঘোষ এম. এ, ও শ্রীঅম্বিকাচরণ মিত্র বি, এল সভার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

## শ্রাবণ-সন্ধ্যা।

—:*:—

শাদা মেঘ মিলে গেছে
হিরণে ও গৌরিকে
আলিঙ্গন করে হয়
তপস্বিনী গৌরীকে।
কোথা বা রজত শৃঙ্গ
শোভে কটা পিঙ্গলে
ধূর্জ্জটির জটা হতে
পড়ে যেন হিম গলে।
হেমাভ জলদ তায়
নীল নভ ঝালসি'
কে ভাসাল, যমুনায়
কনকের কলসী?
শুভ্র মিলে কান্ত নীলে ;—
শ্রীনন্দের নন্দনে
কে সাজালে মুক্তামালে
কুন্দ যূঁথী চন্দনে?
নীলাকাশে পুঞ্জনীল ;—
কুঞ্জপথ ধরিয়া
কেগো যায় অভিসারে
নীলাম্বরী পরিয়া?
রাঙাজলে রাঙামেঘ
জলে রাঙা শাঙনে
সাঙ করি হোলি খেলা
শ্যাম নাহে পাহনে!

না-না

বধূবেশে আসে সে যে
গোধূলির লগনে
অলক্ত-সিঁদূরে সেজে
রক্ত রাঙা গগনে।
তারি তপ্ত অনুভূতি
জাগে নিত্য স্মরণে
অর্ঘ্য দিতে আসি তাই
সায়াহ্নের চরণে।

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

---

## গ্রন্থ-সমালোচনা।

—:*:—

গোবর গণেশের গবেষণা—শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার প্রণীত ও ৭৮।২ হ্যারিসন রোড্ অন্নদা বুকষ্টল হইতে শ্রীসতীপতিভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা। গ্রন্থখানা ছয়টী পরিচ্ছেদে বিভক্ত (১) ধর্ম্ম ও অনুষ্ঠান (২) আইন ও আদালত (৩) গুরু ও গেরুয়া (৪) ঋদ্ধি ও সিদ্ধি (৫) বিত্তাও বুদ্ধি (৬) অবস্থা ও ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান সাহিত্য ক্ষেত্রে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সরস ও মনোহর অথচ মর্ম্মস্পর্শী ব্যঙ্গ পুস্তক এ পর্য্যন্ত একখানাও প্রকাশিত হয় নাই। লেখক প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণ ব্যক্তি, তিনি দেশের কথা ভাবেন বোঝেনও দেশের জন্ত প্রকৃতই তাঁহার প্রাণ কাঁদে, প্রত্যেকটী লাইনেই আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের জাতীয় অধঃপতনের মূল সূত্রটুকু কোথায় তাহা তিনি খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন—তিনি

যথার্থই লিখিয়াছেন "নর হন্তা দস্যুর হাতে একটা পিস্তল দেখিলে আমরা সকলেই ভোঁ। দৌড় মারি। বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্ত আমরা মৃত্যু মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি কৈ? আমরা মনের জোরে কাল ভয় দূর করিতে পারি না; তাই কথায় কথায় কাল-ভয়-হারী হরিকে ডাকিয়া আনি। জন্মিলেই মরিতে হয়, তাই জন্ম মৃত্যুর হাত এড়াইবার জন্ত আমরা সর্ব্বদাই ব্যাকুল। আমরা শিখিয়াছি কেবলধর্ম্ম করিতে—এরূপ ধর্ম্ম করা চাই, যাহাতে চিরদিনের মত আসা যাওয়া ঘুচিয়া যায়।"

"আমরা সকল হারাইয়া এক মাত্র ধর্ম্মকেই সার করিয়াছি। তাই সকল কাজেই আমরা ধর্ম্মের নাড়া দিয়া থাকি। প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া আমরা বলিয়া থাকি, ধর্ম্ম আছেন, আমি সহিলাম, ধর্ম্মে সহিবে না আমাদিগকে যে ব্যক্তি পদাঘাতে সম্মানিত করিবে, আমরা তাহাকে করযোড়ে ধর্ম্মাবতার বলিয়া সম্বোধন করিব।"

যে সকল কারণে বাঙ্গালা দিন দিন হীনবীর্য্য, হীনবল ও অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে, পারিবারিক সুখ শান্তির হস্ত হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে বিচক্ষণ গ্রন্থকার তাহার প্রত্যেকটি বিষয় সরস রসিকতার সহিত জনসজ্বের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমাদের হাসি পায় নাই, বরং হৃদয়ের অন্তস্থলে গভীর বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে-নয়ন দ্বয় অশ্রু-সিক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মের ভানে আমাদের দেশে কতকি ঘটিতেছে কত কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, ধর্ম্মের নামে আমরা কিনা করিতেছি? অথচ আমরা সে দিকে একেবারে নির্ব্বাক, সংস্কার করিতেত চাহিই না বরং সে সকল লুপ্ত প্রায় অতীতের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মকে পূর্ণ মাত্রায় জাগাইয়া তুলিবার জন্ত উদগ্র হইয়া উঠিয়াছি। এ কথাটা আদবেই ভুলিয়া যাইযে ধর্ম্ম কোথায়? আমরা কি ধর্ম্মকে চাই তাত নয়, আমরা চাই অনুষ্ঠান। দয়া, দাক্ষিণ্য, সততা, সত্য-বাদিতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠানের বরং বিপরীত সম্বন্ধ অল্প বুদ্ধি সাধারণ লোক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ভাব লইয়া অনুষ্ঠান বিশেষের দ্বারা সাবেক পাপের কাটান করিয়া নূতন পাপ করিবার জন্ত পাট্টা গ্রহণ করে।"

তার পর মাম্‌লা মোকদ্দমার ভীষণ পরিণাম, গুরু ও পেরুয়ার রহস্ত কথা আলোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেকটী বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি চিন্তাশীলতা এবং বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সকলগুলিই সমাজের নিখুঁত ফোটোগ্রাফ। 'আজকাল সাহিত্যের বাজারে প্রত্নতত্ত্বের বড়ই প্রভাব! সকলের মুখেই প্রত্নতত্ত্বের কথা মাসিক পত্রগুলির স্তম্ভেত কেবল পচা প্রত্নতত্ত্বের তরকারি থরে থরে সাজাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে অনেক সময় দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকে। কিন্তু পাঠকগণ তাহাই উদরস্থ করিয়া লেখকের হাতের তারিফ করেন, আর লেখক তাহাতে ফুলিয়া উঠেন!' অতি সুন্দর।

এরূপ ভাবে গণেশ মহাশয় সমাজের প্রত্যেক ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও ধৈর্য্য চ্যুতি নাই—ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই—ভাষার অপব্যবহার নাই; অতি নিরপেক্ষ ভাবে সমাজের বিষয় আলোচনা করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা আজকাল বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় গোবরগণেশের গবেষণা বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব আম্‌দানী। আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রথম পরিচ্ছেদটাই ভাল লাগিয়াছে। এ অধ্যায়ে ভাবিবার, শিখিবার ও বুঝিবার অনেক আছে।

ভাষা সরল ও সুন্দর। বুঝিতে মাথা ঘামাইতে হয় না। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। বাঙ্গালা সাহিত্য-রস-রসিক ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থ পড়া উচিত।

গয়া-দৃশ্য

( গয়া-কাহিনীপ্রণেতা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে )

# বিক্রমপুর।

## গান।

—:*:—

এইত বুঝি সন্ধ্যা হলো<br>
কোথা তুমি প্রাণেশ আমার!<br>
এইত আমি কুঞ্জে বসে<br>
কোথা তুমি প্রাণেশ আমার!<br>
এইত আঁখি চেয়ে আছে<br>
শক্তিনাই দেখিবার!<br>
সারা দিনের পথ চাওয়া<br>
আঁখি বুঝি হলো আঁধার!<br>
তাতেই তোমায় দেখ্‌তে নারি<br>
শক্তি নাই দেখিবার।<br>
সকল আশা বিফল হলো<br>
জীবন হ'ল অন্ধকার।<br>
ঘুচাও তুমি আঁখির ঘোর<br>
এস কাছে প্রাণেশ আমার!<br>
সকল আঁধার আলো করে<br>
এস প্রাণে প্রাণাধার।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ।

# বুঝিবার ভুল।

—— ০——

ললিত ফিলজফিতে এম, এ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর অবিশ্বাসী। কিরণবালাও ছেলেবেলা হইতে লেখাপড়ার দিকে ঝোঁকটা কিছু বেশী ছিল বলিয়া তার ধাৎটা যে পরিমাণে স্নায়বিক লক্ষণাক্রান্ত, রুচিটা ততোধিক মার্জ্জিত এবং তার মতামত সম্পূর্ণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হইলেও তখন পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্বে গিয়া পঁহুছায় নাই।

ললিতের সঙ্গে কিরণবালার বিবাহটা চুকিয়া গিয়াছিল, আমাদের গল্পটা সুরু হওয়ার অল্প কিছু পূর্ব্বে। তবু সে ব্যাপারখানা একেবারে নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া যায় নাই, গল্পের হিসাবে সেটাও মন্দের ভাল! তা কথাটা তেমন গুরুতর কিছু নয়। এতকাল আমাদের রক্ষণ-শীল বঙ্গসমাজ পঞ্চশরকে সম্পর্কে প্রজাপতির কনিষ্ঠ স্থির করিয়া বিবাহ-ব্যাপারে একমাত্র প্রজাপতিরই আনুগত্য নির্ব্বিচারে স্বীকার করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পি এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজগুলি বিলাতী ডাক লইয়া যে সময় হইতে বাংলার উপকূল ভিঁড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই হইতে ইস্কুল কলেজগুলির কল্যাণে সমুদয় বাংলা মুলুকে বিনা লেকচারে প্রচার হইয়া গেল সহস্র-লোচন হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গের তেত্রিশ কোটী দেবতা-বৃন্দের মধ্যে আমাদের এই অল্প-বয়স্ক জন্মান্ধ দেবতাটী মর্য্যাদা ও পরাক্রমে আর কোন দেবতারই কনিষ্ঠ নন। সে যা হোক, এ ক্ষেত্রে শুভ পরিণয় 'গুপ্ত প্রেসে'র বৃহৎ পঞ্জিকা হইতে শুভ দিনের নির্ঘণ্ট পত্র দেখিয়া খাঁটী হিন্দু মতে নির্ব্বাহ হওয়ায় সমাজের গোঁড়া তরফ হইতে বিশেষ কোন গোল হয় নাই, লৌকি-কতাও ভোজন দক্ষিণার বরাদ্দটা কিছু বাড়াইতে হইয়াছিল এই পর্য্যন্ত!

কিরণ বারান্দার টেবিলের এক পাশে বসিয়া পা দুলাইয়া দিয়া চিকের দড়িটী লইয়া খেলা করিতেছিল। ললিত ক্যানভাসের ইজিচেয়ারে শুইয়া অলস ভাবে হস্তস্থিত "সুনীল-পত্র" খানার উপর চোখ বুলাইতেছিল।

বিকালবেলায় আকাশ ভাঙ্গিয়া ঝর ঝর করিয়া অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছিল। ঘরখানা মৃদু অন্ধকারের স্নিগ্ধতায় যেন একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে, মনের ভিতরটা আরো চমৎকার!

ললিত হঠাৎ অর্দ্ধনিদ্রিত ভাবের রাজ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া "সুনীলপত্রের" একটা যায়গা খুব জোড়ে পড়িয়া গেল "আমাদের বাংলা সমাজে পদে পদে কেবলি সংযমের বাঁধা। তাতে স্ত্রী-পুরুষের যুক্ত না করিয়া কেবলি বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চায়! তাই বাংলার দাম্পত্য-বন্ধন ঘরকন্নার বন্ধন মাত্র, হৃদয়ের বন্ধন নয়।"

এই টুকু পড়িয়া ললিত "সুনীলপত্র" খানা টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করিয়া কিছু অতিরিক্ত উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিল :—

"আচ্ছা—কিরণ, তুমিও কি বলতে চাও, আমাদের বন্ধনটা কেবলি ঘর-কন্নার বন্ধন, তার বেশী কিছু নয়?"

কিরণবালা টেবিলের উপর আরো একটু আঁট হইয়া বসিয়া বলিল :—

"অনেকটা। পদে পদে হোঁচট খেয়ে যাকে বেঁচে থাকতে হয়, তার জীবনী শক্তি তো আস্তে আস্তে ক্ষয়ে যাইবে।"

ললিত একটু উদার মুরুব্বিয়ানা ভাবে হাসিয়া বলিল :—"নাহে কিরণ, তা ঠিক নয়! সংযমের ভিতরে ভালবাসা কেমন জান?—যেন ঐ সবুজপাতার আড়াল দেয়া কেয়াফুলের ঝাড়টার মতো—ঐ আড়াল টুকুই তার সব।

"ঐ আড়াল টুকুই সব? তবে তো দেখতে পাচ্চ, বিবাহের ভিতরেও খাঁটী ফিলজফি আছে। মাঝে মাঝে একটু আধটু চোখের আড়াল হওয়াটা "মন্দ নয়!"

"মন্দ নয়, বল কি, খাঁটী ভালবাসার পক্ষে ওটা যে একটা মস্ত টনিক।"

এবার ললিতের মুখে "কবুল জবাব" শুনিয়া কিরণ ভারি খুসী হইয়া বলিল :—

"বাঁচা গেল বা হোক, এই বেলা তা হলে আমার এক মাসের প্রিভিলেজ-লিভ মজুর হয়ে যাক। এক ঘেয়ে মিলনের মাঝে আমাদের ভালবাসাটা নৈলে নিশ্চয় শীগ্‌গীর হাঁপিয়ে উঠবে যে!"

ললিত এতক্ষণ কথাটা তর্কের দিক দিয়াই বিচার করিতেছিল, সত্যের দিক দিয়া নয়। তাই কিরণের প্রস্তাবটা তামাসা করিয়া উড়াইয়া দিবার মতলবে বলিল :—

"প্রিভিলেজ লিভ! তা সোজা আট আনার ষ্ট্যাম্প দিয়ে দরখাস্ত কর, তার পর দেখা যাবে'!

ললিত সে সময় ডেপুটী চাকরীর নমিনেসন না পাইয়া হাইকোর্টের এক বড় এটর্নীর আর্টিকেল-ক্লার্ক হইয়া আইন দেখিতেছিল।

কিরণ ললিতের হাতে একখানা টেলিগ্রাফ দিয়া তার উপর সহাস্য দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিয়া বলিল :—

"ঠাট্টা নয়, এই দেখনা হঠাৎ বাবার টেলিগ্রাফ এসে হাজির,—আসচে বুধ-বারে মেজদার বিয়ে, মেজদার সবি অবাক কাণ্ড!"

এ অপ্রত্যাশিত সুসংবাদে ললিতের মুখ খানা হঠাৎ অত্যন্ত লম্বা হইয়াগেল। সে এবার গাম্ভীর্য্যের সহিত যৎকিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ-মিশ্রিত করিয়া পুরাদস্তুর দার্শনিকের মত উত্তর করিল :—

'স্বীকার করি, জন্ম মৃত্যুর চাইতে বিবাহ জিনিষটার আপেক্ষিক গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়, কিন্তু ওতে অত অবাক হবার কি আছে?"

অবাক হবার কি আছে এতে? এই না সে দিন তিনি বুক ঠুকে আমার কাছে বলে গেলেন এ জন্মে তাঁকে দিয়ে স্ত্রীর দাসত্ব করা পোষাবে না, শেষ কালে তাঁরো পতন হলো? পতন বলে পতন নয়, একেবারে টেলিগ্রাফে!"

ললিত তথাপি কিছু মাত্র অবাক না হইয়া অত্যন্ত উদাব ভাবে বলিল :—

"পড়েচো তো কিরণ, পতনই হচ্চে উঠ্‌বার সিঁড়ি। রবিবাবুর 'চিরকুমার সভার' সভ্যদেরও তো স্ত্রী জাতির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মেনে নিতে হয়েছিল, তোমার মেজদার দৌড় আর কতদূর বল! যাক ওসব বাজে কথায় দরকার নেই; এখন তো তাড়া-তাড়ি বাড়ী টাড়ী সব দেখতে হয়।"

কিরণবালা স্বামীর মুখের উপর চোখ রাখিয়া কিছু উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল :—

"তবে টেলিগ্রাফটা তুমি মাথা মুণ্ড পড়লে কি! বে হচ্চে যে দার্জ্জিলিংএ; কনের বাপ সেখানকার ডাক্তার!

কিরণের শুভ-সংবাদে ততক্ষণ ললিতের হৃদয়ে সদ্য দারর্জ্জিলিংএর তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছে। তবু সে প্রকৃত বীরের মত, সদ্য বিরহের আশঙ্কাটা ম্লান-হাসির নীচে চাপা দিয়া একটু রহস্য করিয়া বলিল :—

"কি? আমাদের মিষ্টি মুখ করবার ভয়ে ভায়াকে শেষকালে হিমালয় পর্য্যন্ত ধাওয়া কত্তে হয়েছে—বাহাদুর বটে!"

মায়ের পেটের ভাইকে কাপুরুষ বলিলে স্ত্রী জাতি কখনো স্বামীকেও ক্ষমা করে না। তাই কিরণ স্বামীর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল ;—

"না, তা নয়, যাদের মুখই মিষ্টি তাদের মিষ্টিমুখ করাতে বেশী বাজে খরচ হয় না। আমার মনে হয়, তপোভঙ্গই যদি হলো, তবে সেটা তো হিমালয়ে হলেই মানায়। "কুমার সম্ভবে" তার নজিরও রয়েচে তো! বোধ করি মেজদা এই রকম একটা কিছু মনে করেচে।"

ললিত এবার ইজিচেয়ার খানার উপর একটু নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিয়া বলিল :—

"ফিলজফি পড়েচি বলে মনে করো না, কিরণ, আমি কাব্যের কোন ধার ধারি না! অমন গোরার ব্যাণ্ড, গঙ্গার ধার, সস্তা আইসক্রিম ফেলে এসে যাদের তপোভঙ্গের জন্য পাহাড়ে চড়তে হয়, আমি বলি তারা ঘোরতর কাপুরুষ!"

কিরণ এবার জোড়হাত করিয়া বলিল :—

"রক্ষে কর তুমি, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের অত খবর তো রাখি না আমি। তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ সেজদা কাল আমায় যখন নিতে আসবে, তখন তুমি তাতে অমত করো না!"

ললিত এবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষকালে অত্যন্ত কাহিল ভাবে জবাব করিল :—

"আর তো কিছু নয়, তুমিও চলে যাবে মার শরীরটা আজ কদিন থেকে ভাল বোধ হচ্চে না।"

ললিতের কথা শুনিয়া কিরণ যেন স্বর্গ-ভ্রষ্টা অপ্সরীর ন্যায় বিস্মিত হইয়া বলিল :—

"মার অসুখ বল কি তুমি? মা তো আমায় কিছু বলেন নি, আচ্ছা দাঁড়াও আমি এখনি মাকে জিজ্ঞাসা করে আস্‌চি!"

এই বলিয়া ললিতের আর কোনো অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই কিরণ বরাবর তার শাশুড়ীর হবিষ্যি ঘরের দিকে হনহন করিয়া ছুটিয়া চলিল। ললিত বেগতিক দেখিয়া তাকে তাড়াতাড়ি আঁচল ধরিয়া গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়া বলিল :—

"আরে থামোই না, একেবারে ক্ষেপে উঠলে দেখচি। নিজের অসুখ বিসুখের কথা মা আবার বলতে যাবেন কি, আমাদেরি তো দেখে শুনে নিতে হয়! নিজের অসুখের কথা গেয়ে বেড়ানো আমার মার স্বভাব নয়।"

স্বামী স্ত্রীতে বাকযুদ্ধটা যে ভাবে চলিতে লাগিল তাতে কোন পক্ষেই সহজে হারজিৎ হইবে, তার আদৌ কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সব সময় স্ত্রীকে বাকযুদ্ধে পরাস্ত করিতে না পারিলে অন্য রকমের হাতিয়ারের ব্যবস্থা করিতেন কিন্তু আজ কালকার শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের বরুণাস্ত্র সহায় থাকায় বাক যুদ্ধে নিরীহ পুরুষ জাতির অনেকটা মাত্রা রাখিয়া চলিতে হয়।

সে যা হোক্, উভয় পক্ষে অনেক কথা কাটাকাটি, মান অভিমান ও অশ্রু-পাতের পর, অনেক রাত্রে উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া স্থির হইল যে ললিতের মা যদি অনুমতি করেন, তবেই কিরণ ছুটি পাইবে, নচেৎ নয়! এরূপ এক তরফা সন্ধিপত্রে কিরণ নিজের মনে বেশী ভরষা পাইল না। কিন্তু ললিত মনে মনে ভারি খুসী হইয়া গেল, কারণ তার মনে সাড়ে ষোল আনা বিশ্বাস, যে ছেলে ও ছেলের বৌয়ের মাম্‌লা বিচার করিতে গিয়া কোন্‌টী পেটের আর কোন্‌টী পিঠের বাঙ্গালার গর্ভধারিণীরা সেটা প্রায়ই ভুলিতে পারেন না।

পর দিন সকালে শ্যামাসুন্দরী হবিষ্যি ঘরের এক কোণে সবে হরিনামের মালাটী হাতে লইয়া বসিয়াছেন এমন সময় ঘরের সদর ও খিড়কি দরজা দিয়া ললিত ও কিরণ মার নিকট হাজির! শ্যামাসুন্দরীর হাতের মালাটি আর চলিল না। তাদের চাঁদপানা মুখ দু'খানার দিকে তাকাইতেই যে শ্যামাসুন্দরীর হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরের টানও যে শিথিল হইয়া গেল, সেও তো সেই বিশ্বেশ্বরেরই চক্র!

মার পরিচর্য্যার জন্য কিরণকে এসময় আর কোথাও যাওয়াই যে সঙ্গত নয় সে কথা ললিত এমন করিয়াই মাকে বুঝাইল যে শ্যামাসুন্দরী ছেলের আকস্মিক মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ললিতের বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা দেখিয়া তিনি ভাবিলেন এই হীরার টুকরা-ছেলে যখন হাইকোর্টের এটর্ণি হইয়া বসিবে, তখন ঐশ্বর্য্য রাজ্যে প্রবেশ করিবার রৌপ্য নির্ম্মিত মোহনার মুখটী খুলিয়া যাইতেই সংসারে অভাব দৈন্য

যে খিড়কি দরজা দিয়া পলায়ন করিতে পথ পাইবে না সে সম্বন্ধে তাঁর আর কোন সন্দেহ থাকিল না। কিন্তু সে অনেক দূরের কথা। সেদিন যে বিষয় লইয়া ললিত ও কিরণ মার নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে কিন্তু ললিতের এত বক্তৃতার ঝড়েও পালে বেশী বাতাস বাঁধিল না। সে যাত্রা কিরণের দু'টী সুন্দর চোখের জয় হইল। তাহার নীরব ছল ছল চোখ দুটার পানে তাকাইতেই শ্যামাসুন্দরীর সমুদয় চিত্ত স্নিগ্ধ করুণা-রসে আপ্লুত হইয়া গেল। তার সমুদয় স্মৃতি আলোড়িত করিয়া জাগিয়া উঠিল সেই শৈশবের সুদূর তটে, স্নিগ্ধ তরু-পুঞ্জের মাঝে অর্দ্ধ লজ্জিত পল্লীকুঞ্জের ছায়ায় পিত্রালয়ের স্বপ্ন-মণ্ডিত স্বর্ণোজ্জ্বল ছবিটী। সেই সুবর্ণখালীর ভাঙ্গান পাড় হইতে সবুজ ধানের ক্ষেতগুলি গ্রাম ছাড়াইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সে শস্যপূর্ণ প্রান্তরের মাঝে খয়েরি রংএর ছোট বড় ঘর গুলি! সেইখানে, সেই সৌন্দর্য্যের দেশে, দৈন্যঘেরা শান্তির সুশীতল ছায়ায় পল্লী-লক্ষ্মীর সোণার আঁচল-খানা লুটাইয়া পড়িয়াছে। শ্যামাসুন্দরী নিজে পল্লীর ভিতরের মানুষ; তাই সুদূর পিতৃ-ভবনের সঙ্গে প্রবাসী-কন্যার আজন্ম সঞ্চিত মমতার সম্পর্কটী কোথায়, কেমন করিয়া সে তার সারা চিত্তটি স্নেহের সুরভি' বেষ্টনে আজীবন সুমিষ্ট করিয়া রাখে, মুহূর্ত্তে শ্যামাসুন্দরী সব বুঝিতে পারিলেন। সব বুঝিতে পারিলেন বলিয়াই কিরণের মুখে একটী মাত্র কথা না শুনিয়াই শুধু তার কাতর চোখ দুটী দেখিয়াই তার অন্তরের কথাটী শুনিতে পাইলেন। বাপের বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া শ্যামাসুন্দরীর চোখের পাতা ভিজা ভিজা হইয়া উঠিল তাই আজ কিরণের মুখের সম্মুখে ললিতের লজিক বেষ্টিত যুক্তি তর্কের বেড়া কার্য্য কারণের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস শব্দ যোজনার পরিপাট্য কোনটাই টিকিল না। শ্যামাসুন্দরী ললিতের মুখের পানে চাহিয়া একটু চেষ্টাকরা হাসি হাসিয়া বলিলেন :—

"না বাবা, এ সময় বৌমাকে যেতেই হবে, না গেলে তার মা বাপের মন যে কি করবে, তা আমি তো বুঝি!"

মায়ের রায়টা ঠিক ললিতের মনোমত না হওয়ায় ললিত মনে মনে মা ও ললিত দুজনার উপরেই বিলক্ষণ চটিয়া গেল। পূর্ব্ব রাত্রির সন্ধিপত্রের চুক্তিতে বিস্মিত হইয়া সে ঘরে ফিরিয়া কিরণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে মার

রায়টা ঠিক হয় নাই। কিন্তু কিরণকে আজ আর ঠেকাইয়া রাখে কে! সে ললিতকে বেশ একটু খোঁচা দিয়াই শুনাইয়া দিল, যে এ জগতে মায়ের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চলে না, বাস্তবিক ফিলজফি পড়িয়া যে মানুষ এমন বোকা হইতে পারে, তা সে সময় ললিতকে না দেখিলে সহজে কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন।

ললিত এ পর্য্যন্ত নিম্নপ্রাইমারী হইতে আরম্ভ করিয়া এম্.এ পর্য্যন্ত কোন পরীক্ষাই কখনো ঠকে নাই। কিন্তু এ যাত্রা পরীক্ষক নারী, পরীক্ষা জীবনের একটা অধ্যায় লইয়া! সুতরাং মুখস্থ পড়ায় এ বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা পাওয়া মুস্কিল! কিন্তু প্রথম এ সব কথা যেমন তেমন,—সত্যের পরাভবের লজ্জা ললিতের জীবনে এই প্রথম।

সে দিন ভোরে ললিত একা পুরীর সমুদ্র-তীরে হাওয়া খাইয়া বেড়াইতে-ছিল।

সম্মুখে অকূল নীল পাথার সুদূর দিক-প্রান্তের সঙ্গে গিয়া মিলিয়াছে। দিগন্ত নীল স্বচ্ছ নীল রেখায় চুম্বনানত নীলআকাশ যেন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে চিরকালের জন্য মুগ্ধ হইয়া আছে। নীল কাচের পাহাড়ের মত বড় বড় ঢেউগুলি শুভ্রফেন রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে পরিয়া বিচিত্র গম্ভীর ছন্দে এক একবার পাণ্ডুর সৈকতের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে। আবার কি এক টানে, কি এক উন্মত্ত উল্লাসে তারা ক্রীড়া-চঞ্চল শিশুর মত যেন সাগরের উচ্ছ্বসিত মাতৃবক্ষে ছুটিয়া যাইতেছে।

দেখিতে দেখিতে বনরাজিলীলা তটভুমি মুখরিত করিয়া ভোরের পাখী কলরব করিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সবিতা নিদ্রান্তে সমুদ্রে প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া জলস্থল অরুণিত করিয়া ক্ষিরোদ-শায়ী ভগবানের মত সহাস্য মুখে তরঙ্গ শেখরে উদিত হইলেন। আমাদের প্রতি দিনের প্রাতঃ-কালটী তার অনাদি নবীনতার সৌন্দর্য্য লইয়া জলে স্থলে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চারিদিকে সহসা আলোর উৎসব জ্বলিয়া উঠিল, যে রঙ্গীন স্বপ্ন তরঙ্গে তরঙ্গে জড়িত হইয়া, সমুদ্রের বিশাল হৃদয় রঞ্জিত করিয়া দিয়া আকাশের স্তর-বিন্যস্ত মেঘ পুঞ্জে ছড়াইয়া গেল।

সে এক মহান গম্ভীর দৃশ্য! কিন্তু মানুষের মন এমনি দুঃসাধ্য জিনিষ

যে এত বড় সমারোহটাও আজ ললিতের চোখেই পড়িল না। তার মুখখানি পাণ্ডুর, চোখদুটী জাগরণ-ক্লিষ্ট, চুলগুলি অসংযত, সার্টের আস্তিনে বোতাম নাই। অর্থাৎ মহাকবি সেক্ষপীয়রোক্ত সন্থ বিরহের প্রায় সবগুলি লক্ষণই ললিতের চেহারায় অতি উগ্রভাবে বর্ত্তমান। আজ ললিতের চিন্তাটা অভিমানের বেদনায় একেবারে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। যে ললিত তার আনন্দের সবখানি কিরণের হাতে সঁপিয়া দিয়াও অন্তরের ভিতরে নিঃস্বের দৈন্য কিছুমাত্র অনুভব করে নাই। আজ সেই কিরণের ব্যবহার কি নিষ্ঠুর। যে মার হাতে সে মানুষ, যিনি হৃদয়ের অমৃত পাত্র শূন্য করিয়া অন্নপূর্ণার মত এতকাল স্বহস্তে সুধা বিতরণ করিয়া তার স্নেহ ক্ষুধা মিটাইয়া আসিতেছেন, তিনিও আজ ললিতের অন্তরের বেদনাটী টের পাইলেন না! তবু মায়ের ত্রুটি ক্ষমা করা চলে, কিন্তু কিরণও স্বামীর অন্তরের পাশে একটীবার ফিরিয়া তাকাইল না, স্বামীর মতামতের কোন অপেক্ষাই রাখিল না, তুচ্ছ একটা আমোদের লোভ সামলাইতে না পারিয়া ললিতের আহত হৃদয়ের রুদ্ধ প্রেমোচ্ছ্বাস দুই হাতে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, গোলাপের কণ্টকপূর্ণ নির্দ্দয় সুন্দর শাখাটীর মত তার হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সমানে চিরিয়া দিয়া গেল—একবার পিছনে ফিরিয়া দেখিল না,—কত নব বসন্তের আনন্দ-সম্ভার কত ঘনবর্ষার বিরহ বেদনা যৌবনের উন্মেষ হইতে তারি জন্য এতকাল ললিত হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভালবাসার এই পরিণাম, ধিক্ এমন ভালবাসায়।

ললিত ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল এখন হইতে শক্ত হইতে হইবে। স্ত্রীলোকের হাতে স্বেচ্ছাচারের রাশটী তুলিয়া দিয়া নিজের হৃদয়কে আর এমন লাঞ্ছিত করা হইবে না, কিরণ না চাহিয়া এত পাইয়াছে তাই সে না চাহিয়া পাওয়া ধনের দর কষিতে শিখে নাই! এবার তাকে একটু কাঁদিতে হইবে, চাহিয়া পাইতে হইলে যে কি প্রয়াস সেটুকু ভাল করিয়াই শিখিতে হইবে।

এই ধরণের দুশ্চিন্তার বুদ্বুদগুলি ললিতের মনের ভিতরে বরাবর উঠা নামা করিতেছিল। ললিতের মন সেইগুলির উপরেই পড়িয়াছিল, তাই সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়াও আজ তার সমুদ্র দর্শন ঘটিয়া উঠিল না! ললিতের

একটা ধারণা ছিল যে বিবাহাদি উৎকট মানসিক ব্যাপারে সমুদ্রের দৃশ্য ও আবহওয়া নাকি ভাল টনিকের কাজ করে। কিন্তু বেচারা পয়সা খরচ করিয়া পুরীতে আসিয়া তবে টের পাইল যে জগন্নাথ তার ভাগ্যে সে যাত্রা মোটা বালি ও নোনা জল ব্যতীত আর কিছুই ব্যবস্থা করেন নাই।

"মিত ভাষিণী "পত্রিকা—চাই—"মিতভাষিণী কলিকাতার নূতন পত্রিকা নগদ মূল্য এক পয়সা—"

খবরের কাগজ বিক্রেতা ছোকরা ফেরিওয়ালার হাঁক শুনিয়া ললিতের বৈরাগ্যের মোহটা অনেক খানি ছুটিয়া গেল ললিত চোখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিতে পাইল, ছোকরাটী বুকের উপর মস্ত একখানা প্লাকার্ড ঝুলাইয়া বরাবর তারি দিকে আসিতেছে। সে আরো কিছু কাছে আসিলে ললিত দেখিতে পাইল প্লাকার্ড খানার উপরে বড় বড় রঙীন হরপে লেখা রহিয়াছে—

নূতন সংবাদ!

দার্জ্জিলিংএ ভীষণ অগ্নিকাণ্ড!!

বিয়ে বাড়ী ছার খার!!

হতাহত অনির্দ্দিষ্ট!!

"মিতভাষিণী" কলিকাতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা নগদ মূল্য এক পয়সা মাত্র।

খবরটা পড়িতেই ললিতের মস্তিষ্কের ভিতরটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি এক পয়সার স্থানে একটী এক আনা মূল্যের নিকেল মুদ্রা ফেলিয়া দিয়া একখানা "মিতভাষিণী" কিনিয়া সরিয়া পড়িল; ভাঙ্গতি পয়সার জন্য এক মিনিটও সেখানে অপেক্ষা করিল না!

সংবাদ পত্রের স্তম্ভে অনেকখানি যায়গা ছাড়িয়া বড় বড় হরপের হেড-লাইনের সমারোহ শেষ হইলে পর "মিতভাষিণীর" বিশেষ সংবাদ-দাতার পত্রে". আসল খবরটা এইরূপ লেখা ছিল :—

"নৃপেন্দ্র বাবুর নিবাস যশোহর জেলায়। তিনি ডাক্তারি ব্যবসা উপলক্ষে সপরিবারে দার্জ্জিলিংএ বাস করেন, পশার ভালো। সেদিন তাঁর বাসা বাটীতে শ্রীমান শশাঙ্কশেখরের সহিত তাঁর কন্যা হেমনলিনীর উদ্বাহ-বন্ধন-ক্রিয়া

সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহান্তে অন্তঃপুরে তাঁবুর নীচে দার্জ্জিলিংএর আপামর ভদ্র অভদ্র ইতর সম্ভ্রান্ত সকল বাঙ্গালী মিলিয়া মিষ্টি মুখ করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্‌ ফাটিয়া গিয়া তাঁবুর একধারে আগুণ ধরিয়া যায়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এত বড় মিষ্টান্নের যোগাড়টা একেবারে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। হতাহতের সংখ্যা অনির্দ্দিষ্ট! জনরবে প্রকাশ বরের যে ভগিনী কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে নাকি এই দুর্ঘটনার পর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছেনা, যাঁহারা শাস্ত্র-সঙ্গত বিবাহাদি ক্রিয়াকাণ্ডে নির্দ্দোষ ঝাড় লণ্ঠনাদির পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিকীর পক্ষপাতী তাঁহারা এ শোচনীয় দৃষ্টান্তে সতর্ক হউন।'

"মিতভাষিণী"র ভাষার যথেষ্ট অমিতব্যয় সত্ত্বেও খবরটা পড়িয়া ললিতের কিন্তু মাথা ঘুরিতে লাগিল, মুখখানা একেবারে মাটির মত বিবর্ণ হইয়া গেল। ললিতের চট করিয়া মনে হইল, তবে বুঝি তার স্নেহের কিরণ আর নাই। তবে জীবনকুঞ্জ অন্ধকার করিয়া তার সাধের বিরহিনী তবে বুঝি ফাঁকি দিয়া উড়িয়া গেল! বজ্রাহত পথিকের মত ললিত তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের তীরে উত্তপ্ত বালুর উপর বসিয়া পড়িল। দু'চারিটি পথিক তার পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ললিত তাদের পানে তাকাইলও না—সমুদ্রের গর্জ্জন সে সময় তার কাণে পঁহুছিয়াছিল কিনা—তাহাতেও সন্দেহ আছে।

সারা দিন ললিত পাগলের মত সমুদ্রের তীরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া রাত্রিতে কলিকাতার গাড়ী ধরিল। নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া একটীর পর একটী আলোক মালায় সজ্জিত ষ্টেশন ছাড়াইয়া হু হু শব্দে চিৎকার করিতে করিতে বেঙ্গলনাগপুর রেল কলিকাতার পানে ছুটিতে লাগিল। কিন্তু ললিতের চোখে ঘুমও আসিল না, অফুরন্ত পথের আর শেষ হয় না। সে নিদ্রাহীন চোখে নিস্তব্ধ নক্ষত্র-খচিত অন্ধকারের পানে সারা রাত্রি চাহিয়া থাকিল! বাস্তবিক কলিকাতা হইতে পুরীর পথ যে রেলে ও এতদূর আসিবার সময় রাগের মাথায় ললিত সেটা কিছু মাত্র আঁচ করিতে পারে নাই! কিন্তু তার চাইতে ও আশ্চর্য্য সে যে এত রাগ করিয়া কিরণকে জব্দ করিবার জন্য পুরী চলিয়া আসিয়াছিল, সে রাগই বা এখন কোথায় গেল! ললিত মনে করিল, কিরণ ভাইয়ের বিবাহে দুদিনের জন্য বেড়াইতে গিয়াছিল বই তো নয়! এমন কে

না যায়, এবং গেলেই বা এমন দোষ কি, সে কথাটা আজ ললিতকে আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইল না। কিরণকে সে যতই রূপ রস স্পর্শের অতীত করিয়া মনে করিতে লাগিল, ততই কিরণের চরিত্রের মাধুর্য্য তার সমুদয় ব্যথিত চিত্ত জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তার বারে বারে মনে হইতে লাগিল, কিরণের তো কোনো দোষ নাই, নিয়তিই মৃত্যুরূপে কিরণকে তার বক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া নিতে আসিয়াছিল!

পরদিন বেলা নয়টার সময় রুক্ষবেশ রক্তবর্ণ চক্ষে ললিত শুকড়া গাড়ী হইতে কোন মতে নামিয়া পড়িয়া ঝড়ের মত তাদের কলিকাতার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। মা শ্যামাসুন্দরী তখন সবে তসর পরিয়া পূজায় বসিয়াছিলেন :—

"ললিত না কিরে ফিরে এলি বাবা! এ ঘরে একটু দুধের সর ঢাকা রয়েছে একটু মুখে দিয়ে যা না চোখ মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

কিন্তু আজ মায়ের স্নেহের ডাকটাও ললিতের কাণে প্রবেশ করিবার পথ পাইল না। আজ তার শূন্য ঘরের আকর্ষণ যেন মায়ের পানে চাইতে ও বড় হইয়া উঠিয়াছিল। কিরণ আর এ জগতে নাই, শূন্য গৃহে তাকে আবার ফিরিয়া পাওয়ার আজ আশা বৃথা। কিন্তু ঐ ঘরেই তো সে ছিল, চারিদিকে এখনো তো কিরণের সকল স্মৃতি কত ভাবে জড়িত হইয়া আছে। হয়ত তার সাদা ঝালর কাটা বালিশটীতে এখনও কিরণের কেশের ক্ষীণ সৌরভটুকু লাগিয়াই আছে! সেটুকু নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে প্রাণের ভিতর টানিয়া লইবার সময়টুকু এখনও পার হইয়া যায় নাই।

ললিত যখন তার শোয়ার ঘরে ঢুকিল তখন পূবের জানালার সার্সির ভিতর দিয়া বসন্তের মিঠা রোদ তার বিছানার চাদরের ঝালরের একাংশে সোণার রং ধরাইয়া রাখিয়াছে। ললিত ঘরে ঢুকিয়াই দেখিতে পাইল, কে একটী স্ত্রীলোক কিরণের মাথার বালিশটী বুকের নীচে চাপিয়া ধরিয়া বিছানার উপর উপুর হইয়া শুইয়া কি যেন লিখিতেছে। রুলটানা নীলবর্ণ রাইটিং পেপারের উপর তার সোণার ফাউনণ্টেন পেন নিঃশব্দে চলিতেছিল। হাতের সোণার চুড়িগুলি রোদ ঠিকরাইয়া নীল চিঠির কাগজের উপর ঝিক মিক করিতেছে। স্ত্রীলোকটীর কালো চুলের গোছা রাঙ্গা মুখখানার উপর লুটাইয়া

পড়িয়াছে বলিয়া মানুষটীকে ভাল করিয়া চেনা যাইতেছে না—কিন্তু সে যে ঠিক চেনা মানুষটীর মতো!

ললিত একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিল, মানুষটী যেন ঠিক কিরণের মত! কিন্তু সে কি করিয়া হয়! তার কিরণ যে এখন সূর্য্য কিরণের দেশে, সে এখানে ফিরিয়া আসিবে কেন? ললিত চোখের চশমাটী খুলিয়া লইয়া, তার পাথরগুলি চাদর দিয়া ভালো করিয়া ঘসিয়া লইয়া, আবার চোখে পরিয়া দেখিল। আবার হাতে মোড়ানো "মিতভাষিণী" খানা খুলিয়া দুঃসংবাদটা তাড়াতাড়ি পড়িয়া দেখিল খবরের কাগজে তো কোনও ভুল নাই। ললিত আবার দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল ঠিক কিরণের মতই তো বটে! কিন্তু তবু ললিতের চোখ হইতে নব বিস্ময়ের ঘোর কাটিল না, কারণ খবরের কাগজে ছাপানো সংবাদটা মিথ্যা আর চোখের দেখটাই সত্য, তার অধীত দর্শন শাস্ত্রে এমন কোনো সঠিক সংবাদ লেখা ছিলনা! তাই খাটের উপরকার মূর্ত্তিটা মানুষ কি ছায়া তাহা ভাল করিয়া ঠাহর করিতে না পারিয়া ললিত ব্যাকুবের মত বলিয়া উঠিল :—

"ওগো তুমি কে গা এখানে?"

চেনা গলার ডাক শুনিয়া কিরণ ফাউন্টেন পেন ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ললিত তার পানে অত্যন্ত ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে দেখিয়া কিরণ হাসিয়া বলিল :—

"সে কি; দু'দিনের ছাড়া-ছাড়ি তাতেই অত ভুল! চেনা মানুষটাকেও চিন্‌তে পারচো না?

কিরণের সুপরিচিত কণ্ঠ বটে। সে মধুর কণ্ঠস্বরের ভিতরে প্রকৃত মানুষটার পরিচয়টা যে কিছুতেই ভুল হইবার যো নাই! তাই ললিত তখন অত্যন্ত সুস্থ বোধ করিল। সে একটা প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল :—

"আঃ বাঁচলুম, সে দুর্ঘটনায় তোমার যে কোন কিছু হয় নি, ঐ ঢের! কিরণ ললিতের কথার মানেটা কিছুমাত্র ধরিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া বলিল :—

"সে কি! দুর্ঘটনার কথা আবার কি বল্‌চ তুমি?"

ললিত অবিচলিত ভাবে উত্তর করিল :—

"কেন তোমার মেজদার বিয়েতে অতবড় অগ্নিকাণ্ডটা হয়ে গেল, তাকে দুর্ঘটনা বলবো না ?"

ললিতের কথা শুনিয়া কিরণ ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল :—

"মেজদার বে'তে অগ্নিকাণ্ড হতে যাবে কেন ?" পুরীতে হাওয়া বদলাতে গিয়ে দেখছি তোমার দিব্যি মাথার গোলমাল হয়ে গেছে।"

"মিতভাষিণী" খানা তখনো ললিতের হাতে, সুতরাং সে মেয়েলি ধাপ্পায় কিছুমাত্র নরম না হইয়া একটু হাসিয়া বলিল :—

"আর ঠাট্টা করতে হবে না, নাও, এই দেখনা, খবরের কাগজে সব বেরিয়ে গেছে!"

স্বামী স্ত্রী উভয়েই উভয়ের কথা শুনিয়া শুধু অবাকই হইয়াছিল,—এমন সময়ে নেপথ্য হইতে এক পেয়ালা গরম চা হাতে করিয়া শশাঙ্ক সে অবাকের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল, সে কিরণের মেজ দাদা, পেয়ালাটা ললিতের হাতে দিয়া সেকালের বিজ্ঞ বৃদ্ধ রাজ মন্ত্রীর মত শশাঙ্ক গম্ভীর স্বসে বলিল :—

"আরে থামোনা হে ললিত, আগে এই চা টুকু টেনে ফেল। মাথাটা কিছু স্থির হোক :—

ললিতের মাথায় তখনও "মিতভাষিণী"র বিশেষ সংবাদ দাতার পত্রটাই ওলট-পালট খাইতেছিল। তাই সে শশাঙ্ককে সোজা সুজি জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল :—
"আচ্ছা তুমি কি বল শশাঙ্ক অত বড় জাজ্বল্য মান মিথ্যে কথাটা কি আর কখনো খবরের কাগজে ছাপাতে পারে ?"

শশাঙ্ক বাবু অত্যন্ত প্রাজ্ঞের মত গুরুগম্ভীর ধ্বনি করিয়া বলিল :—

"কখ্‌খনো না।"

কিরণ এই অবসরে ললিতের হাত হইতে "মিতভাষিণী" খানা লইয়া দার্জ্জিলিংএর বিশেষ সংবাদ দাতার পত্রখানা আগা গোড়া পড়িয়া ফেলিয়াছিল। শশাঙ্ক সে কথাটাকে কিছুমাত্র আমল না দিয়া সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের সুরে বলিয়া উঠিল :—

"ইস্ ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্ ফাটিলে বুঝি আমি আর জান্‌তুম না—

শশাঙ্কবাবু পূর্ব্ববৎ গম্ভীর চালটাই বজায় রাখিয়া স্থিরভাবে জবাব দিল :—

"কখ্খনো না!"

কিরণ এবার খোপা নাড়িয়া বগলের ইয়ারিং দুলাইয়া তর্কের সুরে বলিয়া উঠিল :—

"খবরের কাগজ ওয়ালা দিব্যি হলপ করে বলচে, যে অগ্নিকাণ্ডটা হবার পর থেকে আমাকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্চে না।" তবে যে আমি জল জিয়ন্ত মানুষটা এখানে দাঁড়িয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা কইচি সেটাও তবে মিছে কথা।"

এবার শশাঙ্ক পরিমান মত হাসিয়া বলিল :—

"তোমার আজো বুদ্ধি পাকে নি কিরণ! এই ধর না বাল্‌ব্ ফাটাইবার পাঁচ মিনিট আগে যদি তুমি দার্জ্জিলিং মেলে কলকাতা রওনা হয়ে থাক তবে তুমি বাল্‌ব্ ফাটাই বা দেখবে কি করে, আর তার পর তোমায় দার্জ্জিলিং পাওয়াই বা যাবে কেমন করে; দার্জ্জিলিং মেল যে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল করে যায়!"

ললিত কিন্তু ব্যাপারটার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিতান্ত ব্যাকুবের মত বলিয়া উঠিল :—

দোহাই শশাঙ্ক আমি হাত যোড় করে বলচি ব্যাপার খানা খুলে বল দেখি, আমি তো মাথা মুণ্ডু কিছুই ঠাওরে উঠতে পারচি না! শশাঙ্ক এবার অনেকটা একরারী আসামীর মত সোজা ভাবে বলিল :—

"যদি অভিসম্পাতের ভয় না থাকে, তবে বলতে পারি—

ললিত একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল :—

"আমি সম্পূর্ণ অভয় দিচ্চি, বল!

শশাঙ্ক একটু কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল :—

"মিতভাষিণী"র সংবাদটা বোধ হয় আগা গোড়া বানোয়াট।" ললিত সম্পূর্ণ সন্দেহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল :—

"সে খবর তুমি জানবে কি করে।"

শশাঙ্ক ঠিয়েটারী কায়দায় বুক ঠুকিয়া উত্তর করিল :—

"আমি জানবো কি করে? তবে বলচি শোন প্রথম দফা বিবাহটা যখন

করেছি অমি তখন সেখানে আগা গোড়া ছিলাম একথা তুমি বিশ্বাস কর অবিশ্যি। দ্বিতীয় দফা আমিই সেই মিথ্যা পুরুষ, যে তোমায় এ ফ্যাসাদে ফেলেছে!

ললিত ব্যাকুবের মত জিজ্ঞাসা করিল :—

"কি রকম।"

শশাঙ্ক হাসিয়া উত্তর করিল :—

"আমি শ্রীশশাঙ্ক শেখর ঘোষ অর্থাৎ তোমার "মিতভাষিণী" পত্রিকার ঐ বিশেষ সংবাদ দাতা, গল্পটা তৈরিও আমার পাঠিয়েছিও আমি, সুতরাং সত্য মিথ্যা সব যে আমার ভালরকম জানা আছে তা তুমি মেনে নিতে পার!"

ললিত ভয়ঙ্কর অপ্রতিভ হইয়া গেল। তবু নিজের ব্যাকুবিটা যথা সম্ভব চাপা দিবার জন্য একটু হাসিয়া বলিল :—

"ব্রে ভো! কি পাকা মিথ্যাবাদী ভাই তুমি :—

শশাঙ্ক সহসা পুনরায় গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিল :—

"চুপ ললিত অমন মানহানি জনক কথা মুখে এনো না, মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে যার ফৌজদারীতে সাজা হয় নি, তাকে মিথ্যাবাদী বলিলে আইনতঃ তার মানহানি হতে পারে!"

ললিত আইনের হেঁয়ালীটাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল :—

"বাঃ অত বড় জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যে কথাটা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিলে তবু—

শশাঙ্ক বাধা দিয়া গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে যথেষ্ট মুরুব্বিয়ানা মিশাইয়া বসিল :—

"ওটা হচ্চে কি জানো—kaisari scrap of paper ফেলে দে তো কিরণ খবরের কাগজটা ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে!

Diplomacy কিছু শিখতে পারলে না ললিত, বেশী ফিলজফি পড়লে মানুষ একেবারে পেতে হয়ে যায়। সেই জন্যই তো বি, এ তে বি কোর্স নিয়েছিলাম জান তো?"

শশাঙ্ক বাহিরে চলিয়া গেলে পর সস্নেহে কিরণের অজস্র পল্লবিত কিশলয় তুল্য কোমল হাত খানা নিজের হাতের উপর তুলিয়া লইয়া সহাস্য মুখে বলিল :—

"তোমার গা ছুঁয়ে বলচি কিরণ, ফের যে তোমায় এ জীবনে ফিরে পাবো এক ঘণ্টা আগে তা আমি স্বপ্নে ভাবতে পারি নি।" কিরণ এবার ললিতের নিকট সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া বলিল :—

"তুমি তো এক মাসেরি প্রিভিলেজ লিভ দিয়েছিলে, কিন্তু তোমায় ছেড়ে যখন দার্জ্জিলিং দু'দিনের বেশী থাকতে পারিনি, তখন পরলোকে গিয়েই কি আর তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো—! এ যে তোমারি বুঝবার ভুল!"

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ

# হৃদয়-বাণী

১৭-৭-১০ বৃহস্পতিবার ( রাত্রি )

Duty ও Silence এই দুটী কথার ঠিক্ বাঙ্গালা প্রতিশব্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন? কারণ আর কি, এ সকল ভাবের চর্চ্চা আমরা করিয়াছি কিছু কমই। বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীর সাহিত্যে ও ইতিহাসে, Silence কথাটী হৃদয়ের যে ভাব প্রকাশ করে, তাহার প্রশংসা সূচক বাক্য পাওয়ার আশা করা অন্যায়। বাঙ্গলার উপন্যাসে নায়ক নায়িকাগণের বক্তৃতার জ্বালায় কাণ ঝালাপালা হইয়া ওঠে। মনে পড়ে না, বাঙ্গলার কোনও সাহিত্য গ্রন্থে তেমন কোনও চরিত্রের বর্ণনা দেখিয়াছি, যে কথা তেমন না বলিয়া ধীরে নির্জ্জনে জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে। শকুন্তলার বর্ণিত কণ্বমুনি অথবা Les Miserablesর Good Bishopর ন্যায় চরিত্রের সহিত বাঙ্গালীর সাহিত্যে দর্শন লাভ অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে একটী মাত্র আছে যাহা অনেকটা ইঁহাদের ধরণের, সে চন্দ্রশেখর। কিন্তু শেষটা সেও বক্তৃতাবাগীশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে তাহার যে চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, তাহা গাম্ভীর্য্য ও মহত্বের ভাবে পূর্ণ, তাহার তুলনায় তাহার শেষের চিত্র কি ম্লান। ইয়ুরোপীয় ঔপন্যাসিক হইলে কি ধীর স্থির সমাহিত চিত্ত পুরুষ প্রবর স্বরূপে এই চরিত্র ফুটিয়া উঠিত।

চিরকালই কথা অপেক্ষা কাজের গৌরব অধিক। এমন কি, মনে হয়,

যত কথা বেশী বলা যায়, ততই যেন মানুষের মহত্বে আঘাত পড়ে। আমাদের মুনি ঋষিগণ বৃথা বাক্যে শক্তি ও সময়ের অপচয় করিতেন না। ইংরাজ ও জানে যে, যিনি চুপ করিয়া নিজের ভাবে নিজ কাজ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত মানুষ। Babler বাচালের তাদের সমাজে স্থান নাই—আমাদের সমাজে ঈদৃশ লোক সমাজদার ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত। এই জন্যই সে সব দেশে William the Sil·nt এর silent উপাধি মহাগৌরব সূচক।

আর Dutyর কথা কি বলিব? ইংরাজ মুখে ভগবানের নাম করে। উহা একটা কথার কথা বিশেষ অর্থশূন্য! তাহাদের প্রত্যক্ষ দেবতা এই Duty। প্রথম Duty দেশের প্রতি, তারপর সমাজের প্রতি, তারপর নিজ পরিবারের প্রতি। Trafa lgar র যুদ্ধে আসন্ন মৃত্যু-স্বদেশভক্ত মহা প্রাণ বীরবর Nelsonর শেষবাণী 'England expects every man to do his duty', প্রতি নিয়ত ইংরাজের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে! কি মহৎবাণী!

আর আমরা? আমাদের Duty বলিয়া কোনও জিনিষ আছে? আছে স্বার্থপরতা, অলসতা ও জাতের বিচার লইয়াই বিবাদ বিসম্বাদ তাই এমন সোণার দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমাদের এ দুর্দ্দশা!

২-৮-১৩ শনিবার।

অনেক দিন হয় ইটালিয়ান লেখক Leo. G. Sera লিখিত On the **Tracks** of life নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম, ইংরাজ, জার্ম্মেন প্রভৃতি উত্তর প্রদেশস্থিত লোক সমূহ স্বভাবতঃই Sexually-cold, প্রবৃত্তি নিচয়ের পরিচালন সম্বন্ধে মৃদু প্রকৃতি। সে সকল দেশের কোনও জিনিষই শীতের তাড়নায় হঠাৎ বাড়িয়া উঠিতে পারে না। কি কীট পতঙ্গ, কি পশু পক্ষী, কি বৃক্ষলতা, কি মানুষ, সকলকেই শীতের সহিত যুদ্ধ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে, সেখানে মৃত্যু সুনিশ্চিত। এই জন্য সে সকল দেশের লোক সমূহ কর্ম্মঠ, বিষম সাহসী, অক্লান্ত কর্ম্মা।

এসিয়ার উষ্ণ বায়ুতে, সবই বাড়ে ও সকালে মরে ও সকালে। রহিয়া সহিয়া তাহারা কিছু করিতে জানে না। পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই এসিয়ার বালিকা পূর্ণ যৌবন শোভায় ফুটিয়া ওঠে, বিংশ বৎসর যাইতে

না যাইতেই ম্লান হইয়া পড়ে। গাছ, পাতা, লতা, ফল, ফুল, সবই মহাতেজো-ব্যঞ্জক, সৌন্দর্য্য ভরা কিন্তু কোনটাই অধিককাল স্থায়ী নহে।

এমন সূর্য্যের প্রখর তেজ, এমন সুনীল সুন্দর আকাশ, এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী ইয়ুরোপে দেখা যায় না। এসিয়া কবিত্বের দেশ, সঙ্গীতের দেশ, সৌন্দর্য্যের দেশ। ইয়ুরোপের দক্ষিণভাগও অনেকটা এসিয়ার ন্যায়। ইটালী ও গ্রীশ ইয়ুরোপের কবিতার লীলাভূমি।

কিন্তু ইয়ুরোপের উত্তরাংশের কাছেও দিন দিন দক্ষিণাংশ হটিয়া যাইতেছে। তাহার কারণ, সেখানে প্রবৃত্তির তেমন উগ্রতাড়না নাই। সেখানকার লোক সকল Sexually-cold তাহারা নারীর সঙ্গে মিশে অপ্রতিহত ভাবে কিন্তু সে তুলনায় চরিত্রগত দোষ নিতান্তই কম। অর্থও রমণী-এই দুটীর সম্বন্ধে সমাজে কি ব্যবস্থা করে, তাহা দিয়াই জাতির শক্তি, বুদ্ধি ও সামর্থ্য বুঝা যায়। রমণীর পদতলে, এলেকজেণ্ডারের সাম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য, মুসলমান সাম্রাজ্য, ধ্বংস হইয়াছে। প্রবৃত্তির তাড়নায় অন্যান্য সর্ব্ববিষয়ে মহাসম্পদশালী এসিয়া জীবন সংগ্রামে হটিয়া গিয়াছে।

প্রবৃত্তিকে দমন করার প্রধান উপায়—সুশিক্ষা সু-আচার। ইয়ুরোপের অপেক্ষা, এসিয়াকে শিক্ষা প্রচারের জন্য শতগুণ চেষ্টা করা উচিত।

১-১-১৫ শুক্রবার রাত্রি ৭টা।

হৃদয়ের ভিতর বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। শক্তির মূল—সর্ব্ব নিম্ন স্তরে, সেখান হইতেই শক্তি বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে! এ অবস্থা তাহার ক্ষয়ের অবস্থা পতন-অবস্থা। এই জন্যই নীরবতার ভিতর শক্তি বাস করেন। যতই কথা বলি ততই যেন শক্তি মূল উৎস হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং উৎস ক্রমে ক্রমে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। এমন কি দেখিয়াছি, নিজের Diary তেও যদি মনের অভিলাষ প্রকাশ করি, তখন হইতেই যেন ঈপ্সিত কার্য্য সম্পাদন করিবার শক্তি কমিয়া যায়। যতদিন গোপনে চুপে চুপে কাজ করি ততদিন যেন অন্তর্হিত শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। যেমন কথা বলা, অমনি যেন তাহা বাতাসে উড়িয়া গেল। দেখনা আগ্নেয়গিরি, যত দিন তাহার Erruption নিস্রাব না হয়, ততদিন তাহার ভিতর কি শক্তিই না নিহিত থাকে। দিনে দিনে, অন্ধকারের ভিতর শক্তি পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, শেষে বহুবৎসরের পর একদিন তাহা

ভীষণ মূর্ত্তিতে গলিতস্রাব রূপে বহির্গত হইয়া নগর জনপদ মানব পশুপক্ষী বৃক্ষ ইত্যাদি সংহার করিয়া থাকে। লোকে ভাবে আগ্নেয় গিরির এই অগ্ন্যুৎপাতের অবস্থাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সামর্থ্যজ্ঞাপক অবস্থা, তাহা নহে উহা তাহার শক্তির অপচয় অবস্থা।

ভাব জমাট অবস্থা, কার্য্য খণ্ডাবস্থা, বাক্য গলিত অবস্থা। যে ভাব পূর্ব্বেই কথায় প্রকটিত হইয়া পড়ে, তাহা বড় কাজে আসে না। ভাব যখন খণ্ড খণ্ড কার্য্যে প্রকাশিত হয় তখনই তাহা লোকের উপকারে আসে।

বাঙ্গালী চিরকাল কথা অধিক বলে, বোধ হয় জলবায়ুর দোষ, তাই তেমন কার্য্যক্ষমও নহে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বাঙ্গালীর তেমন স্থান কৈ? ইংরাজ জার্ম্মেন অল্পবাক্ তাহারাই জগতের পরাক্রমশালী দুর্দ্ধর্ষ জাতি।

বাঙ্গালী! বেশী কথা বলার অভ্যাস পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তুমিও মানুষ হইবে।

পরিবারের ভিতর তুমি কেমন হইবে? না, মণিমালার সূত্রের ন্যায়। মাতা, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতষ্পুত্রগণ, নিজ স্ত্রী পুত্রাদি ও আত্মীয় স্বজন সকলকে তুমি একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিবে। সে সূত্র ভালবাসার সূত্র। তোমার কল্যাণে তোমার চেষ্টায় সকলেই সুখী হইবে, তোমার চেষ্টায় সমস্ত পরিবারটী জ্ঞানী, ধনীও চরিত্রবান পরিবারে পরিণত হইবে। জানিও এমন একটী পরিবার সৃষ্টি করিয়া যাইতে পারিলে, তুমি দেশের মহামঙ্গল সাধন করিয়া গেলে।

১৩-১-১৫ বুধবার রাত্রি ৮-২০।

আমাদের ভিতর Public spirit বলিয়া একটা জিনিষ নাই বলিলেই চলে। সকলেই যার যার পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর জীবন কাটাইতে ইচ্ছুক। পরের জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য কে সাধ করিয়া খাটিতে চায়? কাহাকেও এসব বিষয় বলিলে উত্তর পাওয়া যায় 'আর হয়েছে মশায়! নিজে বাঁচলে তো শেষে দেশ, যা হবার হবে, ভগবানের কাজ ভগবানই কর্‌বেন কপালে যা আছে তাই হবে।'

ইয়ুরোপের রাজ-শক্তি সমূহ প্রতি নিয়ত প্রজাদিগের উন্নতি ও সুখ সচ্ছন্দতার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও প্রজা-সাধারণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল সৎকাজের অনুষ্ঠান করে, তাহা হইতেই বুঝিবা

দেশের অধিকতর উপকার হয়। কেহই বসে নাই, সকলেই একটা না একটা কিছু লইয়া আছে। কেহ Municipality কেহ Local Boord কেহ শিক্ষা, কেহ স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানা বিষয় লইয়া ব্যস্ত। কেহ শ্রমজীবিদিগের নৈতিক উন্নতির চেষ্টা করিতেছে, কেহ ছেলেদের অভিভাবকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাদের মানুষ করিবার যত্ন করিতেছে; কেহ আসন্ন-প্রসবা জননীর আহার ও সংস্থানের যোগাড়ে ব্যাপৃত, কেহ দরিদ্রদের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে রত, কেহ পতিতা রমণী দিগের উদ্ধার রূপ মহাকার্য্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, কেহ গৃহ সমূহের পশ্চাৎ ভাগে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া যাহাতে গৃহবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় তাহার চেষ্টায় রত, কেহ মদ্যপান নিবারণী সভার সহিত সংশ্লিষ্ট কেহ জেল হইতে মুক্ত কয়েদীগণের ভবিষ্য আহার সংস্থান যোগাড়ে লিপ্ত, ইত্যাদি কত না কাজে যে লোক সকল নিজ হ'তে নিজ নিজকে লিপ্ত রাখিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সকলেই কিছু না কিছু দেশের ও সমাজের উন্নতির জন্য করিতেছে। না থাকিলে, কাজ খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতেছে। এই জন্যই ইয়ুরোপীয় জাতি সমূহের এই প্রকার সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি।

আমাদের শিক্ষাই অন্য রকমের। দেশ বলে যে একটা কিছু আছে, যার জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দেওয়া যায়, যার গৌরবে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করা যায়, প্রয়োজন হলে যার জন্য হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দেওয়া যায়, এমন আমরা কিছু শিখি নাই। বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছি সংসার অসার, ভগবানই একমাত্র সার, এ জীবন ক্ষণভঙ্গুর পদ্মপত্রের জলবিন্দুর ন্যায় কখন আছে কখন নাই—শিখেছি জাত। এই জাতের জ্বালায় এখন জগৎ সমাজে আমরা জাতি হারাইতে বসিয়াছি।

এতদিন পর্য্যন্ত, এভাবে এক রকম জীবন যাপন করা গিয়াছে। এখন চারিদিক হইতে কেবলই যেন দেখিতে পাইতেছি এভাবে আর চলে না। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী—দিন দিনই যে সংখ্যায় আমরা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছি। আমাদের অপেক্ষা যারা অধঃপতিতছিল, যাহাদিগকে অজ্ঞ বলে একদিন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছি, তারা আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতিমার্গে কতদূর না অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, ক্রমে ক্রমে আমরাই জগতে অস্পৃশ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছি। [ দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর ] এমন অবস্থায়, জীবনাদর্শ

কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য আদর্শ না ধরিলে উপায় কোথায়? সংসারে থাকিয়া সংসার অসার ভাবিলে, দেশে থাকিয়া দেশের কথা না ভাবিলে, সমাজে থাকিয়া সমাজের উন্নতির চেষ্টা না করিলে, মৃত্যু অনিবার্য্য। বাঙ্গালী মানুষ হও, মানুষ হও, ইংরাজের অনুকরণ কর, দেশের জন্য ভাব, দশের জন্য ভাব; সমাজের জন্য ভাব, সাহসী হও, শক্তিমান হও, দৃঢ়চিত্ত হও, নবজীবনের ভিতর প্রবেশ কর।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত।

# গয়া-তত্ত্ব

বেদ, তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ যে জাতির ধর্ম্মের উপদেষ্টা, সদাচারের নিয়ন্তা, সৎপথের প্রদর্শক, বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক, নিষিদ্ধ কর্ম্মের নিবর্ত্তক, সেই ভারতের—সেই আদি নিবাসী, পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যজাতি নিজের ঐহিক আমুষ্মিক কল্যাণ সাধন অপেক্ষায় পিতামাতার কল্যাণ সাধনে অধিক অগ্রসর। সে জাতি সর্ব্বাগ্রে পিতামাতার পারলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন না করিয়া নিজের জন্য যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে যত্নশীল হয় না, কাশী প্রভৃতি মুক্তিতীর্থে পরিভ্রমণ করে না। তন্ত্র স্মৃতি পুরাণের অনুশাসনে, ভগবদ্‌বাক্য ভগবদ্‌গীতার উপদেশে সেই সনাতন আর্য্য নরনারীর হৃদয়ে আত্মা অবিনশ্বর বলিয়া প্রতিভাত। যুক্তিতর্কের আশ্রয়ে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের অবতারণায় তাহাদিগকে আত্মার অস্তিত্ব বুঝাইতে হয় না, আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রতিপাদনে আত্মতত্ত্ববাদী করিতে হয় না; জননে আত্মার উদ্‌ভব, মরণে আত্মার বিনাশ এ বিশ্বাস তাহাদিগের কল্পনার অতীত। অদৃষ্টবাদী ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া ধূলিপাদ হালিকও এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। সুতরাং এ দেশের জন্য এ দেশবাসীর জন্য অচ্ছেদ্য তর্ককে ভিত্তি করিয়া আত্মতত্ত্ব প্রমাণে প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণের আবশ্যকতা মনে করি না। সেজন্য ভ্রমপ্রমাদবর্জ্জিত অনন্ত জ্ঞানের আকর অনন্ত বেদ রহিয়াছে,—বেদের শিরোভাগ বেদের অন্ত মায়াবরণের উন্মোচক অনাদি নিবিড় অন্ধকারের সংহারক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশক নিবাতনিষ্কম্প

মহাপ্রদীপ উপনিষৎ রহিয়াছে; চিন্ময়ী আনন্দময়ী গৌরীকে অর্দ্ধাঙ্গে নিষণ্ণ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের পঞ্চবক্ত্র-নিঃসৃত ধারাধরের অমৃতধারার ন্যায় বিগলিত আগম রহিয়াছে; আর রহিয়াছে ভগবান্ মনু প্রভৃতি মহর্ষিবৃন্দ বেদার্থের স্মরণ করিয়া যে সকল স্মৃতি সংহিতার সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা, ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পবিত্র লেখনী হইতে যে অষ্টাদশ পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা এবং গোতম কণাদ কপিল পতঞ্জলি জৈমিনি বেদব্যাস যে সূক্ষ্মতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বেদার্থ নির্দ্ধারণের জন্য যে দর্শন শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন তাহা।

ভ্রম প্রমাদ সংশয় নিবারণের জন্যই যুক্তির প্রদর্শন দ্বারা বিষয় প্রতিপাদনের প্রয়োজন; যে বিষয়ে যাহার ভ্রম নাই, বিপ্রতিপত্তি নাই, সেই বিষয়ে যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া অপরিচিত সংশয়ের আমন্ত্রণ করা সর্ব্বথা বিগর্হিত। যাঁহাদিগের সেই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার আছে, তর্কপ্রণালী বুঝিবার ও করিবার সামর্থ্য আছে তাঁহাদিগের জন্য পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থরাশি বিদ্যমান আছে। তাঁহাদিগকে সেই সকল গ্রন্থ দেখিবার জন্য কিঞ্চিৎ শ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে অনুরোধ করি। আত্মার অবিনশ্বরত্ব থাকিলে মরণান্তে লোকান্তর হয় অবশ্য স্বীকার্য্য। দেহী আত্মা মুক্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেহত্যাগ করিতে একান্ত অসমর্থ। দেহ থাকিলেই ইন্দ্রিয় আছে, ইন্দ্রিয় থাকিলেই জ্ঞান আছে, ভোগ আছে, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞেয় আছে, ভোগ থাকিলেই ভোগ্য আছে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই মানবের মত ইন্দ্রিয় আছে, কিন্তু মানবের মত সামর্থ্য নাই; মানুষ যেমন হস্তদ্বারা আহরণ করিতে পারে পদদ্বারা গমন করিতে পারে, মুখ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের প্রতিপাদক পৃথক্ পৃথক্ শব্দের উচ্চারণ করিতে পারে, দুর্ব্বলেন্দ্রিয় পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তাহা করিতে পারে না। আবার পক্ষী অনন্ত আকাশে সন্তরণ করিতে সমর্থ, মৎস্য অগাধ জলনিধির অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে সক্ষম, মানুষের সে শক্তি নাই। ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রধান পশু ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহায়তায় যাহা অবধারণ করিতে সমর্থ, মানুষের সে বিষয়ে সামর্থ্য নাই। বলিতে কি, পিপীলিকার যে শক্তিবিশেষ আছে, মানুষের সে শক্তিবিশেষ নাই। আর্য্যঋষিরা ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাই লিখিয়াছেন—"দেবতারা আমাদিগের পরমপূজনীয় হইলেও মহাশক্তিশালী হইলেও আমাদিগের প্রদত্ত হবিঃ ভিন্ন অন্য আহার আহরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। দেবশরীর পিতৃলোকেরও দেবতার

ন্যায় স্বয়ং হব্যের ন্যায় কব্য আহরণে সামর্থ্য ও অধিকার নাই। এবিষয়েও সহস্র যুক্তি আছে। সেই সমস্ত যুক্তি সেই সমস্ত উপপত্তি আনিয়া বালকবালিকার পাঠ্য পুস্তকের ভূমিকায় সন্নিবেশিত করিতে চাই না।

পশু পক্ষী কীট পতঙ্গও মনুষ্যের খাদ্য এক নহে। নর, বানর, পক্ষীর খাদ্য বৃক্ষের ফল, কীটের খাদ্য বৃক্ষের পত্র, হস্তীর খাদ্য বৃক্ষের ত্বক্। ধান্যস্তম্ব হইতে পলাল উন্মুক্ত করিয়া তুষ অপসারিত করিয়া উন্মোচিত তণ্ডুল অন্নে পরিণত হইলে মনুষ্যের আহার, আবার সেই ত্যক্ত পলাল পশুর আহার, তুষ কীটের আহার; আবার এক অন্ন মানুষেরও আহার মক্ষিকারও আহার; কিন্তু মানুষের স্থূল অন্ন আহার, মক্ষিকার তাহা নহে, মক্ষিকার রস বিশেষ আহার। তৈলপায়ী মনুষ্যের আহার্য্য হইতে স্নেহ আহরণ করিয়া আহার করে, মধু মক্ষিকা যাবতীয় পদার্থের মিষ্টরস আহরণ করিয়া তাহাকে মধুতে পরিণত করিয়া মধুচক্রে সঞ্চিত করে ও পান করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহাতে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়,—ভিন্ন ভিন্ন জাতির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য এবং এক জাতির পক্ষে এক খাদ্য হইলেও এক জাতির পক্ষে এক অংশ বিশেষ, অপর জাতির পক্ষে ভিন্ন অংশ বিশেষ। মধুমক্ষিকা পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া লইয়া যায়, ভ্রমর পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া লইয়া যায়, কিন্তু মানব আমরা এই চর্ম্মচক্ষুর সহায়তায় বুঝিতে পারি না—পুষ্পের কি ক্ষতি হইয়াছে। মধুগ্রহণের পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, মধুগ্রহণের পরেও পুষ্প সেইরূপ আছে।

সনাতন আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী আমরা পরলোক গত পিতৃলোকের পরিতৃপ্তির জন্য পিণ্ডদান করিয়া থাকি। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী জন্মমাত্র তিন ঋণে ঋণী হয়; ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও দেবঋণ। ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্তিলাভ, পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ দ্বার দেবঋণ হইতে মুক্তিলাভ। পুত্রোৎপাদন করিতে দারপরিগ্রহের প্রয়োজন। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়াই দার পরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইতে হয়, পুত্রোৎপাদনের উদ্দেশ্যে দারপরিগ্রহ, পিতৃপিণ্ডের অবিচ্ছেদ রাখিবার জন্যই পুত্রোৎপাদন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্যজাতি নিজের কল্যাণ অপেক্ষায় পিতৃকল্যাণের জন্য অধিক লালায়িত। সেই জন্য এই জাতি পিতামাতার মরণোত্তর একবস্ত্র হইয়া অসহ্য শীতাতপের ক্লেশ সহ্য করে, আহার সংযম দ্বারা

শরীরকে পরিক্ষণ করে, অশৌচের মধ্যে প্রত্যহ পিণ্ডদান, অশৌচান্তে দ্বিতীয় দিনে দৈন্যভাব গ্রহণ করিয়া মহাসমারোহে নানারূপ দান, বৃষোৎসর্গ, আবার আদ্যশ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করে; প্রতি মাসে পিণ্ডদান করিতে করিতে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করে এবং বর্ষান্তে সেইরূপ সপিণ্ডীকরণে পূর্ব্বপুরুষের পিণ্ডের সহিত পিতৃপিণ্ডের মিলন করিয়া দেয়। এই এক বৎসর কাল ছত্রোপানৎ বর্জ্জিত হইয়া খট্টায় শয়ন না করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্যেক জাতির খাদ্যের বিভিন্নতা আছে এবং মক্ষিকা, মধুমক্ষিকা তৈলপায়িকাকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি যে তাহারা যে খাদ্য হইতে সার গ্রহণ করে, সেই বারের অপচয়ে খাদ্যের যে যৎ কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তাহা আমরা বুঝিতে অসমর্থ। পার্থিবভূত যাহার শরীরের উপাদান, সেই মক্ষিকা প্রভৃতি স্বীয় পার্থিব শরীর বর্দ্ধনের জন্য যে পার্থিব অংশ গ্রহণ করে, তাহাই যখন আমরা বুঝিতে পারি না, তখন অপার্থিব শরীর লইয়া যাঁহারা শ্রাদ্ধমণ্ডপে অধিষ্ঠান করেন, তাঁহারা পিণ্ডের যে সূক্ষ্ম অংশ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, সেই সূক্ষ্ম অংশের অপচয়ে স্থূল পিণ্ডের ক্ষতি কি করিয়া উপলব্ধি করিব! শাস্ত্রে 'লিঙ্গশরীর' বলিয়া আত্মার একটী শরীরের উল্লেখ আছে, এই স্থূলভূতের সূক্ষ্মাংশে সেই লিঙ্গশরীর গঠিত। যোগী ভিন্ন লিঙ্গশরীরের প্রত্যক্ষ করিবার কাহারও সামার্থ্য নাই। মৃত্যুর সময় আত্মা স্থূলশরীর পরিত্যাগ করে, লিঙ্গশরীর পরিত্যাগ করে না। সেই লিঙ্গশরীর লইয়াই প্রেতাত্মা সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ। নৈয়ায়িকেরাও কিয়দ্দিনের জন্য প্রেতাত্মার আতিবাহিক দেহ স্বীকার করিয়াছেন। সেই সূক্ষ্মশরীরের খাদ্য অবশ্যই সূক্ষ্ম, স্থূল নহে। স্থূল খাদ্য গ্রহণের জন্যও শাস্ত্রকারের উপদেশ আছে; নিমন্ত্রিত শ্রাদ্ধী ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলে প্রেতাত্মার অধিষ্ঠান হয়; সেই ব্রাহ্মণের পার্থিব দেহের মুখ জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রেতাত্মা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। ভিন্ন দেশেও ব্যক্তিবিশেষে প্রেতাত্মার আবেশ বর্ত্তমান যুগে স্বীকৃত হইতেছে। দেশবিশেষও কাল বিশেষ যে তৃপ্তিসাধনের বিশেষ উপযোগী, শরীরের ও মনের স্বাচ্ছন্দ্য উৎপাদনে সমর্থ একথা বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। যিনি ফেনিল সুনীল উত্তালতরঙ্গময় সমুদ্রের বেলাভূমিতে পাদচার করিয়াছেন ও মেঘচুম্বি হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে অধিরোহণ করিয়া কলনাদিনী

নির্ঝরিণীর কঙ্করময় তীরভূমিতে হিমানীবৃত হইয়া সঞ্চরণ করিয়াছেন, তিনি বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, আর তিনিই সাক্ষ্য প্রদান করিবেন—যিনি ভারতের বিপুল বক্ষে বাস করিয়া পর্য্যায়ক্রমে ষড়্‌ঋতুর প্রবেশ নির্গম অনুভব করিয়াছেন, শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের ভাববৈচিত্র্য অনুভব করিয়াছেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, জলরাশির অগ্রে ও পশ্চাতে যদি সমান জলরাশি থাকে, তবে কখনও তাহার স্রোত হয় না; নীচের জল সরিয়া গেলে তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য উপরের জল আসিয়া পড়ে, তাহারই নাম স্রোত। এই দেহের যতটুকু ক্ষতি হইবে, প্রকৃতি তাহার ততটুকু পূরণ করিতে বাধ্য, অতি সূক্ষ্ম মূল প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির এই ভাবে রক্ষিত অংশ নিয়ত পরিপূরণ করিয়া থাকে, আবার মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির আপনা আপনি ক্ষতি হয় না, সূক্ষ্ম অংশ ক্রমে সরিয়া গেলে ক্ষতি হয়, স্থূলভূত ক্রমে সূক্ষ্মভূত হইয়া প্রকৃতিতে লীন হয়, আবার প্রকৃতি ক্রমে স্থূলভূতের ক্ষতিপূরণ করে। এক্ষণে স্পষ্টতঃ পাঠক বুঝিবেন,—পিণ্ডের সূক্ষ্ম অংশ ক্রমে প্রকৃতিতে মিলিত হয়, আবার প্রকৃতি প্রেতাত্মার সপ্তদশাবয়ব-ক্ষীণ-লিঙ্গ শরীরের নিজের সূক্ষ্ম অংশ দিয়া পরিপোষণ করে, এই হইতেছে প্রাকৃতিক নিয়ম। সর্ব্বত্র সমান কার্য্য হয় না; দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এক 'শব্দকে' উপস্থিত করিতে পারি। একটী তাল আমি চৌকীতে বসিয়া চৌকীর গায়ে বাজাইতে পারি, তৈজসপাত্রে বাজাইতে পারি, মৃদঙ্গে বাজাইতে পারি, খোলে বাজাইতে পারি, পাখোয়াজে বাজাইতে পারি, ঢোলকে বাজাইতে পারি, তবলায় বাজাইতে পারি, শব্দ কি একরূপ হয়? তাদৃশ শব্দের উৎপত্তির নিমিত্ত সেই সেই দেশের কারণতা স্বীকার করিতে হয়। দেশ ভেদে কার্য্যভেদ। গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে যাহা হয় গৃহে করিলে তাহা হয় না। এইজন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন "এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ। যজেত বাশ্বমেধেন নীং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥" পিতৃভক্ত ভারতবাসী এইজন্য সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্মের অগ্রে পিতামাতার উদ্ধারের জন্য গয়াকৃত্য করিয়া থাকেন।

যে সময় জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভ করে, মস্তিষ্কের গঠন পরিসমাপ্ত হয়, সেই যৌবনের সময়ে মন যুক্তিতর্কে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করে; কিন্তু যুক্তিতর্ক দ্বারা কোন এক বিষয় স্থির করিলেও যৌবন স্বাধীনতা তাহার বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক আনয়নের জন্য যত্ন চেষ্টা করে, সুতরাং

উদ্দাম যৌবনে কোনমত হৃদয়ে সংশয়শূন্য হইয়া বিসংষ্ঠুলতা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। বাল্যকালে যখন যুক্তিতর্ক বুঝিবার অধিকার থাকে না, যুক্তিতর্কের পক্ষপাতিতা থাকে না, সেই শৈশবকালের অভ্যস্ত সংস্কার হৃদয়ে যে মতের প্রতিষ্ঠা করে, অদম্য যুক্তিতর্কের প্রভাবে উদ্দাম যৌবনস্রোতে সেই সংস্কার বিদূরিত হইলেও তাহার পদাঙ্ক মুছিয়া যায় না; এইজন্য বালকবালিকাকে যুক্তির পথে না লইয়া পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনাইয়া তাহাদিগের হৃদয়ে সংস্কার গঠন করাইয়া সাধু শিক্ষার প্রথম সোপান বা প্রধান ভিত্তি। পরমকারুণিক মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদার্থ লইয়া আখ্যায়িকাচ্ছলে ইতিহাসের মধ্য দিয়া মহাভারতেও অষ্টাদশ পুরাণে সেই সকল ধর্ম্মের গূঢ়রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। স্ত্রী ও শূদ্রের ন্যায় দ্বিজবন্ধুরও বেদে অধিকার নাই, এই শাস্ত্রীয় শাসন দ্বারা আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি,—শূদ্র বলিয়া নয়, জ্ঞানহীন ব্যক্তিমাত্রই বেদের জটিল মীমাংসা বুঝিতে অক্ষম। ভগবদ্গীতাতেও 'নবুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্' * ইহাদ্বারা সেই শাস্ত্রীয় অনুশাসনের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণ বালককেও শূদ্রতুল্য বলিয়াছেন; তাৎপর্য্য, এই অবস্থাতে তাহাদিগকে জটিল দার্শনিকতত্ত্ব বুঝাইতে যত্ন করা সঙ্গত নয়, পৌরাণিক আখ্যায়িকা দ্বারা তাহাদিগের মনের গঠন করা আবশ্যক। এই কারণ পূর্ব্বকালে বালকবালিকাগণকে 'নাম-শ্লোক' শিখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহজ সংস্কৃতে নিবদ্ধ উপদেশগুলি শিক্ষা দেওয়া হইত, মুখে মুখে পৌরাণিক আখ্যায়িকা বুঝাইয়া দেওয়া হইত। পল্লী, গ্রাম, নগরের মধ্যে পবিত্র মাসে সময়ে সময়ে রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের পূর্ব্বাহ্নে পারায়ণ হইত ও অপরাহ্লে কথকের মুখে সেই পঠিত গ্রন্থের ব্যাখ্যা হইত। তাহা দ্বারা পুরন্ধ্রীবর্গ, বালকবালিকা সকলেই অতি সহজে ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা লাভ করিত ও সেই শিক্ষার ফলে তাহাদিগের হৃদয়ে সেই সেই বিষয়ে সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ হইত; পরিণত বয়সে যখন তাহারা বেদ বেদান্তের আলোচনা করিত, তখন তাহাদিগের সেই পূর্ব্বসংস্কার আরও সুদৃঢ়মূল হইয়া উজ্জ্বলতম হইয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইত। আজ পারায়ণ উঠিয়া গিয়াছে, কথকতা দেশ হইতে অবসারিত হইয়াছে,

* গীতা ৩।২৬

কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত অসভ্যের পাঠ্য বলিয়া সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত পুরন্ধ্রীবর্গ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না, সুতরাং আর্য্যশাস্ত্রের মহীয়সী শিক্ষা বালকবালিকাকে কি করিয়া নিজের দিকে টানিয়া লইবে?

সুখের বিষয়, সৌভাগ্যের বিষয়, বিভীষিকাপ্রদ এইরূপ দুর্দ্দিনে একজন শিক্ষিত সুযোগ্য লেখক এই অভাব দূর করিবার উদ্দেশে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, 'ছেলেদের চণ্ডী,' 'শাক্যসিংহ,' ,৺অর্দ্ধকালী,' 'ধ্রুব' 'ভগীরথ,' 'সর্ব্বানন্দ,' প্রভৃতি উৎকৃষ্ট শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ লিখিয়া ইতিমধ্যেই সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহারই লিখিত এই—'গয়া-কাহিনী'।

এই 'গয়া-কাহিনীতে' পৌরাণিক বিবরণটি যথাযথ সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যেরূপ সহজ ভাষায় বিশুদ্ধ ভাষায় গ্রন্থে বিবরণটি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে আশা করা যাইতে পারে, গয়ার দিকে মানবের মন আকৃষ্ট হইবে। ইতিহাসপ্রিয়, উপাখ্যান-আখ্যায়িকা-প্রিয় বালকবালিকা অতি সহজে গ্রন্থপাঠে মনোযোগী হইবে ও অতি সহজে তাহাদিগের কোমল হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজের অঙ্কুর উৎপাদিত হইবে। শিক্ষিত লিপিকুশল ধর্ম্মবিশ্বাসীর হস্তে ধর্ম্মপুস্তক যেরূপ সুন্দরভাবে সুসঙ্গতভাবে ব্যাখ্যাত হয়, অন্যের হস্তে সেরূপ আশা করা যাইতে পারে না। লেখক একজন আস্থাবান্ শাস্ত্রবিশ্বাসী ধার্ম্মিক; সুতরাং তাঁহার মুখ হইতে যাহা বাহির হইতেছে, তাহার প্রত্যেক অক্ষরে জ্বলন্ত ধর্ম্মের নিদর্শন ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বক্তব্য বুঝাইতে যাইয়া লেখক পুস্তকে যেন তুলাদণ্ড গ্রহণ করিয়া শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, বিন্দুমাত্রও শব্দের ন্যূনাধিক্য হয় নাই। গ্রন্থকারের ভাষায় আধিপত্য আছে, লেখক শক্তিশালী সন্দেহ নাই। যিনি পিতার সহিত সাহিত্যরঙ্গমঞ্চে অবতরণ করিয়া সেই সাহিত্যক্ষেত্রেই শুক্লশ্মশ্রু ও শুক্লকেশ হইয়াছেন, সেই প্রবীণ সাহিত্যিক বৃদ্ধ সাহিত্যিক সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় অন্যসময়ে নহে—সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া অভিভাষণে যাঁহার লিপি কৌশলের প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার লিখিত 'গয়া-কাহিনী' যে একখানি উৎকৃষ্ট উপদেশ পুস্তক, তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

এই পুস্তকে গয়া ও শ্রাদ্ধতত্ত্ব, পৌরাণিক কথা, ইতিহাসে গয়া, গয়াকৃত্য ও পরিশিষ্ট আছে।

গয়া ও শ্রাদ্ধতত্ত্বে পুত্রের কর্ত্তব্যতা, পিণ্ডদানের উপযোগিতা ও পারলৌকিক আত্মার তৃপ্তির জন্য পিণ্ডদানের সযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিশ্বসংহর্ত্তা ভূতভর্ত্তা দেবাদিদেব মহাদেব যে ত্রিপুরাসুরের বধের জন্য মহা আড়ম্বরের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, যাহার বধের জন্য স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ ব্রহ্মা মহাদেবের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনন্ত মূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণু যাহার বধের জন্য পিনাকপাণির পিনাকে শররূপে সংযোজিত হইয়াছিলেন, সেই দেবদ্রোহী ত্রিপুরাসুরেরই পুত্র মহাবীর মহাত্মা গয়াসুর। গয়াসুর পিতৃদ্রোহী রুদ্রদেবকে স্বীয় রৌদ্রতেজে অভিভূত করিয়া বিজয়োল্লাসে দেববৃন্দের উপরে আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই পৌরাণিক কথায় সেই বিবরণ আছে; কৌমোদকী গদাপাণি গদাধরের সহিত গয়াসুরের যুদ্ধ বিবরণ আছে, ভগবান্ বিষ্ণুকে বিজয়দৃপ্ত গয়াসুরের বরপ্রদানের বিবরণ আছে, পিণ্ডদানে পাপীতাপী সংসারক্লিষ্ট প্রেতাত্মার উদ্ধারের জন্য গয়াসুরের প্রার্থনা আছে, গয়াসুরের মস্তকে ধর্ম্মশিলা স্থাপনের বিবরণ আছে, ধর্ম্মশিলার ইতিবৃত্তে পতিব্রতার পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে, গদাসৃষ্টিতে 'হেতি' দানবের অসুরের মধ্যেও বিশ্ববিস্ময়কর আত্মদেহপাতে বদান্যতার প্রকটন আছে। এই প্রত্যেক বিষয়েই হিন্দু নর নারীর শিক্ষা গঠনের উপযোগিতা আছে।

'ইতিহাসে গয়ায়' প্রাকৃতিক বিবরণ ভৌগোলিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। গয়াগামী ব্যক্তির পক্ষে দর্পণের ন্যায় এই পুস্তক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে গয়ার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান, গয়ার মধ্যবর্ত্তি স্থান, গয়ার পার্শ্বে ও মধ্যে নদনদী বনপর্ব্বত পশুপক্ষী সমস্তকেই চক্ষের উপরে প্রদর্শন করিতেছ। স্মরণাতীত প্রাচীন যুগ হইতে ভারতের নরনারীর নিকটে গয়াতীর্থ একটি ভক্তির বিশেষ সামগ্রী। প্রাচীন ঋষিগণ গয়াকে যেভাবে দেখিতেন পৌরাণিক কথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায় আবার ইতিহাসের তক্ষণযন্ত্রে গয়াকে উঠাইয়া নিজের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য বাদ ছাদ দিয়া আগাগোড়া কাটিয়া ছাটিয়া যে ভাবে জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছেন, 'ইতিহাসে গয়ায়' তাহাও আছে। বিদেশী মহামনাঃ পণ্ডিতগণ ইতিহাস রঙ্গমঞ্চে গয়াকে আনিয়া যাহা বলিয়াছেন, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের দেশের সুগ্রহীতনামা মহাত্মা রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও বর্ত্তমান ইতিহাস রঙ্গশালার নাট্যাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাও আছে। দুঃখের বিষয় আমাদিগের সঙ্গে স্কুল কলেজের সম্পর্ক নাই, আমরা নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মিয়াছি, টোল চতুষ্পাঠীর যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতের অনুবর্ত্তন ও সেই মতের অনুবর্ত্তী মহাত্মাদিগের মতের অনুবর্ত্তন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে সমর্থ হই নাই। বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের চরণ চিহ্নের পূজা করিতেন, সেই জন্যে হিন্দুরাও তাহার অনুকরণে বিষ্ণুপদের কল্পনা করিয়া তাহাতে পিণ্ডদান করিতেছেন' এ কল্পনা আমাদিগের চিন্তার অতীত। 'বৌদ্ধ ও জৈনদিগের বরযাত্রার অনুকরণে জগন্নাথের রথযাত্রা কল্পনা, জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি বুদ্ধমূর্ত্তি, ধর্ম্ম, ক্ষেত্রপাল, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি বৌদ্ধদেবতা ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি করিয়া স্বীকার করিব? আমার 'উৎকল ভ্রমণ' প্রবন্ধে জগন্নাথ যে বুদ্ধমূর্ত্তি নহেন, তাহা প্রমাণ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের চরণপূজা অপেক্ষায় বুদ্ধের দন্ত, কেশ, নখ ও ভস্মরক্ষার ব্যবস্থাই বৌদ্ধদিগের বিশেষ অনুষ্ঠেয়। হিন্দুরা যদি বৌদ্ধদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিত, তাহা হইলে হিন্দু রীতিনীতির ভিতরে পিতৃপুরুষের বা গুরুদেবের দন্তরক্ষার ব্যবহার প্রচলিত থাকিত। তাহা না করিয়া বৌদ্ধদিগের ভিতরেও যাহা তাদৃশ প্রচলিত নাই, তাদৃশ চরণপূজার ব্যবস্থা কি করিয়া প্রচলিত হইল? হিন্দুদিগের ভিতরে দন্তরক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা নাই, একেবারে দেহকে ভস্মাবশেষ করিবার ব্যবস্থা; যৎকিঞ্চিৎ অস্থি রাখিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাও রাখিবার জন্য নয়, গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবার জন্য। হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচীন নয়, হিন্দুধর্ম্ম হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্‌ভূত। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া হিন্দু পিতামাতার হস্তে লালিত পালিত হইয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমস্ত আচার ব্যবহার তুলিতে পারেন নাই, তাই বৌদ্ধ আচার ব্যবহার হিন্দু আচার ব্যবহারের ছায়াপাত রহিয়াছে; তাই বুদ্ধদেব শ্রমণের পূজার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের পূজার কথাও বলিয়াছেন। বেদে গয়ার প্রাচীন নাম 'কীকট' শব্দ দেখিতে পাই; * রামায়ণ, ভারতে গয়ার উল্লেখ ও গয়ায় পিণ্ড-

* ঋগ্বেদে আছে—'কিংতে কৃণ্বংতি কীকটেষু গাবো নাশীরং দুহ্রেন তপংতি ঘর্মং
আনোভর প্রমগংদস্ত বেদো নৈচাশায়ং মঘবন্‌রংধয়া নঃ ॥'
ঋক্‌ ৩ মণ্ডল—৫৩ সূক্ত—১৪ শ্লোক।

দানের ব্যবস্থা দেখিতে পাই; অধিকাংশ স্মৃতিসংহিতায় গয়াশিরে পিণ্ডদানের কথা, বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের কথা দেখিতে পাই; ঐতিহাসিকগণ মহর্ষি পাণিনিকে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবধারণ করিয়াছেন, সেই পাণিনীর ব্যাকরণে গয়ার উল্লেখ রহিয়াছে †। ভাষায় যে প্রয়োগের আধিক্য আছে, সেই সেই প্রয়োগের

'কীকট সমূহ' অর্থাৎ অনার্য্য দেশ বা জনপদ সমূহ। উইলসনের মতে ঐ দেশ দক্ষিণ বিহার। সায়ণ বলেন 'কীকটেষু অনার্য্য নিবাসেষু জনপদেষু।"

† পাণিনির প্রমাণঃ—

বরণাদিভ্যশ্চ। বরণা, উজ্জয়িনী, গয়া, মথুরা, তক্ষশিলা। (পাণিনি, তদ্ধিত প্রকরণ, ৪।২।৮।২)।

রামায়ণের প্রমাণ;—

শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতন্ প্রতি॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতা নামপি কশ্চিদ্ গয়াং ব্রজেৎ॥
রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭ সর্গ, ১২শ ও ১৩ শ্লোক।

মহাভারতের প্রমাণঃ—

ততো গয়াং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ। ইত্যাদি ৮২।
তত্রাক্ষয়ো বটোনাম ইত্যাদি ৮৩।
কৃষ্ণশুক্লাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ ইত্যাদি ৯৬।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ। ইত্যাদি ৯৭।
মহাভারত, বনপর্ব্ব,—তীর্থযাত্রাপর্ব্ব, ৮৪ অধ্যায়।
রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্যুতে।
নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যাচৈব মহানদী॥
ঐ, ঐ, ৯৫ অধ্যায় ৯ শ্লোক।

এবং এই স্থানে গয়াকৃত যজ্ঞের বিবরণও আছে।

সংহিতা সমূহের প্রমাণ:—

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত চাশ্বমেধঞ্চ নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥ ৫৫।
কাঙ্ক্ষন্তি পিতরঃ সর্ব্বে নরকান্তরভীরবঃ।
গয়াং যাস্যতি যঃ পুত্রঃ স ন ত্রাতা ভবিষ্যতি॥ ৫৬।

বাহুল্য দেখিয়াই ব্যাকরণকর্ত্তা সেই প্রয়োগসংসাধনের জন্য সূত্রের সৃষ্টি করেন। ব্যাকরণকর্ত্তার অনেক পূর্ব্ব হইতে সেই প্রয়োগটি সাহিত্যে স্থান প্রাপ্ত হয়। যখন ভগবান্ পাণিনি 'গয়া' শব্দ লইয়া সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন বলিতে হইবে,—পাণিনি জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে গয়া শব্দের প্রচলন আছে। আবার রামায়ণ, মহাভারত, স্মৃতি সংহিতা ও অধিক পুরাণে "এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা" শ্লোকটী তুল্যভাবে বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে দেখা যায়, ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, এই শ্লোকটী সেই সেই গ্রন্থের রচয়িতার নহে, তাহার বহুপূর্ব্বে অবিদিত কালে অনবগত পুরুষের রচিত ও ভারতের নরনারীর মুখে উদ্গীত ও সমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। গ্রন্থকারগণ তাহাই নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমাদিগের এই কথার প্রমাণ স্বরূপ রামায়ণের বচনে 'শ্রুতি' কথার উল্লেখ করিতে পারি।

ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্টা দেবং গদাধরং।
গয়াশীর্ষং পদাক্রম্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৫৭ ॥

অত্রিসংহিতা

অথ পুষ্করেষ্বক্ষয়শ্রাদ্ধং * * * এবমেব গয়াশীর্ষে ৪ অক্ষয় বটে ৫ * * * বিষ্ণুপদে ৪০। ফল্গুতীর্থে ২২ * * * বিষ্ণুসংহিতা ৮৫ অধ্যায়।

অপি জায়তে সোহস্মাকং কুলে কশ্চিন্নরোত্তমঃ।
গয়াশীর্ষে বটে শ্রাদ্ধং যো নঃ কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ। ৬৬।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ। ৬৭।

ঐ, ঐ।

যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে।
তথা বর্ষাত্রয়োদশ্যাং মঘাসু চ ন সংশয়ঃ। ২৬১।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১ম অধ্যায়।

গয়ায়াং মক্ষয়ং শ্রাদ্ধং প্রয়াগে মরণাদিষু।
গায়ন্তি গাথাং তে সর্ব্বে কীর্ত্তয়ন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৩০।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণান্বিতাঃ।
তেষান্তু সমবেতানাং যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ। ১৩৯ ॥

কেবল বিষ্ণুপদ বলিয়া নয়, গয়ার একটী পর্ব্বতে সুরভীর পদচিহ্ন আছে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে এবং অদ্যাপি গোক্ষুরাঙ্কে অঙ্কিত একটী পর্ব্বত গয়াক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেবের পদচিহ্নের অনুকরণে বিষ্ণু পদের পূজা করিতে করিতে হিন্দু নরনারী অবশেষে গোজাতির চরণ-চিহ্ন পূজার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন,—একল্পনা অত্যন্ত কৌতূহল ও বিস্ময়ের উৎপাদক।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন

---

গয়াং প্রাপ্যানুষঙ্গেন যদি শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
তারিতাঃ পিতরস্তেন স যাতি পরমাং গতিং॥১৩২।
বরাহপর্ব্বতেচৈব গয়ায়াঞ্চৈব বিশেষতঃ।
এবমাদিষু তীর্থেষু তুষ্যন্তি পিতরস্তদা॥১৩৩। [ উশনঃ সংহিতা, ৩ অধ্যায়।
প্রাধান্যং পিণ্ডদানস্য কেচিদাহুর্ম্মনীষিণঃ।
গয়া দৌ পিণ্ডমাত্রস্য দীয়মানস্য দর্শনাৎ॥ ৯। [ কাত্যায়ণ সংহিতা ৩অধ্যায়।
যদ্দদাতি গয়াক্ষেত্রে প্রবাসে পুষ্করেঽপি চ।
প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে সর্ব্বমানন্ত্য মুচ্যতে॥ ১।
গঙ্গাযমুনয়োস্তীরে তীর্থে বাসরকণ্টকে।
নর্ম্মদায়াং গয়াতীরে সর্ব্বমানন্ত্য মুচ্যতে। ২। [ শঙ্খ সংহিতা, ১৪ অধ্যায়।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥
গয়াশিরেতু যৎ কিঞ্চি ন্নাম্না পিণ্ডংতু নির্ব্বপেৎ।
নরকস্থা দিবং যাতি স্বর্গস্থো মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥১২॥
আত্মনো বা পরস্যাপি গয়াক্ষেত্রে যতস্ততঃ
যন্নাম্না পাতয়েৎ পিণ্ডং তং নয়েদ্ব্রহ্ম শাশ্বতং॥১৩॥ [ লিখিত সংহিতা।
নন্দন্তি পিতরাস্তস্য সুবৃষ্টৈরি চ কর্ষকাঃ।
যদ্ গয়াস্থো দদাত্যন্নং পিতরস্তেন পুত্রিণঃ॥ [ বশিষ্ট সংহিতা ১১অধ্যায়।
কপিলা সহবৎসা বৈ পর্ব্বতে বিচরত্যুত।
সবৎসায়াঃ পদান্যস্যা দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভারত॥৮৯।
সাধিত্র্যাস্তু পদং তত্র দৃশ্যতে ভরতর্ষভ॥৯৩।
মহাভারত বনপর্ব্ব তীর্থযাত্রা পর্ব্ব, ৮৪ অধ্যায়।

# বাজ্ আবার!

বাজ্ পাঞ্চজন্য বাজ্‌রে আবার—
দিগন্ত প্লাবিয়া উঠুক ঝঙ্কার,
মুগধ জগৎ শুনুক আবার—
শুনুক গীতার মধুর গান!

অই যে আবার অস্ত্র ঝনাঝন্,
অই যে আবার করে গরজন
অনল-উগারী, ভীম দরশন
বন্দুক, কামান, মেসিন্ গান্!

নাইসে অর্জ্জুন, বিষণ্ণ অন্তর,
জ্ঞাতি বিরোধিতে পরমকাতর,
ক'বে নারায়ণে করি যুক্ত কর
"যুঝিব না আমি হয়েছি বিকল।

গুরু, পিতামহ, আত্মীয় স্বজন
উপস্থিত অই করিবারে রণ—
যুদ্ধেতে আমার নাহি প্রয়োজন,
আত্মীয় বিনাশে লভিব কি ফল?"

আত্মীয় ভুলেছে আত্মীয়ে এখানে,
যে যাদের পারে, শেলাঘাতে হানে,
মনুষ্যত্ব-বিধি কেহ নাহি মানে—
হয়েছে মানুষ পশুর অধম!

ধিক্ শত ধিক্ সভ্যতা-গরিমা!
ধিক্ ধিক্ ধিক্ বিজ্ঞান-মহিমা!
—শুধুই যে এরা অপ্রাণ প্রতিমা!
স্পর্শিতে পারেনি মানুষ-মরম,

বাজ্ পাঞ্চজন্য, শুনারে আবার
অমর দর্শন অন্তরে গীতার ;
শুনুক মানুষ বুঝুক আবার—
সর্ব্বভূতে এক সত্য সনাতন !

যা'ক দূরে যা'ক বাহিরের ভেদ,
কামনা বিনাশে যত মনঃ খেদ,
জাতি ধর্ম্ম বর্ণে যতেক প্রভেদ—
উজলি উঠুক্ আত্মদরশন।

বুঝুক্ মানব প্রবৃত্তি সরণে—
দ্বন্দ, কোলাহল, মৃত্যু ক্ষণে ক্ষণে,
কাটে দিন সুধু মরণ-মারণে,
উন্নতির নামে ঘটেরে পতন !

নিবৃত্তির পথে চলে যেই জন,
দ্বন্দ দূর করি, সাম্যে রাখি মন,
অনন্ত শান্তিতে রহে নিমগন,
পার্থিব জ্বালায় জ্বলেনা কখন ;

ব্রহ্মে মিলি সে যে হয়ে যায় ব্রহ্ম,
নাহি রহে তাঁর কর্ম্ম কি অকর্ম্ম ;
করি অধিকার প্রকৃতির মর্ম্ম,
আপন ইচ্ছায় চালায় জগৎ ;

আশীষে তাঁহার শান্তি-সুধা ক্ষরে,
পরশ তাঁহার দুঃখ দৈন্য হরে,
প্রসাদ তাঁহার বিজ্ঞান বিতরে,—
স্বরগের জ্যোতিঃ উদ্ভাসে মরৎ !

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলী

———

# স্বপ্ন

নদীর তীর, শ্যাম শষ্পে ভরা! নদী তাহার নীল বক্ষে নীল আকাশের ছায়া বহিয়া চলিতেছে। নদীর মাঝে মাঝে চড়া, চড়াগুলি কাশবনে শ্যামল, সেই শ্যামলতায় শরৎ তাহার মোহন তুলিকা দিয়া শুভ্র রেখা টানিয়া দিয়াছে। তীরে নানা জাতীয় বৃক্ষ কেহ পুষ্পিত, কেহ ফলবান, সকলেই স্নিগ্ধ শ্যামল, পূর্ব্ব সীমায় যেখানে নদীর নীলজল দিগন্ত রেখার সহিত মিশিয়া গিয়াছে সেইখানে মানবহস্ত নির্ম্মিত সেতুটী অ্যাটলাসের মতই যেন স্বর্গ ও মর্ত্ত্যকে বিভাগ করিয়া রাখিতেছে। একটী পুষ্পিত শেফালী তরুর মূলে একটী প্রস্তর রচিত সমাধি স্তূপ। নিকটে আরও কয়েকটী সমাধি রহিয়াছে, কোনওটী সযত্ন রক্ষিত, কোনওটীর বা ভগ্নদশা, কোনওটী বা শেফালী তরু মূলস্থিত স্তম্ভটীর ন্যায় নিজের দৃঢ়তায় কালের কবল হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া চলিয়াছে।

ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম; শেফালীফুলে ছাওয়া সমাধিটীর উপর হেলান দিয়া শষ্পদলের উপর বসিয়া পড়িলাম। কাহার সমাধি এ—কোন্ কালে রচিত তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল জাগিতেছিল; কিন্তু জানিব উপায় ছিল না; স্তম্ভে কিছুই লেখা নাই, নদীতীরও জনশূন্য। বিজনে এ সন্ধ্যায় আকাশ ও প্রকৃতির মাঝ খানে আমি যেন একাকী।

নদীর কুলুস্বর মায়ের ঘুমপাড়ানী গানের মতই মিষ্ট লাগিতেছিল, সন্ধ্যাবায়ু যেন তাঁহারই মৃদুল নিঃশ্বাস, আর শেফালীর গন্ধ তাঁহারই কেশের সুরভি। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম সে কি স্বপ্ন!

সেই কোন্ অতীতে এমনি এক শরতের দিন এমনি সুন্দর সন্ধ্যাবেলা এই নদীর তীর। আমি যেন দূরের দর্শক, দেখিতেছি নদী তীরে এইখানে জনমানবের মেলা। মাঝখানে দাঁড়াইয়া রক্তাম্বরা, আরক্তনেত্রা, রক্তচন্দন ও সিন্দুর ললাটে এক রমণী। তাঁহাকে ঘেরিয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেছে, তাঁহারই মুখ চাহিয়া না জনতা আনন্দে বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।

ঐ আবার কি? ঐ ত না মৃতদেহ চিতার উপর সজ্জিত রহিয়াছে? শবদেহ ত পুরুষের! ঐ রমণীর স্বামীর! রমণী কি বলিতেছিলেন জনকোলাহলে,

কাঁসর ঘণ্টার শব্দে তাঁহার কণ্ঠস্বর ঢাকিয়া গিয়াছিল ; তাঁহার বাণী আমার কর্ণে প্রবেশ করিল না, আমি তাঁহার অধর ওষ্ঠের কম্পনই শুধু দেখিতে পাইলাম।

চন্দন-কাঠের চিতার উপর ধূপধূনার সুরভি উঠিল, পতিপার্শ্বে সতী শয়ান দেখিলাম—তাহার পর দেখিলাম শুধুই অগ্নি। ধূ-ধূ করিয়া পাবক জ্বলিতেছে, তাহার রক্তজিহ্বা লক্ লক্ করিয়া আকাশে উঠিতেছে। আর শুনিলাম বাদ্য-ধ্বনি আর লোক কণ্ঠে জয়ধ্বনি।

অগ্নি নিভিয়া গেল। পুত্র ছাই মুষ্টি ও অস্থি খণ্ড মাথায় করিয়া তুলিয়া নিল। নদীর পবিত্র বারিতে শ্মশানভূমি ধৌত করিয়া নদীতীরের পথ বাহিয়া চলিয়া গেল।

আবার দেখিলাম বৃষ্টি পাতের মাঝখানে চিতাভূমির উপর মৃৎপাত্র স্থাপন করিয়া পুত্র সমাধি রচনা করিল। তাহার মুখে কিসের গর্ব্ব, কিসের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচিত সমাধির পাদমূলে মাথা রাখিয়া জননীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেল।

* * * * *

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না ; হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম জ্যোৎস্নায় জগত ভরিয়া গিয়াছে ; ঝুপ ঝুপ করিয়া দাঁড় ফেলিয়া একদল যুবক ও বালক নদীবক্ষে ডিঙ্গা বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে তাহারা গান করিতেছে :—

"আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা
গেঁথেছি শেফালী মালা !"

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

—

# পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলি সংস্কার

৭৫। বাতির আগুণ চুলায় দিতে নিষেধ।

৭৬। খাইলপাতে ( উচ্ছিষ্ট পাত্রে ) আঁচাইতে নাই।

৭৭। খাইল ( খাওয়া ) পাতে ঘী খায় না।

৭৮। আধখানা পান খাইতে নাই—ঝগড়া হয়।

৭৯। নূতন কল্কী ব্যতীত নূতন হুঁকা বাড়ী আনিতে নাই।

৮০। আম কাঠের চৌকিতে বসিবে না।

৮১। উত্তর কি পশ্চিম শিয়রে শোয় না। প্রবাসে বা জলপথে দোষ নাই।

৮২। পূর্ব্বদিকে মূত্র ত্যাগ করিলে মাথা ধরে।

৮৩। শনির প্রসাদ ঘরে নেয় না।

৮৪। দা'বরাবর বসিতে নাই।

৮৫। ভাঙ্গা কল্কীতে তামাক খাইতে নাই।

৮৬। গায়ের উপর দিয়া হুঁকা, দা বা আগুণ নিতে কিম্বা দিতে নাই।

৮৭। ভাদ্রমাসে কেহ কাহাকেও গোবর দেয় না।

৮৮। অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে গৃহস্থ অন্যকে গোবর দেয় না।

৮৯। গাভীন ( গর্ব্ভবতী ) গাভীর গোবর অপর গৃহস্থকে দিতে নাই।

৯০। গর্ব্ভবতী গাভীর গোবর দ্বারা চাঁচ বা চাটাই লেপন করিতে নাই।

৯১। চাউল না ফুরাইলে লোক মরে না। চাউল—আয়ু।

৯২। দরজার চৌকাঠের উপর বসিতে নাই।

৯৩। রাত্রিকালে দর্পণ দ্বারা মুখ দেখিতে নাই—স্ত্রীলোকে দেখিলে পরজন্মে বেশ্যা হয়।

৯৪। রাত্রে মাথা আঁচ্ড়াইতে নাই।

৯৫। কাঠিতে কাঠিতে আঘাত করিয়া—শব্দ করিতে নাই—অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়।

৯৬। খেয়েদেয়ে অমনিই রাস্তা চলিতে নাই।

৯৭। খাওয়ার পর গাছে উঠিতে নাই।

৯৮। আহারের অব্যবহিত পরে মলত্যাগ সঙ্গত নহে, তাহাতে গ্রহণী, অর্শ প্রভৃতি রোগ হয়।

৯৯। স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিতে নাই।

১০০। পনা ( বাচ্চা মৎস্য ) মৎস্য অপর কাহাকেও দেখাইতে নাই।

১০১। সাপ দেখিয়া কাহাকেও দেখাইতে নাই!

যথাঃ—সাপ, স্বপন, পনা। যে না কয় সে-ই এক জনা।

১০২। চোক বুজিয়া রাস্তা হাঁটিতে নাই।

১০৩। বেড়ার ফাঁকদিয়া চুপিদিয়া চাহিতে নাই।

১০৪। যাত্রাকালীন বিদায় কালে যাই বলা নিষেধ, বলিতে হয়—'আসি'। উত্তরচ্ছলেও বলিতে নাই—'যাও' বলিতে হয়—'যাওয়া না এস।

১০৫। স্ত্রীলোকের এলো চুলে পথ চলিতে নাই—ভূতে পায়।

১০৬। দাঁত খুঁচিতে কিম্বা নখ কামড়াইতে নাই।

১০৭। গায়ের লোম ছাঁচিতে নাই।

১০৮। পথে ঘাটে খাইতে নাই; অগত্যা শুঁকিয়া কিঞ্চিৎ ফেলিয়া দিয়া খাইতে হয়।

১০৯। তিনে সন্ধ্যাকালে ( দিবা ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে ) খাইতে নাই।

১১০। স্ত্রীর গর্ব্ভাবস্থায় মৃতদেহ সৎকার করা অসঙ্গত।

১১১। স্ত্রীর গর্ব্ভাবস্থায় সাপ মারিতে নাই।

১১২। পান খাইয়া যেখানে সেখানে চূণ মুছিতে নাই।

১১৩। ঘাড়া ভাঙ্গা লাউ খায় না।

১১৪। কুলা ও কলস একত্র রাখিতে নাই।

১১৫। বা হাতে খাইতে নাই।

১১৬। কুলা দিয়া পুরুষের ধান্যাদি ঝাড়িতে নাই—আকাল হয়।

১১৭। ভাগিনেয় বধূর মুখ দেখিতে মানা।

১১৮। ভাসুরের কনিষ্ঠভ্রাতার বধূকে ছুঁইতে নাই।

১১৯। দরজায় বসিয়া কোনও বস্তু খাইতে নাই।

১২০। কুলার বাতাস গায় লাগিলে দোষ।

১২১। পরিহিত বস্ত্রের অাঁচলের বাতাস বা আঘাত অপরের লাগান দোষ।

১২২। বা হাতে করিয়া কাহাকেও কিছু দিতে বা কাহারও নিকট হইতে কিছু আনিতে নাই।

১২৩। ভাদ্রমাসে স্ত্রীলোকে শেলাই করিবেনা—ধার কর্জ্জ হয়।

১২৪। চৈত্রমাসে সেলাই করে না—গায়ে খুঁজলী হয়।

১২৫। বিড়ালে ল্যাজ বুলাইয়া মানুষের আয়ু নেয়।

১২৬। নবপ্রসূত কুকুর বা বিড়ালের বাচ্চা ছুঁইবে না—ছুঁলে সহজে চোক ফোটে না।

১২৭। শকুন বাঁচে হাজার বৎসর।

১২৮। গৃধিনী না ছুঁইলে শকুনি খায় না।

১২৯। হাঁচি দিলে জীব বলিতে হয়।

১৩০। চিকা ( ছুঁচা ) মারিতে নাই—বিসূচিকা হয়।

১৩১। কাণে ফুল গুঁজিতে নাই।

১৩২। দোয়াতে কলম দিয়া রাখিতে নাই—ভাতের কাঠি হয়।

১৩৩। কাহারও গায়ে থু থু দিতে নাই! আয়ু কমে।

১৩৪। থাড়ালাথি দিতে নাই।

১৩৫। অশৌচ পালন কালে ভিক্ষা দেয় না।

১৩৬। বাটিতে কঠিন রোগ থাকিলে ভিক্ষাদেয় না।

১৩৭। টিকা দিলে ভিক্ষাদেয় না।

১৩৮। বাড়ীতে বসন্ত বা হামরোগী থাকিলে ভিক্ষাদেয় না।

১৩৯। কোমরে তাগা নাথাকা দোষ লাথি লাগিলে বাগী হয়।

১৪০। বৈষ্ণবের গলায় মালা না থাকিলে তার হাতের জল শুদ্ধ হয় না।

১৪১। সধবার হাতে শাঁখা নাথাকিলে তার হাতের জল অশুদ্ধ।

১৪২। পুত্রের জননী রাত্রে দধি খাইবে না।

১৪৩। ভয় পাইলে বুকে থুথুদেয়।

১৪৪। অমাবস্যা তিথিতে, বৃহস্পতি ও রবিবারে বাঁশকাটে না।

১৪৫। আকাশে তারা ( নক্ষত্র ) ছুটিতে দেখিলে কহা নিষেধ।

১৪৬। গলায় কাঁটা ঠেকিলে বিড়ালের পা ধরিতে হয়।

১৪৭। জন্ম তারিখে বৃষ্টি হইলে তাহার বিবাহ তারিখে ও বৃষ্টি হয়।

১৪৮। মৎস্যে লাথি দিতে নাই—বিবাহে মৎস্য মিলে না।

১৪৯। গাছ ঝরা নেবু স্ত্রীলোকের খাইতে নাই—গর্ভপাত হয়।

১৫০। নৌকার দড়ায় বা মাথায় পা দিতে নাই।

১৫১। নায় আর মায় সমান।

১৫২। পাকে খাইতে নাই অর্থাৎ স্ত্রীলোকে পাক করিয়াই আগে উহা খাইবে না।

১৫৩। বাপ মা মরিলে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে স্ত্রীলোক ডুলিতে উঠেনা।

১৫৪। পিড়ি পাতিয়া তদুপরি শোয় না।

১৫৫। রাত্রিতে মৃত্তিকার উপর পিড়ি পাতিয়া রাখেনা।

১৫৬। বিবাহের পরে-পরে ঐ বৎসর ঐ রমণীকে অন্ততঃ একবার ডুলিতে উঠিতে হয়।

১৫৭। বৈরাগীরা 'কাটন কোটন' বলেনা—বলে 'বানান'।

১৫৮। ঋতুমতী রমণী তিন রাত্রি পার না হইতে ডুলিতে উঠেনা অথবা উক্ত অবস্থায় কাঁকড়ার গর্ত্ত ডেঁইতে ( উল্লঙ্ঘনকরিতে ) নাই।

১৫৯। বহুকাল মৃত্তিকা প্রোথিত টাকা যক্ষে আমল করে।

১৬০। ঘরে বাইরে দিতে নাই।

১৬১। নব প্রসূত গাভীর পতিত ফুলটী ( পদ্ম বা অমড়ানাড়ী ) কাঁকড়ার গর্ত্তে দিতে হয়।

১৬২। ছেলে হলে পাঁচ ঝাঁক (বার) মেয়ে হইলে তিনবার (ঝাঁক) জোকার উলু দেয়।

১৬৩। ছেলে প্রসব করিলে আতুর গৃহের সম্মুখ ভাগে কুমীরলতা আট্‌কাইয়া দেওয়া হয়। মেয়ে সন্তান জন্মিলে কিছুই দেওয়া হয় না।

১৬৪। বিবাহের বৎসর বড়নদী পাড় হইতে নাই।

১৬৫। গোয়ালের দুধে মনসা তুষ্ট।

১৬৬। ল্যাংটা ( উলঙ্গ ) হইয়া লিখিতে নাই।

১৬৭। আম কাষ্ঠের উপর শোয় না।

১৬৮। রাত্রিকালে গৃহে জল রাখিতে হয়—গৃহ-দেবতা তুষ্ট থাকেন।

১৬৯। সন্ধ্যাবেলা প্রত্যেক গৃহেই ধূপ ও দীপ দিতে হয়—অন্যথা অলক্ষী প্রবেশ করে।

১৭০। শিলাবৃষ্টি পাত কালে সর্ষপ উঠানে ছড়াইয়া দেয়—শিলা ক্ষুদ্রাকারে ( সর্ষপের ন্যায় ) পতিত হয়।

১৭১। ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইলে উঠানে একখানা আসন ( পিড়ি ) পাতিয়া দেয়—ঝড় বৃষ্টিতে অনিষ্ট করে না।

১৭২। দা' ডেইতে নাই।

১৭৩। মানুষ ডেঁইতে নাই—যাকে ডেঁইয়া যাওয়া যায় সে নাকি যেঁটে থাকে।

১৭৪। জিহ্বায় কামড় পড়্‌লে বলে—কে জানি গালি দেয়।

১৭৫। বারুণী স্নানে গেলে অষ্টমী স্নানে ও যাইতে হয়।

১৭৬। প্রথম রথে গেলে শেষ রথেও যাইতে হয়।

১৭৭। দুপুর বেলা গাবতলা যাইতে নাই—ভূতে পায়।

১৭৮। তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা দাঁত মাজিতে নাই—সান্নিক আসে।

১৭৯। কার্ত্তিক মাসে আগুণ পোহাইতে নাই—খুঁজলী হয়।

১৮০। রাত্রে কাক ডাকিলে অমঙ্গল।

( ক্রমশঃ )

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

---

# শারদশ্রী

ধান্য-মঞ্জরী-কিরীট শিরে ভ্রমর মঞ্জীর চরণে
কাশ-চামর সুন্দর করে; কুন্দ-ধবল-বরণে!
কণ্ঠে ফুল্ল শেফালী-মাল্য, কর্ণে কুমুদ-কেতকী
অঞ্চলে ঝলে কাঞ্চনচুনি, মুক্তারজত কত-কি!

অলক-পুঞ্জে রঞ্জিত ঘন, প্রেম-অরুণ নয়ানে
করবী-দোপাটি কটির কাঞ্চি, ক্ষেমতরুণ বয়ানে!
মন্দিরে আজি উঠিছেরে বাজি মঙ্গল শুভ শঙ্খ
স্নাত ধরণী—শ্যাম বরণী ;—কলুষধৌত-পঙ্ক!

স্ফুরিত সকল হরিত বীথিকা কাকলীর কল ছন্দে
উত্তরানিল উন্মদ অতি উৎপল ফুল গন্ধে!
শাদ্বলদল উদ্বেল ভেল—শিশির-সিক্ত প্রান্তরে
ঝঙ্কারে বীণা নারদ ঋষি শারদ নিশার অন্তরে!

কল্মী কমল উন্মীল সুখে নির্ম্মল নীর বক্ষে,
এস মা সুষমা! উমা, অনুপমা! কুমারে লইয়া কক্ষে।
আজি পুরিত হর্ষ ভারতবর্ষ! গেহে গেহে হোম আরতি
দেহ মা ধান্য-পণ্য-পুণ্য ; দৈন্য নাশ গো ভারতি!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

# বিক্রমপুরের "বনফুল"

শ্রাবণ মাসে কোন নূতন ফুল দেখিতে পাই নাই তবে সাপলার সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং সাপলা সম্বন্ধে আমার দুই বৎসরের পরিলক্ষিত একটী বিষয় আমি পাঠকগণকে এই উপলক্ষে জানাইতে ইচ্ছা করি আশাকরি সকলে এ বিষয়টী পরীক্ষা করিবেন। যদি বিষয়টী সত্য হয় তবে তাহা প্রকৃতির এক আশ্চর্য্য কথা।—

আমি দেখিতেছি যে দিন বর্ষার জল বাড়িবে তখন যে সাপলাগুলি নূতন নূতন ফোটে সেগুলি জল বৃদ্ধির পূর্ব্বেই জলের উপর (Surface) হইতে উঁচু হইয়া থাকে। অর্থাৎ সাপলাগুলি জল যে বৃদ্ধি হইবে ও কিপরিমাণ বৃদ্ধি হইবে তাহা আমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়া দেয়। আমার এই অন্বেষণ যদি সত্য হয় তবে ইহা প্রকৃতির কেমন একটা চমৎকার ব্যাপার! অবশ্য সাপলার ফুলটীকে জলের

উপরে রাখাই সাপলার এরূপ পূর্ব্ব-বৃদ্ধির প্রাকৃতিক কারণ, কিন্তু সে উপলক্ষে প্রকৃতির ভবিষ্যৎ গণনা কি আশ্চর্য্যজনক। জল সম্বন্ধে জলজন্তুদের কতকগুলি স্বাভাবিক শক্তি ও জ্ঞান সমাদৃষ্ট হয় কিন্তু জলজ উদ্ভিদের ও এরূপ আছে তাহা পূর্ব্বে জানি নাই।

শ্রীজগন্মোহন সরকার

# পণ্ডিত রামকুমার ন্যায়ভূষণ।

বিক্রমপুর পণ্ডিত সমাজে ৺ রামকুমার ন্যায়ভূষণের নাম বিশেষ পরিচিত। বঙ্গীয় ১২২৫ সালে ইনি বিক্রমপুরস্থ বীরতাম্রা গ্রামে তথাকার প্রসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ রামকিশোর চক্রবর্ত্তী। এই চক্রবর্ত্তী বংশ বহুদিন হইতেই পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া নানা বিপদ ও দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে মানুষ হইতে হইয়াছিল।

যৌবনের প্রতিভা শৈশবেই বালক রামকুমারের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে তিনি একদিনেই বাঙ্গ্লা বর্ণমালা কণ্ঠস্থ করিতে ও চিনিতে শিখিয়াছিলেন। এক হইতে একশত পর্য্যন্ত গণনা ও লেখা শিক্ষা করিতে তাঁহার কেবল মাত্র দুইদিন সময় লাগিয়াছিল। পিতা রামকিশোর পৌরহিত্য দ্বারা সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, স্বচ্ছল ভাবে না চলিলেও তাহা-দের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব ছিল না। সহসা পিতার মৃত্যুর পর সংসারের গুরুভার বালক রামকুমারের স্কন্ধে পতিত হইল। তখন রামকুমার টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

সৌভাগ্য ক্রমে কিছুদিন পরে তাঁহার খুল্লতাতের একটী সরকারী চাকরী হওয়ায় তাহার সংসারের ভাবনা আর বড় একটা ভাবিতে হইল না। বালক রামকুমার অসাধারণ প্রতিভা বলে অল্প সময় মধ্যে দেশের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া নবদ্বীপে যাইয়া সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য খুল্লতাতের অনুমত্যানুসারে তথায় গমন করিলেন। সেখানে তিনি প্রায় ছয়বৎসর কাল বিবিধ শাস্ত্রানুশীলন এবং বিশেষ

করিয়া ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা তাহাতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁহার প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ তিনি স্বর্ণ পদক ও বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। কেবল মাত্র বিংশতি বর্ষ বয়সের সময় তিনি 'ন্যায়ভূষণ' উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার যশরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের রামলক্ষ্মী দেবীর সহিত শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছিল। রামলক্ষ্মী দেবী পরমারূপবতী এবং বুদ্ধিমতী বলিয়া উত্তরকালে পল্লী মহিলা সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। রামকুমার দেশে ফিরিয়াই 'টোলের' সংস্কার সাধনে এবং যাহাতে দেশমধ্যে সংস্কৃত-চর্চ্চা বিশেষ করিয়া প্রসার লাভ করে তজ্জন্য মনোযোগী হইলেন। তাঁহার অধ্যাপনার কথা ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় দূর দেশ হইতেও বহু ছাত্র সংস্কৃত-ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য এই টোলে আগমন করিত। ন্যায়ভূষণ মহাশয় খুব দক্ষতার সহিত বহুবর্ষ এই টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে, পুত্রোচিত স্নেহে, শিষ্যগণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। বিক্রমপুরের বর্ত্তমান অন্যতম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারিণী-কুমার শিরোমণি মহাশয় ইঁহারই ছাত্র।

দেশ বিদেশের নানা স্থানে শাস্ত্রীয় বিচারের জন্য 'ন্যায়ভূষণ' মহাশয়ের নিমন্ত্রণ হইত। তাঁহার বাগ্মীতা, এবং বিচারের অকাট্য যুক্তিতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন এবং একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। এক দিকে যেমন বিদ্যাবত্তা প্রভাবে তিনি অতুলনীয় যশের অধিকারী ছিলেন তদ্রূপ চরিত্র মহত্বেও তিনি দেশবাসী জনসাধারণের শ্রদ্ধাও ভক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সত্য-বাদী ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তিনি হাটবাজারে যাইয়াও কোন দিন কোন জিনিষের দরাদরি করিতেন না। দোকানদারগণ যে জিনিষের যে মূল্য বলিত তিনি বিনাতর্কে তাহাকে তাহাই প্রদান করিতেন। তাঁহার এইরূপ মহত্বে অল্প সময়ের মধ্যেই দোকান্দারগণ তাঁহার নিকট কোন দিন জিনিষের দরাদরি করিত না। বরং অন্য লোকের অপেক্ষা তাঁহার নিকট কিছু অল্প মূল্যেই দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। গ্রামে কেহই তাঁহার শত্রু ছিল না, সকলেই তাঁহাকে মিত্র জ্ঞানে ভক্তিও শ্রদ্ধা করিত।

তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেন। ন্যায়ভূষণ মহাশয় সর্ব্বদা বলিতেন "হৃদয়ে পবিত্রতা চাই, মনে ভক্তি চাই।" তাঁহার পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি গঙ্গা স্নানে যাওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন—এত অর্থ নষ্ট ও শরীর ক্ষয় করিয়া গঙ্গা স্নানে যাইয়া কোন ও ফল নাই, ভক্তি-সমন্বিত হইয়া একাগ্র চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে পারিলে বাড়ী বসিয়া পনাপচা পুস্করিণীতে স্নান করিলেও অনেক পুণ্য হইয়া থাকে। দিবসের অধিকাংশ সময়ই সন্ধ্যাআহ্নিকাদি কার্য্যে ব্যয়িত হইত, বাকী সময়টুকু বিদ্যানুশীলনে ব্যয় করিতেন। পথে যাইতে যাইতে যদি কোনও স্থানে কাঁটা ইত্যাদি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে উহা সযত্নে পথের অন্য পার্শ্বে নিক্ষেপ করিতেন। এজন্য অনেকে তাঁহাকে 'পাগল' বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করিত না।

পারিবারিক জীবনে তিনি বিশেষ শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। একে একে তাঁহার চারিটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে কাল গ্রাসে নিপতিত হয়। এসকল পুত্র-বিয়োগ-শোক তিনি অসীম সহিষ্ণুতার সহিত সহ্য করিয়াছিলেন।

তিনি আজীবন নিরামিষাসী ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী রামলক্ষ্মী দেবী পরলোক গমন করেন।

রামকুমার পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে বীরতারা গ্রাম হইতে সংস্কৃত চর্চ্চার অবসান হইয়াছে। এখন আর গ্রামে কোন টোল কিংবা তেমন উপযুক্ত পণ্ডিত নাই, জানি না এই অভাব কতদিন পূর্ণ হইবে।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

---

# বিক্রমপুরের গঙ্গাযাত্রা

রত্ন কিরীটিনী জনমভূমি ! তুমি যে স্বনামধন্যা
"চন্দ্র-পালের" নন্দদুলালী ! "বল্লাল" রাজকন্যা !
পণ্ডিত দ্বিজ মণ্ডিত তুঁঝ ছিল যে উজল অঙ্ক
নীরব আজি সে উৎসবরব মৌন ডমরু ডঙ্ক !
"দীপঙ্করের" পুণ্য-প্রদীপ নির্ব্বাণ তব কক্ষে
সুন্দর শত মন্দির মঠ—"কীর্ত্তিনাশার" বক্ষে !
নাহি সে "নবপঞ্চরতন" ;—নাহি "বল্লভরাজ"
নাহি সে "শুক-কৃষ্ণসাগর"—সে "রাজনগর" আজ !
"চাঁদ কেদার"—কীর্ত্তি-কাহিনী স্বপনে গিয়াছে মিশি
কোথা "সোণামণি"—বীররমণী ? কোথা সে "আদম" ঋষি ?
অনল-কুণ্ডে আত্ম আহুতি !—বল্লাল-ললনা কই ?
"রামপাল" আজি স্মৃতির শ্মশান !—সতীত্বে মহিমময়ী !
পূর্ব্ব গরিমা খর্ব্ব মা ! তব ;—সকলি গিয়াছে খোয়া
নাহি সে "গজারি"—গজের স্তম্ভ ; কুলির "কোদাল ধোয়া !"
"বর্ম্ম-আদিশূর"—কাহিনী শিশুর !
বাখানি "বসুর" বাচ্য—
"নদীয়ায় নব বিক্রম উদ্ভব"
ধন্য "অর্ণবপ্রাচ্য !"

— ——-—

শ্রীকুলচন্দ্র দে

# প্রহেলিকা

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এই প্রকোষ্ঠে ও তাহার সম্মুখস্থ বারেন্দায় বিজয়ের বন্ধুবর্গের প্রায়ই সমাগম হইত। তখন, নানাবিধ তর্কে বিতর্কে কক্ষটী গরম হইয়া উঠিত। একদিনের কথা বার্ত্তার একটী নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল।

বিজয়ের সহপাঠী আশুতোষ বলিল, বিজয়! তুই যে বাবু! এত বাবুগিরি করতে গেলে, আমাদের তো পড়াশুনা একেবারেই হতো না।

বিজয় ভ্রুযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, তুই যে আমাকে কিসে এমন বাবু সাব্যস্থ কল্লি, আশু! বুঝি না। যদি পড়ার ঘরটীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বই-গুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখাকে বাবুগিরি বলিস্ তা হলে আর আমাদের উত্তর নেই। ময়লা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কোন প্রকারে রাত্রিটা কাটান, বেলা আটটার সময় ঘুম হতে উঠা, তার পর হাত পা মুখ ভাল করে না ধুয়েও প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ না করে পড়তে বসা এবং আগের দিন কলেজ হতে আসার পরে যে বই-গুলি ছড়িয়ে ফেলে রাখা হয়েছিল, তা হ'তে পড়ার বইখানা খুঁজতে খুঁজতে না পেয়ে অস্থির হওয়া, কতক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করে, পাঠ করে তাড়াতাড়ি স্নানাহার শেষ করে উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে, বোতামশূন্য পিরাণ গায়ে, ফিতাশূন্য জুতা পায়ে, ময়লা কাপড় পরে, ছেঁড়ামলাটসংযুক্ত বই হাতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কলেজে যাওয়া, ইহাই যদি তোর ছাত্র-জীবনের আদর্শ হয়, তা হলে আমার কিছু বলবার নেই। ভগবান করুন আমার মন হতে এমন আদর্শ যেন চিরকালই দূরে থাকে।

আশুতোষ হটিবার পাত্র নয়। সে উৎসাহের সহিত বলিল, আমাদের দেশ যেমন গরীব, তাতে তোর মত কয়জন চল্‌তে পারে? সকলে তো আর ডেপুটীর ছেলে নয় হে বাপু। কি বলিস্ আনন্দ? কিবলিস্ রমানাথ, কি বলিস্ আজিজ, কি বলিস্ তোরা? এই বলিয়া সে গর্ব্বের ভাবে বেঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত বন্ধুবর্গের দিকে চাহিল।

বিজয় উত্তর করিল, বাবুগিরি করাও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এক নয়।

যার যেমন অবস্থা, সে তেমন ভাবে থাক্‌বে, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা যার যার নিজের উপর নির্ভর করে।

আশু। এমন টেবিল, চেয়ার সকলে পাবে কোথায়? পড়ার বইয়ের দাম জোটে না অনেকের, আবার তার উপর টেবিল, চেয়ার? কি বলিস্ তোরা?

অতুল ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, তা ঠিক্! আগে তো আমাদের দেশে টেবিল চেয়ার ছিল না, তখন কি পড়া শুনা হয় নি? বিশ্বামিত্র মুনিও টেবিলে পড়েন নি, বশিষ্ঠ মুনিও পড়েন নি।

বিজয় যেন আর সহ্য করিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল, কিন্তু তারা আমাদের এখানকার লোকদের মত এমন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নও থাকে নি। পূর্ব্বের হিন্দুর মত চল্‌তে চাও তো সে ভাবে চল। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত লও। অতি প্রত্যূষে ঘুম হতে উঠে, হাত মুখ ধুয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে, গুরুর জন্য ফুল চয়ন কর, তারপর গায়ত্রী জপ কর, কুশাসনে বসে পূজা আহ্নিক কর, শেষে গাছের তলে বসে গুরুর কাছে বিদ্যা শিক্ষা কর, খালি পায়, একমাত্র বস্ত্র পড়ে থাক, মাঝে মাঝে ভিক্ষা করে তাহার লব্ধ অর্থ দ্বারা পড়ার ও গুরুর সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ কর, মান সম্ভ্রমের মাত্রা কমিয়ে দাও, বাসনার নিবৃত্তি কর, তারপর বিদ্যাশিক্ষার অন্তে সংসারে প্রবেশ কর, শেষে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হলে, সংসার ত্যাগ করে নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করে ভগবানের চিন্তায় জীবনের অবশিষ্টাংশ কর্ত্তন কর। কিন্তু এখন তা তো আর করবে না। শিখবে ইংরাজী, চাকরী করবে ইংরাজের, পড়বে ডেস্কের কাছে বেঞ্চের উপর বসে, মিশ্‌তে হবে হ্যাট কোট পরা সাহেবদের সাথে, যেতে হবে বিদ্যালাভের জন্য ইংলণ্ড এমেরিকা, জার্ম্মেণী, থাক্‌বে সারাদিন জুতা পায় দিয়ে, এমন অবস্থায় নিজ নিজ জাতীয় ভাব বজায় রেখে পড়া শুনা কাজ কর্ম্মের চালচলন যতদূর সম্ভব সাহেবদের মত না কল্লে চলবে কেন? তাদের সঙ্গে সব বিষয় সমান হয়ে চল্‌তে হবে। তাদের মত সাহসী হতে হবে, যে সকল গুণচর্চ্চার কল্যাণে তারা আজ বড়—যেমন নিয়ম-নিষ্ঠা শৃঙ্খলা, ব্যবসায়ে সততা, একতা, পরিশ্রমশীলতা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, অল্পভাষিতা, ইত্যাদি—আমাদিগকে শিক্ষা কত্তে হবে। তা না হলে, তাদের সঙ্গে পেরে ওঠব কেমন করে? পূর্ব্বের সে জীবনাদর্শ আর নেই। এখন ব্যবসা বাণিজ্যের

দিন। এখন যিনি কেবল ভগবান, ভগবান্ ক'রে দিন কাটাবেন, সংসার অসার সংসার অসার করে চীৎকার করবেন, তার সংসারে উপায় নেই। এখন,ভগবানের নামও কত্তে হবে ব্যবসা বাণিজ্য করে দেশের শ্রীবৃদ্ধিও সাধন কত্তে হবে। ভাই! যতই বল, বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ মুনির দিন চলে গেছে, আর যে সে দিন আসবে তা মনে স্থান দিও না। মুনি ঋষিরা থাকৃতেন তপোবনে, কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্ম-চর্চ্চা নিয়ে! আমাদের যে লেখা পড়া শিখে টাকা রোজগার কত্তে হবে, তা তো জান পূর্ব্বের আচার ব্যবহার, চাল চলন অনেকটাই পরিবর্ত্তন হয়েছে, অনেক বিষয়ে আমরা ইংরাজী ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছি, বাসগৃহের আস্‌বাবেরও পরিবর্ত্তন হচ্চে, না করে উপায় নেই। করা উচিতও, কারণ এ সবে কাজ করার শক্তি বাড়িয়ে দেয়, তবে যার যতটা সাধ্য।

আশু একটু নরম হইয়া বলিল,তুই যা বল্‌লি তা অবশ্য অনেকটা ঠিক, কিন্তু আমাদের দেশ যে গরীবের দেশ। এমন গরীব দেশ আর কোথায়?

বিজয়। তা ঠিক্ কিন্তু আমরা এত গরীব হলেম কেন? আমাদের দেশের মত এমন শস্য কোথায় জন্মে, এমন ধন রত্ন কোথায়? কিন্তু, তাও আমাদের পেটে ভাত নেই, পিঠেও কাপড় নেই। এর কারণ কি? কারণ, আমাদের জীবনাদর্শ। সংসার অসার, জীবন তুচ্ছ—চিরকালই আমরা এ শিক্ষে পেয়ে আস্‌ছি। শিক্ষার ফল ফলেছে, সংসার আমাদের পক্ষে অসারই হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিরটাকাল আত্মা ও ভগবান্ নিয়েই কাটালেম্ কিন্তু না পেলেম আত্মার খোঁজ, না পেলেম ভগবান্‌কে, এখন পেটের জ্বালায় প্রাণ যায়। আমরা সাধ করে দারিদ্র্যকেবরণ করে নিয়েছি। আমরা ভাল খাই নে, ভাল পরি নে, পড়ার জন্য খরচ পত্র করি নে, কারণ আমরা গরীব। বাল্যকাল হতে, 'আমরা গরীব, আমরা গরীব,' নিজের ঘরে, রাস্তাঘাটে কাগজপত্রে এই কথা শুন্‌তে শুন্‌তে শেষে আমরা গরীবই হয়ে পড়ি। আমরা নিজকে দরিদ্র ভাবি বলেই, আমরা দরিদ্র। নিতান্ত মোটা ভাত মোটা কাপড়েই আমরা সন্তুষ্ট। ধনী হবার আমাদের আকাঙ্ক্ষা কৈ? যে দিন আমরা আমাদিগকে ধনী মনে করব, বড় মনে করব, ধনী হবার ইচ্ছে করব, সেদিন আমরাও ধনী হব, বড় হব। যে যা ভাবে, যা চায়, তাই হয়। জানিস্ তো এজওয়ার্থের **Murad the Unlucky**র গল্প। মুরাদকে ছোট-

কাল থেকে বাড়ীর সকলেই কারণে অকারণে Unlucky, Unlucky বল্‌তো। বেচারা শেষে সত্যি সত্যিই Unluckyই হয়ে পড়্‌লো। আমাদেরও সেই দশা। এমন যদি গরীবই হয়ে থাকি তো আছিই, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা 'দরিদ্রতার' প্রচারে লাভ কি ? এতে কেবল আমরাই দুর্ব্বল হই, কার্য্য করিবার শক্তি সামর্থ্য ক'মে যায়। আমরা গরীব কিসে ? কে বলে আমরা গরীব ? টাকা পয়সা, ধনদৌলত শক্তি সামর্থ্য,--আমরা কিসের গরীব ? গরীব আমরা জীবনাদর্শে। আদর্শ পরিবর্ত্তন কর, নিজকে শক্তিমান মনে কর, মানুষ হবার চেষ্টা কর, দেখবে ধনে জনে দেশ হেসে উঠ্‌বে।

একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বিজয় দেয়ালের গাত্রবিলম্বিত ভূমণ্ডলের মানচিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, চেয়ে দেখ আমাদের ভারতবর্ষ আর ইংলণ্ডে। তুলনায় কত ছোট। কিন্তু তারা আজ পৃথিবীর রাজা। আর আমাদের দেশ দরিদ্রতার আবাসভূমি, অলক্ষ্মীর আবাসভূমি, মহামারি ও দুর্ভিক্ষের বিকট লীলা-স্থল। কেন ?—কারণ, আমরা অকর্ম্মণ্য, উৎসাহবিহীন, সাহসশূন্য,—কারণ, আমরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে জানি না। আমরা এখনও সকল বিষয়েই প্রাচীন সব আদর্শ ধরে চল্‌তে চাই। টেবিল চেয়ার পেণ্টকোট পরে কাজ কল্লে যে কাজ বেশী করা যায়, তার কি কোনও সন্দেহ আছে ? তা না হলে, পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ জাতিই তা গ্রহণ কচ্ছে কেন ? মনে হয়, এসব সামান্য বিষয়, কিন্তু এসব সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারের উপরই জাতির উন্নতি অবনতি অনেকটা নির্ভর করে।

অতুল। তা হলে কি তুই সব সময়ই আমাদের কোটপেণ্ট পরে থাক্‌তে বলিস্ নাকি ?

বিজয়। ভাল, আমি কি তাই বল্‌চি ? কাজ কর্ম্মের সময় কোট পেণ্ট, অন্য সময় ধুতিচাদর পিরাণ। অবস্থা বুঝে সব বিষয়ের পরিবর্ত্তন কত্তে হবে।

বনমালী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল। মোটা সোটা ছেলেটি। মুখখানা গোলগাল। সচরাচর এসব ছেলে যেমন হয়, এও অনেকটা সেই প্রকার। একটু অল্পভাষী। তবে যাহা বলে, তাহার ভিতরই যেন বেশ একটু মিষ্টত্ব ও রসিকতা-মাখা। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, চুপ কর অতুল ! শেষে আশুতোষের দিকে চাহিয়া বলিল, হাঁ আশু ! হাঁরে অতুল ! বড় যে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মুনির

বক্তৃতা কচ্ছিস্? মান্‌লেম তোদের মতই ভাল। কিন্তু, পরীক্ষার সময় নাম খুঁজে বের কত্তে এত কষ্ট হয় কেনরে? তখন কেন বিজয়ের সাথে পেরে উঠিস্ না? বশিষ্ঠ কি বিশ্বামিত্র মুনি তোদের মত কি আমার মত হলে, আর তাদের এমন নাম হতো না।

বিজয় ব্যতীত সকলেই তাহার কথায় হাসিয়া উঠিল।

অতুল মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ধীরে ধীরে বলিল, ভাই! ঐ যায়গাটাতেই তো যত গোল।

আর একটি ক্ষুদ্র শুভ্র হাসির তরঙ্গ বন্ধুগণের ওষ্ঠের উপর ক্ষণকাল ক্রীড়া করিয়া কক্ষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

কি সুখের কাল এই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থল! মধুর তখনকার সহ-পাঠী বন্ধুবান্ধবের সম্মিলন! হৃদয় তখন কত না আশা, কত না উৎসাহে পূর্ণ! প্রতিরজনীতে কল্পনা-সুন্দরী স্বীয় কোমল তূলিকা সাহায্যে হৃদয়-পটে ভবিষ্য জীবনের কত মনোরম চিত্রই না আঁকিয়া যায়!

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। প্রাতঃকাল হইতে বৃষ্টিপাত হইয়া রাস্তা ঘাট এক্ষণে কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হইয়া পড়িয়াছে।

বিজয় ও আনন্দ এইমাত্র কলেজ হইতে গৃহে আসিয়া উপস্থিত। পুস্তকাদি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালনান্তে বিজয় বলিল, বৌঠান! এবেলা খিচুড়ি কল্লে হয় না?

তিনি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, আপত্তি কি? আর কি হবে?

বিজয়। কেন, ডিম, ইল্‌শে মাছ ভাজা ও ডালের বড়া; কি বল আনন্দ?

আনন্দ (হাসিয়া)। বেশ তো, আপত্তি কি? বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে, ভিজে বেড়ালের মত হয়ে পড়েছি। খিচুড়ি হলে তো ভালই হয়।

বৌঠান। চা খাবেন? একপেয়ালা চা করে দেবো?

আনন্দ। তা হলে তো চমৎকারই হয়।

বিজয় ( হাসিয়া )। দেখ্‌বেন, আমি যেন আবার বাদ না যাই।

বৌঠান। আপনি তো আর চার কথা বলেন নি ? আপনি বাদই যাচ্ছেন।

বিজয় এই তো বল্লাম। খিচুড়িতে দাদার তো কোনও আপত্তি হবে না ? তাঁর শরীর ভাল তো ?

বৌঠান। ভালখাবারের দিন কবে খারাপ থাকে ? ঐ যে বাবুও আস্‌ছেন ?

কথা বলিতে না বলিতেই পরেশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিল। স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল কি ? কিসের জল্পনা কল্পনা হচ্ছিল ? ভারি বৃষ্টি, সাহেব মফঃস্বলে সকালেই আফিস থেকে চলে এলেম।

বিজয়। খিচুড়ির যোগাড় হচ্ছিল। আপনার শরীর ভাল তো ?

পরেশ। খুব ভাল, আজকার দিনেতো একটা গরম কিছু চাইই।

বৌঠন। তাতো আমি জানিই। ভাই ছুটি যেন, ছুটি দামোদর।

পরেশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে সস্ত্রীক বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল।

কতক্ষণ পরে বধূঠাকুরাণী টেবিলের উপর গরম গরম দুপেয়ালা চা, খানকয়েক বিস্‌কিট, চাউলভাজা লঙ্কা ও বাতাসা দিয়া গেলেন।

তদ্দর্শনে বিজয় হাসিতে হাসিতে বলিল. বৌঠান। আমাদের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

বৌঠান। ধন্যবাদের আর দরকার নেই।

আনন্দ বলিল, Thanks আমাকে দেওয়া উচিত। আমার দরুণই তো চা পেলে।

বিজয় ( হাসিতে হাসিতে )। আচ্ছা, তোমাকেও Thanks। বৌঠান ! খিচুড়ির যোগার চলছে তো ? ডিম আছে তো ? না হলে বলবেন্ তো আমি বাজার থেকে এনে দি।

বৌঠান। চিন্তে নেই চিন্তে নেই। সবই সময় মত পাবেন।

বন্ধুদ্বয় মনের আনন্দে চা পানে প্রবৃত্ত, এমন সময় তাহাদের সহধ্যায়ী কলেজের স্পোর্টিং ক্লাবের সেক্রেটারী, প্রিয়নাথ হাসিতে হাসিতে কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিজয়, 'বস্' বলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল ও অল্পক্ষণ পরেই আর এক পেয়ালা চা ও জলখাবার সহ উপস্থিত হইল।

চার পেয়ালা টেবিলের উপর স্থাপন করিতে করিতে বিজয় বলিল, খবর কিরে প্রিয় ? কোনও উত্তর এলো ?

প্রিয়নাথ ( ঈষৎ হাসিতে হাসিতে )। সেই জন্যেই তো আসা। সুখবর। Challenge accept করেছে। এমন কি, দিন পর্য্যন্ত ঠিক্ করে দিয়েছে। 10th. August শনিবার আস্‌বে, রব্‌বার খেল্‌বে।

বিজয়। আমি তো বলেইছিলেম যে Accept করবে আরবার Cricketএ হারিয়ে বুক ফুলে গেছে। আচ্ছা এবার Footballএ ওদের এমন শিক্ষে দিচ্ছি যে, আর এজন্মে যেন না ভুল্‌তে পারে।

প্রিয়। আগেই এত গর্ব্ব করিস্‌নে। জিতে নে, তারপর বলিস্। সেবার যে দুর্দ্দশাই হয়েছিল।

বিজয়। সেবার তো আর বিজয় সেন Captain ছিল না। এবার যে আমাদের জয়, তার কি আর কোনও কথা আছে ?

প্রিয়নাথ। শুন্‌তে পাই খুব Strong team নিয়ে আস্‌ছে। কুচবিহার থেকে রমেশ ও আনোয়ার আর শোভাবাজার থেকে মনোহর রায়কে নাকি নিয়েছে। তা ছাড়া তো তাদের প্রফেসার Morison সাহেব আছেই।

বিজয়। প্রফেসার যত ইচ্ছে নিক্, কিন্তু Outsider নিতে দেবো কেন ?

প্রিয়। আমরা অবশ্য আপত্তি কর্‌ব। দেখা যাক্, শেষ্‌টা কি দাঁড়ায় ?

বিজয়। সে যা হোক্, এখন আমাদের Teamর লোক তো Select করা যাক্। একটি কথা ভাই! আগেই বলে রাখি। মুখ দেখে কিন্তু Player নেওয়া হবে না। সেবার সেই Favouritismএর জন্যই তো এক প্রকার হারা। এবার যদি ওসব Jobbery হয়, তা হলে আমি Captain থাক্‌ছিনে।

প্রিয়। না, না, আমারও ইচ্ছে তাই। এবার ওসব হতে দিচ্ছিনে।

আনন্দ। শেষ্‌টা পর্য্যন্ত কি ঠিক্ থাক্‌তে পারবি তোরা ? মুখ চেনাচিনি না হয়েছে কোন্ বার ? দেখা যাক্, বিজয়ের Captain গিরি ও তোর secretaryshipএর সময় যদি কিছু পরিবর্ত্তন হয়। যা বলিস যা করিস্, এবার জিতিতেই হবে।

বিজয়। Victory or Death—আমার প্রতিজ্ঞা। জয় হওয়া চাইই। ( একটু চুপ্ থাকিয়া ) আজ তারিখটা কত রে ? 16th, বাকী মোটে দিন

কুড়ি পঁচিশ! কাল থেকে নিজেদের ভিতর কতকগুলা Friendly match খেলে নেওয়া যাক্।

তৎপরে বন্ধুদ্বয় মধ্যে খেলার কোন্ কোন্ খেলোয়াড়কে নেওয়া হইবে, ও খেলা সম্বন্ধে অন্যান্য নানাবিষয়ে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা চলিতে লাগিল।

*     *     *     *     *

১১ই আগষ্ট, রবিবার। বেলাঅনুমান চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। আগের দিন খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ প্রভাত হইতে বর্ষাস্নাত প্রকৃতি প্রখর সূর্য্যকিরণ-প্রদীপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব শুভ্র শ্রীধারণ করিয়াছে। সূর্য্যালোকে চারিদিক্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে।

কলেজের ফুটবল ফিল্ড লোকে লোকারণ্য Presidency কলেজের সঙ্গে খেলা, সমস্ত সহরের লোক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ক্রীড়াক্ষেত্রের একপার্শ্বে তাম্বুর নীচে কমিশনার, জজ ও মেজিষ্ট্রেট সাহেব, রাজা, মহারাজা, কলেজের প্রিন্সিপাল, প্রফেসারগণ, হাকিম, উকীল, মোক্তার এবং সহরের অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের বসিবার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ছাত্রগণ ও অন্যান্য লোক সমূহ ক্রীড়াক্ষেত্রের চারিধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

বেলা সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় দুইদলের খেলোয়াড়গণ ক্রীড়াক্ষেত্রমাঝে উপস্থিত হইল। রেফারি হুইছিল্ দিল, খেলা আরম্ভ হইয়া গেল।

দর্শকগণ বিস্ফারিতনেত্রে খেলা দেখিতে লাগিল। বিজয়ের দলের পিরাণের রং লাল ও সবুজবর্ণ মিশ্রিত, Presidency কলেজের ছেলেদের নীলরঙ্গের পরিচ্ছদ।

দেখিতে দেখিতে দশমিনিটের ভিতর Presidency কলেজের ছেলেরা এক গোল করিয়া ফেলিল। আনন্দ ঈষৎ দুঃখভারাক্রান্তভাবে বন্ধুবর বিজয়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সে কিন্তু নির্ভীক। বিচক্ষণ সেনাপতির অধীনে সৈন্যগণ যেমন স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে মন প্রাণ সঁপিয়া দেয় তাহার আজ্ঞানুসারে তাহার সঙ্গীয় খেলোয়াড়গণও তেমনি খেলিতে লাগিল। তাহার সুঠাম বলিষ্ঠ বাহু দীর্ঘাকৃত, তেজোবিমণ্ডিত উজ্জ্বল নয়নদ্বয়, সর্ব্বাপেক্ষা তাহার ধীর স্থির ব্যবহার দর্শকের মনে প্রীতি ও বিশ্বাস উৎপাদন করিতেছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে যখন এক গোল হইয়া গেল তখন দর্শকবৃন্দের ভিতর

অনেকেই তাহার প্রতি ও তাহাদের কলেজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাদিগের দুঃখের কারণ শীঘ্রই অপসারিত হইল।—কলেজের পক্ষ হইতে একপ্রকার দর্শকবৃন্দের অলক্ষিতে এক গোল হইয়া গেল।

এক্ষণ হইতে, খেলা খুব জমিয়া উঠিল। দর্শকবৃন্দ বুঝিতে পারিল সমানে সমানে খেলা হইতেছে, কোন দলই কম শক্তিশালী নহে। বল্‌টি এক একবার কিক্ খাইতে খাইতে Presidency কলেজের দিকে যাইয়া পড়িতেছে,—বুঝিবা এই গোল হইল, অমনি গোলকিপারের হস্তদ্বারা প্রহৃত হইয়া ফিল্ডের মাঝখানে আসিয়া পড়িতেছে। একবার, দুইবার, তিনবার এমন হইল। চতুর্থবার—কলেজের পক্ষ হইতে আর এক গোল হইয়া গেল। তখন হইতে যেন প্রেসিডেন্সি কলেজের কাপ্তান ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পক্ষীয় খেলোয়াড়গণও যেন ঈষৎ হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। বাধানিয়মাদি পরিত্যাগ করিয়া যে যাহার মনে খেলিতে লাগিল।

Half the time এর হুইছিল্ পড়িল। পাঁচ মিনিট বিশ্রামের পর আবার খেলা আরম্ভ হইল। বিজয়ের আজ্ঞানুসারে তাহার পক্ষীয় খেলোয়াড়গণ অনেকটা ডিফেন্সিভ খেলিতে লাগিল। বিপক্ষগণ প্রবলবেগে বারংবার চার্জ করিতে লাগিল। কিন্তু হাফ্‌বেক পর্য্যন্ত আসিয়া বল আবার প্রেসিডেন্সীর দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে যখন বিজয় দেখিতে পাইল যে, বিপক্ষগণ একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছে, তখন সে তাহার দলের খেলোয়াড়গণকে ফরওয়ার্ড খেলিবার হুকুম প্রচার করিল। সে আক্রমণ বিপক্ষদল সহ্য করিতে পারিল না। এক বিজয়কে লইয়াই তাহারা নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বল্‌টি তাহার হাতের ক্রীড়া পুতুলের ন্যায়, যেন তাহার ইচ্ছানুসারে তাহার এবং তাহার সঙ্গীয় খেলোয়াড়গণের পায় পায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে অপূর্ব্ব ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়া দর্শকগণ বিস্ময় ও আনন্দপ্লুত হইয়া হাতে তালি দিতে লাগিল। বৃদ্ধ কমিশনার লেনী সাহেব উৎসাহভরে চেয়ার হইতে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে Bravo Captain Bravo Players! বলিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। দেখিতে দেখিতে—কলেজের দিক্ হইতে আরও এক গোল হইয়া গেল। হুইছিল্ বাজিল, খেলা বন্ধ হইয়া গেল।

আনন্দমোহন আনন্দভরে বিজয়ের দিকে দৌড়াইয়া গেল। বিজয়ও তাহার দিকে স্মিতবদনে অগ্রসর হইতেছিল। আনন্দ তাহার চাদরের কোণায় জড়িত সুন্দর ফুলের মালা গ্রহণ করিয়া বিজয়ের গলায় জয়মাল্য পরাইয়া দিল। অমনি বিজয়ের সঙ্গীয় খেলোয়াড়গণ, সেক্রেটারী প্রিয়নাথ ও অন্যান্য ছাত্রগণ সমস্বরে Three cheers for the Captain! Three cheers for our College! Hip, Hip. Hurrah! বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

---

# ধাঁধা

বিশ্বের বিরাট ধাঁধাঁ, সুনীল রেশমে বাঁধা
সজ্জিত বিবিধ সাজে মলাট সুন্দর,
যুগ যুগান্তর ধরি ঊর্দ্ধে অই আছে পড়ি
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যুড়ি গ্রন্থ মনোহর।
নাহি আদি অন্ত তার, সীমাহীন পারাবার
দেখিলে মানব চক্ষুঃ রচনা উহার,
সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন তবুও চিরনূতন
ইহার দুর্ব্বোধ্য তত্ত্ব বুঝে সাধ্যকার,
গ্রন্থের উপরে কত সোণার জলের মত
অযুত অক্ষরে লেখা নামটি কাহার?
পড়িতে পারিলে কিনা, ভেবে দেখ যাবে চিনা,
ভাবুক কহিয়া দেও—যিনি গ্রন্থকার।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত

---

# আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু।

ভারতমাতার যশস্বী এবং কৃতী সন্তান শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু স্বীয় জ্ঞান-জ্যোতিতে পাশ্চাত্য জগৎ চমৎকৃত এবং উদ্ভাসিত করিয়া আবার মাতৃ অঙ্কে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অমানুষিক প্রতিভা, তাঁহার অতুলনীয় জ্ঞানগরিমা পাশ্চাত্যবাসীগণকে বিস্মিত এবং স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে; তাহারা সসম্ভ্রমে ভারতের এই অদ্বিতীয় বিজ্ঞানবিৎকে অবনত মস্তকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে ইহা লুপ্ত গৌরব ও লুপ্ত বৈভব ভারতের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন ভারতবর্ষ এখনও নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই। এখনও তাঁহার সন্তানগণ প্রতিযোগিতায় পাশ্চাত্য দেশবাসীগণের সমকক্ষ, এখনও তাঁহারা পাশ্চাত্যদেশীয় মনীষীগণের সহিত সমস্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত। তিনি দেখাইয়াছেন, অতীতের ভারতবর্ষ যে শক্তির প্রভাবে যে প্রতিভায় এককালে সভ্যতার এবং জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা এখনও তাহার হৃদয়ের গুপ্তকক্ষে মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে অতর্কিতভাবে আগ্নেয় গিরির উচ্ছ্বাসের মত স্বীয় সন্তানের মধ্যদিয়া অতীতের মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বিশ্বজগৎ স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে।

সে দিন জগদীশচন্দ্র কোনও সম্বর্দ্ধনা সভায় দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমক্ষে আপনার প্রচারকার্য্য, ভারতের বর্ত্তমান অভাব এবং ভবিষ্যত ভারতের প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলীর যে আভাষ দিয়াছেন আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

প্রথমতঃ তিনি যে কার্য্যে পাশ্চাত্যদেশে গিয়াছিলেন তাহার মর্ম্মাংশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন এই চতুর্থবার তিনি ভারত গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া বিজ্ঞান প্রচারোদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য দেশে গিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্য সম্পাদনে তিনি আশাতীত ফললাভ করিয়াছেন। ভিয়েনা, প্যারিস, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন হারবার্ড, ওয়াশিংটন, চিকাগো, কলোম্বিয়া, টোকিও প্রভৃতি স্থানের বিদ্বৎসমাজ তাঁহার বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নূতন আবিষ্কারের একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার যথোচিত গুণাবধারণ ও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যদিও বিজ্ঞানক্ষেত্রে তাঁহার নবানুসন্ধান কয়েকটি প্রচলিত অনুমানকে (theory) সম্পূর্ণভাবে আক্রমণ করিয়াছে তথাপি তাঁহার গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত সমগ্রজগৎ একবাক্যে গ্রহণ করিয়াছে, তিনি বলিয়াছেন তাঁহার সফলতা শুধু স্বীয় নির্ম্মিত নব যন্ত্র সমূহের উপর নির্ভর করিয়াছিল এবং সেগুলি কার্য্যকালে বিশেষ ফলপ্রদান করিয়াছিল। ভিয়েনার বিজ্ঞানবিৎগণ ও এই যন্ত্র সমূহের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন পদার্থ বিজ্ঞান এবং জীব বিজ্ঞানের সম্মিলিত

প্রান্ত সীমায় ডাক্তার বসুর অনুসন্ধান পাশ্চাত্য জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ইয়োরোপকে অনেক নীচে ফেলিয়া গিয়াছে এবং এই বিষয়ে ইয়োরোপকে ভারতবর্ষের শিষ্য হইতে হইবে। তাঁহারা আরও স্বীকার করিয়াছেন যে যেদিন প্রাচ্যের মনোবৃত্তি সমুদ্ভুত সংশ্লেষক প্রক্রিয়া ( synthe-tic method ) প্রতীচ্যের বিশ্লেষক প্রক্রিয়ার ( analytical mehods ) সহিত সমযোগে কার্য্য করিবে সেদিন বিজ্ঞানের মহদুপকার সাধিত হইবে। অন্যান্য যায়গার বিজ্ঞানবিৎগণ একযোগে এই বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন তিনি ইয়োরোপ এবং আমেরিকার অনেক সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে তাহার লেবরি-টারিতে ভারতীয় নূতন প্রণালীতে শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন ইয়োরোপের পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতের সাহায্য ব্যতিরেকে মানবের জ্ঞানচর্চ্চা কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। এই স্বীকারোক্তি ভারতের ভবিষ্যত কর্ম্মীদিগকে একনূতন উৎসাহে উদ্দীপিত করিবে সন্দেহ নাই। জগদীশচন্দ্র তাঁহার স্বদেশবাসী দিগের ধী এবং চিন্তাশক্তির প্রভূত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এত প্রখর যে তাহারা বিক্ষিপ্ত ঘটনাবলী হইতে সহজেই সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। তক্ষশীলা, নালন্দ এবং কাঞ্জিভারাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে ভারত অচিরেই লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইবে। ভারত শীঘ্রই দেখিবে তাহার বিদ্যা-মন্দিরে আচার্য্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় পার্থিব সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ভোগ-বাসনা বিরহিত হইয়া সত্যের অনুসন্ধানে অক্লান্তভাবে ছুটিয়া চলিয়াছে। জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হইয়াও তাহাদের অধ্য-বসায় তিলমাত্র শিথিল হইবে না বরং মৃত্যুকালে শিষ্যবর্গকে সেই মহদুদ্দেশ্য সাধনে প্রণোদিত করিয়া যাইবে। জগদীশচন্দ্র ও সেই পথে চলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন সন্ন্যাসীর ভাব লইয়াই তাঁহার আদর্শ গঠিত, ভারতবর্ষকে দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে পৃথিবীতে ঐ একটি মাত্র দেশ আছে যেখানে বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মে সংঘর্ষ হইতে না দিয়া জ্ঞানকেই ধর্ম্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য দেশে আজকাল বিজ্ঞানের যে অপব্যবহার চলিতেছে ভারতবর্ষ দ্বারা তাহা হওয়া অসম্ভব। জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্য দেশের পুষ্পকরথ ইত্যাদি দ্বারা শূন্যে অধিকার স্থাপন বিষয়ে বলিয়াছেন যে যদি ভারতবর্ষ এই উন্নতি লাভ করিতে পারিত তবে পার্থিব দেহে বিধাতার আবির্ভাব হইয়াছে মনে করিয়া ভারতবাসীদের প্রথম কার্য্য হইত প্রতি দেব মন্দিরে ভগবানের পুষ্প বিল্বদল সমর্পণ করিবার জন্য ভক্তিপুলকিত চিত্তে ছুটিয়া যাওয়া।

জাপানে অবস্থান কালীন তিনি জাপানীদিগের কর্ম্ম জীবন সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিয়া-ছেন। তিনি তাহাদের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন জাপদিগের উদ্যম অধ্যবসায় উচ্চা-

কাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যত-দৃষ্টি দেখিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। জড়বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা হইল সভ্যতার প্রথম নিদর্শন। এই জড়বিজ্ঞানের রাজ্যে জাপগণ তাহাদের গুরু জার্ম্মাণদিগকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করিয়াছে। শতবৎসর পূর্ব্বে তাহাদের সমুদ্রগামী অর্ণবপোত ছিলনা। ব্যবসা-বাণিজ্য তাহারা জানিত না। কিন্তু আজ তাহাদের অগণ্য বাণিজ্য পোত অন্যান্য সভ্যজগতের সঙ্গে এরূপ ভাবে প্রতিযোগিতা করিতেছে যে অচিরেই হয়ত আমেরিকা তাহার প্রশান্ত মহাসাগরের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইবে। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাদের এই উন্নতি চক্ষে না দেখিলে বাস্তবিকই বিশ্বাস করা যায় না। তাহাদের পণ্য দ্রব্য সমুহ আজ বিদেশীয় রাজ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে দেশ তাহাদিগকে এই বিষয়ে অকাতরে সাহায্য করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার বিষয় তাহাদের ভবিষ্যত দৃষ্টি। যে জাতির সঙ্গে তাহারা ঘনিষ্ঠতা করিতে চায় প্রাণান্তেও তাহারা সেই জাতির সঙ্গে কোন হাঙ্গামায় জড়িত হইতে চাহে না। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে অন্য জাতির প্রাধান্য বিস্তৃত হইলে মনোমালিন্য এবং বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য পণ্য শুল্কাদির দ্বারা বিদেশীয় দ্রব্যাদি আমদানী একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

জগদীশচন্দ্র গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন আমাদের দেশ যেন তাহার আসন্ন বিপদ উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। তাহার ব্যবসা-বাণিজ্য যে সমূলে ধ্বংস হইবার উপক্রম হইয়াছে তাহা দেশবাসী যেন দেখিয়াও দেখিতেছে না। নির্ব্বিকার ভাবই যে সর্ব্বনাশের আমন্ত্রণ ইহাও কি তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না? চীনের বিগত ঘটনাও কি তাহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিবে না? এখন আর কোন ক্রমেই সময় নষ্ট করা উচিত নয়। ভারতগভর্মেণ্টের সাহায্য এবং দেশবাসী-গণের অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা লুপ্ত প্রায় ব্যবসা বাণিজ্য পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। যে দুই একটি ব্যর্থ চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ঠিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় নাই সুতরাং আশারূপ ফল লাভ ও করে নাই। বিদ্যুতের ক্ষণিক বিকাশের মত দুই একবার জ্বলিয়া তাহা আবার যে তিমিরে সে তিমিরেই লয় পাইয়াছে। উপরন্তু গভর্মেণ্ট এবং দেশীয় ব্যক্তিবর্গ যেন বিভিন্ন মতে বিভিন্ন পথে চলিয়াছিলেন। এই বিষয়ে গভর্মেণ্টের ভারতীয় সদস্য পূর্ণ একটি কমিটি গঠন করা উচিত। তাহারা প্রকৃত আভ্যন্তরীণ ব্যাপার গভর্মেণ্টকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে। যে নিয়মানুসারে ছাত্রদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া শিল্প এবং বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে বিদেশে পাঠান হয় সেই নিয়মের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হওয়া দরকার এবং বিদেশে পাঠাইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে এদেশে জিনিষপত্র নির্ম্মাণের সুবিধা এবং অসুবিধা শিক্ষা দেওয়া ও আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য। প্রত্যেক শিল্পাদি বিভাগের জন্য তিনজন করিয়া ছাত্র নির্ব্বাচিত হওয়া দরকার, দুইজন সেই কার্য্যে উন্নতি করে যত্নবান হইবে অন্যটি বাণিজ্যের দিক হইতে উহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে শিখিবে।

বিদেশীয় জ্ঞান লইয়া আমাদের দেশীয় শিল্পালোচনা করা কষ্টকর হইয়া উঠে বটে কিন্তু এই সকল অসুবিধা, যে সকল সৎকর্ম্মীলোক মৌলিকভাব লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, তাহাদের দ্বারাই দূরীভূত হইতে পারে। গভর্মেণ্ট ও আমাদিগকে নিম্ন লিখিত ভাবে সাহায্য প্রদান করিতে পারেন :—

(১) জিনিষ পত্র যোগাইবার সুবিধা প্রদান; (২) সুপরামর্শ প্রদান; (৩) এবং লব্ধ অভিজ্ঞান শিল্পের প্রতিষ্ঠা স্থাপন। জগদীশচন্দ্রের বিশ্বাস গভর্মেণ্ট এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিতেও বাসনা করিয়াছেন এই বিষয়ে গভর্মেণ্ট এবং দেশীয় ব্যক্তিবর্গের যে উদ্দেশ্য এক তাহার কোন সন্দেহ নাই। একই বিপদের সম্মুখীন হইয়া সমযোগে সমোদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে গেলে আপনা হইতেই পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য এবং হৃদয়ের মিলন সংস্থাপিত হয়। আজ যে বিপদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে ইহাই হয়ত সে সমস্বার্থ এবং প্রীতিবন্ধন শাসক শাসিতে বর্ত্তমান থাকা দরকার তাহার গুরুত্ব ভারতকে সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিবে।

যে বিপদ ভারতের অদৃষ্টাকাশে পুঞ্জীভূত হইতেছে তাহাকে দূরীকৃত করিতে হইলে অদম্য উদ্যম চাই। শুধু শিল্প-বাণিজ্য নয়, প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার আদর্শটিকেও ধ্বংসের মুখ হইতে আমাদের ফিরাইয়া আনিতে হইত। উহাকে রক্ষা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে প্রাণপাত চেষ্টা চাই—ত্যাগ স্বীকার চাই। শুধু যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নতিকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে যেমন বিপদ, আবার অন্যদিকে কর্ম্মহীন স্বপ্নময় জীবন লইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকাও তেমনি বিপজ্জনক। শুধু উচ্চভাবের স্বদেশপ্রাণতাই একমাত্র আমাদিগকে চিন্তা এবং কর্ম্মের আদর্শ ঠিক করিয়া দিতে সক্ষম এবং স্বদেশের সেই আহ্বান সমগ্র ভারতকে যে একভাবে সাড়া দিবে তাহা নিশ্চয়।

পরিশেষে জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন, যে দেশ স্বর্গীয় গোখেলের মত ভক্ত সন্তানের জননী তাহার দুঃখের অবসান অচিরেই হইবে।

শ্রীযামিনীমোহন সেন।

---

# শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়।

শ্রীনাথ রায় মহাশয় বিক্রমপুরের একজন কর্ম্মী ও কৃতী সন্তান। তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে শেখরনগরের প্রাচীন জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য-কালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েটস্কুলে ও ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে জেনারেল এসেমব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় এবং মেট্রপলিটেন ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৫ অব্দে ঢাকা বারে এবং তৎপর বৎসর ময়মনসিংহ বারে যোগদান করেন। ছাত্র জীবন হইতেই তাঁহার সাধারণের হিতকর কার্য্যে এবং সকল সদনুষ্ঠানে অসামান্য উৎসাহ ছিল। ঢাকা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে তিনি তাঁহারই ন্যায় উৎসাহী দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একজন ছাত্রের সহিত মিলিত হইয়া "ভারত হিতৈষিণী" নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপকগণের তিরস্কারে তাঁহাকে এই অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয়। অতঃ-পর কলিকাতায় বি, এ, পড়িবার কালে তিনি "বিক্রমপুর সম্মিলনীর" একজন প্রধান সভ্য হইয়াছিলেন। বি, এ, পাশকরার পর ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের মেম্বর হন। ময়মনসিংহ বারে যোগদানের অত্যল্প কাল পরেই তিনি ময়মনসিংহ এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক এবং মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ও ভাইস্ চেয়ারম্যান্ মনোনীত হন। এই সময়ে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও সততা মহারাজা সূর্য্যকান্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মহারাজ তাঁহাকে তাঁহার ষ্টেটের একজন উকিল নিযুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি কিয়দ্দিন অস্থায়িভাবে মুন্সেফের কার্য্য করেন। পরে স্থায়ী মুন্সেফী প্রাপ্ত হইলে মহারাজা তাঁহাকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে বারণ করেন এবং তাঁহার জমিদারীর লিগেল্ এড্‌ভাইজর পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। কিয়দ্দিন পরে, প্রসিদ্ধ ফিলিপ্‌স্ কেসের অবসানে যখন তিনি পরলোক গত বিখ্যাত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহে হাইকোর্ট বারে যোগদানের জন্য কলিকাতা যাইতে সঙ্কল্প করেন, তখনও মহারাজা তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা প্রদান করেন এবং তাঁহার ষ্টেটের চিফ্ ম্যানেজারের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। যাহা হউক, এইবার তিনি তাঁহার শক্তির অনুরূপ কর্ম্মক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন।

তিনি দীর্ঘকাল মিউনিসিপালিটীর কমিশনর ছিলেন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ ময়মনসিংহের সদর বেঞ্চে অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ডিষ্ট্রীক্‌বোর্ডের মেম্বর, ময়মনসিংহ জেলের পরিদর্শক, জমিদারগণ কর্ত্তৃক মনোনীত আনন্দমোহন কলেজ কমিটীর সদস্য, সিটি কলেজিয়েট স্কুল কমিটীর ও মুক্তাগাছা রামকিশোর হাইস্কুল কমিটীর সদস্য, ইষ্টবেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্‌স্ এসোসিয়েসনের মেম্বর, ময়মনসিংহ লোন অফিসের ডিরেক্টর এবং ময়মনসিংহ সেণ্ট্রাল কো—অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের ডেপুটী চেয়ার ম্যান্ প্রভৃতি পদে নিযুক্ত আছেন। তিনি চরিত্র বলেও কার্য্য দক্ষতায় জনসাধারণের এবং রাজকর্ম্মচারিগণেরও বিশেষ শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছেন। মহারাজা সূর্য্যকান্তের বিস্তীর্ণ জমিদারীর প্রজাগণ তাঁহাকেই "মা-বাপ" বলিয়া জানে। প্রজাগণের অভাব অভিযোগ তিনি এমন সহৃদয়তা ও সহিষ্ণুতার সহিত শ্রবণ করেন যে তাহারা তাঁহার "মাটির ম্যানেজার" নাম রাখিয়াছে।

বহুদিন যাবত তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার ব্যয়ে পরিচালিত একটী বালিকা বিদ্যালয় রহিয়াছে। তিনি নিজ বাড়ীতে একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন, বিশ্ব বিদ্যালয় কর্ত্তৃক তাহার এফিলিয়েসন্ ও হইয়াছিল, কিন্তু পরে পার্শ্ববর্ত্তী চিত্রকোট গ্রামে আর একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় প্রতি-যোগিতায় দুইটীই উঠিয়া গিয়াছে। আমরা আশা করি রায় মহাশয় লোক শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে শেখরনগরে পুনরায় একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপনে ব্রতী হইবেন। শেখরনগর গ্রামে উত্তম পানীয় জলের অভাব লক্ষ্য করিয়া রায় মহাশয় ১৩১৯ সনে নিজ বাড়ীর সম্মুখে একটী জলাশয় খনন করেন। পর বৎসর উহা রিজার্ভ করিয়া জল ব্যবহারার্থে সর্ব্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি নিজগ্রামে একটী দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দেশবাসীর মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ও তাঁহার একান্ত উৎসাহ দৃষ্ট হয়। বিদেশ প্রত্যাগত যুবকগণ যাহাতে সমাজে গৃহীত হয় তজ্জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ সর্ব্বদা যত্নবান্। পূর্ব্ববঙ্গেয় কায়স্থসমাজের সংস্কার কার্য্যে যাহারা ব্রতী হইয়াছেন তন্মধ্যে রায় মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

—

# প্রকাশ বেদনা

বসি' বসি' চিরদিন
কে তুমি এ চিরবিরহী পরাণ
করিছ বিরামহীন ?—
সুখের দুখের স্রোত শতধার
অন্তরতলে বহে অনিবার,
কল কল কল বাজে অবিরল
রাগিণী কত ;
পাখীর কাকলী, কুসুমের বাস,
আকাশের নীলে বরণ-বিকাশ,
জাগায় আকুল মরমে আমার
কামনা শত।
বসি' বসি' চিরদিন
কে তুমি এ চিরবিরহী পরাণ
করিছ বিরামহীন ?

গাহিতে চাহি যে তাই,
গভীর গোপন হিয়ার কাঁপন
ছন্দে ধরিতে চাই ;
শারদ-গগনে লঘু মেঘ প্রায়
কল্পনারাশি ভেসে চলে যায়,
মূরছিয়া পড়ে ভাষাহীন তান
হিয়ার তারে,
নিশিদিন সেই রাগিনী গভীর
চিত্ত আমার করেগো অধীর,

পাগল পরাণ আপনাতে আর
রহিতে নারে ;—
গাহিতে চাহি যে তাই,
গভীর গোপন হিয়ার কাঁপন
ছন্দে ধরিতে চাই।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

---

# "চাণ্ডিকান" নগরী।

[ ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত। ]

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য পর্য্যটক, ঐতিহাসিক ও মানচিত্রকরগণ নিম্নবঙ্গে এক প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দু-ভূঞা শাসিত চাণ্ডিকান রাজ্যে ও তন্নামধেয় নগরীর উল্লেখ ও বর্ণনা বহুস্থানে করিয়াছেন। এতৎ নামীয় কোন নগরীর স্মৃতি পর্য্যন্ত অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সুলভ বিকৃত উচ্চারণ হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং অন্য কোন স্থানকে পর্য্যটকগণ হয়ত কোন কারণ বিশেষে চাণ্ডিকান নামে অভিহিত করিয়াছেন, এইরূপই অনুমিত হয়, কারণ এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বিশেষতঃ, দুই রাজ্য ও সমৃদ্ধিশালী নগরীর অস্তিত্বের স্মৃতি পর্য্যন্ত তদ্দেশবাসীগণের মানসপট হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, যে বিভিন্ন গ্রন্থে ও মানচিত্রে চাণ্ডিকান নগরী উল্লিখিত আছে তাহার বিবরণ, এবং চাণ্ডিকানের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের বিভিন্ন অভিমত সমূহ নিম্নে যথাযথরূপে বিবৃত হইল।

## বিভিন্ন গ্রন্থে ও মানচিত্রে "চাণ্ডিকান" নগরীর উল্লেখ ও বর্ণনা।

—ওলন্দাজ পর্য্যটক John Huyghen van Linschoten ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের

রাজধানী Amsterd m নগরী হইতে তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত Itinerario ofte Schipvart নামে প্রকাশিত হয়। * এই গ্রন্থে চাণ্ডিকান নগরীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। লিন্‌সোটেনের বঙ্গভ্রমণ কালে হুগলি নদীর পুর্ব্বদিকস্থ ভূভাগকে চাণ্ডিকান বলিত; এবং সাগর দ্বীপের নিকটস্থ হুগলী নদীর একটি শাখা—সম্ভবতঃ হুগলী নদীই—তৎকালে চাণ্ডিকান নদী বলিয়া পরিচিত হইত। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে জেসুইট পাদরীদের হুগলীস্থ আবাস গৃহ চাণ্ডিকানে অবস্থিত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। †

Nicholas Pimenta-পর্ত্তুগীজ জাতীয় জেসুইট সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। তিনি ভারতে প্রধান পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ গোয়ার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৫৯৮ ও ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ধর্ম্মপ্রচারার্থ তিনি Francis Fernandez Dominic da Sosa, Melchior da Fouseca, এবং Andiew Bowes নামক চারিজন জেসুইট পাদরীকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। এই সজ্যই সাধারণতঃ

---

* Hakluyt Societyর গ্রন্থাবলী ভুক্ত করিয়া Burnell এবং Titelo লিন্‌সোটেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইংরেজীতে অনুবাদ ও সম্পাদন করিয়া "The voyages of John Huyghen van Linschoten to the East Indes," etc. আখ্যায় দুই খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছেন। লিন্‌সোটের মূল গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে Amsterdam হইতে Le Grand Routier de Mer নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতেই চাণ্ডিকানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় Burnell এবং Titelo সম্পাদিত পূর্ব্বোক্ত Le Grand Routeir de Mer নামক অংশ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং, চাণ্ডিকানের বিবরণ তাহাতে নাই। Hakluytus Posthumus অথবা Purchas His Pilgrimes নামক সুবিখ্যাত সংগ্রহ গ্রন্থেও লিন্‌সোটেনের ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশিত হয়। তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত অংশ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

† "Before 1596, when the earliest edition of van Linshoten's work was published, the country to the E. of the Hugli river was known as the country of chandecan. One of the channels of the Hugli near saugor island, if not the Hugli itself, was then called river of Chande can. In 1604 the Jesuit Residence at Hugli was designated as situated in the Chandecan district."

—J. and Proc. A. S. B. New series, Vol. IX. (1913), p. 441.

Bengal Mission নামে ইতিহাসে পরিচিত, এবং ইহাদের দ্বারাই সর্ব্ব প্রথম বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ফার্ণাণ্ডেজই ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। Bartholome Alcazar প্রণীত "Chronicle of the Jesuit Worthies of the Province of Toledo" (Madrid নগরী হইতে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) নামক পুস্তকে ফার্ণাণ্ডাজের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ফার্ণাণ্ডেজ Toledoর নিকটবর্ত্তী La Villa de Huerta নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে বিংশ বৎসর বয়সে Alcala বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গোয়াতে আগমন করেন, ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ৫২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, অথচ Du Jarric এবং Alcazar উভয়েই লিখিয়াছেন যে, বয়সের আধিক্য বশতঃ তিনি স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * Bengal Missionএর পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপ্রচারক চতুষ্টয় বঙ্গদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া তত্তৎদেশের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক, এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিবরণাদি কতিপয় পত্রদ্বারা গোয়ার অধ্যক্ষ পাইমেণ্টাকে জানান। ঐ পত্রসমূহ অবলম্বন করিয়া পাইমেণ্টা গোয়া হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রধান অধ্যক্ষ Claude Aquavivaর নিকট কতিপয় লিপি প্রেরণ করেন। ঐ পত্রাবলী পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত হওয়াতে এক খানি পত্রেরই বিভিন্ন অংশ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এবং প্রকৃত পক্ষে উহা উক্ত ধর্ম্মপ্রচারকগণের কার্য্যবিবরণী। পাইমেণ্টা পত্রাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রথমে ১৬০১ ও ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ভেনিস নগরী হইতে

---

* "There is a short biography of Fernandez in Bertholome Alecazar's "Chronicle of the Jesuit Worthies of the Province of Toledo, "Madrid 1710. From it we hear that Farnandez was born at a place called La Villa de Huerta, near Toledo, and that he entered the university of Alcala in 1510, when he was twenty years old. He arrived in Goa in 1575, and died in 1602, when he was only about fifty two, though Dujarric and Alcazar speak of him as being weighed down by years." —BEVERIDGE, The District of Bakarganj, Trubner, 1876, Appendix VIII. p. 446.

ইতালীয় ভাষায় * প্রকাশিত করেন, এবং ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে বহু পরিবর্দ্ধিত হইয়া Constance নগরে উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। ফার্ণাণ্ডেজ কর্ত্তৃক ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অথবা ১৯শে জানুয়ারী তারিখে শ্রীপুর হইতে লিখিত লিপির এক পর্ত্তুগীজ অনুবাদ ১৬০২ খৃষ্টাব্দে লিস্‌বন্ নগরী হইতে প্রকাশিত হয়। Mayence হইতে পাইমেণ্টার গ্রন্থের এক ল্যাটিন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার ফরাসী অনুবাদ অচিরেই প্রকাশিত হইয়াছিল। Hakluytus Posthumus অথবা Purchas His Pilgrimes নামক সুবিখ্যাত সংগ্রহ গ্রন্থে ইংরেজী ভাষায় পাইমেণ্টার বিবরণীর এক সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশিত হয়। আধুনিক কতিপয় গ্রন্থেও পাইমেণ্টার বিবরণের অংশ বিশেষের ইংরেজী অথবা বাঙ্গলাতে অনুবাদ অথবা সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে। পাইমেণ্টার বিবরণে যে যে স্থানে চাণ্ডিকানের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

প্রারম্ভেই পাইমেণ্টা বঙ্গের তৎকালীন ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়া বলিয়াছেন যে বঙ্গদেশ তৎকালে মোগল সম্রাটের বিদ্রোহী দলভুক্ত বার জন ভূঞা কর্ত্তৃক শাসিত হইত, এবং তন্মধ্যে ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলি, এবং শ্রীপুর ও চাণ্ডিকানের নৃপতিদ্বয় অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। পাইমেণ্টা প্রদত্ত Bengal Mission এর বিবরণে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ফার্ণাণ্ডেজ ও সোসাকে এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসরে ফন্‌সেফা এবং এণ্ড্রু বার্ডয়সকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। পূর্ব্বোক্ত দুইজন ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে কোচিন হইতে যাত্রা করিয়া অষ্টাদশ দিবসে ক্ষুদ্র বন্দরে ( Porto Pequino ) পৌছেন। তথা হইতে নদী বাহিয়া আট দিনে তাঁহারা গুলো অথবা গোলিতে আগমন করেন। গুলো হইতে তাহারা চাটিগাঁও যান। গুলোতে অবস্থান কালে ফার্ণাণ্ডেজ ও সোসা চাণ্ডিকান পতি কর্ত্তৃক তদীয় রাজ্যে যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু সেই সময়ে তাঁহারা চাণ্ডিকানে যাইতে

* "Fernandez' first letter was written from Sripur......It will be found at length in the edition of Pimenta's letter published at venice in 1602 but the note of Aquaviva prefixed to this edition states that the letter was originally printed in Latin. It would seem, therefore ......that the missionaries originally wrote in Latin," and not in Italian —BEVERIDGE, The District of Bakarganj, Trubner 1876, apendix v iii ; p. 446.

পারেন নাই। ইহাতে তত্রস্থ নৃপতি তাঁহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া ফার্ণাণ্ডেজ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে চাটিগাঁও হইতে সোসাকে চাণ্ডিকানে প্রেরণ করেন। সোসার তথায় পৌছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল, কারণ তিনি পথিমধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। সোসা চাণ্ডিকানে উপস্থিত হইলে সেই স্থানের নৃপতি তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তিনি তাঁহার আতিথ্যের জন্য চাউল, ঘৃত, চিনি, ছাগশিশু পাঠাইয়াছিলেন। তিনি একটি মাত্র ছাগশিশু রাখিয়া আর সমস্ত ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। পাদরীগণ অনেক বেশ্যা ও দুষ্ট লোক দিগকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া অনেক ভারতবাসী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পাদরীগণ বেশ্যাদিগকে রীতিমত বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন। চাণ্ডিকান-পতি তাঁহাদের কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীপুর হইতে পাইমেণ্টার নিকট ফার্ণণ্ডেজ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই (মতান্তরে ১৭ই অথবা ১৯শে) জানুয়ারী তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহা হইতেই সোসার পূর্ব্ববর্ণিত চাণ্ডিকান নগরের বিষয় আমরা জানিতে পারি। ঐ পত্রে তিনি চাণ্ডিকানের বর্ণনা প্রদান উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—চাণ্ডিকান রাজ্যে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়; এই রাজ্য এত বৃহৎ যে ইহার সীমান্ত দেশে যাইতে নৌকাযোগে ১৫।২০ দিন লাগে। এই রাজ্যের অরণ্যানীতে এত প্রভূত পরিমাণে মৌমাছির চাকের মোম পাওয়া যায়, যে তাহা সমস্ত বঙ্গ দেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে বিক্রীত হয়। চাণ্ডিকান Porto Grande (চট্টগ্রাম) এবং Porto Pequeno (বেভারিজের মতে গুলো, Hosten এর মতে কাল্পি) এতদুভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত; সুতরাং এস্থান হইতে বঙ্গের সর্ব্বত্র জল পথে যাওয়ার সুবিধা আছে। এই প্রদেশে সর্ব্বদা জাহাজের গতিবিধি হইয়া থাকে। গুলো হইতে চাণ্ডিকান যাওয়ার রাস্তায় দস্যু তস্করের ভয় ও ব্যাঘ্রের উপদ্রব ছিল।

ফার্ণাণ্ডেজের নির্দেশক্রমে সোসা চাণ্ডিকানে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং তিনি ফার্ণাণ্ডেজকেও চাণ্ডিকানে আগমন করিবার জন্য পত্র প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি চাণ্ডিকান যাত্রা করেন। সোসার ন্যায় তিনিও দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন।

ফার্ণাণ্ডেজ চাণ্ডিকানে উপস্থিত হইলে নৃপতি তাঁহার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তদীয় সভাস্থ জনৈক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করেন। পাদরীগণের সহিত সোমবারে রাজার সহিত সাক্ষাৎ হয়। চাণ্ডিকান পতির সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাঁহাদের অনেক আলাপাদি হইয়াছিল। বহু দেবোপাসক বলিয়া পাদরীগণ হিন্দুদিগকে নিন্দা করায় রাজা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, খৃষ্টানগণ যেরূপ খৃষ্টধর্ম্মের সাধুগণকে Saints পূজা করেন, হিন্দুরাও তেমনি বহু দেব দেবীর উপাসনা করেন। * ফার্ণাণ্ডেজ চাণ্ডিকান হইতে শ্রীপুর গমন করেন, এবং তথা হইতে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে পাইমেণ্টার নিকটে যে লিপি প্রেরণ করেন, তাহাতেই তাঁহার চাণ্ডিকান ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী তারিখে ফন্‌সেকা চাণ্ডিকান হইতে পাইমেণ্টার নিকট যে পত্র লেখেন, তাহাতে তৎপ্রদত্ত চাণ্ডিকানের এবং চাণ্ডিকান যাইবার পথের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। ফন্‌সেকা প্রদত্ত বিবরণ ডু জারিকের গ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। যথাস্থানে তাহা উদ্ধৃত হইবে বলিয়া পুনরুক্তির ভয়ে এস্থানে তাহা উল্লিখিত হইল না। ক্রমশঃ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

---

## গ্রন্থ-সমালোচনা।

**পল্লী**—( কবিতা পুস্তক ) শ্রীদুর্গামোহন কুশারী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী বেলতলি আটপাড়া-ঢাকা। মূল্য সাধারণ ৸৹ আনা। বাঁধাই ১৲ এক টাকা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

---

* Purchas His Pilgrimes নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নে এই অংশ উদ্ধৃত হইল :—

"The king of Chandecan (which lyeth at the mouth of Ganges) caused a Jesuit to rehearse the Decalogue: who when he reproved the Indians for their polytheisme worshipping so many Pagodes: He said that they observed them but as, among them, their saints were worshiped to whom how sanoury the Iesuites distinction of douleia and latreia was for his satisfaction I leave to the Readers judgment.—Purchas His Pilgrimes, Part iv; Book v. p. 512.

নলিনীবাবু ভূমিকায় কবির যে একটি চিত্র পাঠক সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা হইতে এ কাব্যের আভাষ কতকটা পূর্ব্ব হইতেই উপলব্ধি করা যায়। পল্লী-স্নেহময়ী পল্লী-জননীর রস-বিহ্বল চিত্র। সেই রজত ধারার ন্যায় স্নিগ্ধ বিমল জলধারার উচ্ছল সৌন্দর্য্য, বনরাজির শ্যামল-শোভা-সম্পদ, বিহগের মধুর সঙ্গীত-তান, পল্লীবাসীর সুখে দুঃখে ভরা জীবন-বৈচিত্র্য, খেয়া ঘাটের জনতা, পল্লী-বধূর সহজ সরল অনিন্দ্য আড়ম্বর বিহীন জীবন-যাত্রার বিচিত্র চিত্র, মান অভিমান, খোলা মাঠে, খোলা বাতাস,—শস্যে ভরা পল্লী লক্ষ্মীর বিস্রস্ত অঞ্চল—যা কিছু শোভা যা কিছু সম্পদ সবই বিচিত্র নবীন ছন্দের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই এ নির্ম্মল কবিত্ব রসে ভরপুর কাব্য খানা হাতে পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি, বার বার পড়িয়াও যেন সাধ মিটে নাই।

কবিত্ব সম্পদে বাঙ্গালা সাহিত্য অতুল যশৈশ্বর্য্যের অধিকারী। বৈষ্ণব কবিগণের অমৃত-ধারা-প্লাবিত বাঙ্গালা দেশে কবিত্বের অভাব কোথায়? মূল গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কবিতার কথা লইয়া দুইএকটী কথা বলিব। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে কবিতা কল্পনার অভিব্যক্তি 'The expression of the imagination আমরা কবিতা রাজ্যের অধিবাসী, বহি প্রকৃতির সহিত অন্ত প্রকৃতির সংযোগ এবং তাহার মাধুর্য্য আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করি তথাচ তাহা ভাষায় বিকাশ করিতে অক্ষম যিনি সেই মাধুর্য্য, যিনি সেই অপূর্ব্ব সম্পদ ভাষার সাহায্যে বিশ্ব-জনীন ভাবে তৃষিত নরনারীর সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারেন তিনিই কবি। নচেৎ কি নীরব মহা আনন্দে সৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রকৃতির বুকের সে গূঢ় গোপন আনন্দ কথা শুধু

কি যে গেয়ে যায়,
কি যে দিয়ে যায়
উঠায়ে অধীর ছন্দ ;

এ নিরাশার নিদারুণ বাণী অন্তরে উদিত হইয়া অন্তরেই বিলীন হইয়া যায়। সৃষ্টির সহিত আত্মার, আত্মার সহিত সৃষ্টির যে মহা সংযোগ—যে অতিন্দ্রীয় মিলন—আমরা বুঝিয়াও বুঝাইতে পারি না, কেবল ভাবি

'আত্মার সনে দৃঢ় বন্ধনে
জানি সে কেমনে বদ্ধ' !

দুর্গামোহন বাণী-মন্দির-দ্বারে সে মহা সিদ্ধির জন্য ভক্ত সাধক রূপে উপস্থিত হইয়াছেন। মহা আনন্দের ক্ষীণ আভাষ পাইয়া বলিয়াছেন—

আকুল করিয়া আনন্দ আসে,
তোরে খুঁজে নিতে হবে না।

এ কবির কবিতায় আগাগোড়া একটা আনন্দ ও প্রীতির আভাষ জাগিয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব মিলনের জন্য ব্যাকুল চিত্তে বলিতেছেন,—
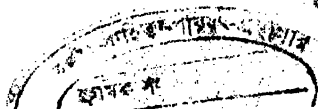
কোথায় কে যে ডাক্‌ছে মোরে
বুঝ্‌তে নাহি পারি ;—
কোন্ তটিনী, কোন্ পারাবার,
কোন্ সে মাঠের এপার ওপার,
কোন্ পাহাড়ের ধ্যানের টানে
স্থির রহিতে নারি।

আবার—

ইচ্ছা করে, আকাশ-বাতাস—
আঁধার-আলো হ'য়ে
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ভ'রে
ছড়িয়ে থাকি সবার তরে,—
নিঃশেষেতে মজ্‌তে চাহি
বিশ্ব-পরাণ ল'য়ে।

কবির প্রধান কার্য্য আনন্দ সৃষ্টি। যিনি সেই আনন্দ দান করিতে পারেন, ভাবে ভাষার ছন্দে তাহার বিকাশ করিতে পারেন তিনিই কবি। সে বিষয়ে আমাদের কবি সিদ্ধ হস্ত। তাঁহার কবিতায় বিশ্ব-বীণার আনন্দ সঙ্গীত ঝঙ্কৃত। যেখানে পল্লীর কথা সেখানেই তাহার ভাষা মূর্ত্তিমতী 'শীত-প্রভাতে' দেখিতে পাইতেছি,—

গোময়-লেপা চক্ চকে সে স্নিগ্ধ আঙ্গিনাতে,
মেয়েরা দেয় ডালের বড়ি মান কচুর পাতাতে।
তুলসী তলা দাঁড়িয়ে আছে নবীন বধূ দুটী,
মাথার উপর দাড়িম ডালে ফুল রয়েছে ফুটি।
* * * * *
খিড়কী দ্বারে রোদ এসেছে বধুটি একেলা
ভেসে আস্‌ছে বোসের বাড়ীর 'লাউল্' ঠাকুরের ভেলা।
সর্ষে ক্ষেতে ফুল ফুটেছে আগুণ লাগ্‌ছে মাঠে!
শাক্ তুলিয়ে দিদি নাত্‌নী 'টোপর' ভরে হাটে,
'খাটার' পুকুর চা'র পারে তা'র দুল্‌ছে গাঁদাফুল
গন্ধে তাহার কবির মানস করেছে আকুল।

আবার,—

কোথা মাঁদার গাছের ফাঁক দিয়ে সে কালো ডোবার জল,
সেথা আপন মনে করছে খেলা বন-বিহগের দল,

কোথা ডাহুক পাখীর ছেলে মেয়ে বেড়ায় নেচে নেচে,
ছুটে মাতা ওদের সাথে সাথে. পিতা ওদের পিছে;
কোথা নলের বনে পাখী যুগল করছে প্রেমালাপ
দুটী কৌড়াল বসে তরুর শিরে করছেরে আলাপ।
কোথা টুন্‌টুনিরা ঝোপে ঝাড়ে করছে ফিস্ ফিস্,
কোথা দোয়েলেরা গাবের শাখার দিচ্ছে বসে শিষ।

ইত্যাদি!

আমরা এই নবীন কবির কবিত্ব সম্পদে আশান্বিত হইয়াছি। আশাকরি ইনি অবহিত চিত্তে বাণীর সাধনা করিয়া বঙ্গ-কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী স্থায়ী আসন লাভ করিবেন। গ্রন্থ মধ্যে মোট ৪১ টী কবিতা আছে। ভাল এণ্টিক কাগজে সুন্দর করিয়া ছাপা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট একাব্যের যথেষ্ট আদর হইবে।

**ব্রতকথা**—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীহরিরাম ধর, বি, এ, পপুলার লাইব্রেরী ঢাকা। গ্রন্থ মধ্যে কোথাও মূল্যের উল্লেখ দেখিলাম না। ডবল ক্রাউন ১২৮ পৃষ্ঠা। সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই ও সোণার জলে নাম লেখা। ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

গ্রন্থকার বালিকা ও রমণীগণের চির প্রচলিত পনেরটী ব্রতকথা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তা ছাড়া শনির পূজা, সত্যনারায়ণ পূজা ও তাঁহার পাঁচালীও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্রতকথার কোন কোনটী বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত ব্রতকথা হইতে একটু স্বতন্ত্ররকমের, স্থান বিশেষে এইরূপ প্রভেদ বিচিত্র নহে।

মাঘ মণ্ডলের ব্রতকথার ছড়ার সহিত বিক্রমপুর অঞ্চলের ছড়ার অনেকটা বিভিন্নতা দেখিলাম। অন্ততঃ, 'উঠ উঠ সূর্য্য দেব ঝিকি মিকি দিয়া' এই সুন্দর সুদীর্ঘ ছড়ার উল্লেখ লেখক কোথাও করেন নাই। বোধ হয় ময়মনসিংহ-অঞ্চলে উহার প্রচলন নাই।

ব্রতকথার ভাষা বেশ সহজ হইয়াছে; বৃদ্ধ-মহিলাগণের কথিত ভাষা লেখক একরূপ অবিকৃত রাখিয়া অতি সুন্দর ভাবে জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন।

ব্রতকথার শেষে মঙ্গলচণ্ডী, শনির পাঁচালী ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী উদ্ধৃত হইয়াছে। মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী ও শনির পাঁচালী কোন্ প্রাচীন কবির স্মৃতি বহন করিতেছে গ্রন্থমধ্যে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

সত্যনারায়ণের পাঁচালীর মাঝে মাঝে ভণিতায় দেখিলাম :—

দ্বিজ রামকৃষ্ণ কহে শুনে সর্ব্বজন।

এই দ্বিজ রামকৃষ্ণ কে? কোথায় বসতি? পুঁথিখানা কতদিনের প্রাচীন অন্ততঃ পরিশিষ্টে তাহার উল্লেখ করিলে ভাল হইত।

আমাদের নিকট দ্বিজ রামকৃষ্ণ বিরচিত একখানা অমুদ্রিত ৺সত্যনারায়ণের পাঁচালী আছে তাহার কবিত্ব সমৃদ্ধি উপেক্ষনীয় নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ঐ গ্রন্থ খানার মুদ্রাঙ্কনের

ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। বিক্রমপুরের প্রায় প্রতিগ্রামেই এ দ্বিজ রামকৃষ্ণের পাঁচালী পঠিত হইয়া থাকে। এই রামকৃষ্ণের বাড়ী ছিল বিক্রমপুরে। নরেন্দ্র বাবু যে পাঁচালী উদ্ধৃত করিয়াছেন উহার লেখক দ্বিজ রামকৃষ্ণের পরিচয় দিলে আলোচনার একটু সুযোগ হইত। এবং একই পুঁথি নানা স্থানে প্রচারিত ও পঠিত হইতেছে কিনা তাহাও বুঝিবার সুবিধা হইত। আশাকরি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে পাঁচালী লেখকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। উহাতে প্রাচীন কবিগণের পরিচয়ের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা দিক্ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

গ্রন্থের ছবি গুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে। গার্হস্থ্য জীবনের উপর এই ব্রতকথা গুলি যে একটী অসীম শক্তি বিস্তার করিয়া আছে, একথা কয়টী অতি খাঁটি। বর্ত্তমান বিলাসিতার দিনে মেয়েদিগকে ননীর পুতুল না গড়িয়া যাহারা প্রকৃত সুগৃহিনী করিতে চাহেন তাহারা নিশ্চয়ই এ গ্রন্থের আদর করিবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি! শিক্ষিতা রমণীগণের করকমলে এই গ্রন্থ দেখিতে পাইলে সুখী হইব।

# বিক্রমপুর সম্মিলনী কর্ত্তৃক

## বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের

### অভ্যর্থনা-উপলক্ষে—

আপনার রত্নরাজি শ্রীচরণে বঙ্গজননীর
রত্নাকর বঙ্গোপসাগর
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি নিঃশেষেতে ঢালিয়াছে যেথা
—ভক্তি ভরে অঙ্গ থর থর্;
সেথা হ'ল মহাপীঠ, মহাস্বর্গ হইল সৃজিত
আনন্দিত ত্রিদিবের সুর
যোজন ব্যাপিত সেই রত্নরাজি হইল প্রদেশ
ধরা-ধন্য "বিক্রমের পুর"!
পূজাশেষে রত্নাকর দূরে আছে দাঁড়াইয়া আজি,
সাম গান গাহে নিশিদিন

প্রেমে হাসে, প্রেমে কাঁদে, প্রেমে লুটে, প্রেমে করে আহা
সংকীর্ত্তন বিরাম বিহীন।
সে "বিক্রমপুর" আজি বঙ্গ-মাতা-চরণ-পরশে
জড় অঙ্গে লভিয়া জীবন
দাঁড়ায়েছে মাতৃমূর্ত্তী লক্ষশত রত্ন প্রসবিনী
ধন্য আহা করি ত্রিভুবন।
কত জড়, কত জীব—সুসন্তান, মরি, জননীর
দাঁড়ায়েছে অঞ্চল ধরিয়া
কত গ্রাম, উপগ্রাম, কত বন, উপবন আদি
নদী, মাঠ রয়েছে পড়িয়া।
কত খাল, কত বিল, পুষ্করিণী, দীঘি শত শত
কত রাজ্য রাজধানী আর
বাজার, বন্দর কত, রাজপথ সুষুপ্ত নগর
শোভিতেছে চৌদিকে মাতার।
বিহগ কূজিত পল্লী, কুসুমিত কত ঝোপ ঝাঁড়
ফল-নত বৃক্ষলতা আদি
বিরাজিছে থরে থরে—সহোদর সহোদরা তারা
তার তরে প্রেমে কত কাঁদি।
হের চরণের তলে, হের কোলে, হের বুকে মার
হের পাশে, অঞ্চলের ছায়
কত শত নর নারী স্বরগের দেব দেবীসম
হাসে খেলে, কত নাচে গায়।
কত জ্ঞানী, কত গুণী, ভক্ত, যোগী, ধর্ম্মপ্রাণ, ধ্যানী
বৈজ্ঞানিক দার্শনিক কত
কত কবি, সুলেখক, সুপণ্ডিত, শাস্ত্রবিদ্, মুনী,
জ্ঞান অনুশীলনে নিরত।
রাজনীতি-বিশারদ কত রাজ-প্রতিনিধি গণ
সুবিচারে শিষ্টের পালনে,

দুষ্টের দমনে করে নিরাপদ শান্তিময় ধরা
ধন্য ধন্য করে দেব গণে।
কত সিদ্ধ, জপরত, সঙ্গীতজ্ঞ বাউল, ফকির
প্রেমময় হৃদয় বৈষ্ণব
ধর্ম্মবীর শাক্ত কত ধর্ম্মতেজ পূর্ণ মন প্রাণ
তুচ্ছ করে বিষয় বৈভব।
বৈশ্য কত রত্নাকরী কমলার অঞ্চলের নিধি
এক নিষ্ঠ ধনের সাধনে
মেঘ-চুম্বি তুলে সৌধ, বাষ্পযান অর্ণবে ভাসায়,
দেশ-হিত-ব্রত মনে মনে।

৩

ফলে জলে মাতৃস্তনে স্তন্য পিয়ে দেশ জননীর
তার মাটি-ক্রোড়ে পেয়ে স্থান
পিতা-মাতা-ভাই-বোন-বন্ধু-প্রেমে লভিয়া মরম,
বাতাসের তেজে পেয়ে প্রাণ ;
অনন্ত সে আকাশের নির্ম্মলতা, উদারতা, আর
শান্তোজ্জ্বল সুনিলীমা থেকে
লভিয়া হৃদয় সবে সহোদর সহোদরা যত
সৃষ্ট পুষ্ট আমরা প্রত্যেকে।
বয়োপ্রাপ্ত হয়ে আজি জননীর লইয়া অভয়
অঙ্গ ঢাকি দুর্ভেদ্য বর্ম্মেতে,
লয়েবর ব্রহ্ম-অস্ত্র, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমরে
বিশ্বে আজি ছুটি যেতে যেতে।
সাধনা রণের ঐ আমাদের মহা সেনাপতি
জ্ঞান-অস্ত্রে দিক্‌বিজয়ী বীর
বিশ্ব করিজয় আজি স্ফীত বক্ষে, উন্নত মস্তকে
ফিরিয়াছে আপন শিবির।

আজি গাহ জয় তাঁর, কর আজি আনন্দ-উৎসব
গাহ জয় "জগদীশ" জয়,
সাজাও সাজাও তাঁর বর অঙ্গ সুগন্ধ কুসুমে
অঙ্গ তাঁর কর পুষ্পময়।
শারদ গগন আজি বরিষণ করহ চন্দন
পুষ্পবৃষ্টি কর দেব বালা,
মলয় হিল্লোলে আজি প্রবাহিত হওরে পবন
দিগাঙ্গনা দেহ জয়-মালা।
জগদীশ! "জগদীশে" কর, কর আশীর্ব্বাদ, তারে
শত বর্ষ দেহ পরমায়ু।
রহতাঁর সাথে সাথে, পূর্ণ শক্তি পূর্ণ কর তার
আত্মাদেহ অস্থি মজ্জা স্নায়ু।
'বিক্রমপুরে'র প্রাণ—গুণনিধি স্নেহের দুলাল
জননীর অঞ্চলের ধন,
বঙ্গের মুকুট-মণি ভারতের জ্ঞান-প্রভাকর
জগতের দেবতা রতন।
প্রজ্ঞান-বিজ্ঞান-ঘন আত্মা তব বুদ্ধি, প্রাণ, মন
ঋষি, যোগী, ত্যাগী ও তাপস
তৃতীয় নয়ন তুমি জগতের ফুটাইলে, সবে
জড়ে প্রাণ করিল দরশ।
জগতের চীৎ শক্তি, কর তুমি উদ্বোধন তার
কর তপ তুমি তপোধন
অজ্ঞান-আঁধার-রাতি ভারতের করহ প্রভাত
কর যোগী কর প্রাণ পণ।
ভ্রাতাতব সহোদর কোটী কোটী, তব মুখ পানে
চেয়ে আছে দীন আঁখি মেলে
তপোবল দেহ সবে, মনুষ্যত্ব, দেবত্ব লভিবে
তারা সবে তব দান পেলে।

কি করিব নিবেদন, দীনকবি কি কহিবে আর
তোমা আজি করি আলিঙ্গন
ধন্য তব দেশ ভ্রাতা, ধন্য তব জন্মভূমি, আর
ধন্য এই "সান্ধ্য-সম্মিলন"।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

২

# সঙ্গীত।

কথা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত    সুর-সঙ্গীতাচার্য্য—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

তোমারি গরবে গরবী আমরা তোমারি মানে মানী,
মেঘনার কল-কল্লোল-নাদে তোমারি কীর্ত্তি-বাণী!
জড়ের জীবনে কি গোপন কথা,
বিটপীর কাণে কি যে কহে লতা
কেন হাসে ফুল পুলকে আকুল জান সে নিগূঢ় বাণী!
ঋষিদের বাণী নবীন ছন্দে,
জাগায়ে তুলিলে মুরজ মন্ত্রে
এক প্রাণ খেলে বিশ্ব-নিখিলে এক সুরে বাঁধা প্রাণী!
দিগ দিগন্তে উজলিয়া যশে
এসেছ হে সুধী ফিরি নিজদেশে
কণ্ঠে জয় মাল্য সৌরভ-বিভোর ( ওহে ) স্বদেশ-ভূষণ-মণি।
মিলিয়াছি আজি আমরা হেথায়
প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পিতে তোমায়
তুমি আমাদের,—আমরা তোমার—অতুল গৌরব গণি!
জয় জগদীশ! রাখ জগদীশে
সুখে স্বাস্থ্যে সদা স্বদেশে বিদেশে।
নাচিছে পদ্মা শত তরঙ্গে বহিয়া সুযশ-কাহিনী।
জয় জন্মভূমি বিক্রমপুর! জয় জগদীশ-জননী!

# বাঙ্গালা দেশে পাটের চাষ।

বলিতে গেলে ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু বাঙ্গলা দেশই পাটের চাষের একমাত্র কেন্দ্র স্থান। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এই কার্য্যের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। এবং ইংরাজ গভমেণ্টই

সর্ব্বপ্রথম এই কার্য্যে মনোযোগী হন। তখন অল্প কয়েক মন মাত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে প্রতি বৎসর পাটের চাষ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতে লাগিল; বর্ত্তমানে ইহা এখন পৃথিবীর মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্যের উপকরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ টাকার পাট প্রতি বৎসর বিদেশে চালান হইতেছে। ইহা ব্যতীত বহু পরিমাণ পাট ভারতীয় মিল সমুদায় হইতে ক্রীত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা ছালা, দড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। উপরন্তু অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য ও ইহাদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

## বীজ বপন।

এখন বীজ বপন হইতে আরম্ভ করিয়া পাট প্রস্তুত হইয়া বাজার চালান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশের কৃষকেরা কিরূপ প্রণালীতে কার্য্য করে তাহাই বলিব দেশের প্রত্যেক বিভাগে এই জিনিষের আবাদ একই ভাবে হইয়া থাকে। পাটের বীজ বপনের জন্য জমী প্রস্তুত শ্রীপঞ্চমীর পর হইতে অর্থাৎ ইংরাজী বৎসরের ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চের মধ্যে আরম্ভ হয়। তখন নূতন বৎসরের জন্য পাট বপন আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ ফাল্গুন বা মার্চ্চ মাসেই কার্য্য আরম্ভ হয়। সেই সময়কার বীজ বপন কে "ফাল্গুনী" বলে। আবার অনেক সময় বৈশাখ বা জুন মাসে ও বীজ বপন করা হয়। ইহাকে "বৈশাখী" বলে। ইহা জমীর অবস্থিতি এবং বৃষ্টির অবস্থার তারতম্যানুসারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিঘা বা একারে প্রায় চারসের করিয়া বীজ বপন করা হয়। হস্তদ্বারা বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতে হয়। ইহাই হইল "বীজ-বপন"। সাধারণতঃ দেশী বীজ বপন করা হয় কিন্তু অনেক স্থানে সিরাজগঞ্জের বীজ ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেশী বীজ নীচু জমিতে এবং সিরাজগঞ্জের বীজ উঁচু জমীতে বপন করা হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। যখন চারা গুলি প্রায় পাঁচ ছয় ইঞ্চি বড় হয় তখন "বাছাই" কার্য্য আরম্ভ হয় অর্থাৎ জমীর মধ্য হইতে আগাছা এবং জঙ্গল পরিষ্কার কিংবা চারাগুলি ঘন হইয়া উঠিলে মধ্যে মধ্যে তাহা উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে অন্যান্য চারাগুলি বেশ সতেজ হইয়া উঠিবার অবসর পায়। এই সময় যদি বৃষ্টি হয় তবে গাছগুলি তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে এবং আশাতীত ফল লাভ হয়। যখন ফুল ফুটিয়া গাছে বীজ হইতে আরম্ভ করে তখন পাট কাটা আরম্ভ হয়। ইহা প্রায়ই শ্রাবণ বা ভাদ্র (আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর) মাস হইতে আরম্ভ হয়। যদি গাছগুলি একটু শীঘ্র শীঘ্র কাটান যায় তবে জিনিষ অল্প পাওয়া যায় বটে কিন্তু পাটগুলি অত্যন্ত সাদা এবং উজ্জ্বল হয়। আর দেরীতে কাটিলে পাটগুলি ভারী এবং উজ্জ্বলতা হীন হয়।

## পাট কাটা এবং তাহার পরের কাজ।

পাট কাটার পর কৃষকেরা ঐ গুলি আঁটি বাঁধিয়া ২।৩ দিন মাঠেই রাখিয়া দেয়। শুধু পাতাগুলি ঝরিয়া যাইবার জন্যই ঐরূপ করা হয়। তারপর গাছগুলির মাথা একফুট

আন্দাজ কাটিয়া আঁটিগুলি নিকটবর্ত্তী কোন খাল কিংবা ঝিলে লইয়া যায়। সেখানে ষোলটি করিয়া আঁটি একত্র বাঁধা হয়। সহজ ভাবে গুনিবার জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এইরূপ বাঁধা হইবার পর আঁটিগুলিকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হয়। এইরূপ রাখিলে পর গাছগুলি পচিয়া যায়। পরিষ্কার জলেই ভিজান ভাল, কারণ তাহাতে পাটগুলি বেশ পরিষ্কার এবং একটু হল্‌দে আভাযুক্ত হয়। কিন্তু ইহাতে অত্যন্ত বেশী সময় যায়। আর যে কৃষক একটু কম খাটিতে চায় কিম্বা বেশী সময় এবং অর্থ ব্যয় করিতে নারাজ হয় সে আঁটিগুলি কোন অপরিষ্কৃত ডোবা, নালা কিংবা রেলপথের পার্শ্বস্থ বৃহৎ খানা ইত্যাদিতে ডুবাইয়া রাখে। কিন্তু ইহাতে পাট খারাপ হয়।

১০।১৫ দিন এইরূপে ডুবাইয়া রাখিবার পর যখন কৃষকেরা দেখিতে পায় যে গাছের বাকল গুলি এত নরম হইয়াছে যে আঙ্গুল দিয়া টানিলেই উহা উঠিয়া আসে তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে "পাট ভিজান" ঠিক হইয়াছে এবার উহা উঠাইয়া ফেলিবার সময় হইয়াছে। তখন তাহারা ডাঁটা হইতে বাকল ছাড়াইয়া লইতে আরম্ভ করে এবং ডাঁটা গুলি একধারে ফেলিয়া রাখে। ডাঁটাগুলি শুকাইলে পরে "খড়ি শলা বা পাঁকাটি রূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে সমস্ত বাকল গুলি ছাড়াইয়া লইয়া জলের মধ্যে সে গুলি উলট পালট করিয়া ধুইতে আরম্ভ করে। কিয়ৎক্ষণ পরেই সমস্ত ময়লা বাহির হইয়া যায়। তারপর সেইগুলি হইতে জল নিংড়াইয়া এক একটি গোলাকার পিণ্ড করিয়া সাজাইয়া রাখে। এইরূপে সমস্ত বাকলগুলি ধোওয়া হয়। প্রায় ষোলটি আঁটির বাকলে আধমণ শুকনো পাট হয়। এবং গড়ে প্রতি বিঘা বা একারে দশমণ করিয়া পাট পাওয়া যায়।

## দিন মজুর ও তাহার মাহিয়ানা।

কৃষকেরা উপরোক্ত কার্য্যের জন্য যে সমস্ত লোক নিযুক্ত করে তাহাদিগের এক একজনকে দৈনিক তিন আনা করিয়া দেয়। স্ত্রী লোকেরা শুধু ডাঁটা হইতে বাকল ছাড়াইবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। এই কাজ যে খুবই শ্রমজনক তাহার সন্দেহ নাই। উপরোক্ত হারে লোক বেশী পাওয়া যায়না অথচ কাজের ও ক্ষতি হয় কাজেই কৃষকেরা তাহাদের নিযুক্ত লোকগুলির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে। তাহাদের সঙ্গে চুক্তি হয় যে প্রতি আঁটিতে তাহারা এক পয়সা করিয়া পাইবে। ইহাতে দুইপক্ষেরই সুবিধা হয়। কাজটি যদিও শ্রমজনক কিন্তু যে খুব পরিশ্রমী সে অনায়াসেই সন্ধ্যার মধ্যে বত্রিশ আঁটি ধুইয়া ৷৷০ আনা পয়সা রোজগার করিতে পারে। এবং অন্যদিকে পাটও প্রায় ডবল ধোওয়া হয়। পাট ধোওয়া হইলে পর বাঁশ টাঙ্গাইয়া উহার উপর পাট ছড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয়। খুব ভাল করিয়া শুকাইলে পর কৃষকেরা পাট ওজন করে। এক মণ করিয়া গাটরী বান্ধা হয়। তারপর তাহারা গাড়ী করিয়া বাজারে কিংবা নৌকা করিয়া বড় বড় কোম্পানীর এজেন্টদের নিকট বিক্রয় করিতে লইয়া যায়। ইহা বেশ লাভ জনক ব্যবসা।

শ্রীযামিনীমোহন সেন।

# বিক্রমপুর

| তৃতীয় বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩২২ | ৭ম সংখ্যা |
|---|---|---|

## বিক্রমপুর

নমো বিক্রমপুর !
অয়ি বঙ্গের মুকুট শীর্ষে
উজ্জ্বল কহিনুর ।
পদ্মা-মেঘনা-কল্লোলে যা'র
স্তন্যের ধারা বহে অনিবার
চঞ্চল চারু শস্য-শ্যামল
অঞ্চল সুমধুর
নমো বিক্রমপুর !

নমো গৌরবময়ি !
নমো বল্লাল-জননী ধন্যা
কেদার-ধাত্রী অয়ি !
চাঁদ-চন্দ্রিকা ভালে ঝলমল
রাজবল্লভ-কীর্ত্তি উজল
অতুলিত বীর-বীর্য্যে যাহার
সন্তান চিরজয়ী
নমো গৌরব ময়ি !

নমো বিজ্ঞানরাণি!
চরণে যাঁহার নমিছে বিশ্ব
ধন্য আপনা মানি'
কবি-কন্যার বীণা ঝঙ্কার
পশ্চিম আজি মুখরে যাহার
যমুনার নীল উর্ম্মি লীলায়
কল্লোলে যার বাণী
নমো বিজ্ঞানরাণি!

নমো চির মনোরমা!
পল্লববন শ্যামনিকুঞ্জে
বিশ্ব-মোহিনী ওমা!
নির্ম্মল নভঃ স্নিগ্ধ উজল
হরিত স্বর্ণে পূর্ণ আঁচল
অয়ি শোভাময়ী জননী আমার
কল্যাণী নিরুপমা
নমো চির মনোরমা!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

---

# নৈমিষারণ্য

প্রাচীন ভারতবর্ষে তপোবনের নির্জ্জনতা মানব বুদ্ধিতে এমন একটি অপূর্ব্ব শক্তি দান করিয়াছিল যে, সেই পুণ্যাশ্রমের সভ্যতার ধারা সমগ্র ভারতবর্ষকে আজিও অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের স্মৃতি, শ্রুতি ও পুরাণে যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র সমস্তই প্রাচীন নৈমিষা-

রণ্যের স্মৃতির সহিত জড়িত। এই তপোভূমি নৈমিষারণ্যেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের হৃদয়ে উপনিষদ্ বর্ণিত পরমাত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহারা—

স্বদেহং অরনিং-কৃত্বা
প্রণবঞ্চো ওরাবণিং।
ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্
দেক্ পশ্যেন্নিগূঢ়কং॥

কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নির ন্যায়, দুগ্ধে নবনীতের ন্যায়, নবনীতে ঘৃতের ন্যায়, সর্ব্বজীবে অপ্রকাশ ভাবে অবহিত পরপ্রাণকে ধ্যানরূপ মন্থন দ্বারা স্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এখান হইতে সনাতন ধর্ম্মের তত্ত্ব নিচয় যোগবলে নির্ম্মিত হইত এবং মানবজীবের মঙ্গলের জন্য আর্য্য ঋষিগণ সকলে মিলিয়া সেই তত্ত্ব মানব সমাজে প্রকৃত অধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতেন। পূর্ব্বে এই তপোভূমি গোমতী তীরে এই বিস্তীর্ণ বন্ধুর আম্রকাননে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে এই স্থান 'নিমশার' নামে পরিচিত। ইহা যুক্ত প্রদেশের সীতাপুর জিলায় অবস্থিত। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে এখানে একটি বড় মেলা জমিয়া থাকে।

'বৃন্দাবনের ন্যায় এখানেও ৮৪ ক্রোশ পরিক্রম করিতে হয়। নিজ নিমখারে চক্রতীর্থ, ব্যাস গদি, পুরাণ বক্তা সুতের মন্দির, পাণ্ডবগড়, ললিতা দেবীর মন্দির প্রভৃতি অতীতের সাক্ষীস্বরূপ অনেক দর্শনীয় স্থান আছে এখান হইতে চারিক্রোশ দূরে দধীচি মুনির স্থান 'মিশরিখ' বা 'মিশ্রতীর্থ' 'হত্যাহরণ' আর একটী তীর্থ। * * * নৈমিষারণ্যে আসিবার তিনটী পথ আছে :-(১) আউদ রোহিলখণ্ড রেলওয়ে শান্তিলা ষ্টেশন হইতে গরুর গাড়ীতে হত্যাহরণ গিয়া ১৩।১৪ ক্রোশ কাঁচাবাঁধা রাস্তা; (২) ঐ ষ্টেসনের বাঘৌলী ষ্টেশন হইতে এক্কা করিয়া ৮ ক্রোশ ভাল পাকা রাস্তা; (৩) রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন রেলওয়ের সীতাপুর হইতে ডুলী করিয়া দশ ক্রোশ কাঁচা বাঁধা রাস্তা।

* ধর্ম্মপ্রচারক ১৮২৫ শত, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ৯৬ পৃষ্ঠা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

# বিক্রমপুরের "ভুল উড়ান"

বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তি দিবস 'ভুল উড়ান' উৎসব হইয়া থাকে। 'ভুল উড়ান' ব্যাপারটী আর কিছুই নয়, কেবল একটি ক্ষুদ্র বংশদণ্ডকে দ্বিভূজাকৃতি করতঃ উহাকে খর কুটাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মশা, মাছি এবং ইচা (চিংড়িং) ও বৈচা মৎস্যের মুড়া প্রভৃতি উহার মধ্যে বাঁধিয়া সংক্রান্তির দিবস সন্ধ্যার সময় অগ্নি-সংযোগ পূর্ব্বক প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীর চারিদিক ঘুরাইয়া উত্তর দিকে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলিয়া দেয়। উক্ত 'ভুল উড়ানের' সময় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা শঙ্খ, কাঁশি, কুলা, ভগ্নটিন, খোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহকারে এক প্রকার 'ছড়া' গাহিয়া থাকে। ছড়াটী এই—

"ধান চাউল গড়া গড়ি
খৈলূশা পুঁটি চৌদ্দ বুড়ি
মশা যায় মাছি আসে
ঘরে ঘরে লক্ষ্মী বসে
ইচার মুড়া বইচার মুড়া
ভুল যায় উত্তর মোরা।"

ভুল উড়াইবার পূর্ব্বে যে সকল অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করা থাকে তাহা পরে ভক্ষণ করা নিষেধ। কারণ ভুলা হাঁড়ির ভাত খাইলে শরীর অপবিত্র হয়।

বলাবাহুল্য—উক্ত উৎসবটী কেবল মাত্র বিক্রমপুরের প্রত্যেক হিন্দু বাড়ীতেই হইয়া থাকে।

বিক্রমপুরের এই উৎসবের ন্যায় যশোহর প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির দিবস 'বুড়ির ঘর' নামক উৎসব হয়।

এরূপ ভুল উড়ানের উদ্দেশ্য কি? এবং কতকাল যাবত এপ্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রকৃত বিবরণ এখন পর্য্যন্ত সম্যকরূপে জানা যায় নাই। কেহ বলেন—ভুল উড়াইয়া লোকের ভুল-ভ্রান্তি নিবারণ করা হয়। কেহ

বলেন—ধান চাউলের শ্রীবৃদ্ধি সাধনই ভুল উড়ানের উদ্দেশ্য। কেহ বলেন—যাহাতে প্রচুর মৎস্য জন্মে সেই উদ্দেশ্যেই ভুল উড়ান হয়। কেহ বলেন—যাহাতে লক্ষ্মী অচলা হইয়া গৃহে থাকেন সেই উদ্দেশ্যে ভুল উড়ান হয়। কেহ বলেন—মশক বংশ ধ্বংশ করিবার জন্যই ভুল উড়ান প্রথা চলিয়া আসিতেছে। সাধারণতঃ মশা হইতেই ম্যালেরিয়া জ্বরের সৃষ্টি এবং বর্ষান্তেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং বর্ষান্তে শারদীয় উৎসবের পরলোকে ভুল উড়াইয়া থাকে।

বিক্রমপুর অঞ্চলে মশক উৎপত্তির যে একটা জনপ্রবাদ আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করা গেল –

এক ধীবর প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় ঘুমাইত, একারণে মাছ ধরিতে যাওয়া তাহার প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না। সুতরাং তাহার দরিদ্রতারও একশেষ ছিল। একদিন সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিবার মানসে নদীর পাড়ে যাইতে ছিল, এমন সময় "পার্ব্বতী" এক বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"বাছা তুমি কোথায় যাইতেছ ?"

ধীবর উত্তর করিল—"তাহা তোমার নিকট বলিলে আর কি হইবে ? আমার দুঃখ নিবারণ করিবার ক্ষমতা তোমার নাইত !"

বৃদ্ধা—"আচ্ছা বাবা, তুমি একবার বলই না কেন ?"

ধীবর—"আমি প্রত্যহ রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়ি, সুতরাং আর মাছ ধরিতে যাইতে পারিনা। একারণে অন্নাভাবে আমার স্ত্রীপুত্র মৃতপ্রায় হইয়াছে। আমি তাহাদের দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিনা—তাই নদীতে ডুবিয়া ভবের সকল জ্বালা এড়াইব মনে করিয়াছি।"

বৃদ্ধা—"তোমাকে ডুবিতে হইবে না, আমি তোমার নিদ্রাভঙ্গের ঔষধ দিতেছি।"—অতঃপর পার্ব্বতী নিজ গাত্র হইতে একটু ময়লা তুলিয়া বড়ি পাকাইয়া একটা কচুপাতায় করিয়া বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন—"এই ঔষধটা লইয়া যাও, এখন খুলিওনা। রাত্রে আহার করিয়া ঘরের মধ্যে খুলিও।"

ধীবর তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। পরে রাত্রিতে আহার করিয়া, পাতার মুখ খুলিতেই সেই ময়লাটুকু মশা হইয়া উড়িয়া

গেল। ক্রমে ক্রমে সেই হইতেই মশার বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং রাত্রি হইলেই ধীবরের শরীরের রক্ত শোষণ করিতে উপস্থিত হইত। ধীবর মশার হুলের বিষে আর রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিত না। সেই অবধি তাহার মাছ ধরিবার ব্যাঘাত ঘুচিল। তাহার অবস্থা ফিরিল। ইহাতেই মশকের উৎপত্তি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

# বিক্রমপুরের শব্দ-সম্পদ (২)

পাঁচল—কলার পাট।

পাখাল—পতিত। যথা—পাখাল জমি।

বাতা—কিনারা। যথা—চালের বাতা।

বাইচ্—ক্ষীপ্রবেগে নৌকা চালনা।

বাঐল—মোড়; মোচড়।

লোস্তা—লোণা; লবণাক্ত।

লাপ্সি-গাপ্সি—মোটা সোটা।

আবুর-চুবুর—ডুবুডুবু।

খেরৎ—ক্ষতি; আঘাত।

খেজালত—কষ্ট।

হরবরি } ফাজিলামি;—অক্ষম অথচ
ফরফরি }

সর্ব্বকর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করিয়া সাবাসিকতা প্রদর্শনের ব্যর্থ প্রয়াস

লোট—যাহাতে ধান ভানা হয়।

চিকনি—'মোত্রা' নির্ম্মিত চাটাই।

নেইল
নেউল } বাঁশের পাত্লা চটা; ইহা সদ্যপ্রসূত সন্তানের নাড়ী ছেদনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

নৈসা—নসু; খোকা, শিশু।

বাঁশী—অপরিচিত বালককে "বাঁশী"
সম্বোধন করা হয়। যথা,
'বাঁশীরে, একটু পার করবি?'

ছেমড়ি
ছেড়ি } ছুড়ি, বালিকা (তুচ্ছার্থে)

কাইলা করা—কালোমেঘ সাজা।

যথা,—

কাইলা করছেরে—
উঠানেতে ধান,
ছেমড়ি গেছে বাপের বাড়ী,
চুলে ধইরা আন।

কাছা—কচ্ছ।

কাম—কর্ম্ম।

বাওয়ার—বাদাম; পাল; বাতাস।

কাতলা—ঢেকির যূপ-কাষ্ঠাকার অবলম্বন বিশেষ।

কাস্তি—স্তম্ভের ঊর্দ্ধতম অংশ চালের পাইরের সঙ্গে মিশাইবার জন্য কর্ত্তিত স্থান।

আইলান—ঢেঁকিদ্বারা ধান ভানার সময় 'লোট' মধ্যস্থ ধান্য উলট্ পালট্ করিয়া দেওয়া।

কাঁড়ান—চাউল হইতে কুঁড়া ছাড়ান।

খোজ দেওয়া—মেরামত করা।

গুয়া—সুপারী, গুবাক্।

গইন্—গভীর।

মাইয়া—মেয়ে, কন্যা।

মন্যি—অভিশাপ।

গাপুর গুপুর—ঘুষির শব্দ ; দুগ্ধ দোহন-শব্দ।

যথা,—

গাপুর গুপুর গাপুর গুপুর
দুধেভরে হাঁড়ি,
এই দুধ যাইব আমার
সোনার শশুর বাড়ী।

গেলাম—যাইলাম। যথা,

কত দেখন দেখ্লাম,
দেখ্তে দেখ্তে তল গেলাম।

ক্ষ্যাণ, ক্ষণ—ক্ষ্যাণ পীরিতের ঘর—

ক্ষ্যাণে হয় মাথা ব্যথা,
ক্ষ্যাণে হয় জ্বর।

পরণে—পরিধানে।

ত্যানা—নেকড়া ; ছেঁড়াকাপড়।

বৌর পরণে ত্যানা খান,
ধাইর পরণে শাড়ী।

কাঁথা—কন্থা।

শীত! শীত! শীত!—
কাঁথাওয়ালার গুণ্ গুণি,
জামাওয়ালার গীত।

টাইনা—টানিয়া। যথা,—

লতার উপুর দিয়া লতা গেছে,
টাইন্যা আন্তে ছিঁড়া গেছে।

ছাও—ছা'; বাচ্চা ;—আমার পেটের ছাও,

আমারে খাইতে চাও ?

চুন্নী—যে স্ত্রীলোক চুরি করে ; যথা,

চুন্নি মাগীর বড় গলা,

আর খায় সে দুধ্ কলা।

কইলে—কহিলে।

লড়া লড়া—ভুরি ভুরি। যথা,

কইলে লড়া লড়া,

না কইলে পেট ভরা।

ইহার আর একটি অর্থ বিশীর্ণ। যথা,

'খাঁ খাঁ রৌদ, পেটে ভাত নাই ;

পোলাডুগা লড়া-লড়া অইয়া

গেছে।'

লাই—প্রশ্রয় ;—লাই কুত্তার পাতে ভোজন।

কুত্তা—কুকুর।

চিমটি—কৃশ ;—খায় লয় চিমটি,

নাম পড়ে ডুমকির।

লাড়ে—চাড়ে—নাড়ে চাড়ে।

সকল সতীনে লাড়ে চাড়ে,

বইন সতীনে পুইরা মারে।

গিরস্ত—গৃহস্থ।

হেচুর—বসিয়া বসিয়া চলা। যথা,

ভাত বোলে মোরে খা

হেচুর পাইরা ঘরে যা।

হুইয়া—শুইয়া। শয়ন করিয়া।

—নায় আটে না,

হুইয়া যায়।

খ্যার—খর। খেড়ে কুটায় আগুন দিয়া,

পেত্নি বইল আল্ গোচ হইয়া।

আল্‌গোচ্—আল্‌গা।

মচর-মচর—নূতন চর্ম্মাদির শব্দ। যথা,

"মচর-মচর—জোতাপায়,

দেখ্‌ল বইন-কে যায় ?"

—"ভাবরঙ্গীর ভাতারে যায়"

সগল }
হগল } সকল

মাইপা– মাপিয়া।

পিরদুপ—প্রদীপ। যথা,

পিরদুপেরই কোল আঁধার।

কইচিলি—কহিয়াছিলি।

* * * *

বিয়া রাইতে কইচিলি কথা !

বুইড়া—বৃদ্ধ।

লগ্যি—চিকণ বাঁশের নৌ-চালন-যন্ত্র।

হরমাইল—পাটখড়ি ; আঁশযুক্ত

পাটগাছ।

নাস্তানাবুদ—ধ্বংশ ; নাশ।

ঢেউকশালা—ঢেঁকিশালা।

খান্দুইরা—স্থূল ; মোটা।

মুথইরা—ঐ, ঐ।

উনান—শোষণ।

ঘি খায় উনায়,

ফেন খায় ফোপায়।

নীলপূজা—নীলকণ্ঠ পূজা ; চড়ক পূজা।

বেলেহাজ—লাজশূন্য ; অসংযত রসনা।

ভেঙুর—বিকলাঙ্গ।

কাণ-খোর ভেঙুর,
হারাম জাদার লেঙুর।

লেঙুর—লেজ।

বেবাইজা—অসভ্য।

আউয়াল কান্দি—সুবিধাজনক স্থান।

চোস্কা—চুষিতে যে নিপুণ। কিলো! পোলার
দুধ চোস্কা দেখ্তে পাও অলে!'

টোবর—টোপর। হাউস—পছন্দ।

হাউসলাগি—পছন্দ সই।

জাইলা—জেলে।

কোলা—জঙ্গল বেষ্টিত তৃণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র মাঠ।

দান—দানব।

কুৎকুতান—মিটি মিটি চাওয়া।

মূলদেবতার পূজা নাই,
সুবচনীর কুৎ-কুতানী।

ছালন্—ব্যঞ্জন।

ভাত নাই ঘরে,
ছালন্-ছালন্ করে।

অষুধ—ঔষধ।

মইলে—মরিলে।

মৈল্যের সন্তান—প্রথম সন্তানের মৃত্যুর পরজাত সন্তান।

পো—ছেলে, পুত্র।

বাইর—বাহির।

গোজা—প্রবেশ করান।

ফাল—লম্ফ।

বাইচ্যা—বাঁচিয়া।

বাইচা—জলজ ঘাস।

আর্জের—মুক্ত, খালি।

পড়ত পড়—

নয় খাচা আর্জের কর।

সেকা—শেখ, মুসলমান।

দেখাদেখি সেকা নাচে।

তন—চেয়ে, হইতে।

লেখা পড়ার তন ধন নাই।

কাল—ঠাণ্ডা।

মাউতা—মাতা; স্ত্রী।

সোয়ামী—স্বামী।

গাব্বর—অপরিস্কার।

থাপ্পর—চপেটাঘাত।

বাইন্যা—বণিক।

ধইন্যা—ধনে।

বাইন্যার কাছে ধইন্যা চুরি।

খান্‌কি—বেশ্যা।

বিয়াইল—প্রসব করিল।

'মামাগ' পালে বিয়াইল গাই,

সে সম্পর্কে মামাত ভাই।'

গ'—বহুবচন বোধক।

মরুম—মরিব।

জীলে—জীবিত থাকিলে।

কুচ্‌কুচি—অসহ্যতা।

চান—চাঁদ।

বেমুন—ব্যঞ্জন।

মাইগ্যা—মাগিয়া।

দেয়ইয়া—যে দেয়।

হাচই—সত্যই।

ধোকর—কিছুই না; ( তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় )

"মাকর মার্‌লে ধোকর হয়।"

আঠর—গুণ।

ঠাঠর—সাজ সজ্জা।

"আঠর নাই—ঠাঠর বেশী।"

খওয়া—খসা। শ্লথ হওয়া।

খেন্—খান।

"একখেন্ বাতাসা!"

তখিত—তল্লাস।

টইয়া-টইয়া—ছোট-ছোট।

টৌঙ্গর—যে একের কথা অন্যের কাছে বলে।

তগ'—তোদের।

ক্রমশঃ—

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# নিরাভরণ

আজকে আমি করিনি ক' সাজ,
জ্বালাইনি ক' বাতি।
ঘরেতে আজ তুমি আমি একা,
আজকে শুধু নয়'ক চোখের দেখা
তিমির মাঝে নিবিড় হবে আঁকা
পরাণ-চিত্র অতি,
বঁধু ওগো বঁধু আমার! বিজন গহন নিশা,
আজকে আমি জ্বালাইনি'ক বাতি।

আলোর মাঝে যখন তোমায় দেখি
তখন দেখি আধা।
রূপের নেশায় নয়ন হয় যে ভোর,
কণ্ঠ তোমার শ্রবণে আনে মোর,
ভূষণ থাকে মাঝখানেতে যখন
তখন পাই যে বাধা,
প্রিয় ওগো প্রিয় আমার! আভরণের মাঝে
পরশ তোমার লাগে যে গো আধা!

একটি সুরে বাজে যখন বীণা
বাজে তখন গভীর;
নীরবতার অতল তল হ'তে
চিত্ত যখন পূর্ণ চেতনাতে
আপনাতে জাগে, তখন
ভাষা পায় না তীর
কান্ত ওগো কান্ত আমার! প্রাণের ধ্বনি বাজে
সকল রব নীরব যবে স্থির!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

—•০•—

# বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ

## সোনারং

( গ্রাম্য বিবরণী )

বিক্রমপুর বাঙ্গালীর অতীত মহিমার গৌরবময় পুণ্যপীঠ। ইহার প্রত্যেক পল্লীতে ইতিহাসের এত উপকরণ সঞ্চিত রহিয়াছে যে তাহার উদ্ধারচেষ্টা

যে কোনও একনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের পক্ষে গৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বিক্রমপুরের বর্ত্তমান অবস্থাও অগৌরবের বিষয় নহে শিক্ষায়, সমৃদ্ধিতে, জ্ঞানে, গরিমায় বিক্রমপুর আজিও বঙ্গদেশে প্রায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যেক গ্রামের অতীত ও বর্ত্তমানের এক একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সংগৃহীত হইলেই বিক্রমপুরের ইতিহাস রচনা পূর্ণাঙ্গরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। এজন্য প্রতি গ্রামের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

আয়তনে জনসংখ্যায় ও শিক্ষাদীক্ষায় ষোলঘর বিক্রমপুরের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রাম। ইহার অতীত ইতিহাস গভীর তমসাচ্ছন্ন। আমি যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি অদ্যকার প্রবন্ধে তাহাই অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। ষোলঘরের মত একটি বৃহৎ গ্রামের বিস্তারিত ইতিহাস একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থে পরিণত হইতে পারে।

ষোলঘর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে দুইটি অধিক প্রচলিত এবং উভয় বিবরণেই স্থাপয়িতার নাম একরূপ। একটি প্রবাদ এই যে ষোলঘরের সুবিখ্যাত ঘোষ বংশের পূর্ব্বপুরুষ বাণীদাস ঘোষবিশ্বাস ও চণ্ডীদাস ঘোষ বিশ্বাস নামক ভ্রাতৃদ্বয়ই এই গ্রামের স্থাপয়িতা। বর্ত্তমান জীবিত বংশধরগণের ঊর্দ্ধতন ছয়পুরুষ পূর্ব্বে ইঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস যশোহর জিলায় চিড়নীয়া গ্রামে ছিল। বাণীদাস ও চণ্ডীদাস নবাব সরকারে সৈন্যাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিতেন। একবার ইঁহারা কোনও বিদ্রোহদমনার্থ পূর্ব্বাঞ্চলে প্রেরিত হন। গমনকালে ষোলঘরে একদিনের জন্য ইঁহারা সেনানিবাস স্থাপন করেন। ষোলঘর তখন আড়িয়লবিল নামক নিকটবর্ত্তী বিখ্যাত বিলের মধ্যবর্ত্তী অরণ্যসমাকীর্ণ কতিপয় উচ্চভূমি মাত্র ছিল। এই স্থানে সৈন্যগণ বরাহাদি শীকার করিয়া মহানন্দে একদিন কাটায়। চতুর্দ্দিকেই নিসর্গশোভা দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয় বিমোহিত হন এবং বিদ্রোহদমন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া পুরস্কারস্বরূপ সরকার হইতে স্থানটুকু চাহিয়া লন। চিড়নীয়াতে পরিবার বৃদ্ধির দরুণ তাঁহাদের তখন স্থানাভাব হইতেছিল। অবিলম্বে ভ্রাতৃদ্বয় সপরিবারে ক্ষৌরকার, ধোপা,

মালাকর ইত্যাদি ষোলপ্রকার জাতিসহ ষোলঘরে আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। ষোলজাতি স্থাপন করাতে গ্রামের নাম ষোলঘর হয়।

নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে বাণীদাস ও চণ্ডীদাস এখানে আগমন পূর্ব্বক বাসের জন্য একরাত্রি যোগে ষোলখানা গৃহ নির্ম্মাণ করান এবং তাহা হইতেই গ্রামের নাম ষোলঘর হইয়াছে।

চণ্ডীদাস গ্রামের পশ্চিমাংশে ও বাণীদাস পূর্ব্বাংশে ( বর্ত্তমান পাইকরা-পাড়ায় ) বসবাস করেন। ষোলঘর গ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পূজনীয় শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পর্য্যন্ত বংশতালিকা স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল ঃ—

বাণীদাস ও চণ্ডীদাস সরকার হইতে বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের ষোলঘরের বাসস্থান পশ্চিম ঘোষ পাড়ার উত্তরাংশে খালের ধারে ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবুর বিশ্বাস। সেখানে বহু ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ইষ্টক নির্ম্মিত সেতুর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। গমনা-গমনের সুবিধার জন্য খালের ধারে প্রথম গৃহ নির্ম্মাণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

এই ইষ্টক সেতু ব্যতীত গ্রামের বহুস্থানে এত বেশী প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় যে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোনপ্রকার সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে না। এই সকল কীর্ত্তিকলাপের চিহ্নাবশেষের সহিত প্রধানতঃ প্রাচীন ঘোষ ও সেন পরিবারের নামই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। অধি-কাংশ ভগ্নাবশেষই শুকদেব রায়জী ( বংশতালিকা দ্রষ্টব্য ) নামক ঘোষ পরিবারের এক বিশ্রুতকীর্ত্তি মহাপুরুষের নামের সহিত বিজ-ড়িত। আজো গ্রামে বয়োবৃদ্ধগণ গৌরবের সহিত এই মহাত্মার নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। অনেক প্রবাদ প্রবচন ইঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। ইনি নবাব সরকারে অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য বহু পুরস্কার ও 'রায়জী' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রায় অর্দ্ধ মাইল বিস্তৃত প্রাসাদোপম ভবনের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। বর্ত্তমান চৌধুরী বাড়ীর বিশাল প্রবেশদ্বারের ভগ্নাবশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোষপাড়ার উত্তর সীমা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে ও 'জোয়ারিয়া পুকুর' এবং

বণিকপাড়ার পশ্চিমপ্রান্ত হইতে খাল পর্য্যন্ত প্রস্থে এই বিশাল ভবন অবস্থিত ছিল। এই স্থানটি বেষ্টন করিয়া একটি নালার চিহ্ন খালে যাইয়া মিশিয়াছে। 'মুন্সীবাড়ীর' জীর্ণপ্রায় ঝিকটী ঘর' 'বৌ-পুকুরের' লুপ্তপ্রায় সোপান শ্রেণী ও বৈদিক বাড়ীর পশ্চিমস্থিত 'শান-বাঁধা পুকুরের' সোপানের ভগ্নাবশেষ এই ভবনের অন্তর্গত ছিল। ঝিকুটী ঘরটির স্থাপত্য কৌশল অভিনব—ঠিক দোচালা ঘরের মত; দেওয়ালের গায় দশ অবতারের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল, তাহা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 'শান-বাঁধা পুকুর' সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর কথা এই যে ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বমান। হিন্দু কর্ত্তৃক খণিত পুষ্করিণী উত্তর দক্ষিণেই বিস্তৃত হইয়া থাকে।

সেন বংশের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রধান স্মৃতিচিহ্ন সুবিখ্যাত জোড় দিঘী। এত বড় বিশাল দিঘী বিক্রমপুরে খুব কমই আছে। দিঘী দুইটি একেবারে পাশাপাশি খনিত এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইলের মত হইবে। মাঝখানে একটি বৃহৎ সোপানের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। এই দিঘী দুইটি খননের ইতিহাস ও খননকর্ত্তা সম্বন্ধে আমি কোনও সঠিক বিবরণ এখনও পাই নাই। 'সেনবাড়ীর' প্রাচীন অট্টালিকাদিও ষোলঘরের সেন-বংশের অতীত গৌরবের পরিচায়ক।

এতদ্ব্যতীত কতিপয় স্থাপিত বিগ্রহও প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিয়া থাকে। 'কাত্যায়ণী বাড়ীর' স্থাপিত বিগ্রহ পিতলের দশভুজা মূর্ত্তি বহু পুরাতন। পূজকগণ তাহার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিতে পারে না। চৌধুরী বাড়ীর পিতলের লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ সাত কি আট পুরুষ যাবত পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আমার নিকট একখানি পুরাতন দলীল আছে তাহা পরগণাতি ৯০৫ সনের। দলীলখানা একখানা বিক্রয়পত্র, তাহাতে 'সমসাবাদের' উল্লেখ আছে। এই সমসাবাদ ষোলঘরেরই একটি পাড়া। অধিবাসীগণ প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। সুদূর তমসাচ্ছন্ন অতীত যুগের বাণীদাস ও চণ্ডীদাস, শুকদেব রায়জী এবং সেন বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ছাড়াও আমাদের গৌরব করিবার আরও অনেকে আছেন। রায়জী সম্বন্ধে একটী প্রবাদ অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। একবার কোনও

বিখ্যাত দস্যু রায়জীর ধনগৌরবের কথা শ্রবণ করিয়া লুণ্ঠন মানসে তাঁহার নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। ভয়ে অনেক ধনরত্ন 'বৌ-পুকুরে' নিক্ষিপ্ত হইল। রায়জীর লোকবল কম ছিলনা, কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে শুনিল তিনি কাহারও সাহায্য লইবেন না, একা দস্যুর সম্মুখীন হইবেন। অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হইল। নির্দ্ধারিত দিবসে দস্যুগণের আগমণ সংবাদ পাইয়া রায়জী অশ্বারোহণে তদভিমুখে ছুটিলেন,—তাঁহার কোষে তরবারী, হস্তে একগাছি ফুলের মালা। দলপতির সম্মুখীন হইয়া তিনি অকস্মাৎ মালাটি তাহার গলে অর্পণ করিয়া 'বন্ধু' বলিয়া তাহাকে গৃহে আমন্ত্রণ করিলেন। দলপতি ইঙ্গিত করিল—এক মুহূর্ত্তে সশস্ত্র দ্বিশতাধিক দস্যুর কোলাহল ও ঝঞ্ঝনা নীরব হইয়া গেল। দলপতি মালা খুলিয়া 'রায়জীর' গলে পরাইয়া দিল এবং বলিল যে রায়জীর জীবিতকালে ও তাঁহার বংশধরগণকে আর কখনও দস্যুদ্বারা অত্যাচারিত হইতে হইবে না। দস্যু তাহার কথা রাখিয়াছিল। রায়জীর নামানুসারে, একটি পাড়া এখনও 'রায়জীনগর, ও সংক্ষেপে 'নগর. নামে কথিত হয়। তাঁহার পুত্র সীতারাম ও সদারামের নামে দুইটী পাড়া সদারামপুর ও সীতারামপুর নামে অভিহিত হয়।

আমাদের এই গ্রামে অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনী এখন. বিস্মৃতির অতল তলে লয় পাইয়াছে। এখানে সবিস্তারে তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত করিবার স্থানাভাব। আমি মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিব ঃ—

১। ৺ মুন্সী কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ।—ইনি প্রথমে. সেরেস্তাদার পরে ডেপুটী হন। ইনি ষোলঘরের গৌরব, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। ইঁহার মাতৃভক্তির বিবরণ শুনিলে বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। বরিশালে মহাসমারোহে ১০৮ স্বর্ণজবা দ্বারা কালীপূজা করেন। ৺ গয়াধামে পাণ্ডাদের গৃহবিবাদ মিটাইয়া লক্ষটাকা পারিতোষিক প্রত্যাখ্যান করেন। ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

২। ৺ নবীন চন্দ্র ঘোষ।—ইনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুজ। সামান্য মাহিনায় গভর্ণমেণ্টের কাজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে ৮০০৲ টাকা বেতনে সংযুক্ত হন।

সে সময়ে ইঁহার মত আইনজ্ঞ বিচক্ষণ বিচারপতি বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব কমই ছিলেন। ইঁহার মীমাংসিত কয়েকটি বিখ্যাত মোকদ্দমা প্রিভি-কাউন্সিল কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়া আইনের প্রধান নজীর হইয়া রহিয়াছে। ১২৮৯ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৩। মুন্সী ফকিরচাঁদ ঘোষ।—পারস্যভাষায় ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার বাহির্ব্বাটীতে টোল ও মণ্ডব প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৪। ৺রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ।—ইনি সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পিতা। বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ডিপুটীর কাজ করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি ন্যায়পরায়ণ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন।

৫। ৺নন্দকুমার বসু।—ইনি কৃষ্ণচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের ভগ্নীপতি। ইনিও সবজজ্ ছিলেন। ইঁহার মত উদার অন্তঃকরণ বিশিষ্ট, দেব দ্বিজে ভক্তিমান ধার্ম্মিক মহাপুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

৬। ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ।—ইনি হাই কোর্টের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহার-জীবি বলিয়া সে সময়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তখন সবেমাত্র হাই কোর্ট সংস্থাপিত হইয়াছে। আরও কিছুকাল জীবিত থাকিলে ইঁহার হাইকোর্টের জজ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

এইরূপ আরও অনেকের নামোল্লেখ করা যায়, কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে ভাবিয়া নিবৃত্ত রহিলাম।

এইগ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা আশানুরূপ ভাল না হইলেও ভালই বলিতে হইবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে যদিও ইহার শিক্ষিতের (বর্ত্তমান) সংখ্যা কম তবুও এবিষয়ে ইহার স্থান বিক্রমপুরে অতি উচ্চে।

আয়তনে ষোলঘরের স্থান বিক্রমপুরের মধ্যে বোধ হয় বজ্রযোগিনী ও হাসাড়ার পরেই। ইহার বিস্তৃতি উত্তর দক্ষিণে ন্যূনাধিক ২॥ মাইল এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে (উমপাড়া হইতে সমসাবাদ) প্রায় ৩॥ কি ৪ মাইল। ষোলঘরের লোকসংখ্যা প্রায় ১২০০০।

ষোলঘরে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল, একটি মাইনর স্কুল, একটি বোর্ডের পাঠশালা ও অনেকগুলি পাঠশালা এবং বালিকা বিদ্যালয় আছে।

উচ্চ ইংরেজী স্কুলটির অবস্থা ভাল নয়। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৪০০ হইলেও

পরীক্ষার ফল মোটেই ভাল হইতেছে না। স্কুলটি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। এই সংশ্রবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু চৌধুরী হেড মাষ্টার মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে স্কুলটি স্থাপিত হয়. এবং তিনিই সহস্র প্রকার অসুবিধা ও বাধার মধ্য দিয়া স্কুলটিকে বাঁচাইয়া আনিয়াছেন। এই গ্রামের বহুজনহিতকর কার্য্যে ইনি অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। ইনি এই গ্রামেরই অধিবাসী ও ভূস্বামী। এই স্কুল স্থাপন কার্য্যে হেড মাষ্টার মহাশয় ব্যতীত শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ এল্, এম্, এস্, শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত শশিভূষণ সেন ও শ্রীযুত কুলদাপ্রসন্ন ঘোষ প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। স্কুলটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয়. এবিষয়ে গ্রামের শিক্ষিত মণ্ডলীর তেমন দৃষ্টি নাই।

মাইনর স্কুলটি আমাদের গ্রামের গৌরব সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের স্থাপিত। এণ্টান্স স্কুল স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ইহার অবস্থা খুব ভাল ছিল কিন্তু এখন ইহা লুপ্ত প্রায়।

বোর্ডের পাঠশালাটি বেশ ভাল চলিতেছে কিন্তু বালিকাবিদ্যালয় গুলির অবস্থা মোটেই ভাল নয়। মেয়েদের এখনও সেই পুরাতন চাটাই পাতিয়া বসিয়া 'গুরুমা'র নিকট শিক্ষা লইতে হয়। ছেলেদের জন্য যেমন বোর্ডের পাঠশালা হইয়াছে, মেয়েদের জন্যও কি সেরূপ একটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়? গ্রামের মুখোজ্জলকারীগণ এবিষয়ে একটু সচেষ্ট হইবেন না কি?

এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত হওয়া অবধি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তারিত হইতেছে। দুইটি সাহাযুবক বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। মৎস্যজীবি, তন্তুবায়, কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রেণীর অনেক ছেলে স্কুলে অধ্যয়ন করিতেছে। নিম্নে গ্রামের শিক্ষিতদের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দিলাম; ইহাতে সার চন্দ্রমাধব হইতে যুবক গ্রাজুয়েট সকলের নামই সন্নিবিষ্ট হইল :—

১। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি সার চন্দ্রমাধব ঘোষ শুধু বিক্রমপুরের কেন সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ। এমন সন্তানের জননী হইয়া আমাদের গ্রাম ধন্য, আমরাও ধন্য যে আমরা তাঁহারই স্বগ্রামবাসী। তাঁহার জীবনী সকলেরই জানা আছে।

২। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এই গ্রামের

Grand old man। ইঁহার বয়স প্রায় ৯১ বৎসর, প্রায় ৩৫ বৎসর যাবত পেন্সন ভোগ করিতেছেন। গ্রামের অনেক খুটিনাটি ঘটনা পর্য্যন্ত ইঁহার অমূল্য দিনলিপিতে লিখিত আছে। স্বগ্রামের প্রতি ইঁহার টান জননীর প্রতি শিশুরই মত। ঘোলঘরের ইতিহাসের উপকরণ কেবলমাত্র ইঁহার নিকট সংগৃহীত আছে। ইনি এখন চুঁচুড়ায় অবস্থান করিতেছেন।

ক্রমশঃ।

---

# আমি

কে বলে ভিক্ষুক আমি?—রাজার নন্দন;
বিশ্বরাজ পিতা মোর—তাঁহারই স্পন্দন
তালে তালে বাজে হৃদে, তাঁহারই আদেশ
মস্তিস্কে লহর তোলে, হৃদয়ে আবেশ!

বিশ্বরাণী মাতা মোর—শক্তি স্বরূপিণী,
রক্ত অস্থি মজ্জামাংস মেদ প্রসবিনী,
বাসনা কামনাময়ী মহা বাগীশ্বরী
ভাব, চিন্তা, ইচ্ছা, ক্রিয়া—সকলই তাঁহারি।

জগৎ ভাণ্ডারে যত অমূল্য রতন -
আমারই তরে শুধু এসব সৃজন!
মোহান্ধ বলিয়া আমি পায় ঠেলি' সব
উঞ্ছবৃত্তি ল'য়ে আছি থাকিতে বৈভব!

কি সুন্দর গৃহ মোর গড়েছেন মাতা,
কি আনন্দে পরিপূর্ণ করেছেন পিতা!
কি মহান্ কি বিশাল সে গৃহ আমার
কি বৈভবে পরিপূর্ণ প্রতি কক্ষ তা'র!

সুনীল আকাশ ঊর্দ্ধে কিবা চন্দ্রাতপ!
পদ-তলে প'ড়ে আছে ক্ষিতি আর অপ,
মধ্যস্থলে বহে সদা স্নিগ্ধ সমীরণ,
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা—তাহারই স্ফুরণ।

পদতলে ধরিত্রীর গালিচা শ্যামল
সুরঞ্জিত তৃণে পুষ্পে মরি কি কোমল!
মাথার উপরে ঝোলে তারকা মণ্ডল—
যেনরে সহস্র কোটি মাণিক উজ্জ্বল!

আমার ক্ষুধার শান্তি করিবার তরে
মাতৃস্তন হ'তে সুধা শত মুখে ক্ষরে,
গাছে গাছে ফলে ফল—অমিয়-ভাণ্ডার,
লতায় লতায় বহে লহর সুধার!

আমার নয়ন তৃপ্তি লভিবে বলিয়া
সাজে তরু পত্রে পুষ্পে; আকাশ ছাইয়া
নানাবর্ণে সুরঞ্জিত জলদের জাল
মাথার উপরে ধরে সুচিত্রিত চাল।

আমার শ্রুতির তৃপ্তি সাধিবার তরে
নানাস্বরে বিহঙ্গম কত গান করে.
গগনে গরজে ঘন, বনে জন্তু ডাকে।
ষড়রিপু মূর্ত্তি ধরি, নানাভাবে হাঁকে।

আমার পরশ সুখ করিতে সাধন
সতত চঞ্চল বহে মন্দ সমীরণ,
শীত গ্রীষ্ম ষড় ঋতু আসে আর যায়,
কোমলে কঠিনে ধরা আপনা সাজায়,

আমার প্রাণের সুখ করিতে প্রদান
পত্রেপুষ্পে সাজে পৃথ্বী, বায়ু বেগবান্
চুরি করি গন্ধে তার নাসারন্ধ্রে বহে,
এই ভাবে আমরণ সঙ্গে সঙ্গে রহে।
আমি ছায়া চা'বো ব'লে বৃক্ষ ছায়া দেয়;
আমি তাপ চা'বো ব'লে জ্বলে যে ধরায়
অনল ভাস্কর দুই। আমার লাগিয়া
জলে শৈত্য তরলতা আছে জড়াইয়া.
—আমার সুখের লাগি এত আয়োজন;
তবু আমি খুঁজি কোথাকাঙ্গালী ভোজন.
কে কৃপাকটাক্ষ ক'রে একমুষ্টি দেবে,
মুখের আদরে কেবা মোরে ডেকে নিবে!
অন্ধ আমি, মূঢ় আমি—চিনিনি আমায়,
কত কান্না কাঁদিয়াছি যথায় তথায়;
বিবেকের বিনিময়ে দাসত্ব কিনেছি.
রাজার নন্দন আমি—সকল ভুলেছি!
—জানিয়াছে আত্মবোধ ক্রূর পদাঘাতে;
আর ত ভিক্ষুক নাহি—ধরিবনা হাতে
কৃপা-কণা কা'রো আর। নয় কভু কিরে
ভবানীর প্রিয়পুত্র পর-পদ শিরে!

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলী

---

## রাসবিহারী-স্মৃতি।

মরণে কি হয়?—মরণ সকলেরি হয়।
ভাবরে ভাবরে কালীনাথের পদদ্বয়॥
ব্রহ্মাদি দেবতা সবে চিরস্থায়ী কেবা কবে,
( এমন )　সকলেরি মরিতে হবে নাহিক সংশয়॥

মরে, যদি ফিরে আসি, এই ভ্রমণের অভিলাষী,
( আমি ) মুক্তি চাইন মুক্তকেশী, রাস বিহারী কয় ॥

রাস বিহারী যেমন কবি ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন, তেমন ভক্তও ছিলেন। তিনি তদীয় দীক্ষা-গুরু ইছাপুরা নিবাসী স্বর্গীয় কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য ও তদীয় গুরুপত্নী শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবীর চরণ তলে বসিয়া ভক্তি-গদ-গদ-চিত্তে এই গানটি গাহিয়াছিলেন। গানেও কাশীনাথ-মুক্তকেশীর নাম আছে। তিনি গুরুপাটে আসিয়া "নিতুই নূতন" গীতি মালা রচনা করিয়া তাঁহার অভিষ্ট দেব-দেবীর চরণ তলে উপহার দিতেন।

রাস বিহারীর ইষ্ট দেবী—মদীয় মাতা মহী—বলেন যে রাস বিহারীর ন্যায় ভক্ত-শিষ্য তাঁহার বেশী ছিলনা। রাস বিহারী গান গাহিত, আর তাহারা বসিয়া শুনিতেন,—শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের পক্ষ্মশ্রেণী প্লাবিত হইয়া যাইত। আর রাস বিহারী ?—তাঁহার নয়নে পূত মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইত। তিনি যখন-তখন আসিয়া তাঁহাদিগকে গান শুনাইতেন! তিনি গুরুপাটে আসিয়া কখনো সন্ধ্যা-আহ্নিক করিতেন না। তিনি বলিতেন, মা-বাপের কাছে আসিয়া আবার মা-বাবাকে ডাকা কেন? যতক্ষণ আছি, গান গাহিব, আনন্দ করিব!

ভক্তি বটে!

দিদি মা বলেন—তিনি ভাত-প্রসাদ আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। কুম্ভপূর্ণ গুরু-পাদপদ্ম-পূতোদক তাহার কাছে গঙ্গাজলের চেয়েও যে কত পবিত্র ছিল—তাহা তিনি বলিতে পারিতেন না। শুনিয়াছি তিনি চরণামৃত নিজেই বাড়ীতে লইয়া যাইতেন, কাহারও হাতে দিতেন না। "কাশীনাথ"—বলিতে বলিতেই তাহার তনুত্যাগ হইয়াছে। আমার ঠাকুর দাদা নাকি তাহাকে "রাম-প্রসাদ" বলিয়াই ডাকিতেন।

রাস-বিহারীর আরও ভক্তিপূর্ণ গান, এবং তদীয় দেবোপম গুরু বংশের বিবরণ অচিরেই প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব।—

শ্রীসদাশিব বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

# বিবাহে পণ প্রথা।

বিবাহে পণ গ্রহণ যে অতীব অন্যায় তাহা বর্ত্তমান কালে প্রায় সকলেই ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই স্বার্থের দাস হইয়া তাহা সময়ে একেবারে ভুলিয়া গিয়া থাকেন। বিবাহে পণ প্রথা নিবারণ কল্পে যাঁহারা সভা সমিতিতে তীব্র সমালোচনা করিয়া থাকেন তাঁহারাই তাঁহাদের স্বীয় পুত্র কি ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রজত কাঞ্চনে বাক্স পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। বাঙ্গালী জাতির কথা এবং কার্য্যে বৈপরীত্য হেতু পাশ্চাত্য জাতি যে নিন্দা করিয়া থাকেন কতদিনে বাঙ্গালীর সে কলঙ্ক দূরীভূত হইবে তাহা বলা যায় না। অধুনা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে অনেকে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইতেছেন যে কেহই বিবাহ উপলক্ষে কন্যা দাতার নিকট হইতে পণ গ্রহণ করিবেন না। কন্যা দাতা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া স্বীয় সাধ্যানুসারে যৌতুকাদি যাহা অর্পণ করিবেন তাহা সাদরে পরিগৃহীত হইবে। কিন্তু তাহাদের অভিভাবকগণ যখন তাঁহাদিগের ঈপ্সিত লাভের আশা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া বিবাহের সম্বন্ধাদি স্থির করেন তখন তাহারা অভিভাবকগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অসম্মতি প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ অভিভাবক গণের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করাও ছাত্রগণের পক্ষে ঔদ্ধত্যই প্রকাশ পায়। এমতাবস্থায় অভিভাবকগণ এ বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হইলে ইহা প্রতিকারের কোন উপায় পরিলক্ষিত হয় না।

ব্রাহ্মণ, ও কায়স্থ বৈদ্য এই তিন জাতির মধ্যেই শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক পরিদৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাদের মধ্যেই পণ প্রথার বাহুল্য অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক দেখা যায়। মধ্য বিত্ত সম্প্রদায়ে যিনি ৩।৪টী কন্যার পিতা হইয়াছেন তিনি কিরূপ বিপদাপন্ন তাহা ভুক্ত ভোগী ব্যতীত অন্যের বুঝিবার সাধ্য নাই। এক একটী কন্যার বিবাহে ঋণগ্রস্ত হইয়া হয়ত তিনি পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। কত চারুশীলা বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা কন্যা অর্থাভাবে উপযুক্ত বরের হস্তে সমর্পণ করিতে না পারিয়া তাহার পিতা আজীবন অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া থাকেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পিতা পুত্রের

শিক্ষা কি তাহার মনুষ্যত্ব অর্জ্জন জন্য অর্থ ব্যয় করেন। পরে তাহাকে বিবাহ দিয়া পুত্রের শ্বশুরের নিকট হইতে সেই অর্থ আদায় করিবার বাসনা কখনই সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি সভা সমিতি আহ্বান করিয়া বর পণ প্রথা দূরীকরণ মানসে প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ হইয়া থাকেন কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীয় পুত্রাদির বিবাহে সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হন না ইহা অতীব লজ্জাজনক বটে। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে কোন সমাজে কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি এইরূপ প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিলে কিছুদিন পর তাঁহার পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হয় এবং তিনি কন্যা পক্ষের নিকট পণ স্বরূপ নগদ টাকা গ্রহণে অসমর্থ জ্ঞাপন করিয়া যৌতুকের একখানি ফর্দ্দ প্রদান করেন। কিন্তু তাহা প্রায় তিন সহস্র টাকার ন্যূন হইবে না। কন্যা পক্ষের প্রস্তাবক তাহাতে বিস্মিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন এবং বলিলেন মহাশয়! শুনিয়াছিলাম আপনি 'বর পণ প্রথা নিবারণী' সভার একজন প্রধান সভ্য তাহাতে আপনি নগদ টাকা গ্রহণ না করিয়া যে যৌতুকের দাবি করিলেন তাহা বিস্ময়জনক বটে। বাস্তবিক এইরূপ ঘটনা সমাজে প্রতি নিয়তই ঘটিতেছে। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি এ বিষয় চিন্তা করিয়া স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে যত্নবান না হইলে প্রতীকারের কোন উপায় নাই।

দেশের মধ্যে যাহারা কুলীন আখ্যাধারী তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদের নিকট কন্যা সম্প্রদান করিবার বাসনা ধনী ব্যতীত অন্যের পক্ষে দুরাশা মাত্র। এ দিকে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে দেখা যায় উপযুক্ত অর্থাভাবে কত কুলীন কুমারী আজীবন অনূঢ়া থাকিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তৎপ্রতি কুলীন সমাজের লক্ষ্য নাই কিন্তু কুলীন পুত্রগণ শ্রোত্রিয় ও বংশজ কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া প্রভূত অর্থ অর্জ্জনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছেন। সমাজের এই সকল কুপ্রথা কতদিনে তিরোহিত হইবে তাহা বলা যায় না।

কিছুদিন পূর্ব্বে কোন কোন সম্প্রদায়ে কন্যাপণ গ্রহণের আধিক্যও পরিলক্ষিত হইত কিন্তু কালস্রোতে তাহা অনেকাংশে অন্তর্হিত হইয়াছে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে যাহারা শ্রোত্রিয় ও বংশজ শ্রেণী ভুক্ত তাহাদিগকে বিবাহ করিতে পুর্ব্বে এক একটী কন্যার জন্য সহস্রাধিক টাকা পণ দিতে হইত. কত লোক অর্থাভাবে বিবাহ করিতে না পারায় তাহাদের বংশ লোপ পাইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখনও কোন কোন সমাজে কন্যা পণ প্রথা একেবারে বিদূরিত হয় নাই। অর্থলোভে কোন কোন পাষণ্ড স্বীয় কন্যাকে এখনও মূর্খ কিম্বা বৃদ্ধের করে অর্পণ করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয় না। কন্যার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অর্থ লোভে এইরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করে এই প্রকার লোকও একেবারে বিরল নহে। অতএব প্রত্যেক সমাজের শীর্ষ স্থানীয় সুধীবৃন্দ বিবাহে পণ নিবারণ কল্পে স্ব স্ব শক্তি নিয়োগ করেন ইহাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরাসমোহন মৌলিক

— —

## মনের মতন।

তুমি আমার মনের মতন।

ওগো, শত কোটী জনমধ্যে
আমার প্রাণ যারে চায় সকাতরে,
আমি বুঝিয়াছি এ অন্তরে
তুমি সে দুর্ল্লভ রতন।
তোমায় নেত্রে রেখে হেরব মাতা,
তোমায় কর্ণে রেখে শুনব কথা,
তোমায় প্রাণে রেখে বাসব ভাল,
মর্ম্মে রেখে করব যতন।
ওগো কোথায় গেলে তোমায় পাব ?
আমি অন্ধ আতুড় কোথায় যাব ?
ওগো তোমায় ভেবে, তোমায় ডেকে
হবে আমার দেহের পতন।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

———

# কাঁদি কেন?

ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত সংক্ষুব্ধ প্রশ্বাস তমিস্রা যামিনী তাহার চিরারাধ্যের উপাসনায় তখন বিভোর ছিল, সেই গভীর নীরবতায় প্রণবশব্দের শেষ ঝঙ্কা টুকুমাত্র তাহার চেতনার প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিতেছিল; কম্পিতপদে রিক্ত সঙ্গী আমিও তখন আমার নিভৃত পূজাগৃহে প্রবেশ করিলাম। কাহার ওই স্নিগ্ধদৃষ্টি আমাকে অপেক্ষা করিতেছিল; সেই নিশ্চল উৎসুক চাহনির অভিঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, আমি দৃষ্টি নত করিয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সরম কণ্ট কত হইয়া উঠিতেছিলাম। কে যেন প্রমত্ত উচ্ছ্বাসের প্রথম স্রোতে প্রচণ্ড বাঁধাদিয়া আমার সকল উৎসবের আয়োজন বিক্ষিপ্ত, উৎসারিত করিয়া দিল। আমি স্তম্ভিতের মত তাঁহার শয্যাপার্শ্বে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কত কি ভাবিয়া আসিয়াছিলাম সব যে এলো মেলো হইয়া গেল! এত বিপুল বিফলতায় নিজের মধ্যে শতবার ধিক্কার জাগিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় কাহার মৃদু হস্তস্পর্শে লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া তাহার বাহুতে আবদ্ধ হইলাম! জানিনা সঙ্কোচে কি শঙ্কায়, তৃপ্তিতে কি উচ্ছ্বাসে আমি বাক্‌হীন ও নিস্পন্দ হইয়া রহিলাম। আর আমার সকলহৃদয় বিলোড়ন করিয়া কে তখন প্রশ্ন করিল, "তুমি নাকি আজ কাঁদিয়াছিলে?" "হায়, তোমার একি নিষ্ঠুর পরিহাস!" আজ কত কথা ভাবিয়াছিলাম, কত প্রশ্নের কত না উত্তর ঠিক করিয়াছিলাম; কতনা সংকল্প করিয়াছিলাম, আজ যত প্রশ্নই হউক, যে প্রশ্নই করুক সবারই উত্তর দিব; কিন্তু তা' আর হতে দিলে কই? এদোষ কার? আমি তো কোনদিন ইচ্ছা করিয়া নিরুত্তর থাকি নাই; ভাষা নাই বলিয়া এ পোড়া মুখ যাহা বলিতে পারে নাই, হৃদয়ের মৌন বেদনা কি শেষবার উত্তর প্রদান করে নাই? কিন্তু আজ হৃদয় ও যে উত্তর খুঁজিয়া পায় না। যাহার উত্তর ভাবিতে যাইয়া, অন্যমনস্কতায় আজ কত যে বিদ্রুপ সহ্য করিয়াছি কই তার একটী প্রশ্নও তো করিলেনা। যার কোন উত্তর নাই, রমণীর ইতিহাসে যে প্রশ্নের উত্তর এপর্য্যন্ত কেহ কোনদিন দেয় নাই, দিতে পারেনাই, আজ তারিই উত্তর আমি কোথা হইতে দিব?'

"তুমি নাকি আজ কাঁদিয়াছিলে, কেন কাঁদিয়াছিলে? উত্তর পাইনা বলিয়াইতো কাঁদি! আমিও যে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া মরি কাঁদি কেন? ইহার মীমাংসা জন্য হৃদয় যখন সহানুভূতি যাচ্ঞা করে, এ সমুদয় প্রশ্নই যে বিদ্রূপের মত আমাকে আঘাত করে আমাকে কাঁদাইয়া তোলে। কেমনে বলিব কেন কাঁদি?

যখন সহৃদয়া পুত্রবতীগণ আমার দুঃখের ভার লাঘব করিতে যাইয়া নানা বিকট প্রশ্নে আমাকে উত্যক্ত করিয়া তোলেন, তখন কি না কাঁদিয়া পারা যায়? মনে হয় ওরা বুঝি কোন দিন কাঁদে নাই, কাঁদিতে জানে না; তাই শত সান্ত্বনা বাক্য আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া যায়। সহানুভূতির সুখস্পর্শ ইহারা দিতে পারে কই? ফলবতীশীর্ণ লতিকার মত ইহারা যে নত হইয়াই আছে, বসন্তের উদার পবন কোন্ সে অজ্ঞাত দেশের যে আবেশময় কুহক-বার্ত্তা আনয়ন করে, তাহাতে আকুল হইবার অধিকার ইহাদের কই? সেখানে কত যে পরিচিত আজ অপরিচিত, কতযে আপনার আজ পর হইতে পর, কতযে সুখের স্মৃতি দারুণ দুঃখ সৃজনে ব্যস্ত, ইহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর ইহারা যে কোন দিন ও পায় নাই। ইহারা কেমন করিয়া আমার এ হৃদয়ের স্পন্দনে বেদনা অনুভব করিবে? প্রৌঢ়া কে একজন নাতিনিম্ন ব্যঙ্গ স্বরে বলিতেছিলেন, "বুড় হয়ে বিয়ে হয়েছে, তা আবার নেকামি দেখ! আমার শুধুই মনে হইতেছিল এ যে নিতান্তই সত্য! যদি এ বয়সে এবিবাহ না হইত, তবে আমারও বুঝি এরূপ কান্না আসিত না। যদি না বুঝিতাম আমাতে কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যদি না জানিতাম কোথায় কি হারাইয়াছি, যদি না দেখিতাম কোথায় কি দেখিয়াছি, তাহা হইলে আমিও বুঝি কাঁদিতাম না। আর যদি বা কাঁদিতাম এদের মত কখনও বুঝি বুঝিতাম না কেন কাঁদি। বুঝি বলিয়াইতো নিজকে ধরিয়া রাখিতে অসমর্থ হই, আকুল ক্রন্দনকে বাঁধা দিবার শক্তি থাকে না।

যখন পিতার স্নেহ, মাতার যত্ন, সখীজনের অকৃত্রিম ভালবাসার কথা মনে পড়ে, তখন সকল ভুলিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতে প্রাণ যে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সেখানে কোথাও কোনও সঙ্কোচ যে ছিল না। আকাশের মত মুক্ত, বাতাসের মত সহজ ভাবে আমি যে সকলকেই আলিঙ্গন করিতে

পারিতাম। কিন্তু আজ কেবলি মনে হইতেছে, যা' ছিল তা, বুঝি আর নাই। তা'দের হৃদয়ের নিভৃত নিশ্বাস, পুষ্পের সুবাসের মত আমার নিকট যে ধরা না প'ড়য়া যাইত না, আজ বুঝি আমি সে শক্তি হইতেও বঞ্চিত হইয়াছি। আশঙ্কার কে গুরুভারে আমি নিতান্তই আজ অবসন্ন।

শ্বশুরালয়ের এই উচ্চ প্রাচীর আমার ও তাহাদের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করিয়াছে তাহা একটু পীড়া প্রদান করিতে পারে; কিন্তু ইহাও সহ্য হইত। অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাস বলিয়া ইহা উপেক্ষা করিবার শক্তি আমার যথেষ্ট ছিল। আর তাহা আছে বলিয়াইতো শুধুই কান্না পায়। আমি যদি সে শিক্ষা না পাইতাম, তবে আমিও বুঝি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শান্ত হইতাম। দুটি সান্ত্বনার বাক্যে আমার হৃদয়ের ক্রন্দন থামিয়া যাইত। কিন্তু এ যে দূর ব্যবধান নয়; এযে হৃদয়ের চির-বিচ্ছেদ। যখন পিতার সস্নেহ উপদেশ ও সদয় শিক্ষার কথা মনে পড়ে -তাহাকে ঘিড়িয়া আমাদের জীবন কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল, যখন সারা প্রাণ তাহার অভাবে চমকিয়া উঠে, তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইবার জন্য উগ্র হইয়া উঠে; তখন এ রীতির প্রাচীর যাতনা দিতে পারে, কিন্তু এরূপ অস্থিরতা আনিতে পারে কই? যখনই তাহাকে চাই, তখনই এ কা'র কথা মনে উঠে?

কোন দিন যাহাকে ভাবি নাই, অভ্যস্তের মত বার বার তারি কথা যে মনকে উদ্বেল করিয়া তোলে। তখনই কান্না পায়,—কি যে সে স্নেহ ও শিক্ষা, সে যত্ন ও আদর, প্রীতি ও সৌহৃদ্য—সবার সঙ্গে যে আজ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ঘটিল। যত'ভাবি ততই কষ্ট হয়, হৃদয় অস্থির হইয়া পড়ে; স্থান ও সময় ভুলিয়া যাই, কাঁদিয়া আকুল হই।

আমি কাঁদিতে ছিলাম,—হৃদয়ের বিলোড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ফুটস্বরে পরিত্যক্ত গৃহকোণে। আমি আপন মনে কাঁদিতে ছিলাম; তাহারা গোপনে সে কান্না শুনিল কেন? তখন যে আমি আপনা ভুলিয়া ছিলাম. তাহারা সহানুভূতির সুর শুনালে কেন? তখন কি মনে ছিল কেন কাঁদি? বিশ্ব যে তখন আমার নিকট বিস্মৃত ছিল। একবার যদি মনে পড়িত শতবার শ্রুত নামটী, "বার্হস্পত্য প্রবরস্তের" পরে কি যেন কেমন এক ভাবে প্রাণকে আকর্ষণ করিয়াছিল; সকল পুরাতন ছাড়িয়া

একটী নিতান্ত নূতনের পক্ষপাতী কেমন করিয়া হইয়াছিলাম। যদি না ভুলিতাম সেই পরম অপরিচিতের অভিনব মুখচ্ছবি দেখিবার জন্য মনে কেমন এক সসঙ্কোচ কৌতুহল জন্মিয়াছিল,—এক অজ্ঞাত শক্তির উপর ধীরে ধীরে কি যে নিবিড় বিশ্বাস আসিতেছিল;—তা'হলে এ কান্না জীবনে হয়ত কখনও আসিত না। কিন্তু শারদ প্রভাতের স্বচ্ছ শিশির কণার মত কখন যে নয়ন কোণে নীরবে আসিয়া অশ্রু ভরিয়া ছিল, তাহা যে জানিতে পারে নাই; তা'রা অতর্কিতে আমার হৃদয়ে মৃদু আঘাত করিল কেন? শেফালিশিরের শুচি শিশির বিন্দু কখনও কি পুষ্পচয়ন নিরতা নিরপেক্ষ বালিকাদিগের বিরক্তি উৎপাদন করে না। আমি যদি সমবেদনার কোমল স্পর্শ মনে করিয়া অধীর অশ্রুনিষেকে ভুলে কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিয়া থাকি, সে কি শুধুই আমার দোষ?

আমার দোষ, কেন আমি ভুলিয়াছিলাম. শত শত সম্মুখ দৃষ্টির কৌতুহল উপেক্ষা করিয়া, সেই যজ্ঞীয় বাসরের দীপ্ত দীপাবলির রশ্মিচ্ছটা প্রতিহত করিয়া, কাহার অনভিজ্ঞাত অক্ষিকে অভিনন্দন করিতেছিলাম। আর তাহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে, ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হইতে ছিলাম। আমার দোষ কেন আমি ভুলিলাম,—সে দিন এক অনাত্মীয় অপরিচিতের, প্রতি ক্ষুদ্র বাক্যটীকে কেমন করিয়া নিত্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম. আমার হৃদয়ে যতটুকু বিশ্বাস যতটুকুশ্রদ্ধা সঞ্চিত ছিল, নিঃশেষে সকল দিয়া তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিলাম। তখন যে সকল ভুলিয়া ছিলাম. কি এক বিহ্বল বিস্মৃতি আমাকে বিবশ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আবার যে সকল স্মৃতির মাঝখানে এ ভুল ভাঙ্গা চেতনা লাভ করিব, ইহা কে জানিত!

আর এই ভুলইতো জগতে যত কিছু ক্রন্দনের সৃজন করিয়াছে। দিকে দিকে শুধু এই এক ব্যর্থ অভিযোগ, 'আমি কেন এ ভুল করিয়াছিলাম, তখন যদি বুঝিতাম তবে আজি আর আমাকে এ বিচল ক্রন্দনে মর্ম্মপীড়া প্রকাশ করিতে হইত না।" পৃথিবীর নিয়ম ভুল করিয়া কাঁদে। কিন্তু তখনই তো কেহ কাঁদে না। যদি কখনও উষ্ণশ্বাস অনুতাপে কাহারও হৃদয় দগ্ধ হয়,—সে যে বহুদিন পরে। ভুল করিয়া কেহ কাঁদে না; প্রথম ভুলকে সবাই যে উপেক্ষা করে। কিন্তু যখন তাকে আর উপেক্ষা করা চলে না,

যখন সে স্মৃতি শত সুখময় জীবন পটে বিভীষিকার কালিমা লেপন করিতে আরম্ভ করে, তখনই আমরা কাঁদি। আর যতই উহাকে মুছিয়া ফেলিতে প্রাণপণ প্রয়াস করি, ততই যে উহা গাঢ়তর হইয়া উঠে। তখনই ক্রন্দনের আত্মবিস্মৃতিতে মর্ম্ম বেদনার সান্ত্বনা খুঁজিতে চাই। আমরা কাঁদি, কৃতকর্ম্মের ফলকে দূর করিবার জন্য নয়, তার স্মৃতিকে অভিভূত করিয়া রাখিতে। যখন আত্মস্মৃতি দুঃসহ যাতনা দিতেছিল, বিস্মৃতির মোহময় ক্রোড়ে লুকাইবার জন্য আমি নিভৃতে কাঁদিতেছিলাম, তোমরা তাহা দেখিলে কেন? সে কার দোষ? আমার দোষ আমি ভুলিয়াছিলাম, কৌতুক ক্রীড়ার ছলে সেই অপরিচিতের অতি তুচ্ছ আশ্বাস বাক্য কেমন করিয়া আমার হৃদয়ে এক নিবূঢ় নির্ভরের ভাব জাগাইয়াছিল। দেবতার আশীর্ব্বাদের মত যে বিশ্বাস আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল, তাহা দূর করিবার শক্তি যে আমার কোন কালেও হইবে না, তখন তাহা বুঝিলাম কই? অসীম শ্রদ্ধা ভরে, তাহার মধ্যে নিজকে বিলোপ করিতেছিলাম, তাহার মঙ্গল আশ্বাসে শুধুই বিজিত হইতেছিলাম, সেখানে অকল্যাণ খুজিলাম কই? সেই পুণ্য আত্মব লোপের মধ্য হইতে কে আমাকে জাগাইয়া দিল? যদি ভুলের মাঝে আত্মহারা হইয়াছিলাম, কে সে দগ্ধ শত্রু আমার এ ভুলের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলিল?

আজ স্মৃতি ও বিস্মৃতির, প্রিয় পুরাতন আর নন্দিত নবীনের রুদ্র দ্বন্দ্বের মাঝখানে আমি যে প্রচণ্ড পীড়ন অনুভব করিতেছি, তাহা হইতে। উদ্ধারের অন্য কোন উপায় যে নাই। আজ কেবলি প্রীতিমাখা সে স্মৃতির পাশে মোহময় বিস্মৃতির মুগ্ধ আবেশের কথা থাকিয়া থাকিয়া হইতেছে। তাইতো কাঁদি: ভুলকে ভুল বলিয়া চোখে পড়ে কেন? পৃথিবী কাঁদে ভুলকে ভুলিয়া থাকিতে; আর আমি কাঁদি ভুলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার উগ্র উত্তেজনায়। কিন্তু তা, আর হতে দেয় কই? অহোরাত্র স্মৃতির বিনিদ্র প্রহরী যে প্রতপ্ত প্রহারে আমাকে সচেতন করিয়া রাখিতেছে। তাই আমি উন্মুখ উন্মাদনায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া আত্মবিস্মৃতির মধ্যে সুখের সন্ধান করিতেছিলাম। তাহারা আমাকে সে সুখ হইতে বঞ্চিত করিল কেন? এরা যে কোন দিন কাঁদে নাই। হাসি কান্নার প্রভেদ যারা বোঝে না,

কাঁদিয়া যে সুখ কোনদিন যারা অনুভব করে নাই—আজ তাদের কথায় তুমি যদি আমায় জিজ্ঞাসা কর,—'কেন কাঁদিয়াছিলে,' আমি কি উত্তর দিব ? তারা যে কান্নাকে দুঃখের পীড়নের সঙ্গে শুধু এক করিয়া দেখিতেই জানে; তা' বলিয়া আমি দেখিব কেন ? যদি বলি, "না কোথায় কাঁদিয়াছি ?" এই অসাবধান প্রতি-উত্তরকে তোমার অযাচিত বিশ্বাসের গৌরবে গর্ব্ব অনুভব করিবার অবসর দিবে কি ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ।

---

# পল্লী-সন্ধ্যা

লুটায়ে লুটায়ে শীতল আঁচল এসেছে কুমারী সন্ধ্যা,
সরমে ভরমে নেহারে সে ছবি পারুল রজনী গন্ধা ;
তারকার হার শোভিতেছে অই সুনীল গগন গলে,
করুণার ধারা ঝরে ঝর্ ঝর্ হিম বরিষণ ছলে।
রাখাল বালক গাভী নিয়ে তার ছুটেছে আবাস পানে,
আবাহন গীতি গাহিছে তটিনী মধুর বেহাগ তানে।
কাননে কাননে ফুলের পাথায় জ্যোতিরূপে পরকাশি
পল্লীতে বুঝি লক্ষ্মী এসেছে ঢালিতে রতন রাশি।
তাপিত তৃষিত ব্যথিতের লাগি এনেছে সুধার ঝারি,
তৃপ্ত হয়েছে তাপিত পল্লী লভিয়াছে সুধা বারি।
নন্দন হ'তে এসেছে সন্ধ্যা, এনেছে আনন্দ রাশি,
ফুল্ল ফুলদল কাননে কাননে অধরে রেখেছে হাসি ;
ফুলের সুবাস ঢেউ তোলে বুকে, চিত করে উতরোল,
মধুর বায়ুর শীতল পরশে বুকে দিয়ে গেল দোল।

ভবনে ভবনে জ্বলিতেছে বাতি তুলসী বেদীর পায়,
পল্লীর যত সঞ্চিত পাপ হরিয়া নিয়েছে তায়।
দেউলে দেউলে উঠিল বাজিয়া অইরে কাঁসর শঙ্খ,
আলোকে পুলকে উঠিল কাঁপিয়া বেদনা-বিধুর অঙ্ক।
চির ঈপ্সিত, চির মঙ্গল, চির সুন্দর সাজে
বিশ্বরাজ এসেছেন বুঝি শান্তি স্বরগ মাঝে।

"বান্ধব-কুটীর"—ঢাকা শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

—০O০—

# বিক্রমপুর-প্রসঙ্গ।

**গ্রাম্য-বিবরণ**—বিক্রমপুরের গ্রাম্য-বিবরণী আমরা যে প্রণালীতে লিখিবার জন্য গ্রামবাসিগণকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছি, অধিকাংশ স্থলেই তদনুযায়ী লিখিয়া পাঠাইতেছেন না। আমরা এখানে লেখকগণের সাহায্যার্থ পল্লীর অবস্থা সম্যক জ্ঞাত হইবার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বনে গ্রাম্য-বিবরণী লিখিতে নির্দ্দেশ করিলাম, আশাকরি ভবিষ্যতে গ্রাম্য-বিবরণী লেখকগণ সেই পন্থা অনুসরণ করিবেন।

১। গ্রামের সীমা, পরিমাণ; নামের ইতিহাস যদি সংগ্রহযোগ্য হয়; খাল, বিল, পুকুর, ডোবা ইত্যাদির বিস্তৃত পরিচয়। পুষ্করিণীগুলি সংস্কারোপযোগী কয়টী, ভাল কয়টী ইহার সবিশেষ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

২। জাতি, সংখ্যা, কোন্ জাতি কতদিন হইতে গ্রামের অধিবাসী, শ্রেণীভেদ, হ্রাসবৃদ্ধির তারতম্য, কৌলীন্য, উচ্চনীচ, পরস্পরের ব্যবহার, বর্ত্তমান অবস্থা, শিক্ষা, জীবিকা ধর্ম্মানুরাগ, চরিত্র সুনীতি ও দুর্নীতি।

৩। শিল্প-বাণিজ্য;—শিল্পী বা ব্যবসায়ীর সংখ্যা দোকানী পশারী, আমদানী রপ্তানী। ব্যবসায়ী শ্রেণীর মধ্যে দেশী ও বিদেশীর পরিমাণ। কৃষি-শস্যের নাম; কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির পরিচয়, কৃষকদের চাষ বাসের প্রণালী, সারইত্যাদি ব্যবহার করে কিনা? কোন্ কোন্ শস্য

উৎপন্ন হয়? উৎপন্ন শস্যের রপ্তানী ও বিক্রীর কি ব্যবস্থা করা হয়? পাট ও ধানের চাষের তারতম্য কিরূপ? কোন নূতন শস্য প্রচলিত হইয়াছে কিনা?

৪। ধর্ম্ম—ধর্ম্মের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ, কি প্রণালীতে ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়? মন্ত্রদাতা গুরু গ্রামে আছেন কিনা? গ্রাম্য দেবালয়ের পরিচয় প্রতিষ্ঠাতার কথা, দৈনন্দিন ধর্ম্মানুষ্ঠান, তীর্থ যাত্রার আগ্রহ কিরূপ কোন কোন তীর্থে যাত্রীর সংখ্যা অধিক হয়? ভূত প্রেত ইত্যাদির ভয় কেমন?

৫। শিক্ষা—শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা? গ্রামে কোনও উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে কিনা? স্থাপিত থাকিলেও কতদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? প্রতিষ্ঠাতার নাম ও পরিচয়। গ্রাম্য পুরুষও নর নারীর মধ্যে লেখাপড়া জানা কত জন আছেন।

বালিকা বিদ্যালয়, মক্তব বা পাঠশালা ইত্যাদি থাকিলে তাহার বিবরণী।

৬। সমাজ—সামাজিক উৎসব, ব্রত ইত্যাদির বিবরণ।

৭। গ্রাম্য উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ ইত্যাদির নাম, ও বিশেষত্ব, দোষগুণ বাসস্থান ও সকলের পরিচয়।

৮। যান-বাহন, প্রাচীন ও আধুনিক, নাম ও আকার। বেশভূষা কোনও বিশেষত্ব থাকিলে তাহার উল্লেখ।

৯। রাস্তা ঘাট—সংখ্যা, অবস্থা, কাহার কৃত? সংস্কারের প্রণালী। সেতু সাঁকো ইত্যাদি।

১০। স্বাস্থ্য—সাধারণ; ঋতুভেদে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় কি না। কোন্ কোন্ পীড়ার আধিক্য? মৃত্যু সংখ্যা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, চিকিৎসক সংখ্যা।

১১। জল—পানীয় জলের বিস্তৃত বিবরণ ও উহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিবেন। গ্রাম্য সভাসমিতি থাকিলে তাহাদের কার্য্য পরিচয়, উপকারিতা ও অবস্থা লিখিবেন। আমোদ-প্রমোদের কথা থাকাও আবশ্যক।

গ্রামে কোনও পাঠাগার থাকিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী, পুস্তক সংখ্যা গ্রাম বাসী নরনারীর মধ্যে বৎসর কতসংখ্যক পুস্তক পাঠোদ্দেশ্যে চলা ফিরা

করিয়াছে। যাহাতে কাহারও প্রতি কোনওরূপ অযথা আক্রমণ, জাতিগত সংকীর্ণতা কিংবা হীনতা সূচক কোনওরূপ ভাষার প্রয়োগ না থাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন। আশাকরি দেশের হিতকামী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজ নিজ গ্রামের বিবরণী লিখিয়া পাঠাইবেন।

* * * * * *

**বিক্রমপুরে বর্ষা**—এবার বিক্রমপুরে বর্ষা পূর্ব্ববিক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিয়া গিয়াছে। লোকের ঘর বাড়ী সব জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। এই-রূপ দুরবস্থার দরুণ ব্যাধির প্রকোপও স্থানে স্থানে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য ভাল।

* * * * *

**ব্যাধি ও দরিদ্রতা**—কিছুদিন হইল 'সঞ্জীবনী' পত্রে ব্যাধি ও দরিদ্রতা সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে লেখক ব্যাধিও দরিদ্রতার মূল কারণ নিম্নলিখিত রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

সেকাল অপেক্ষা একালের লোক দৈনিক আহার পান, পরিচ্ছদ গৃহে সজ্জা, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ম্ম, সামাজিক নিমন্ত্রণ প্রভৃতি লৌকিকতা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি নানা বিষয়ে অতি ব্যয়ী হইয়া পড়িতেছে, অনেকেই এইরূপ বিশ্বাস করেন। বাঙ্গালীর আহার পান ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার করিলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয় অথচ ব্যয় হ্রাস হয়, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। পঞ্চব্যঞ্জন না হইলে বাঙ্গালীর দৈনিক আহার নিষ্পন্ন হয় না। ইহাতে ব্যয় অনেক কিন্তু শরীর রক্ষার জন্য যে অবশ্য প্রয়োজন এমন কথা বলা যায় না। পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীগণ ডাল আর রুটী খান ইহাতে ব্যয় কম অথচ তাঁহাদের শরীর বাঙ্গালীর অপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট। জাপানীরা ভাত আর মাছ খান—ভাতের মাড় ফেলিয়া দেন না। তাঁহাদের আহারের ব্যয় কম অথচ শরীর অতি দৃঢ়। এই সকল চিন্তা করিয়া বাঙ্গালীর আহার সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার করা প্রয়োজন, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

রন্ধন প্রণালীর জন্যও অনেক ব্যয় হইয়া থাকে। রন্ধন প্রণালীর কিরূপ সংস্কার করিলে আহার্য্য দ্রব্য শুসিদ্ধ হয়, অল্প সময়ে ও অল্প ব্যয়ে রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাও নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

পূর্ব্বে জল, সরবৎ বা ডাবের জল ইহাই বাঙ্গালীর পানীয় ছিল। এখন সোডা, লেমনেড, চা, কফি প্রভৃতি নানা প্রকার পানীয় ব্যবহার হইতেছে। ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, শরীরের কোন উপকার হয় কিনা তাহাও বিবেচ্য।

চা চুরুটে অনেক টাকা খরচ হয়। এই উৎপাত আগে ছিল না। সেকালে চিড়া, মুড়ি, মুড়কি খৈ, গৃহজাত নারিকেলের লাড়ু, ক্ষীরের সন্দেশ প্রভৃতি জল খাবার দ্রব্য ছিল। অল্প ব্যয়ে এই সকল দ্রব্য তৈয়ার হইত, এখন তৎপরিবর্ত্তে দুর্ম্মূল্য মোণ্ডা মিঠাই ব্যবহৃত হইতেছে—এতদ্বারা বেশী অর্থব্যয় হইতেছে, শরীরের তাদৃশ উপকার হয় কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

পরিচ্ছদের আড়ম্বরও অতি বেশী হইয়াছে। প্রথমে গঞ্জি, তাহার উপর জামা, তদুপরি কোট, এই গরম দেশে আর দরিদ্র দেশে এইরূপ পোষাক প্রচলিত হইতেছে। পায়ে মোজা ও বুট, ইহাতে পা সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। রেসমী কোট, রেসমী চাদর, ইহার ব্যবহার ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে। মোটা কাপড় ও সাদাসিধে পরিচ্ছদ ব্যবহার করিলে অতি ব্যয় হ্রাস হইতে পারে।

গৃহ-সজ্জা ক্রমে জাঁকাল হইতেছে। পল্লীগ্রামেও তক্তপোষ, জল চৌকি, ফরাসের পরিবর্ত্তে টেবিল চেয়ার, সোফা পালঙ্ক প্রবেশ করিতেছে। গৃহ সজ্জার একটা সীমা নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বরের পণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘড়ী, চেন, পালঙ্ক আলমারী, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি উপহার দ্রব্য, আবার, বাদ্ধারোসনাই, গোরার বাদ্য প্রভৃতিকত আড়ম্বরে বাঙ্গালীর ঘর শূন্য হইতেছে।

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে এখন দই চিড়া বা লুচি সন্দেশে কাহারও মন উঠেনা। পোলাও, কোরমা, চপ কালিয়ার দরকার হইয়াছে। শ্রাদ্ধেও এখন মাছ মাংস চাই।

আগে যাত্রাগান বিনাপয়সায় শোনা যাইত, এখন থিয়েটার বায়স্কোপের পালা পড়িয়াছে। যুবক বৃদ্ধ ইহার জন্য প্রতি মাসে বহু টাকা ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইতেছে।

নানারূপে বাঙ্গালীর অপব্যয় হইতেছে। এই অপব্যয় নিবারণের জন্য চিন্তাশীল বাঙ্গালীদের মতামত প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালী সময়-স্রোতে গা ভাসাইয়া না দিয়া অবনতির পথ রুদ্ধ করুন।

**সভা সমিতি**—এবারও ৺ পূজার ছুটিতে কয়েকটী সাহিত্য সভাও সামাজিক সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। সামাজিক সভা সমিতিতে মামুলি ধরণের বক্তৃতা, করতালি, ভোজন ও বচন সবই হইয়াছে। বৎসরের ফলাফল 'খাড়াবড়ি থোর, থোর বড়িখাড়া। সমাজ এক পাও উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় নাই। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতামাতার হাহাকার ঘুচিবার ভরসা নাই! অমর গিরিশ যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন' –যার ছেলে আছে সে দাঁও ক'সে বসে আছে, আর যার মেয়ে আছে, সে ফ্যাফ্যা করে।' যাঁরা যাঁরা বক্তৃতা দেন, যাঁরা যাঁরা মেয়ের বে'তে খরচ কমাবার সভা করেন, তাঁদের ছেলেটীর সঙ্গে মেয়ের বে দিতে চাইলে বলেন, আমার ছেলের এখন বে দেবার সময় নয়। ঘটক পাঠিয়ে খুঁজছেন, কে দশ বিশহাজার টাকা ছাড়বে।" এইত অবস্থা। এ সকল সভার কর্ত্তারা সারা বছর নাসিকা গর্জ্জন করিয়া নিদ্রা যান, বৎসর পরে শুধু একদিন বক্তৃতার বন্যায় দেশ উদ্ধার করেন। লজ্জাও নাই!

গ্রামের হিতজনক কার্য্যানুষ্ঠানে সমগ্র বিক্রমপুরের মধ্যে কামারখাড়ার শুভকরী সভা ও কলমার সভা আদর্শ সভা। সভার কার্য্য-প্রণালী যেমন সুন্দর – গ্রাম্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একযোগে কর্ম্ম পটুতাও তেমনি আদর্শ স্থানীয়। আমরা পূর্ব্বে যে কামারখাড়া গ্রাম দেখিয়াছি এখনকার সহিত তাহার তুলনাই হয় না, এখন সারাগ্রামের রাস্তাঘাট উঁচু করিয়া বাঁধান হইয়াছে। চলাফেরা যাতায়াত ও অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়েই ইহার উন্নতি হইয়াছে। অথচ মুষ্টি ভিক্ষা ইঁহাদের অর্থ সংগ্রহের একমাত্র প্রধান উপায়। এই গ্রামের শুভকরী সভার বার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রণ পত্র ও মুদ্রিত হয় না, ঢাক ঢোল ও বাজেনা অথচ ধীরে ধীরে সারা বৎসর কার্য্য হইতে থাকে। আমরা এই সভার কল্যাণ অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি। ইহাদের কার্য্য বিবরণী একখণ্ড পাইলে সাদরে মুদ্রিত করিব।

* * * * * * *

এই সংখ্যায় 'পল্লী সন্ধ্যা' শীর্ষক যে কবিতাটি প্রকাশিত হইল, তাহার লেখক শ্রীমান শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ বঙ্গের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-রথি স্বর্গগত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের পৌত্র। আমরা আশা করি শ্রীমান্ শ্রীপতি জন্ম-সূত্রে তাঁহার পিতামহদেবের সাহিত্য-প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইবেন।

---

# পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলী সংস্কার (৩)

১৮১। পদ দ্বয়ের ভিতর দিয়া যাইতে নাই।

১৮২। ভাতের কাঠি দ্বারা হাড়িতে শব্দ করিতে নাই—অলক্ষ্মী ঢোকে।

১৮৩। বিবাহের কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে জলে ফেলিয়া দিতে হয়।

১৮৪। শিলাবৃষ্টি পতন কালে 'শিলা' বলিতে নাই—বেশী পড়ে।

১৮৫। শিলা পতন কালে স্থলবিশেষে উঠানে কুলাতে করিয়া [illegible] রাখিতেও দেখা যায়।

১৮৬। কাহারও গৃহদাহ হইতে দেখিলে নিজ বাটীর থামে (খুঁটি) ও ঘরের চালার কোনে জল ছিটাইয়া দেয়। স্থলবিশেষে জোকার (উলু) ওদিতে দেখা যায়।

১৮৭। গৃহদাহ থামাইয়া হরিধ্বনি ও জোকার দিতে দেখা যায়।

১৮৮। তিনে সন্ধ্যাকালে (দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণে) ঘরের দরজা জানালা খোলা রাখে না।

১৮৯। কাহার ও বাড়ীর উপর পেঁচকে ডাকিলে দোষ—কাহার ও মৃত্যু হয়।

১৯০। দুপ্ দাপ্ করিয়া হাঁটিয়া চলিতে নাই—অলক্ষ্মীর চিহ্ন।

১৯১। চপ্ চপ্ বা চাকুম ২ শব্দ করিয়া খাইতে নাই।

১৯২। সাপ দেখিলে 'বাবারে' বলিতে নাই।

১৯৩। রবিবারে বেড়া বান্ধে না।

। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দেয় না। ও কলা গাছ রুইতে নাই।

১৯৫। রাত্রে বেড়ার বান্ধ দেয় না।

১৯৬। ভাগিনেয়কে মারিতে নাই—হাত কাঁপে।

১৯৭। গদিতে বসিয়া তেল দিতে নাই—লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়।

১৯৮। গরু কিম্বা নৌকা বেঁচিয়া সঙ্গে দড়ি দেয় না।

১৯৯। কদম ফুল গৃহে আনিলে গৃহস্থিত কাসুন্দি ( কাসন্দ ) পঁচিয়া যায়।

২০০। কাসুন্দীর ভালমন্দদ্বারা স্বগৃহের ভালমন্দ ঠিক করে।

২০১। কাসুন্দী পচিলে অমঙ্গল হয়।

২০২। তেল মাথায় দিয়া গদিতে বসেনা।

২০৩। তেল মাথায় দিয়া স্নানের পূর্ব্বে কিছুই ছুইতে নাই—নেহাৎ ঠেকা পক্ষে মাথায় জলের ছিটা দিতে হয়।

২০৪। খরমের উপর বসিতে নাই।

২০৫। এক বারা ভাত ( একবার মাত্র ভাত ) খাইয়া পুরুষের উঠিতে

২০৬। খাড়াঝিলৃকি দিলে, ( বিদ্যুৎচমকিলে ) বলে—'জয়মুনি, ;— ইহাতে নাকি বজ্রপাত দ্বারা কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

২০৭। সন্ধ্যাবাতি না দিয়া দোকানী ত্রিসন্ধিক্ষণে কিছুই বিক্রী করে না।

২০৮। সন্ধ্যা বাহিয়া না গেলে বাকী বেচে না।

২০৯। সাইদের সময় ( প্রথম বিক্রী কালে ) বা বইনি ( প্রথম বিক্রী ) না করিয়া দোকানী বাকী বেচে না।

২১০। হাই উঠ্‌লে তুড়ি দিতে হয়।

২১১। অপরকে হাই তুলিতে দেখিয়া তুড়ি না দিলে মহাপাপ।

২১২। কাহার ও ঘন ঘন ঢেউক্ ( ঢেকুর, হিক্কাবিশেষ) উঠিতে থাকিলে অন্যে বলিতে থাকে—'কবে কার কি চুরিকরে খেয়েছে ?'

২১৩। বলির জন্তু এক কোপে দ্বিখণ্ড না হইলে অমঙ্গল হয়।

ক্রমশঃ—

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।
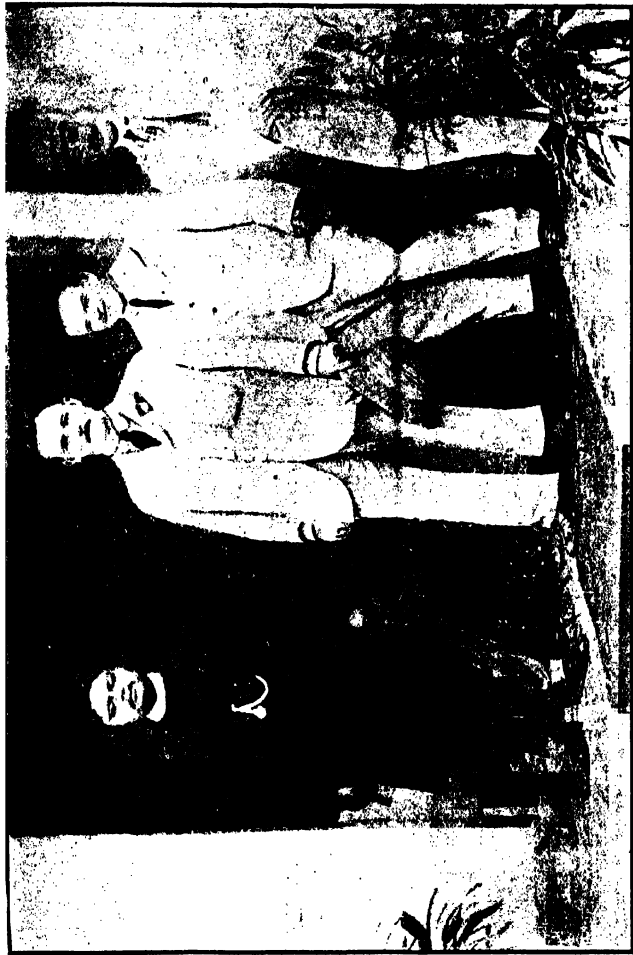
সেখরনগর পূর্ণচন্দ্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের সম্মুখে।

রায় শ্রীনাথ রায় বাহাদুর | লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর | কমিশনার সাহেব

# বিক্রমপুর

| তৃতীয় বর্ষ | অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২২ | ৮ম, ৯ম সংখ্যা। |
|---|---|---|

## আবাহন।

(১)

স্বস্তি, স্বাগত, বিবুধ বৃন্দ, জ্ঞানে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে বীর।
স্বাগত, স্বাগত, স্বস্তি, স্বাগত, উজল আজি গো যার কুটীর।
ভুলেছ সবে কি এইত সে দেশ, আদিশূর যার রাখিল মান,
পুণ্য তটের দ্বিজের তনয় ধর্ম্ম যাহারে করিল দান ;
দেখ একবার এই সে তোমার হৃত গরিমার চিতার শেষ—
বিক্রম যার বঙ্গে অপার কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ !

(২)

চক্র ধরিয়া ভিক্ষু যথায়, মুক্তি-মন্ত্র করিল দান,
সুগত-নিরত, ভারত-বিদিত, পুত্র যাহার যতি শ্রীজ্ঞান;
সাগর-মুকুরে বদন হেরিত, যেই সমতট এই সে দেশ
তড়াগে, দেউলে, সৌধে, শিবিরে, ধারণ করিয়া মোহন বেশ ;
দেখ একবার এই সে তোমার হৃত গরিমার চিতার শেষ—
খ্যাতি যার বঙ্গে অপার কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ !

( ৩ )

কৃপাণ যাহার শক্তি ঘোষিল, কামান যাহার গাহিল জয়
লীলায় নাচিল সমর-তরণী, মেঘনারবুকে অকুতোভয়।
'হর হর বলি' বম্ বম্ বম্,' ধাইল যাহার তনয় বীর—
বিজয়-শোভিত, পাল-পূজিত, কেদার-সেবিত পুণ্য তীর ;
দেখ একবার এই সে তোমার হৃত গরিমার চিতার শেষ—
বিক্রম যার বঙ্গে অপার কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ !

( ৪ )

বিদ্যার ভাতি কুন্দ-ধবল, ফুটিল যেথায় বঙ্গে অপার
মাল্য পরা'লো কণ্ঠে যাহার, বয়ন শিল্প কলা কুমার—
এই সে ধরণী, বল্লাল-জননী, বিজয়-বাহিনী বিপুল যার
ধনের মানের যশের স্মৃতিটী বহিছে আজিও শ্রীপুর তার ;
দেখ একবার, এইসে তোমার হৃত গরিমার চিতার শেষ—
বিক্রম যার বঙ্গে অপার, কীর্ত্তি যাহার ছিল অশেষ !

( ৫ )

এসহে সৌম্য, এসহে শান্ত বন্দি' সবারে আজি সেথায়,—
এখনো যাহার কীর্ত্তি অপার রয়েছে মিশিয়া ধূলি কণায় ,
সম্পদ যার বক্ষে ধরিয়া গরবে পদ্মা বহিছে সে,
সিংহ দুয়ারে রক্ষী বসা'য়ে ভীম দরশন মেঘনাদে ;
দেখ একবার এই সে তোমার হৃত গরিমার চিতার শেষ—
দেবী তোমার, সাধনা তোমার, স্বর্গ তোমার তোমার দেশ।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য।

---

মুন্সীগঞ্জ বিক্রমপুর সম্মিলন উপলক্ষে গীত। ১৩ই পৌষ ১৩২২।

# হিন্দু জগতে রামমোহনের আসন।

"পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

যাঁহারা রামমোহনের অনুবর্ত্তক বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া থাকেন তাঁহাদের অনেকেই রামমোহনের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ বাসরে উপরি উদ্ধৃত, ভগবৎ-প্রতিশ্রুত মহাসনন্দটি (magna charta) আওড়াইতে শুনি; এবং ইহাও দেখি "সম্ভবামি যুগে যুগে" অংশটুকু বাদ দিয়া তাঁহারা শ্লোকের অপরাংশ অক্ষরে অক্ষরেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না! এটুকু কি তবে প্রক্ষিপ্ত অথবা ভগবানের স্তোভ-বাক্য? আসল কথাটা হইতেছে এই, "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটা মানিয়া লইলে যে ভগবান্‌কে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ করাইতে হয়! সে কি কখনও হইতে পারে! অত বড় একটা অপরিমেয় অনন্ত অতবড় একটা বিরাট্ কুহেলিকা—সে কি এরূপ একটা সান্ত, দর্শন স্পর্শন-যোগ্য রক্তমাংসের মধ্যে আসিয়া সীমাবদ্ধ হইতে পারে?

রামমোহনের কীর্ত্তি-কাহিনী যখনই আলোচনা করি তখনই একটা গুপ্ত আত্মশ্লাঘায়—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জঞ্জাল পরিষ্কার করিতে ব্রাহ্মণই যে অগ্রসর হইয়াছিলেন; ব্রাহ্মণেরই পদ-চিহ্ন শিরোধার্য্য করিয়া বর্ত্তমান যুগও যে সগৌরবে অনাগতের দিকে অগ্রসর হইতেছে. এই আত্ম-গৌরবে হৃদয় নাচিয়া উঠে। রামমোহন কতবড় যে বিরাট পুরুষ, বর্ত্তমান যুগ যে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে সাহিত্যেও সভ্যতায়, রাজনীতি ও সমাজনীতিতে তাঁহার নিকট কত ঋণী, ইহা ভাবিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এমন সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা লইয়া কয়জন মহাপুরুষ যে জগতের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে!

আমি অবতার বাদী। আমি পূর্ণ প্রাণে বিশ্বাস করি যে পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায়াচ দুষ্কৃতাম্' ভগবান্‌কে যুগে যুগেই অবতীর্ণ হইয়া একটা নূতন যুগের অবতারণা করিতে হয়। মানুষের উদ্ধার যে মানুষেরই হাতে—এই শিক্ষাদানের জন্যই যেন ভগবানের এই বিধান!—এটা হইতেছে বিশেষ অবতারের কথা। আমার ইহাও দৃঢ় বিশ্বাস যে মাটি, পাথর, তৃণ, লতা

হইতে আরম্ভ করিয়া যত ইতি সৃষ্টি, সবই ক্ষুদ্র বৃহৎ অবতার—সবই সেই অখণ্ড নিরাকারের দৃশ্যমান ক্ষুদ্র খণ্ডরূপ—সবই তাঁর অসীম জ্ঞান অনন্ত প্রেম, অপ্রমেয় শক্তির অল্পবিস্তর স্ফুরণ মাত্র। দৃষ্টবস্তু মাত্রই ভগবৎ মহিমা ঘোষণা করিয়া থাকে।

এই ব্যাপক অর্থে রামাশ্যামার ন্যায় রামমোহন ও যে অবতার, সে সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই। কিন্তু যে বিশেষ অর্থে "অবতার" কথাটা হিন্দু জগতে গৃহীত ও প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, সেই বিশেষ অর্থের দিক হইতেও বিচার করিলে দেখিতে পাই, রামমোহন সামান্য সংস্কারক নহেন—অবতার বিশেষ। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক হিন্দুজগতের—সুধু হিন্দুজগতের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেরই রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চিত্র সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার জীবন-চরিত আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, অনাদি অনন্ত ভগবানের শ্রীমুখে উচ্চারিত ও প্রতিশ্রুত "পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" এই মহা সনন্দ (magna Charta) সার্থক করিবার জন্যই যেন রামমোহন জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস অবতারের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টার অভাবে বিশাল ও বিরাট রামমোহনকে খর্ব্ব করিয়া ফেলা হইয়াছে। "সর্ব্বভূতে নারায়ণ"—একথাটা যদি সত্য হয়; সৃষ্টিমাত্রই ভগবৎ শক্তির স্ফুরণ, এ কথার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে অবতার কথাটার ব্যবহারে বিশেষ কি আপত্তি হইতে পারে? অবতারবাদীরা কি একথা বলেন যে অবতার রূপে গৃহীত ব্যক্তি বিশেষের বাহিরে তখন ভগবানের কোনই সত্তা নাই; নিশ্চয়ই নয়। তাঁহারা ভাবেন, বিশ্বাস করেন, এই সকল মহাপুরুষ দিগকে অবলম্বন করিয়া, উদ্দেশ্য বিশেষ সংসাধনের জন্য, ভগবান্ আপনাকে বিশেষ ভাবে প্রকটিত করিয়া থাকেন মাত্র। তাই, এতদ্দেশে স্বীকৃত অবতারের মতই যীশু মহম্মদ প্রভৃতিও অতিপ্রাকৃতিক এবং অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিয়া জগতের রঙ্গমঞ্চে আবার নূতন করিয়া নূতন ভাবে ও নূতন চিত্রে ভগবানের মহিমা বিঘোষিত করিয়াছেন। এই ভাবে, দেশকাল-পাত্র বিচার করিয়া, বিশেষ বিশেষ কুসংস্কার ও পাপের স্রোত রুদ্ধ করিবার জন্য, এবং জ্ঞানের কিম্বা ভক্তির অথবা জ্ঞান ও ভক্তির নূতন সজীব ধারা

প্রবাহিত করিবার জন্য, ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবতীর্ণ হইতে হয়। এবং তখন হইতেই জগতে আবার একটা নূতন চিন্তা, নূতন ভাব প্রবাহিত হইয়া একটা নূতন যুগের অবতারণা হয়। যাঁহারা 'যুগের মানুষ', যুগ প্রবর্ত্তক, পুরাতনের ভিতরে যাঁহারা নূতন প্রাণ, নূতন আশা, নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত করেন, তাঁহারাই অবতার; তাঁহারাই বিশেষ কোন দেশ কাল পাত্রের উদ্ধারের জন্য ভগবৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া জরাজীর্ণ অতীত ও বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া উজ্জ্বল অনাগতের শুভ আগমনী গাইয়া থাকেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত এই দুঃসাধ্য সাধন কয়জনে করিতে পারেন? যাঁহারা ভগবানের এইরূপ বিশেষ অনুগৃহীত তাঁহারাই অবতার বলিয়া পূজিত হইবার যোগ্য। অনুগ্রহের—ভগবৎ প্রেরণার—তারতম্য অনুসারে অবতারের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্যের ও তারতম্য ঘটিয়া থাকে; কাঁহাতে সুধু জ্ঞানের আধিক্য, কাঁহাতে প্রেমের আধিক্য, কাঁহাতে শক্তির আধিক্য, কাঁহাতে বা এই তিনেরই প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে উদ্দেশ্য বিশেষ সাধনের জন্য ভগবান্ এই সকল মহাপুরুষদিগকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে যুগে যুগে প্রচারিত করিয়া থাকেন, সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ীই অবতারের প্রভাব ও শক্তি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এখন কথা হইতে পারে, অবতার মানিয়া লইলে মানুষকে—অনন্তের স্থানে খণ্ডকে, অসীমের পরিবর্ত্তে সসীমকে, অনন্তের স্থানে সান্তকে—পূজা করা হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না। খণ্ডের, সসীমের, সান্তেরই যদি এত জ্ঞান, এত প্রেম, এত শক্তি, তবে অখণ্ডের, অসীমের, অনন্তের জ্ঞান ও প্রেম ও শক্তি কত যে অপরিমেয়, ইহা ভাবিয়াই মন বরং অভিভূত হইয়া পড়ে; এবং মানুষের রক্তমাংস অস্থিমজ্জার আবরণ ভেদ করিয়া তখন নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের জ্যোতিঃই বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। বালিকা যেমন পুতুল লইয়া মানুষের মত করিয়া খেলে, অথচ জানে সেটা শুধুই মাটির পুতুল; অবতার ভক্তও তেমন অবতারের নিকট মস্তক অবনত করিবার সময় জানেন, আমি মানুষকে প্রণাম করিনা, তাঁহার অন্তরাত্মাকে সচ্চিদানন্দের স্ফুরণকে প্রণাম করি। তাই পুতুল লইয়া ঘরকন্না করিয়া বালিকার যেমন পুতুলত্ব প্রাপ্তি ঘটে না, তেমন অবতারের সেবায় মানুষের দৃষ্টির খর্ব্বতা লাভ হয় না; বরং প্রসারই

বাড়িয়া থাকে। আর যদি মানুষকেই পূজা করা হয়, তাহাতেই বা দোষটা কি? এ পূজায় মানুষের রক্তামাংসের পূজা করা হয় না, তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির, আনন্দ ও প্রেমেরই নিকট মস্তক অবনত করা হয়। ইহাতে মহত্ত্ব বই ক্ষুদ্রত্ব লাভের কোন আশঙ্কা আছে কি? মহত্ত্বের উপলব্ধিতেও মহত্ত্বের সঞ্চার হয়।

রামমোহন সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব, তাঁহার অমানুষিক ত্যাগ, উদ্দেশ্যের বিশেষত্ব অনন্য সাধারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা; তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও ভক্তির অসাধারণ গভীরতা—এই সকল নিরপেক্ষ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে অবতারবাদী তাঁহাকে অবতারের আসন প্রদান না করিয়া কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, সমসাময়িক, ও পরবর্ত্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে শাস্ত্রে আস্থাবান্ হিন্দু তাঁহাকে অবশ্যই অকুণ্ঠীত চিত্তে অবতারের আসন প্রদান করিবেন। যদি বিগত দুইশত বৎসরের মধ্যে কখনও "সম্ভবামি যুগে যুগে" কথাটার সার্থকতা সাধনা আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে তাহা রামমোহনের আবির্ভাব সময়েই বিশেষভাবে হইয়াছিল। হিন্দুর ধর্ম্মজীবন তখন আপনার প্রশস্ত সরল খাত পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যিক প্রাণহীণ ক্রিয়ানুষ্ঠানের পঙ্কিল খাতে প্রবাহিত হইয়া সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে সভ্য জগতের চোখে ঘৃণিত করিয়া তুলিয়াছিল; নানাপ্রকার কুসংস্কার ও কদাচারের তুলিকাপাতে হিন্দুর সমাজ-চিত্র তখন বীভৎস ভাব ধারণ করিয়া সভ্য জগৎকে ব্যথিত ও চমকিত করিয়া তুলিতেছিল; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তখন পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছিল; জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পসাহিত্য তখন অতীতের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছিল। এক কথায় অধঃপতনের রুদ্র দশাননমূর্ত্তি তখন দশ দিকেই সমভাবে একটা ভীষণ আতঙ্কের শিহরণ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এইভাবে, জাতীয় জীবন যখন অধঃপতনের প্রান্তসীমায় যাইয়া পৌঁছায়, তখন অবতারের আবশ্যক হইয়া থাকে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্য; যীশু এবং মহম্মদ—সকলের অবতারই এইরূপে পতনের শেষ মুহূর্ত্তে অবতীর্ণ হইয়া বিধ্বস্ত প্রায় জাতিগুলিকে আবার উত্থানের পথে সবলে টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাই ভারতের জাতীয় জীবনের এই মরণ মুহূর্ত্তে রামমোহন ও

জন্মগ্রহণ করিলেন। ইংরাজরাজের শুভ পদার্পণের সঙ্গে দেশে তখন সবেমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকচ্ছটা কুয়াসাচ্ছন্ন রবি-রশ্মির মত উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল—কেহই তখন বুঝিতে পারে নাই, কুয়াসা কাটিয়া এই নবীন পাশ্চাত্য রবি কখনও সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে কিনা, এবং উঠিলেও তাহার ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইবে। অধঃপতিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অন্তরালে পালিত ও বর্দ্ধিত, সংস্কৃত ও পারশীভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, ষোড়ষবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-কুমার রামমোহন তখনই এই পাশ্চাত্য রবিকে বরণ করিয়া লইলেন এবং যত অজ্ঞান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিলেন! কি অলোকসামান্য দূরদর্শিতা, জ্ঞানের কি সমুজ্জ্বল প্রভাব! পিতার রোষ, মাতার ক্ষোভ, আত্মীয় স্বজনের বিরাগ, সমাজের বিদ্রূপ, পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা—কিছুই তাঁহাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিতে পারিল না। তখন দেশে যাতায়াতের এমন সুবিধা হয় নাই, দস্যু তস্কর প্রভৃতির উপদ্রব এমন মন্দীভূত হইয়া আসে নাই। কিন্তু সকল দুর্য্যোগ ও বিপদাপদ উপেক্ষা করিয়া ষোড়শবর্ষের জ্ঞানার্থী যুবক, সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, জ্ঞানান্বেষণে—সত্যের সন্ধানে—সুদূর ও দুর্গম তিব্বৎ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আসিলেন! এত গভীর আবেগ, এমন অনন্যসাধারণ সাহস এমন অদম্য উত্তেজনা, ধর্ম্মের জন্য প্রাণের এত আকর্ষণ, সত্যের জন্য এমন সর্ব্বতোভাবে পার্থিব সুখের বিসর্জ্জন, জগতে কয়জনের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়?

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত আসিয়া যখন আমাদের এই পুণ্য ভূমিটিকে বিধৌত করিতে উদ্যত হইল, তখন সর্ব্বাগ্রে তাহার পঙ্কিল ফেন রাশিই আসিয়া আমাদিগের যোগনিদ্রাশ্লথ অন্তরাত্মাটিকে একটা অভিনব শিহরণে জাগ্রত করিয়া তুলিল, আমাদিগের চক্ষুর নিকট জগৎ তখন নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; অতীতের দিকে চাহিতে অতীতের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিশ্বাস ভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকিতে, আমরা ঘৃণা বোধ করিলাম—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘর্ষণে যে অভিনব বর্ত্তমান জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে ডুবিয়া যাইয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ভাসিয়া চলিলাম। মুহূর্ত্তই মাত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আমরা যে ইহার ফলাফল বিচার করিব, সে শক্তি ও প্রবৃত্তি

আমাদের রহিল না। এক কথায়, পাশ্চাত্য সভ্যতার এই "নূতন জলের" সমাগমে যত কূপমণ্ডুকের বংশধর আমরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া একেবারে ঘ্যাঙর্ ঘ্যাঙ করিয়া উঠিলাম। হিন্দুর অতীতের ক্ষীণ কাষ্ঠ সে কলরবের নীচে পড়িয়া গেল, হিন্দুর নাম, গন্ধ, ভাষা সকলই তখন ন্যাক্কারজনক হইয়া উঠিল। এই ভাবে, একদিকে কুসংস্কার ও অজ্ঞান এবং অপরদিকে উৎকট জ্ঞান ও বিকট সংস্কারের মাঝখানে পড়িয়া হিন্দু জাতিটা নিষ্পেষিত হইয়া ধূলিকণায় পর্য্যবসিত হইবার মত হইয়া উঠিল। জাতির রক্ষার্থ এই ভীষণ সন্ধিলগ্নে যাঁহার জন্ম হইয়াছিল, যাঁহার অদম্য তেজ ও দূরদর্শিতার ফলে এই ভীষণ সংঘর্ষণ কাটাইয়া হিন্দু জাতি এখন ক্রমশঃ স্বস্থ ও সুস্থ হইয়া উঠিতেছে—সেই বিশাল, বিরাট্ মহাপুরুষকে ভগবদংশ-সম্ভূত বলিয়া মনে করিলে কি বড় দোষের কথা হয়?—নিশ্চয়ই নয়; বরং মনে না করিলেই চিন্তাহীনতার পরিচয় দেওয়া হয়। আমি আবারও বলিতেছি—রামমোহন বিশেষ ভাবে ভগবদংশে সম্ভূত, হিন্দু যাঁহাদিগকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগেরই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারই আহ্বানে হিন্দু জাতি আবার জাগ্রত হইতে থাকে, তাঁহারই শঙ্খনাদে হিন্দু শাস্ত্রের তত্ত্বান্বেষণে হিন্দুর দৃষ্টি আবার বিকশিত হইতে থাকে, তাঁহারই সূক্ষ্ম দূর দৃষ্টি সম্ভূত উপদেশের অনুসরণে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্ঞান বিজ্ঞানের সমবায় সাধন সম্ভবপর হয় এবং সেই সমবায় সাধনের বলে ও ফলেই বর্ত্তমান ভারত এই নবজাগরণে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। সমগ্র হিন্দু জাতিটার পুনরুত্থান ও উন্নতির মূলীভূত কারণ যিনি, তিনি কি সামান্য মানুষেরই গণ্ডীভুক্ত?—কত কাল আর তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া প্রতত্ত্বদর্শী হিন্দু অবজ্ঞার চোখে দেখিবে? কবে হিন্দু তাঁহাকে যুগপ্রবর্ত্তক শঙ্করাচার্য্যের মত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনাকে ধন্য ও গৌরবান্বিত করিতে শিখিবে? যুগ যুগান্ত ধরিয়া হিন্দুর বেদ, বেদান্ত উপনিষদ্ ও গীতা যে সনাতন সত্যের অমৃত-ধারায় ভারতের আধ্যাত্ম্য জীবন সঞ্জীবিত রাখিয়া আসিতেছে, সেই সনাতন সত্যেরই তিনি একনিষ্ঠ উপাসক—সেই সনাতন সত্যের প্রচারই প্রাণ পাত করিয়া ভারতের মস্তকে গৌরবোজ্জ্বল মুকুট পরাইয়া দিয়াছেন। তবু কি

তাঁহাকে এমন আপনার জনকে পর করিয়া রাখিয়া হিন্দু আপনাকেই খর্ব্ব করিয়া রাখিবে ?

অবতারের গৌরব হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত রাখিলেও, তাঁহার অনুবর্ত্তকগণ তাঁহার মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়া আপনারা ধন্য হইতেছেন এবং জননী জন্মভূমিকেও ধন্য করিতেছেন। যাঁহারা মহত্ত্বের গৌরব ঘোষণার জন্য এত ব্যস্ত, যাঁহাদের চেষ্টায়, গোঁড়া হিন্দুসমাজের বিদ্বেষ সত্ত্বেও, রামমোহনের আলোকচ্ছটা সমাজের প্রত্যেকস্তরে প্রবেশ করিয়া সমাজকে পুলকিত ও সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে, তাঁহারা সমগ্রজাতিরই কৃতজ্ঞতাভাজন। ধন্য তাঁহারা! এসো ভাই, হিন্দু-মুসলমান্ খৃষ্টান, যাহারা সত্যের উপাসক এসো, সত্যের একনিষ্ঠ সেবকের গুণ গান করিয়া আপনারা ধন্য হইয়া যাও এবং জগতে সত্যের প্রকৃত সম্মান প্রতিষ্ঠায় সহায় হও।

শ্রীকুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলী

---

# বিক্রমপুর সম্মিলনীর সভাপতি

## আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অভিভাষণ।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বংশের জননী প্রপিতামহী দেবী তরুণ যৌবনে বৈধব্য প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র শিশুসন্তান লইয়া ভ্রাতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রের লালনপালন ও শিক্ষাভার লইয়া প্রপিতামহী দেবী যখন নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তখন এক দিন তাঁহার শিশুপুত্র শিক্ষকের তাড়নায় অন্তঃপুরে আসিয়া মাতার অঞ্চল ধারণ করিয়াছিল। যিনি তাঁহার সমুদয় শক্তি এক মাত্র পুত্রের উন্নতিকল্পে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া ক্ষয় করিতেছিলেন, সেই স্নেহময়ী মাতা মুহূর্ত্তে তেজস্বিনী রূপ ধারণ করিয়া পুত্রের হস্ত পদ বাঁধিয়া তাহাকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিলেন। ভাবিয়া দেখিলে আমাদের মাতৃভূমি বিক্রমপুর, আমার তেজস্বিনী বংশজননীর মত। সন্তানদিগকে বিক্রম ও পৌরুষে উদ্দীপ্ত হইতে

দ্বরা দিয়া তিনি তাহাদের প্রতি আপনার গভীর বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে অঙ্কে রাখিয়া আলস্যে কাল হরণ করিতে দেন নাই, কিন্তু জগতের অগ্নিময় কর্ম্মশালে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিয়াছেন "পৃথিবীর সংগ্রামময় কর্ম্মক্ষেত্রে যখন যশঃ, বিক্রম ও পৌরুষ সংগ্রহ করিতে পারিবে, তখনই আমার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিও।" মাতার আদেশ পালন করিবার জন্য বহু শতাব্দী পূর্ব্বে দীপঙ্কর হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত বহু বিক্রমপুরবাসী ভারতের বহুস্থানে গমন করিয়া কর্ম্ম, যশঃ ও ধর্ম্ম আহরণ করিয়াছেন। বিক্রমপুর, বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি,—মনুষ্যত্ব হীন দুর্ব্বলের নহে। আমার পূজা হয়ত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এই দুঃসাহসে ভর করিয়া আমি বহুদিন বিদেশে যাপন করিয়া জননীর স্নেহময় আরাধ্য ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। হে জননি! তোমারই আশীর্ব্বাদে বঙ্গভূমি এবং ভারতের সেবকরূপে গৃহীত হইয়াছি।

কি ঘটনাসূত্রে আমি এখানে সভাপতিরূপে আহুত হইয়াছি তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। কোন্ নিয়মে আমাদের দেশে কোন এক সঙ্কীর্ণ পথে খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগকে বিসদৃশ কার্য্যে নিয়োগ করা হয় তাহার নির্দ্দেশ করা কঠিন। যে যুক্তি অনুসারে ব্যবহারজীবকে কলকারখানায় ডিরেক্টার করা হয় সেই নিয়মেই, লোকালয় হইতে দূরে পরীক্ষাগারে লুক্কায়িত শিক্ষার্থী, আজ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নিয়োজিত হইয়াছে। এই নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ আপনারা গ্রহণ করেন নাই। আপনাদের প্রীতিকর কিছু যে আমি বলিতে পারিব সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। যে বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই সে বিষয়ে কিছু বলিতে উদ্যমকরা ধৃষ্টতা মাত্র। আমি স্বীয় জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি কেবল সেই বিষয়েই কিছু বলিব। পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া আমি ইহা উপলব্ধি করিয়াছি, যে আমাদের সমুদয় শিক্ষা দীক্ষা কেবল মনুষ্যত্ব লাভের উদ্দেশ্য মাত্র। কি করিয়া আমরা দুর্ব্বলের ক্রন্দন ও স্ত্রীজন সুলভ মান, অভিমান ও আবদার ত্যাগ করিয়া পুরুষোচিত শক্তিবলে স্বহস্তে স্বীয় স্বীয় অদৃষ্ট গঠন করিতে পারি, ইহাই যেন আমাদের একমাত্র সাধনা হয়।

## বিক্রমপুরের কৃতী সন্তান।

বিক্রমপুর চিরদিন পাণ্ডিত্যের জন্যই বিখ্যাত। বৌদ্ধযুগে দীপঙ্কর, শীল ভদ্র, হিন্দুরাজত্বে হলায়ুধ, আর কেদাররায়ের রাজত্বের কিছু পূর্ব্বে জগন্নাথ ঠাকুর প্রভৃতি বহু পণ্ডিত জন্ম-গ্রহণ করেন। জগন্নাথ ঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্ম্মপ্রচারক। আধুনিক কালেও ন্যায়, দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মহামহোপাধ্যায় প্রসন্নকুমার তর্কনিধি, কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম, সারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, কালীচরণ তর্কালঙ্কার, নৃসিংহ শিরোমণি, কাশীকান্ত ন্যায় পঞ্চানন, দীননাথ বিদ্যাবাগীশ, ব্রজলাল তর্করত্ন, কালীচরণ তর্কবাগীশ, মদনমোহন সার্ব্বভৌম, কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় রাসমোহন সার্ব্বভৌম, গোলকচন্দ্র সার্ব্বভৌম, অভয়াচরণ চমৎকার, চন্দ্রনারায়ণ ন্যায় পঞ্চানন, মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি, জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এবং কালিদাস কবিরত্ন, রামদুর্লভ সেন, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, রামরাজ দাস, ভগবানচন্দ্র দাস, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন, পীতাম্বর কবিরত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাহার পর গুডিভ চক্রবর্ত্তী, গুরুপ্রসাদ সেন, রজনীনাথ, নিশিকান্ত, শীতলাকান্ত, অভয়কুমার দত্ত, ও অভয়াচরণ দাস, মুন্সী কাশীনাথ, সার চন্দ্রমাধব, মনোমোহন ও লালমোহন, দাতা কালীকুমার ও কালীমোহন, দুর্গামোহন, ভুবনমোহন প্রভৃতি বহু মহাত্মা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। কালিপ্রসন্ন ঘোষ, ডাঃ অঘোরনাথ ও তাঁহার বিদুষী কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নামও স্মরণীয় থাকিবে। সৎকার্য্য বিক্রমপুরের অনেকে করিয়াছেন, তবে এ বৎসর সেখরনগরের শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়, হাসারার শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র।

বিক্রমপুরে কয়েকটি সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিক্রমপুরের ইতিহাস উদ্ধারে বিশেষ প্রশংসনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

আমি যে সময়ের কথা বলিলাম তাহার পর পৃথিবীর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে যে কেবল শক্তিমানই জীবিত থাকে, দুর্ব্বল নির্ম্মূল

হয় একথা কেবল নিম্ন জীবের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য মনে করিতাম। কিন্তু এবার পৃথিবী ভ্রমণের ফলে এ ভ্রান্তি দূর হইয়াছে। বিশ্বব্যাপী আহবে দুর্ব্বল বিনষ্ট হইয়া সবল প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনে করিবেন না যে আমরা এখনও দুরে আছি বলিয়া এই খাণ্ডবদাহ হইতে উদ্ধার পাইব। বহু দিন হইতেই এই ভীষণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের অধিপতি অনেকদিন হইতেই দেশবাসীকে সাবধান করিয়াছেন "জাগরিত হও, নতুবা জ্ঞানে, শিল্পে এবং বাণিজ্যে বিদেশীর নিকট পরাভূত হইলে জগতে আর তোমাদের স্থান থাকিবে না।" পূর্ব্ব গৌরবে মুগ্ধ ইংলণ্ডবাসী এত দিন এই আহ্বানে বধির ছিলেন। সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে এখন রণ-ভেরীর নিনাদে তাহারা উদ্বুদ্ধ এবং জাগরিত হইয়াছেন।

অহিফেণ সেবায় অতি সহজেই নানা কষ্ট হইতে নিজকে উদ্ধার করিতে পারা যায়। সুতরাং অতীতগৌরবস্মরণেই আমাদের পক্ষে বর্ত্তমান দুরবস্থা ভুলিবার প্রকৃষ্ট উপায়। আর এই যে সম্মুখে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্ম্মূল হইতেছে, দেশী শিল্প জাপানের প্রতিযোগিতায় উচ্ছন্ন হইতেছে এ সব কথা ভাবিতে নাই। আমাদের জড়তা সম্বন্ধে যদি আমি কোন তীব্র ভাষা ব্যবহার করি, তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। আমার জীবনে যদি কোন সফলতা দেখিয়া থাকেন; তবে জানিবেন তাহা সর্ব্বদা নিজেকে আঘাত করিয়া জাগরিত রাখিবার ফলে। স্বপ্নের দিন চলিয়া গিয়াছে, যদি বাঁচিতে চাও, তবে কশাঘাত করিয়া আপনাকে জাগরিত রাখ।

## সর্ব্বসাধারণে শিক্ষা-বিস্তার।

বিক্রমপুর এতদিন স্বাস্থ্যকর বলিয়াই খ্যাত ছিল। বাঙ্গালার আর আর স্থল ম্যালেরিয়াতে মনুষ্যহীন হইয়াছে, কিন্তু এদেশ এবিপদ হইতে এতকাল উদ্ধার পাইয়াছিল। অল্পদিন হইল এই ভীষণ শত্রুর উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম অবস্থাতেই এই বিপদ দূর করিবার সময়, বিলম্বে আর কোন উপায় নাই। ওলাউঠা বসন্ত ও আর আর সংক্রামক রোগ যেন দেশকে একেবারে বিধ্বস্ত করিতে চলিল। এই সব বিপদ একেবারে অনিবার্য্য নয়, কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা ও চেষ্টাহীনতারই বিষময় ফল। যে পুকুর হইতে পানীয়

জন্য গৃহীত হয় তাহার অপব্যবহার সভ্যতার পরিচায়ক নহে। কি করিয়া এই সব অজ্ঞতা দূর হইতে পারে? স্কুল বৃদ্ধি অতি মন্থর গতিতে হইতেছে আর কোন কি উপায় নাই যাহা দ্বারা অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিবরণ সহজে প্রচারিত হইতে পারে? আমাদের সর্ব্ব সাধারণের শিক্ষা বিস্তারের চিরন্তন প্রথা কথকতা দ্বারা। তাহা ছাড়া চক্ষে দেখিলে একটা বিষয়ে সহজেই ধারণা হয়। আমার বিবেচনায় স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়, গৃহ ও পল্লী পরিষ্কার, বিশুদ্ধ জল ও বায়ুর ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ এ সব বিষয়ের শিক্ষাবিস্তার এবং আদর্শ-গঠিত পল্লী প্রদর্শন অতি সহজেই হইতে পারে। ইহার উপায় কৃষি-মেলা স্থাপন। পর্য্যটনশীল মেলা বিক্রমপুরের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই অন্য প্রান্তে পৌঁছিতে পারে। এই মেলায় স্বাস্থ্য রক্ষা ছায়া-চিত্র যোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যায়াম প্রচলন, যাত্রা, কথকতা গ্রামের শিল্প বস্তুর সংগ্রহ, কৃষি প্রদর্শন ইত্যাদি গ্রাম্যহিতকর বহুবিধ কার্য্য সহজেই সাধিত হইতে পারে। আমাদের কলেজের ছাত্রগণ ও এই উপলক্ষে তাহাদের দেশ-পরিচর্য্যা বৃত্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন।

## লোকসেবা।

গত কয়েক বৎসর আমাদের দেশের ছাত্রগণ বহুপ্রকারে সেবায় আশ্চর্য্য পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। ইহা আমাদের ছাত্রদের বিশেষ গৌরবের বিষয় ইহা দ্বারা সর্ব্বত্র তাহাদের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'পণ্ডিত সেবা' অথবা 'ডিপ্রেষ্ট মিসনে'ও অনেকের ঐকান্তিক উৎসাহ দেখা যাইতেছে। ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ। এই সম্বন্ধেও কিছু ভাবিবার আছে। শৈশব কালে পিতৃদেব আমাকে বাঙ্গালা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তানদিগকে ইংরাজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামে ধীবর পুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি জলজন্তুর জীবন-বৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবতঃ, প্রকৃতির কার্য্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছুটির পর যখন বয়স্ত সহিত আমি বাড়ী ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহার্য্য বণ্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে—

একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন—কিন্তু এই কার্য্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। শৈশবে সখ্য হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতে ও যে পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় "পতিত অস্পৃশ্য" জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ্যে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাঁহারা যৎসামান্য আহার্য্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুমূর্ষ স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য্য পাইয়া তাহা দশ জনের মধ্যে বণ্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত? উহারা না আমরা?

## আর এক কথা।

তুমি ও আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্যের ভার প্রকৃত পক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে হইলে সমৃদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে পঙ্কে অর্দ্ধ-নিমজ্জিত রোগে শীর্ণ, অনশনক্লিষ্ট অস্থি-চর্ম্মসার এই পতিত শ্রেণীরাই ধন ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণের বেদনা বোধ শক্তি নাই। কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম তাহার মজ্জায় চিরবেদনা নিহিত রহিয়াছে।

## শিল্পোদ্ধার।

সম্প্রতি এই বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে একজন সরকারী ডিরেক্টার নিযুক্ত হইলেই আমাদের দেশের শিল্পোদ্ধার হইবে। ডিরেক্টার মহোদয় সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন। এই সমস্ত গুণ সমন্বয়েও বিধাতা পুরুষ আমাদের দুর্গতি দূর করিতে পারেন নাই। ইহা হইতে মনে হয় আমাদেরও কিছু কর্ত্তব্য আছে যাহাতে

আমরা একান্ত বিমুখ। জাপানে অবস্থান কালে দেখিলাম যে ভারতবাসীর ছাত্রগণ তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে। অথচ কার্য্যক্ষেত্রে ভারতবাসীর কোন স্থান নাই। জাপানী কিন্তু ঐ অবস্থাতেই সিদ্ধমনোরথ না হইয়া ক্ষান্ত হয় না। সে নিজের নিষ্ফলতার কারণ অন্যের উপর ন্যস্ত করে না। আমাদের দুরবস্থার প্রকৃত কারণ কি? কারণ এই যে চরিত্রে আমাদের বল নাই, 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' একথা আমরা কেবল মুখেই বলিয়া থাকি। আমি জানি যে আমার বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশী শিল্পের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন। বহু দিনের চেষ্টার পর তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ ব্যবহার্য্য বস্তু উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের ব্যবসা যে স্থায়ী হইবে তাহার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাহার প্রকৃত কারণ এই যে এপর্য্যন্ত তাঁহারা একজন কর্ম্মকুশল ও কর্ত্তব্যশীল পরিচালক দেখিতে পাইলেন না।

কেরাণী বাবু শত শত পাওয়া যাইতেছে তাহাদের কেবল কলমের ও মুখের জোর। বিদেশে দেখিয়াছি ক্রোড়পতির পুত্র ও ব্যবসা শিক্ষার সময় আফিসে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য্য গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে সেখানের সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে করিয়া সম্যক শিক্ষা লাভ করেন। আমাদের দেশে অল্পেতেই লোকের মানক্ষয় হয়। এমন কি আমাদের দেশের ছাত্র যাহারা আমেরিকা যাইয়া সেখানকার রীতি অনুসারে কোন কার্য্যকে হীন জ্ঞান করেন নাই এমন কি দরোয়ানী করিয়া এবং বাসন ধুইয়া বহু কষ্টে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন—এখানে আসিয়াই তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব ভুলিয়া বিদেশীয় বাহিরের ধরণ ধারণ অবলম্বন করেন। তখন তাঁহাদের পক্ষে অনেক কার্য্য অপমানকর মনে হয়। এসব সম্বন্ধে আমাদের দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ না করিলে কোন দিন কি শিল্পের স্বার্থকতা লাভ করিতে পারিব?

সম্প্রতি জাপান হইতে প্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর নিকট শুনিলাম যে জাপানে আমাদের সম্বন্ধে দুই একটি আমোদ জনক কথা চলিতেছে। তাহাদের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে নাকি আমাদের গৃহিণীদের পট্টবস্ত্র হইতে হাতের চুড়ি পর্য্যন্ত সংগ্রহ হয় না। এখন বাঙ্গালী বাবুদের জন্যও তাহাদিগকে

হুকার কল্‌কে পর্য্যন্ত প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এতদিন তোমরা ইউরোপের উপেক্ষা বহন করিয়া আসিয়াছ। এখন হইতে তোমরা আসিয়ারও হাস্যাস্পদ হইতে চলিলে।

## মানসিক শক্তির বিকাশ।

শিল্পের উন্নতির আর এক প্রতিবন্ধক এই যে বিদেশে শিক্ষা করিয়া উহা ঠিক সেইমতে শিল্প এদেশের ঠিক ভিন্ন অবস্থায় পরিচালন করিতে গেলে তাহা সফল হয় না। অনেক কষ্টে এবং বহুবৎসর ব্যয়ে যদি তাহা কোন প্রকারে কার্য্যকারী হয় তাহা হইলেও অতদিনে পূর্ব্বপ্রচলিত উপায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পরের অনুকরণ করিতে গেলে চিরকালই এইরূপ ব্যর্থমনোরথ হইতে হইবে। কোন দিন কি আমাদের দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে না? যাঁহারা কেবল শ্রুতিধর না হইয়া স্বীয় চিন্তাবলে উদ্ভাবন এবং আবিষ্কার করিতে পারিবেন?

যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ ও প্রতিযোগী, বহুপ্রাচীন জাতি ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও মানবের আশা এবং চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু।

তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞান শক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সে দিন চলিয়া গিয়াছে—এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের কোন স্থান নাই। কতকাল এই অপমান সহ্য করিবে? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমরা কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না?

ভাবিয়া দেখ এক সময়ে দেশ দেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত। তক্ষশীলা, কাঞ্চি ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? বিক্রমপুর যে শিক্ষার এক পীঠস্থান ছিল তাহা কি স্মরণ

নাই? দেবতার করুণায় ভারতের দান ব্যতীত জগতের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিবে ইহা সম্প্রতি স্বীকৃত হইয়াছে। এই সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হয় ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার? কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ? এই আশা কি কেবল কল্পনামাত্রই থাকিবে? আমি তোমা-দিগকে নিশ্চয় বলিতেছি সে চেষ্টাবলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ইহা আমি জীবনে বারম্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অজ্ঞ হিন্দু রমণী কেবল বিশ্বাসের বলেই বহু দেবমন্দির স্থাপন করিয়াছেন। তবে জ্ঞানমন্দির স্থাপন কি এতই অসম্ভব? মুষ্টিমেয় ভিক্ষার ফলে ভারতের বহুস্থানে বিশাল বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হইয়াছে। অজ্ঞতাই যে কেবল ভেদ সৃষ্টির মূল এবং তোমাতে এবং আমাতে যে কোন পার্থক্য নাই ইহা কেবল ভারতই সাধনা দ্বারা লাভ করিয়াছে। আমাদের সেই বিশাল একত্বের ভাব কি জ্ঞান এবং সেবা দ্বারা জগৎকে পুনঃপ্লাবিত করিবেনা?

ভয় করিতেছ যে সমস্ত জীবন দিয়াও এই অভীষ্ট লাভ করিতে পারিবে না? তোমার কি কিছুমাত্র সাহস নাই? দ্যুতক্রীড়কও সাহসে ভর করিয়া জীবনের সমস্ত ধন পণ করিয়া পাশা নিক্ষেপ করে। তোমার জীবন কি এক মহা ক্রীড়ার জন্য ক্ষেপণ করিতে পার না? হয় জয় কিম্বা পরাজয়।

## বিফলতা।

যদিই বা পরাজিত হইলে, যদিই বা তোমার চেষ্টা বিফল হইল, তাহা হইলেই বা কি? তবে এক বিফল জীবনের কথা বলি, ইহা শতাব্দীর পূর্ব্বের কথা। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি অতদিন পূর্ব্বেও চক্ষে দেখিয়াছিলেন যে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য এবং কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোন উপায় নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জ্জন দিয়াছিলেন। যাঁহারা পথ প্রদর্শক হয় তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নূতন উদ্যমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের সুবিধার জন্য তাঁহারই প্রযত্নে সর্ব্বপ্রথমে ফরিদপুরে লোন্ আফিস হয়। এখানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব পরকে দিয়াছিলেন। এখন তাহাতে শতগুণ লাভ হইতেছে। তাঁহারই প্রযত্নে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ফরিদপুর মেলা স্থাপিত হয়। তিনিই আসামে স্বদেশী চা

বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অংশিদারগণ এখন বহুগুণ লাভ করিতেছেন। তিনিই প্রথমে নিজব্যয়ে টেক্‌নিকেল স্কুল স্থাপন করেন, এবং উহার পরিচালনে সর্ব্বস্বান্ত হন। জীবনের শেষ ভাগে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার সমস্ত জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যর্থ? হয়ত একথা তাঁহার নিজ জীবনে প্রযুজ্য হইতে পারে, কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহু জীবন ফলবান হইয়াছে। আমি আমার পিতৃদেব ৺ভগবানচন্দ্র বসুর কথা বলিতেছি। তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপ যখন ফল নিষ্ফলের মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতেই আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবাল কঙ্কাল দ্বারাই মহাদ্বীপ নির্ম্মিত হয়।

হে বঙ্গবাসি, বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের কথা এখন ভাবিয়া দেখ। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে অকুল জলধি এবং হিমাচল তোমাদিগকে সমগ্র পৃথিবী হইতে বিচ্যুত রাখিতে পারিবে না। তুমি বুঝিতে পার না যে অতি-মানুষ শক্তি ও জ্ঞান-সম্পন্ন পরাক্রান্তজাতির. প্রতিযোগিতার দারুণ সংঘর্ষের মধ্যে তুমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছ? তুমি কি তোমার ক্ষীণ শক্তি ও জীবন লইয়া জাতীয় জীবন চিরদিনের মত প্রবাহিত রাখিবে আশা করিতেছ? তুমি কি জাননা ধরিত্রী মাতা যেমন পাপভার বহন করিতে অসমর্থ প্রকৃতি-জননী ও সেইরূপ অসমর্থ জীবের ভার বহন করিতে বিমুখ? প্রকৃতি মাতার এই আপাত ক্রূরা নির্ম্মম প্রকৃতিতেই তাঁহার স্নেহের পরাকাষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে। রুগ্ন ও দুর্ব্বল কতকাল জীবনের যন্ত্রণা বহন করিবে? বিনাশেই তাহার শান্তি ধ্বংসই তাহার পরিণাম। আশিরিয়া, বেবিলন, মিশর, ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তোমার কি আছে যাহার বলে তুমি জগতে চিরজীবি হইতে আকাঙ্ক্ষা কর। বোধ হয় পূর্ব্ব পিতৃগণের অর্জ্জিত পুণ্য এখনও কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চিত আছে সেইপুণ্য বলেই বিধাতা তোমাদের অবসন্ন মস্তক হইতে তাঁহার অমোঘ বজ্র সংহার করিয়া রাখিয়াছেন।

এই দেশে এখনও ভগবান তথাগতের মন্দির ও বিহারের ভগ্নচিহ্ন স্থানে

স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুখে বহু তপস্যা—লব্ধ নির্ব্বাণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল তখন সুদূর জগত হইতে উত্থিত জীবের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সিদ্ধ-পুরুষ তখন তাঁহার দুষ্কর তপস্যালব্ধ মুক্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন। যত দিন পৃথিবীর শেষ ধূলিকণা দুঃখ-চক্রে পেষিত হইতে থাকিবে, ততদিন বহুযুগ ধরিয়া তিনি তাহার দুঃখ-ভার স্বয়ং বহন করিবেন। কথিত আছে, পঞ্চশত জন্ম পরম্পরায় সুগত জীবের দুঃসহ দুঃখভার বহন করিয়াছিলেন। এইরূপে যুগে যুগে দেবোপম মহাপুরুষ-গণ মানবের দুঃখভার লাঘব করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। সেই যুগ কি চির অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? পরের দুঃখ পাশ ছেদন করিবার জন্য ঈশ্বরের লীলাভূমি এই দেশে কি মহাপুরুষগণের পুনরায় আবির্ভাব হইবে না? পূর্ব্ব পিতৃগণের সঞ্চিত পুণ্যফল ও দেবতার আশীর্ব্বাদ হইতে আমরা কি চির তরে বঞ্চিত হইয়াছি? যখন নিশির অন্ধকার সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতম, তখন হইতেই প্রভাতের সূচনা। আঁধারের আবরণ ভাঙ্গিলেই আলো। কোন্ আবরণে আমাদের জীবন আঁধারময় ও ব্যর্থ করিয়াছে? আলস্যতার, স্বার্থপরতার এবং পরশ্রীকাতরতার! ভাঙ্গিয়া দাও এসব অন্ধকারের আবরণ! তাহা হইলেই তোমাদের অন্তর্হিত আলোরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া দিকদিগন্ত উজ্জ্বলিত করিবে।

---

## প্রতিযোগী

মহাম্বুধি আমি, প্রেম কহে সগৌরবে  
আকাশ স্পর্শিতে চাহে তরঙ্গ বিপুল,  
বিশ্ববাসী হেরে তটে দাঁড়ায়ে নীরবে,  
অনন্তের প্রতিমূর্ত্তি অতল অকূল;  
অভিমান কহে হায়! পাঠালেন বিধি,  
প্রতিযোগী করি তব, কৃতান্ত সমান,  
তীব্র হিম-বায়ু ঘোর আমি, জলনিধি!  
পরশে নিমেষে তোমা করিব পাষাণ।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

# সরস্বতী পূজা

উষার আলোকে উঠিয়াছে অই পূরব গগন রাঙ্গিয়া,
গৃহে গৃহে উঠে আনন্দের রোলে মঙ্গল কাঁসর বাজিয়া,
উৎসাহ আবেগে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উঠেছে জাগিয়া
দেশের দৈন্য ঘুচাইবে আজ মাতৃপদে বর লভিয়া,
গাঁদা বেলী ফুল পলাশ বকুল ডালায় ডালায় ভরিয়া
বালক বালিকা থরে থরে অই যতনে দিতেছে রাখিয়া,
ভকতি-কুসুম-অর্ঘ্য অর্পিয়া চরণে তোমার আজিকে
বছরের পরে ল'বে শুভ বর অয়ি মা মঙ্গল মালিকে!
লক্ষ নরনারী কণ্ঠে হের মা পূরব গগন জুড়িয়া!
বর দে বরদে শুভ দে শুভদে অই যে উঠিছে ধ্বনিয়া,
কুল পুরোহিত আমাদের হিত তোমার চরণে মাগিয়া
অই পুষ্পগুলি লইতেছে তুলি অঞ্জলি বন্ধন লাগিয়া,
তবে সপ্তস্বরে দীন ভারতের মঙ্গল-গীতি গাহিয়া
উর গো জননী সন্তাপহারিণী দেও গো অশুভ নাশিয়া,
অয়ি শ্বেতভুজে ভুবন পূজ্যে শ্বেত শতদলবাসিনী
অমল ধবল পুণ্যের কিরণে মণ্ডিত কর ধরণী,
শান্তির সলিলে ভাসুক জগৎ দুঃখ যাক সব দূর হ'য়ে.
তোমার চরণ পরশে অভয় লভুক ওগো মা অভয়ে,
বাজিয়া উঠুক বীণা তোমার রাগ রাগিণীতে নাচিয়া,
সুপ্ত এ ভারত শুনিয়া সে গান উঠুক আজিকে জাগিয়া,
বাজাও যন্ত্র মোহন মন্ত্র কাণে কাণে দেও কহিয়া,
সিদ্ধির আশায় অয়ি সিদ্ধেশ্বরি! উঠুক এদেশ মাতিয়া,
চরিত্র গৌরবে কর গো ভারতে গৌরবান্বিত জননি!
ধন্য হ'য়ে যাই আশীষে তোমার অয়ি মা পীযূষবরণি!

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত।

# হৃদয়-বাণী

( ১৬-৭-১৩ রাত্রি )

গত রবিবার Captain Cli—নামক কলিকাতা হইতে আগত একটী সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম লোকটী পূর্ব্বে সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন। এক্ষণে পেন্‌সেন্ লইয়া Society for the Protection of Children নামক কলিকাতায় নূতন স্থাপিত একটী সমিতির সম্পর্কে কাজ করিতেছেন। পূর্ব্বে লোক-সংহার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এক্ষণে জীবন-সায়াহ্নে লোক রক্ষারূপ মহৎকার্য্যে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন।

লোকটীকে দেখিবা মাত্রই আমার প্রাণে কি যেন এক আনন্দের তরঙ্গ খেলা করিতে লাগিল। এই তো মানুষ! এই তো পুরুষসিংহ! বৃদ্ধ হইয়াছে, শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু তথাপি কি অদম্য উৎসাহ, কি স্ফূর্ত্তি, কি তেজ! হাতে কাজ ছিলনা, তাই গায়েপড়িয়া কাজ জুটাইয়া নিয়াছে। বাঙ্গালী পেন্‌সেনের পর, কয়েক বছর ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শেষে হাত পা পেট ফুলিয়া মরিয়া যায়। যারা কিছু দিন বাঁচিয়া থাকে তারা ও অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কোনও প্রকারে জীবন যাপন করে মাত্র। মানুষের মত কয়জন প্রাণ-ধারণ করে?

কাপ্তান সাহেব ছেলেদের সম্বন্ধে নানা কথা বলিলেন। বক্তৃতাটী ছোট কিন্তু বেশ সুন্দর সুন্দর কথায়ও ভাবে পূর্ণ ছিল। প্রতি কথা হইতে যেন উৎসাহ ও আশা ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছিল। তিনি বলিলেন, এক্ষণে সভ্য জগতের লোকেরা বুঝিতে পারিয়াছে যে কোনও পরিবার অথবা সমাজই হো'ক, সুদে অন্যের নিকট টাকা কর্জ্জ দেওয়ার চেয়ে, সন্তানের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য তাহা ব্যয় করিলে কালে অধিকতর লাভবান্ হওয়া যায়। কথাটী বড়ই ঠিক, কিন্তু আমাদের দেশের কয়জন এ সার সত্য অনুধাবন করিতে পারিয়াছে? তিনি বলিলেন ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি সমস্ত সভ্যদেশেই বিগত বিংশ বৎসরের মধ্যে শিশুদের পালন ও শিক্ষা সম্বন্ধে যত আইন প্রচলিত হইয়াছে গত শতাব্দীর বাকী বৎসর সমূহের ভিতরও তাহা হয় নাই। ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যাইতেছে, যে সকল দেশের

লোকেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, যে শিশুরূপ সম্পদের ন্যায় দেশের কিম্বা জাতির এমন মূল্যবান সম্পদ আর নাই। যে সমাজেও যে দেশে শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে সেই সমাজও সেই দেশই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও ক্ষমতাপন্ন। তাহার দৃষ্টান্ত জার্ম্মেন, তাহার দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড, মার্কিন।

তিনি সমস্ত সভ্যমণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন আপনারা কি আপনাদের স্ব স্ব সন্তানদের প্রতি আপনাদের যে কর্ত্তব্য ( Duty ) রহিয়াছে তা পালন করিয়াছেন কি এক্ষণে করিতেছেন? আপনারা কি তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন, তাহাদিগকে সময়োপযোগী আহার ও পরিচ্ছদ দিয়া থাকেন? কি শয্যায় শয়ন করিলে কতক্ষণ ঘুমাইলে, কি ভাবে জীবন যাপন করিলে শিক্ষা পাইলে তারা ভবিষ্যতে সুপুরুষ হইবে সুবিদ্বান হইবে দেহ ও মনের বলে শক্তিশালী হইতে পারিবে, বংশের ও দেশের গৌরব হইবে তাহার প্রতি কি চিন্তা করিয়াছেন? আপনাদের কন্যাদের লেখাপড়ার আপনারা কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন? আমি লজ্জায় অধোবদন হইতে বাধ্য হইতেছিলাম কারণ আমিও যে সন্তানের পিতা।

সত্য বটে আমরা দরিদ্র এবং দারিদ্র্যের দরুণ অনেক কাজ মনোমত ভাবে করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু আমরা দরিদ্র কেন এবং কি করিলে এই দারিদ্র্য দূর হয়, তাহা আমরা কেমন ভাবে চিন্তা করি কি? আমরা অর্থ অপেক্ষা ও ভাবে এবং কার্য্যকরী ক্ষমতায় অধিক দরিদ্র। আমরা নিজেরা তো দরিদ্রই রহিয়া গেলাম। ভবিষ্যতে সন্তান সমূহ যে মানুষ হইয়া দেশের দারিদ্র্য ঘুচাইবে, তার চেষ্টা আমরা কি করিতেছি? সন্তানের পিতা হইতে আমাদের বড়ই অভিলাষী কিন্তু জন্মগ্রহণ করার কিছু পরেই আমাদের অমনোযোগীতা বশতঃই তাহাদের অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যাহারা বাঁচিয়া থাকে তারা অর্দ্ধাহার ও অশিক্ষা বা কুশিক্ষার ভিতর কোনও প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া থাকে। মানুষের মত মানুষ কয়জন হয়?

লজ্জার কথা, দুঃখেরও কথা! একটী বৃদ্ধ ইংরাজ আমাদের দেশের ছেলেপেলের ভবিষ্যৎ ভেবে অস্থির হইতেছেন আর আমরা নাকে তেল

দিয়া ঘুমাইতেছি। পরের সমাজের দোষ ধরিতে আমরা বড়ই মজবুত কিন্তু নিজেরা যে সংসারের সকলজাতির অধম তার প্রতি দৃষ্টি নাই। কেন,—সাহেবেরা আমাদের দরিদ্র অসহায় শিশুদিগকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণেরও তাদের মানুষ করার জন্য চেষ্টা করিতেছেন আমরা ও কি প্রাত নগরে নগরে অনেকটা এই ভাবের সমিতি সমূহ সৃষ্টি করিতে পারি না? সহরের যত সন্তানের অভিভাবকগণ এই সকল সমিতির সভ্য থাকিবেন ছেলের কে কি প্রকার শিক্ষা পাইতেছে. তাদের কি অভাব অভিযোগ, কি ভাবে চালিত হইলে তারা সুস্থ সবলকায় ও সুশিক্ষিত হইতে পারে ইত্যাদি কত বিষয়ই না এ সকল সমিতির বিবেচ্য রিষয় হইতে পারে। ইয়ুরোপও আমেরিকার ঈদৃশ ভাবের অনেক সমিতি রহিয়াছে; আমাদের দেশে তার নাম শোনা যায় না।

Captain Cl —র বক্তৃতা শ্রবণ করিতে করিতে হৃদয়ের ভিতর যেন আমি বড়ই উৎসাহের স্পন্দন অনুভব করিতেছিলাম। আমারও তাহার মত কোন একটা সৎকার্য্যে নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছিল। লোকটী আমার হৃদয়ের হাল ধরিয়া যেন তাঁর দিকে টানিতে ছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবনে এমন উৎসাহের ও আনন্দের ভাব অনুভব করি নাই।

( ২১।১-১৪ বুধবার রাত্র

ছেলেদের কেমন করে মানুষ করিতে হয়, সে বিদ্যা আমরা শিক্ষাই করি নাই।

পূর্ব্বকালে ছেলেরা ছিল পিতার আজ্ঞাবহ ভৃত্য। পিতা ছিলেন যম সদৃশ দেবতা। ভালবাসা অপেক্ষা সে দেবতা ভীতিই অধিকতর উৎপাদন করিতেন। তাই কালে অনেক গৃহে পিতা কর্ত্তা নামে পুত্র কর্তৃক অভিহিত হইতেন। তাঁহার ত্রিসীমানায় ও পুত্র যাইত না, ভয় কখন কোন্ বিপদ আসিয়া পড়ে।

ইংরাজী শিক্ষার কল্যাণে ফল বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। এখন পিতা মস্ত ইয়ার। একটু বেশী বয়সের হইলেও পুত্র যদি কলেজে পড়ে তাহা হইলে

তো তিনি অনেকটা দয়ারই পাত্র স্বরূপ। পিতাকে এখন 'তুমি' বলা হয় কলিকাতার ধরণে, পূর্ব্বে আমাদের চক্ষে ইহা জ্যাঠামি বলিয়া ঠেকিত। এক্ষণে পুত্র যদি পিতাকে 'আপনি' বলে তাহা হইলে বরং বিসদৃশ বোধ হয়।

অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা পিতা পুত্রের সম্পর্ক অধিকতর মধুর হইয়াছে এবং যেখানে পুত্র চরিত্রবান ও বিদ্বান, সেখানে তাহা বড়ই সুখের হইয়া থাকে। কিন্তু ঈদৃশ দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। আমার চক্ষে এ পর্য্যন্ত একটী মাত্র পড়িয়াছে। পুত্রটী এম. এ, বি, এল হাইকোর্টের উকীল, পিতা ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। পিতার প্রতি পুত্রের ব্যবহার যেমন ভালবাসাময়, তেমন ভক্তিপূর্ণ। দেখিতে বড়ই ভাল লাগিত।

এই যে পুত্রকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে দেওয়া, ইহা ইংরাজী রীতি-নীতির বিকৃত অনুকরণ। সন্তান কেমন করিয়া মানুষ করিতে হয়, তাহা তাহারাই জানে। ইংরাজ পরিবারে স্বাধীনতা যথেষ্ট। পিতামাতার সঙ্গে পুত্র কন্যা স্বাধীনভাবে অহরহঃ মিলিতেছে অথচ সন্তান সকল সময়ই জানে এ স্বাধীনতার সীমা আছে। ইংরাজ পরিবারের প্রধান দেবতা Dutyর নিকট সকলই নতজানু। পিতার যেমন কর্ত্তব্য রহিয়াছে, পুত্রের ও সেই প্রকার পিতার প্রতি কর্ত্তব্য রহিয়াছে যাহা তাহাকে অবনত মস্তকে বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিতে হইবে। তাহাকে পিতা মাতাকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে যে আজ্ঞা তাঁহারা দিবেন তাহা অম্লান বদনে মানিতে হইবে তাঁহাদের নিকট সংযত বাক্, সংযত ব্যবহার হইতে হইবে।

ইংরাজ পরিবারে ভালবাসা আছে কিন্তু বৃথা দয়া নাই। যেমন ইংরাজ জাতি নিয়মের দাস, আইনের দাস, সেই প্রকার প্রত্যেক পরিবারেই বাঁধাবাঁধি নিয়ম সকল রহিয়াছে তাহা মানিয়া চলিতে হইবেই। Implicit obedience বিনা বাক্যব্যয়ে আজ্ঞা পালন ইহাদের প্রধান সূত্র। নিয়ম-ভঙ্গ করিলে পুত্রের আর রক্ষা নাই।

আমরা সন্তানের চরিত্র-গঠন সম্বন্ধে ইংরাজী অনুকরণে যে ভাবে চলিতেছি তাহাতে আমাদের ক্ষতি বই লাভ কিছুই হইতেছে না। পূর্ব্বে ছেলেদের সঙ্গে পিতা মিশিতেন না, এখন এত মিশেন যে পুত্রের উপর

শাসন সংরক্ষণ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে পুত্র পিতার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতেছে, অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

সন্তান বংশের জাতির প্রধান ধন। তাহার ঈদৃশ অপচয় চিন্তার বিষয়। যাহারা সন্তানের পিতা তাহাদের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। সন্তান যাহাতে সুস্থ, সবল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান হইয়া কালে বংশের ও দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে, সকলকেই তাহাদের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাঙ্গালীর মহিমা ও গৌরব যাহাতে একদিন সর্ব্ববিষয়ে ভারত ছাড়িয়া সমস্ত জগৎ ব্যপ্ত হইয়া পড়ে. সে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া পুত্র কন্যাগণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত।

——•o•——

# স্বাগত।

( বিক্রমপুর সম্মিলনের মুন্সীগঞ্জ অধিবেশনে পঠিত )

স্বাগত যত　　　　দেশ-জননীর
অঞ্চল-নি ধ আজি!
জানিনা কি দিয়া　　　　লইব বরিয়া,
কোন্ ফুলে ভরি' সাজি।
জননীর ডাকে　　　　মিলিয়াছ সবে
ভুলে যাওয়া স্নেহ-ক্রোড়ে
নয়নের জলে　　　　তুষিব সকলে
বাঁধিয়া বাহুর ডোরে।
জগ ত-বিজয়ী　　　　এস জগদীশ
কণ্ঠে যশের মালা!
পল্লীমায়ের　　　　বুক-চেরা ধন,
ভুবন করেছে আলা,

বিটপী লতায় কহায়েছ কথা,
জড় সে পেয়েছে সাড়া,—
ভারতের চির প্রাণের প্রবাহ
তোমাতে লভেছে ধারা।
যাদুকর! তব কুহক দণ্ড
অচেতনে দিল প্রাণ,—
তুষার গলায়ে বহাও নির্ঝর
জীবন করিয়া দান।
স্বাগত যত দুখিনী মায়ের
অঞ্চলহারা মণি!
নগরীর মোহে ভুলিয়াছ যারা
পল্লীর স্নেহ-বাণী!
এস এস এই গৌরবময়
তীর্থভূমির মাঝে,
চাঁদ কেদারের পদ ধূলি যার
ধূলিকণিকায় রাজে;
দীপঙ্করের জন্মভূমি এ,
এরি অঞ্চল-ছায়
বল্লাল রাজ উজলিলা দেশ
অতুলিত মহিমায়;
রামপাল আজো জাগায় স্মরণে
অতীত গরিমা যার,
রাজবল্লভ লভিলা যেথায়
স্তন্য-পীযুষ-ধার;—
এস আজি সেই স্মৃতির শ্মশান
গৌরব-পীঠ ভূমে,
আজিও যেথনা পদ্মার বারি
চরণ যাহায় চুমে।

অতীত কাহিনী হয়েছে স্বপন,
কি আজি কহিব আর,—
'বিক্রমপুর' হয়েছে শ্মশান,
'বিক্রম' কোথা তার!
আজিও মোদের যশে গরিমায়
গরবোন্নত শির,
বিশ্বে অতুল জ্ঞানে প্রতিভায়
সন্তান জননীর;
আজিও তেমনি ফেণিল পদ্মা,
সুনীল মেঘনা-বারি,
উদার গগণ, শ্যামল কানন,
তেমনি মানসহারী;
আজিও সন্ধ্যা আরতি-মুখর,
স্নিগ্ধ উষার হাসি,
শ্যামল আঁচল করে ঝলমল
হরিত স্বর্ণরাশি;—
তবু কা'র লাগি সকল তেয়াগি,
বিসরি' স্বজন স্নেহ,
স্তন্য ধারার ঋণ পাসরিয়া
ভুলিলে আপন গেহ?
পরবাসী যারা এসেছ আবার
পল্লী মায়ের বুকে,
যার লাগি, যার কাঁদেনি পরাণ,
তৃপ্ত আপন সুখে,—
অশ্রু সজল আঁখি দুটি মেলি
কি আজি হেরিছ হায়!—
সোণার পল্লী কোথা আজি আর,
হয়েছে শ্মশান প্রায়!

পথে পথে ওই 'হরি হরি' বোল,
গৃহে গৃহে হাহাকার,
শ্মশানের ধূমে ধূসর ছায়ায়
আবরিত চারিধার।
মহামারী আজি গ্রামের মাঝার
চিরবাস লভিয়াছে,
অসহায় যত পল্লী নিবাসী
দাঁড়াবে কাহার কাছে?
ক্ষুধায় আহার নাহি অভাগার,
তৃষ্ণায় জোটেনা বারি,
পীড়ায় কেবল নয়নের জল
সম্বল দুখহারী,
ক্রন্দনে শুধু লভিয়াছে হেলা,
যাচনায় অপমান,
দুঃখ লুকায়ে কঙ্কাল বুকে
ডাকিয়াছে ভগবান।
দেশের রতন মিলেছ সকলে
পরবাসী নরনারী,
কে মুছাবে আজ পল্লী ভ্রাতার
সিক্ত চোখের বারি?
বুঝি অভাগার ব্যথিত নিশ্বাস
প্রাণে প্রাণে আজি বাজে,
ক্রন্দন রব পশেনিক যার
নগর-হর্ম্ম্য মাঝে।—
হের সবে হের নয়ন মেলিয়া
লজ্জিত নত শির
চির অনাদরে কঙ্কাল দেহ
অভাগিনী জননীর।

স্বাগত যত দেশ জননীর
অঞ্চল-নিধি, আজি !
জানিনা কি দিয়া লইব বরিয়া
কোন্ ফুলে ভরি সাজি।
উথলে পরাণে হাসিরাশি যত
আঁখি-জলে বাহিরায়,
মিলনের যত আনন্দ আজি
ক্রন্দনে ভেসে যায় !
ঘুচাও ঘুচাও কলঙ্ক-লেখা,
মুছাও মুছাও আঁখি,
স্নেহ করুণার অঞ্চল ছায়
দৈন্য বেদনা ঢাকি।
ঋত্বিক্ ! তব মঙ্গল-গানে
তোল তোল আজি সুর,—
জয় পরমেশ ! জয় সম্রাট !
জয় বিক্রমপুর !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

---

# চ্যাণ্ডিকান নগরী (২)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে লিস্‌বন্ নগরী হইতে প্রকাশিত পর্ত্তুগীজ ভাষা নিবদ্ধ *Colleczao de documentos, ineditos*, etc. নামক গ্রন্থে বহু পর্ত্তুগীজ পর্য্যটক এবং ধর্ম্মযাজকগণের ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় পত্রাবলী ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে দুইখানা পত্রে চাণ্ডিকানের উল্লেখ আছে বলিয়া অবগত আছি। উহার প্রয়োজনীয় অংশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Philip de Brito de Nicote নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ সেনানী স্বীয় শৌর্য্য ও সাহসবলে কৌশলে সাইরাম অধিকার করিয়া বহু পর্ত্তুগীজ অধ্যুষিত ডায়েঙ্গা বন্দর অধিকার করিতে সচেষ্ট হওয়াতে আরকান-রাজ মেংরাজগী (সেলিম শাহ) Brito de Nicoteর পুত্র ও অন্যান্য বহু পর্ত্তুগীজগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন।

১৬১০ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে স্পেনের নৃপতি গোয়ার রাজপ্রতিনিধি Ruy Lourenzo de Tavora র নিকট যে পত্র লেখেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, *Philip de Brito de Nicote* স্পেনের নৃপতিকে এই মর্ম্মে জানান যে, চাণ্ডিকানের নৃপতির ধনরত্নাদি অনায়াসেই অধিকার করা যায়। চাণ্ডিকান পতি অত্যাচারী, এবং ভারতের মধ্যে একজন প্রতাপশালী নৃপতি। তিনি আরাকানের অধীন নহেন, পরন্তু গৌড়ের নৃপতির বশ্যতা স্বীকার করেন। চাণ্ডিকান রাজ্য অধিকার করিতে পারিলে বঙ্গের উপর আকবরের অন্যায় দাবী লুপ্ত হইবে। বৈভবশালী চাণ্ডিকান-পতির ধনরত্নাদি আকবরের হাতে পড়িতে দেওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। *

*Bishop Dom Fedro* নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ পাদরীর লিখিত কতিপয় পত্রও পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। লিস্‌বন্‌ নগরী হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ তারিখে গোয়ার রাজ প্রতিনিধি Dom

---

* "From a letter of the King of Spain (Lisbon, 20 Febr. 1610) to the Viceroy of Goa, Ruy Lourenzo de Tavora, we learn that Philip de Brito de Nicote had represented to the King that it was easy to seize the treasures of the King of Chandecao. He was a tyrant, one of the powerful chiefs of India, "and subject not to Arracoo, but to the King of Guouno" [Gaur]. Seizing his lands would put an end to "Akbar's" pretensions over the whole of Bengal. [Akbar had died in 1605. Note the discrepancy]. It was not advisable either that the treasures of the King of Chandecao, a man *de pouco poder e de gente pusillanimo,* should be let fall into Akbar's hands." (Cf *Colleccao de documentos ineditos,* Tom. VII, 1a Serie, Tom. I, Lisbon, 1880, p. 354.)—J. and Proc. A. S. B. *New Series,* Vol. IX. (1913). p. 242.

Jeronymo de Azevedo র নিকট Bishop Dom Pedro র লিখিত এক পত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, তৎকালে মোগলগণ চট্টগ্রাম, শ্রীপুর, চাণ্ডিকান প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিলেন। *

*Bernouilli* তদীয় গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, সাতগাঁও প্রদেশকেই পূর্ব্বে চাণ্ডিকান বলিত। †

Bengal Misson এর ফার্ণাণ্ডেজ প্রমুখ পাদরীগণের লিখিত পত্রাবলী এবং তদবলম্বনে লিখিত পাইমেণ্টা ও ডুজারিকের গ্রন্থদ্বয় হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া *Samuel Parcha* ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে তদীয় গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। পার্শার পুস্তকে চাণ্ডিকানের উল্লেখ আছে। চাণ্ডিকানকে গঙ্গার মোহানায় অবস্থিত বলিয়া পার্শা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ স্থানে গঙ্গা যে কুম্ভীরাদি জলজন্তুসঙ্কুল, এবং গঙ্গার মোহনা যে গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত হইত, পার্শার পুস্তকে এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে। ‡

ডুজারিকের গ্রন্থাবলম্বনে *Pirre D' Avity* ( Seigneur de Montmartin ) ফরাসী ভাষায় *La Monde on la description generale de ses quatres parties*, etc. নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং Paris নগরী হইতে উহা ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার গ্রন্থ অধিকাংশ স্থানেই ডুজারিকের গ্রন্থের নকল মাত্র। D' Avity র মতে শ্রীপুর ও চাণ্ডিকান

---

* "In a letter of Bishop Dom Pedro to Dom Jeronymo de Azevedo, Viceroy of Goa ( Lisbon, 15 March 1613 ), there is question of the Mogorese having taken the Porto Grande, Sripur, and Chandecao (*O Chandecas*). (Cf. *ibid*, Tom. VII, 1a serieTom. II, Lisbon, 1884, p. 392.) —*Ibid.*

† "Bexnouilil stated that the Province of Satgaon was anciently called Kandecan."—*Ibid*, p. 443.

‡ "The King of Chandecan ( wich lyeth at the mouth of Ganges ) caused" &. "This river hath in it crocodiles, which by water are no lesse dangerous then the Tygors by land, and both will assault men in their Ships." Paracha.

রাজাধর অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিল, এবং মসনদ-ই-আলি ভূঞাগণের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। *

*Sebastion Manrique* St. Angustin শ্রেণীভুক্ত, স্পেনদেশীয় জনৈক ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি ১৬২৮ হইতে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া বহুস্থান পর্য্যটন করেন। তিনি হুগলীতে এক বৎসর, ও চট্টগ্রামে ছয় বৎসর অবস্থান করেন, এবং উড়িষ্যা ( ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ), ঢাকা, গৌড়, রাজমহল, প্রভৃতি বহুস্থান পরিভ্রমণ করেন। বঙ্গের বহুস্থানে দীর্ঘকালব্যাপী পর্য্যটনের ফলে এতদ্দেশের তাৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটে। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি *Itinerario de las Missiones que hizo* শীর্ষক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তাহা রোম নগরী হইতে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থ সাধারণতঃ *Itinerary* নামেই পরিচিত। এই গ্রন্থে তিনি বঙ্গের বারভূঞার নামের যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে চাণ্ডিকানের নাম উল্লিখিত আছে। তাঁহার মতে, চাণ্ডিকান-পতি বারভূঞার একতম ছিলেন।

যে সমস্ত প্রাচীন মানচিত্রে চাণ্ডিকানের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

*Linscholen* অঙ্কিত অথবা তাঁহার গ্রন্থসংলগ্ন মানচিত্রে * ( ১৫৯৬

---

* "D' Avity copies the description of Bengal (from Du Jarric), but gives a few additional particulars of the twelve sovereigns, as he calls them. The most powerful, he informs us, were those of "Sripur et Chandecan, mais le Masandolin on Moasudalin," is the chief"—J. A S. B. Vol. XI. IV, ( 1875 ), Part I. p. 1810.

* Hankluyt series এর অন্তর্গত করিয়া Burnell এবং Tiele Linschoten এর যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে Linschoten অঙ্কিত কোন মানচিত্র নাই। কিন্তু Rev. H. Hosten লিখিয়াছেন,—'It ( chandecan ) is to breaced in the earlier edifious of van Linschoten, wheoe Angelim [ Hijiti ] is placec din the Island of Chandecen" ( J and Proc. A. s. B. New series, Vol, IX, p 443 ) অপরন্তু, William Footer সম্পাদিত *Embassy of Sir Thomas Roe to India* নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে ( ৫৪৪ পৃঃ ) লিখিত আছে— 'The coast line and the chief ports ( of Bengala ) had been given with fair accuracy in Linschoten's map ( see the English edition of 1598 ) ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, Lisnchoten অঙ্কিত একখানা মানচিত্র আছে।

খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী ) গঙ্গার মোহনাস্থিত একটী দ্বীপ চাণ্ডিকান নামে চিহ্নিত হইয়াছে, এবং হিজলি (Angelim) ঐ দ্বীপে অবস্থিত বলিয়া চিহ্নিত আছে।

১৬০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে *Father A. Monserrate* কর্ত্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে গঙ্গার মোহনাস্থ একটী শাখার সাগরসঙ্গমস্থলে সমুদ্রতটে চাণ্ডিকান চিহ্নিত আছে। ‡

Sir Thomas Roe র গ্রন্থসংলগ্ন *William Baffin* কর্ত্তৃক লণ্ডন নগরীতে ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত *A Description of East India conteyninge the Empire of the Great Mogoll* নামক প্রসিদ্ধ মানচিত্রে গঙ্গার মোহানাস্থ একটী দ্বীপ *Ile de chandacan* নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এই দ্বীপে সাগর তীরে হিজলি ( Angeli ) নগরী চিহ্নিত আছে।

পিটার হেলেনের *Cosmography* নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থসংলগ্ন *Philippi chefwind* কর্ত্তৃক ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত A S I Æ *Discriptio Nova Impensis* নামক মানচিত্রে গঙ্গার মোহানাস্থ একটী বদ্বীপকে *chadcan* নামে চিহ্নিত করা হইয়াছে।

*Mandelolo* র ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে Amsterdam হইতে প্রকাশিত *Voyages Celbres of remrrquables Faits de perse Aux Indes Orien tales* নামক গ্রন্থ সংলগ্ন *Pierre vander* কর্ত্তৃক অঙ্কিত *Royaume du grand Mogol* নামক মানচিত্রে গঙ্গানদীর একটী বদ্বীপে সমুদ্রতটে *Chandacan* নগরী চিহ্নিত আছে।

১৫৬১ খৃষ্টাব্দে Gastaldi কর্ত্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে চাণ্ডিকানের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু গঙ্গার একটী বদ্বীপের একটী অন্তরীপ C:Sigora ( সাগর ) নামে চিহ্নিত হইয়াছে।

---

‡ "Father A. Mouserrate's map ( ante 1600 ) mentions chandecan. He places it on the coast, at the mouth of one of the outlets of the Ganges ; but, as he did not visit Bengal, his authority in this matter amounts to little." I and Proe, A. S. B. *New Series* Vol IX (*1913*) P. 443.

লিস্‌বন্‌ হইতে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Joao de Barros এর Da Asia (Iom IV, of 2) নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থ সংলগ্ন *Descripcao do Reino de Bengalla* নামক মানচিত্রে চাণ্ডিকানের উল্লেখ নাই, কিন্তু Gastadi যে দ্বীপস্থ অন্তরীপকে Sigora নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই অন্তরীপই C. Cegogora (সাগর) নামে চিহ্নিত হইয়াছে।

Dordrecht নগরী হইতে ১৭২৪—২৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Francois Valentyn এর গ্রন্থসংলগ্ন Von den Broucke কর্ত্তৃক অঙ্কিত Nieuwe kaarte van't koninkyk Bengala নামক মানচিত্রে চাণ্ডিকান উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু গঙ্গার একটি সাগরতটস্থ দ্বীপ Sagoor (সাগর), এবং তৎপার্শ্ববাহী গঙ্গার এক শাখা নদী Sagoor Riv, (সাগর নদী) নামে চিহ্নিত হইয়াছে; এবং উহার কিঞ্চিৎ উত্তর পূর্ব্বে গঙ্গার এক শাখা নদীর তীরে Jessoor (যশোহর) নগরী চিহ্নিত আছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

—•০•—

# বিক্রমপুর।

( ১ )

মেঘনা ধ্বনিছে গুরু গম্ভীরে যাহার কীর্ত্তি ঘোষণা,
বন্দনা-গীতি, গায়িছে কুঞ্জে লক্ষ বিহগরসনা;
দীপঙ্করের, পুণ্য-প্রদীপে দীপ্ত ছিল যাঁর অঙ্ক,
আদমের সেই পীঠস্থান এযে নির্ম্মল অকলঙ্ক।
উদ্ধত ভীম পদ্মা ছুটিছে যাঁহার চরণ চুমি
মোদের জন্মভূমি সেযে গো মোদের জনমভূমি।

( ২ )

যাঁহার কোলেতে জন্ম লইল চাঁদকেদার রায়,
মহিমা যাঁদের এখনো জগতে পদ্মামেঘনাগায় ;
যাঁহার ললনা নহে সামান্যা অনলকুণ্ড জ্বালি
নারীর গৌরব বজায় রাখিতে দিলগো জীবন ডালি।
আদিশূর যাঁর ধন্য হইল চরণ কমল চুমি
মোদের জন্মভূমি সে যেগো মোদের জনম ভূমি।

( ৩ )

যাঁর 'প্রসন্ন' চিন্তার শিখায় উজল করিল বিশ্ব,
যাঁর দানবীর শ্রীনাথ, জানকী বলীর ধর্ম্মে হইল নিঃস্ব ;
যাঁর সন্তান 'বিজ্ঞান রাজ' ধরার গৌরব রবি।
পুত্র যাঁর সৌম্য শান্ত, 'সাগরের' মহা কবি।
শৈলেন, যোগেন জাগাল আবার যাঁহার স্মিরিতি খানি—
মোদের জগতরাণী সেযে গো মোদের হৃদয়-রাণী।

( ৪ )

মা তোর কোলেতে মিলেছে আসিয়া দেশের রতন রাজি ;
তোমার দৈন্য করিতে ছিন্ন জুটেছে সকলে আজি— ;
মধুর ছন্দে বন্দনা তব গাহে সন্তান দিগ-দিগন্তে,
পূজিতে তোমায় প্রাণ ভরি আজ জুটেছি তোমারি চরণ প্রান্তে।
যাঁহার পূজার অর্ঘ্য এনেছে 'জগতের শিরোমণি,
বিদ্যা-বিভব-দায়িনী সেযেগো মোদের জগত রাণী।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।
"বান্ধব—কুটীর" ঢাকা

বিক্রমপুর সম্মিলনের মুন্সীগঞ্জ অধিবেশনে পঠিত।

—:০:—

# লর্ড কারমাইকেল কর্ত্তৃক

## শেখরনগর পূর্ণচন্দ্র ডিস্‌পেন্‌সেরীর দ্বারোদ্ঘাটন।

মহৎ ব্যক্তিগণের জীবন ও কর্ম্মই লোক সাধারণের প্রধান শিক্ষাস্থল; সুতরাং তাঁহাদের স্মৃতি যত সমুজ্জ্বল হয় লোক সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। যাঁহার পুণ্য-স্মৃতি রক্ষার জন্য শেখরনগর দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইয়াছে তাঁহার নাম "সাধু পূর্ণচন্দ্ররায়"। মহাত্মা পূর্ণচন্দ্র সংত পরহিতৈষী, পরম ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। সংসারের শত কর্ম্মের মধ্যেও তাঁহার দৃষ্টি অনুক্ষণ ঊর্দ্ধদিকে নিবদ্ধ ছিল। তিনি ৫২ বৎসর কাল ওকালতি করেন। এই সুদীর্ঘ কর্ম্ম জীবনে তিনি কদাচ একটী অন্যায় কার্য্য বা পরের কোন অপকার করেন নাই। বস্তুতঃ তাঁহার জীবন এবং মৃত্যু ও অতীব শিক্ষাপ্রদ। আমরা বারান্তরে "বিক্রমপুরের" পাঠকগণকে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিব।

১৩১৩ সনের কার্ত্তিক মাসে পূর্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। তাঁহার যশস্বী পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় মহাশয় কোন লোক হিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যবান পিতার স্মৃতি রক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং দেশে চিকিৎসালয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া শেখরনগরে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করাই যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিলেন। ১৩২০ সনে ইছামতী তীরে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তিনি চিকিৎসালয় নির্ম্মানের আয়োজন করেন, এবং গত বৈশাখ মাসে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহার কর্ত্তব্য একরূপ সম্পন্ন হইয়াছে ভাবিয়া তনি বিলক্ষণ আত্ম প্রসাদ অনুভব করিলেন। তখন তিনি মনে করেন নাই যে এই চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন ব্যাপারও একটী স্মরণীয় ঘটনায় পর্য্যবসিত হইবে।

গত জুলাই মাসের মধ্যভাগে যখন তিনি স্বাস্থ্য লাভের জন্য সপরিবার বারাণসী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও মুন্সীগঞ্জের সব ডিভিজনেল অফিসর "পূর্ণচন্দ্র ডিসপেন-সেরীর" অবস্থান ও গৃহাদি পরিদর্শনের জন্য শেখরনগর গমন করেন, এবং

জানাইয়া আসেন যে গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর তাহার দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি বাড়ীর গোমস্তার পত্রে এই সংবাদ অবগত হইলেন। প্রথমে তাহার বিশ্বাস হইল না। পরে কতিপয় বন্ধুর এবং ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের পত্রেও অবগত হইলেন যে গভর্ণর বাহাদুর ৬ই আগষ্ট "শেখরনগর পূর্ণচন্দ্র ডিস্‌পেন্‌সেরীর" ও হাসারা জয়কালী ডিস্‌পেন্‌সেরীর" দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। রায় মহাশয় চিন্তিত হইলেন। তখন নিজের ও পরিবারের প্রায় সকলেরই অসুখ। সহসা ঢাকার কমিশনার ও ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত দেখা করিতে পারিলেন না। ২৬ শে জুলাই ঢাকায় যাইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রায় মহাশয়ের আগ্রহে এবং কমিশনার মহোদয়ের উদ্যোগে স্থির হইল যে গভর্ণর মহোদয় রায় মহাশয়ের বাড়ীতেও পদার্পণ করিবেন। রায় মহাশয় বিপুল উৎসাহে শেখরনগর গমন করিলেন এবং বঙ্গেশ্বরকে স্বভবনে অভ্যর্থনা করিবার সম্যক আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু একে বিক্রমপুর তাহাতে বর্ষাকাল। অতি অল্প সময় মধ্যে ইছামতী তীর হইতে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত ৬০০ শত ফুট রাস্তা সুসজ্জিত করিতে হইবে, তন্মধ্যে ডিস্‌পেন্‌সেরীর পশ্চাতে একটী নালা বর্ষার জলে ভরিয়া ৮০ ফুট প্রশস্ত হইয়াছে, তাহার উপর সুপরিসর সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে; বর্ষার ধারায় পথ কর্দ্দমাক্ত না হয় তাহার উপায় করিতে হইবে এবং গভর্ণর বাহাদুরের জাহাজ বাঁধিবার জন্য ইছামতী তীরে একটী সুদৃঢ় উত্তরণ মঞ্চ (জেটী) নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তদুপরি লাট বাহাদুর তাঁহার গৃহে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে কোন বিঘ্ন বা অমঙ্গল না ঘটে তজ্জন্য ও যার পর নাই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। যাহা হউক, রায় মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ কর্ম্ম ক্ষমতা ও অর্থব্যয়ে ৫ই আগষ্ট অপরাহ্নে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। এমন সময় মুন্সীগঞ্জের সব ডিভিজনেল অফিসর মিঃ লোথিয়েন তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি চারিদিকে দৃষ্টি পাত করিয়াই বলিলেন "I congratulate you Srinath Babu, you have done wonders."

বস্তুতঃ ইছামতী তীর হইতে রায় মহাশয়ের বাড়ী পর্য্যন্ত স্থান এক নূতন শ্রীধারণ করিয়াছিল। জেটী হইতে ডিস্‌পেন্‌সেরী পর্য্যন্ত এবং

তথা হইতে রায় মহাশয়ের বাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত পথ লোহিত বর্ণের আস্তরণে আচ্ছাদিত হইয়াছিল; মনোহর পত্র—পুষ্পশোভিত তিনটী বৃহৎ তোরণ, বিবিধ বর্ণের সহস্রাধিক পতাকা ত্রিশতাধিক কদলি বৃক্ষ, রঙ্গিন কাগজের বিচিত্র লতা-পুষ্প এই পথ ও তাহার উভয় পার্শ্বস্থ ভূমির শ্রীসম্পাদন করিয়াছিল। সেতুর দক্ষিণ দিগবর্ত্তী কুম্ভকার পল্লী খাকি নীল বর্ণের হইয়াছিল। গভর্ণর মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য বহির্ব্বাটির নাট মন্দির, তাহার চতুর্দ্দিকের গৃহ গুলি এবং সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান ও অতি মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। রায় মহাশয়ের দ্বিতল অট্টালিকার গম্বুজের উপর সুশোভন য়ুনিয়ন্ জ্যাক্ উড়িতেছিল।

৬ই আগষ্ট প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া রায় মহাশয় সকল আয়োজন পুনরায় পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তখন পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ ওয়ারেন তাঁহার লন্স্ সহ উপস্থিত হইলেন। অতঃপর রায় মহাশয় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ডিস্‌পেন্‌সেরীর ডাক্তার ও ডিসপেন্‌সেরী কমিটীর সভ্যগণকে লইয়া ইছামতী তীরে লাট সাহেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ৮ টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবডিভিজনেল অফিসরের লন্স্ এবং তৎপশ্চাৎ গভর্ণর মহোদয়ের জাহাজ উপস্থিত হইল। প্রথমে লাট সাহেবের জাহাজ কিছুদূরে রহিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তীরে উঠিয়া চারদিকের সুন্দর দৃশ্য ও সুসজ্জিত জেটী দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং জেটীর মাথায় ১০ ফুট জল রহিয়াছে জানিয়া গভর্ণর মহোদয়ের জাহাজে সংবাদ পাঠাইলেন। জাহাজের ফনেল দৃষ্টিগোচর হওয়া অবধিই নদীতীর হইতে বমের আওয়াজ হইতেছিল। ক্রমে জাহাজ ধীরগতিতে আসিয়া জেটীতে লাগিলে বোমাধ্বনি ক্ষান্ত হইল। রায় মহাশয় অতি পূর্ব্বে ময়মনসিংহের রাজ-প্রাসাদে দুইবার গভর্ণরের অভ্যর্থনা করিয়াছেন, সুতরাং গভর্ণর বাহাদুর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে চিনিতেন। জাহাজের দ্বিতল হইতেই তিনি স্মিতমুখে রায় মহাশয়ের অভিবাদন গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কমিশনার মিঃ ফেন্স্ ও প্রাইভেট সেক্রেটেরী মিঃ গোরলে, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ম্যাক্‌করম্যাক রিভার পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ ক্লিয়ার ও এডিকং সমভিব্যাহারে নদী তীরে উত্তরণ করিলেন, এবং রায় মহাশয়ের হস্তামর্ষণ করিয়া অবিলম্বে "পূর্ণচন্দ্র

দাতব্য চিকিৎসালয়ের” দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের অভিপ্রায় অনুসারে রায় মহাশয়ই ডিস্‌পেন্‌সেরী কমিটির সভ্যদিগের পরিচয় প্রদান করিলেন। বঙ্গেশ্বর প্রত্যেককে কর-মর্দ্দনে আপ্যায়িত করিলেন। অতঃপর রায় মহাশয় তাঁহার হস্তে ডিসপেন্‌সেরীর চাবি প্রদান করিলে তিনি তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, “May I now declare the Disdensary open ?” ইহা বলিবা মাত্রই কমিশনার প্রমুখ সাহেবগণ টুপী নামাইলেন। “Yes, if it please your Excellency”—বলিয়া রায় মহাশয় সম্মতি জানাইলে বঙ্গেশ্বর স্বহস্তে চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। তখন তখনই রূপার তালা ও চাবি কৌতুহলের সহিত অবলোকন করিয়া তাহা কোথায় কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে অনুসন্ধান করিতে মিঃ গৌরলেকে আদেশ প্রদান করিলেন। চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার সকল প্রকোষ্ঠ ও আসবাব দেখিলেন। অতঃপর Visi tors' Book এ লিখিলেন :—

6th August, 1915. I have very great pleasure in opening the Dispensary and hope it will prove a great boon to the people in the neighbourhood.

Sd/. Carmichael.

তাহার নিম্নে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হার্ট লিখিলেন :—

“All the arrangements for the opening ceremony by his Excellency the Governor were excellent.”

রায় মহাশয় ডিস্‌পেন্‌সেরীর এক প্রকোষ্ঠে মিঃ গৌরলের সহিত কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে গভর্ণর মহোদয় কমিশনার সাহেবের সহিত ডিস্‌পেন সেরীর পশ্চাতে রায় মহাশয়ের গৃহাভিমুখী সেতুর উপর উপস্থিত হইলেন। সেতুর উপর হইতে কমিশনার মিঃ ফ্রেন্স্‌ তাহাকে ডাকিতেছেন শুনিয়া তিনি দ্রুত গতিতে লাট সাহেবের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। সেতুটী স্থায়ী কিম্বা বর্ত্তমান কার্য্যোপলক্ষে নির্ম্মিত হইয়াছে ইহাই হইল প্রথম প্রশ্ন। রায় মহাশয় ইহার উত্তর প্রদান করিলেন, গবর্ণর বাহাদুর তাঁহার বাড়ীর রিজার্ভ ট্যাঙ্কের পারে উপস্থিত হইলেন। পুষ্করিণীটী দেখিয়াই তাহার জল

কেমন থাকে, তাহাতে মাছ আছে কিনা, কি কি মাছ আছে, যে যে মাছে অন্য মাছ খাইয়া ফেলে তাহা আছে কিনা, তাহাদের কি কি নাম, ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান লইলেন এবং পুকুরের জলে ভাসমান গোলাকার পাত্রে মানুষ দেখিতে পাইয়া অতিশয় কৌতুহল পরবশ হইলেন। রায় মহাশয় তাঁহাকে জানাইলেন যে, বর্ষাকালে বিক্রমপুর জলে ভাসিয়া যায়, তখন এই মৃন্ময় ভাণ্ডই গরীব লোকদিগের নৌকার কাজ করে। ইহাতে করিয়া তাহারা হাট বাজার করে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরেও যায়, অনেক গরীব বালক ইহাতে চড়িয়া স্কুলেও যাইয়া থাকে। ইহার নাম চারি, ইহার এক একটীরমূল্য ১৲ হইতে ১৷৵০ আনা। বঙ্গেশ্বর শুনিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং গরীব লোকের পক্ষে ইহার উপকারিতার কথা বলিয়া, নৌকার তুলনায় ইহার গতি অতি ধীর কিনা জানিতে চাহিলেন। তখন রায় মহাশয়ের আদেশে তিনটী চারির বাইছ্ হইল। চারির গতি, বাহক দিগের নিপুণতা দেখিয়া লাট মহোদয় বিস্মিত হইলেন। রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ইহাতে উঠিতে পারেন কিনা। রায় মহাশয় উত্তর করিলেন, তিনি উঠিতে পারেন না, কারণ তাহা অভ্যাস সাপেক্ষ, অনভ্যস্থ ব্যক্তি উঠিতে গেলে সমতা রক্ষা করিতে পারিবে না, সুতরাং চারি ডুবিয়া যাইবে।

এইরূপ নানা কথা বলিতে বলিতে এবং চারিদিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে গভর্ণর বাহাদুর রায় মহাশয়ের বহির্ব্বাটীর পুষ্পোদ্যানের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন শত শত পুরনারী সমস্বরে হুলুধ্বনি করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিলেন। অদূরে কুম্ভকার কুনাল চক্রে কলিকা নির্ম্মাণ করিতেছিল, তৎপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এক একটী কলিকা কেমন তাড়াতাড়ি নির্ম্মিত হয় তাহা জানিতে চাহিলে কুম্ভকার তৎক্ষণাৎ একটী পাতিল তৈয়ার করিয়া দেখাইল। অতঃপর তিনি সম্মুখস্থ নাট মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দ্বার দেশের অদূরে রায় মহাশয়ের পুরোহিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদন মোহন বিদ্যানিধি পুষ্পমালা হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিলে রায় মহাশয় বলিলেন, "ইনি আমার পুরোহিত, আপনাকে অভ্যর্থনা ও আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন।" অমনি ২।৩ খানা চেয়ার নিজ হাতে সরাইয়া

গবর্ণর বাহাদুর পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে গেলেন। বিদ্যানিধি মহাশয় স্বরচিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া এবং বঙ্গভাষায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বঙ্গেশ্বরকে অভিনন্দিত করিলেন। তৎপর তিনি খর্ব্বাকৃতি বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট মস্তক অবনত করিলে বিদ্যানিধি তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা পরাইয়া দিলেন।

গভর্ণর মহোদয় আসন-পরিগ্রহ করিলে বালিকা বিদ্যালয়ের তিনটী ছাত্রী তাঁহার সম্মুখে, বামে ও দক্ষিণে টেবিলের তিন দিকে দাঁড়াইয়া এবং পশ্চাৎ হইতে অন্যান্য বালিকাগণ প্রায় ১০ মিনিট কাল একটী গান গাহিল। তিনি অতীব মনোযোগের সহিত গান শুনিলেন, বালিকাদের মধ্যে রায় মহাশয়ের কন্যা কেহ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাদিগকে ৭ দিনের ছুটী দিলেন।

নাট মন্দির হইতে বাহির হইয়া তিনি পুনরায় পুষ্পোদ্যানের নিকটে দাঁড়াইলেন। রায় বাটীর অট্টালিকাদির কোন্‌টী কখন নির্ম্মিত হইয়াছে, পুষ্পোদ্যান কবে তৈয়ার হইয়াছে, বাড়ীর সীমানা কি, পশ্চাদ্ভাগে আর একটী পুষ্করিণীর প্রয়োজন কি ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান লইলেন। বাড়ীর সীমার মধ্যে কতিপয় খড়ের ঘর দেখিয়া তাহার আবশ্যকতা কি তাহাও জানিতে চাহিলেন। রায় মহাশয় জানাইলেন যে ঐ সকল ঘরে তাঁহার ভৃত্যগণ সপরিবারে বাস করে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের সম্ভাষণ কালে গভর্ণর মহোদয় তাঁহার গায়ে একখানা রেশমী উড়ানী দেখিয়াছিলেন। তাহা কোথায় তৈয়ার হয় এবং তাহাতে কি লেখা আছে জানিতে চাহিলে রায় মহাশয় বলিলেন যে উহা বারাণসীতে তৈয়ার হয়, হিন্দুদেবতাদিগের নাম উহাতে লিখিত আছে। যাঁহার অনুসন্ধিৎসার ফলে মুরসিদাবাদের রুমাল "কারমাইকেল হ্যাণ্ড্‌কারচিফ" নাম পাইয়াছে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচিত্র নামাবলি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

এইবার গভর্ণর বাহাদুর নদী তটাভিমুখে ফিরিলেন। কথা-প্রসঙ্গে রায় মহাশয়কে বলিলেন "দেখুন, আমার ইচ্ছা হয় আমি আরও দেখি, নিজে দেখিয়া শুনিয়া লোকের সকল অবস্থা অবগত হই, কিন্তু গভর্ণরের

সময় কোথায় ? দেখিতে দেখিতে সকলে ইছামতী তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন রায় মহাশয় কমিশনার মহোদয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন :--

"I feel exceedingly honoured by the visit of His Excellency to my house. To show my gratitude and to commemorate the event of his ausp cious visit I wish to place in His Excellency's hand a sum of Rs 2000 to be disposed of by His Excellency in whatever way he pleases for the good of this village."

ইহা শুনিয়াই লাট মহোদয় স্মিতমুখে বলিলেন :—

"This two thousand Rupees should go to the improvement of the Dispensary."

এই সময়ে ইছামতীর বক্ষ অগণিত নৌকায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। গভর্ণর বাহাদুর তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে রায়মহাশয় বলিলেন, "এসকল গ্রাম্য লোক কখনও কমিশনর সাহেবকেও দেখে নাই, আজ স্বয়ং বাঙ্গালার গভর্ণর আগমন করিয়াছেন; সুতরাং পার্শ্ববর্ত্তী সকল গ্রামের লোক তাহাদের লাট সাহেবকে দেখিবার আশায় উপস্থিত হইয়াছে। লর্ডকারমাইকেল হাসিতে হাসিতে অসংখ্য কণ্ঠের অসংখ্য জয়ধ্বনির মধ্যে জাহাজে আরোহণ করিলেন। জাহাজে উঠিয়াও যতক্ষণ লোকারণ্য দৃষ্টি গোচর হইতেছিল ততক্ষণ তাহাদের দর্শন লালসার তৃপ্তির জন্য তিনি বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন।

এসময়ে আর একটী দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিন খানা সুদীর্ঘ নৌকা একখানা জলকর একখানা ছিপ ও একখানা ঘাসি লাট সাহেবকে বাইছ্‌ প্রদর্শনের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সজ্জিত হইয়াছিল। এক এক খানা নৌকায় ৪০ হইতে ৬০ জন দাঁড়ী বিবিধ বর্ণের পাগড়ী মাথায় বাঁধিয়া ক্ষেপনী হস্তে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। লাট সাহেবের জাহাজ ছাড়িবামাত্র তাহারা পরস্পরের সহিত এবং লাট সাহেবের জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তালে তালে দাঁড় ফেলিয়া পবন বেগে উত্তরাভিমুখে ছুটিল। গভর্ণর মহোদয় বিক্রমপুরের দ্রুতগামী নৌকা ও মাঝিদের নিপুণতা দেখিতে দেখিতে শেখরনগর পরিত্যাগ করিলেন।

গভর্ণর মহোদয়ের আগমনের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই বহুসংখ্যক পুলিশ কর্ম্মচারী ও গোয়েন্দা শেখরনগরে আড্ডা করিয়াছিল। বলাবাহুল্য রায় মহাশয় তাঁহাদের প্রতি যথাযোগ্য আ তথেয়তা প্রদর্শনে কুণ্ঠীত হন নাই। কেবল পুলিশ কর্ম্মচারিগণের হাতে লোক সমাগম নিয়ন্ত্রিত করিবার ভার থাকিলে লোকের বিস্তর ক্লেশ হইবে ভাবিয়া তিনি নিজেও এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে জলে স্থলে ও দালানের ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া অসংখ্য নরনারী লাট সাহেবকে দর্শন করিয়াছিল; কিন্তু সর্ব্বত্র এমন শৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়াছিল যে যতক্ষণ লাট সাহেব তাঁহার বাড়ীতে ছিলেন ততক্ষণ সামান্য মাত্র গোলমাল বা একটী উচ্চ কথাও শ্রুত হয় নাই। পুলিশ কর্ম্মচারীগণের ব্যবহার ও সম্যক্ সন্তোষজনক হইয়াছিল।

গভর্ণর মহোদয় পূর্ণচন্দ্র ডিসপেনসারীর উন্নতির জন্য স্বয়ং আরও ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

---

# বিক্রমপুর সম্মিলন।

বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার বিরাট অধিবেশন এবার মুন্সীগঞ্জে অতিশয় সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিগত ১১ই পৌষ সোমবার ও ১২ই পৌষ মঙ্গলবার এই দুই দিন সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল। এ সম্মিলনে প্রবাসী বিক্রমপুরবাসগণ যে উৎসাহ ও আনন্দের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, দেশের কল্যাণ কামনায় একযোগে কার্য্য করিবার জন্য যেরূপ আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ বড়ই আনন্দের বিষয়।

মুন্সীগঞ্জের অধিবাসীবৃন্দ সম্মিলনীর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার জন্য মনে-প্রাণে যেরূপ খাটিয়াছিলেন সে কথা স্মরণ করিতে গেলেও আনন্দে প্রাণ বিভোর

হইয়া উঠে। এইরূপ বিরাট সম্মিলন বিক্রমপুরে শীঘ্র হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হয় না। এই সভায় ধনী নির্ধন, ছোট বড় কৃষক শিল্পী প্রভৃতি সর্ব্ব শ্রেণীর লোক মিলিত হইয়াছিল। এই সভায় জাতিভেদের সঙ্কীর্ণতা ছিল না।

## সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আগমন ও অভ্যর্থনা।

সম্মিলনীর সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সি, এস, আই মহোদয় সস্ত্রীক ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে মুন্সীগঞ্জ আগমন করিবেন, এ সংবাদ বহুপূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় উক্ত তারিখে ঢাকা, নারাণয়গঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ এবং বিক্রমপুরের অন্যান্য নানাস্থান হইতে বহুবিশিষ্ট ভদ্রলোক নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমার ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিলেন। ষ্টীমার নারায়ণ-গঞ্জ পৌছিলে উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ ও বালকগণ উচ্চকণ্ঠে 'জয় জগদীশ-চন্দ্রের জয়' ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন। ষ্টীমার তীরে লাগিলে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক স্বনামপ্রসিদ্ধ দানশীল রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় বাহাদুর, কুমার প্রথমনাথ রায়, শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় প্রভৃতি ভাগ্যকুল রায় পরিবারের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবৃন্দ এবং শ্রীযুক্ত শিবেশ্বর সেন, শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর সেন, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, "বিক্রমপুর" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বসু মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টীমারে গমন করেন। ডাঃ বসুর সঙ্গে বিক্রমপুরসম্মিলনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার, 'বার্ত্তাবহ' সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন প্রভৃতি কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জ হইতে সভাপতি মহাশয় রায় বাহাদুরের লঞ্চে মুন্সীগঞ্জ গমন করেন।

মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কিশোরীগঞ্জের চর হইতে তাঁহাকে পাকী সহযোগে মুন্সীগঞ্জ লইয়া যাওয়া হয়। যে পথে তিনি মুন্সীগঞ্জের দিকে অগ্রসর হন তাহার উভয় পার্শ্ব কলাগাছ ও লতা-পতাকা দ্বারা বিশেষরূপ সুসজ্জিত করা

হইয়াছিল। তাঁহার পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পাঁচশত বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও স্বেচ্ছাসেবক উচ্চৈঃস্বরে 'জয় জগদীশচন্দ্রের জয়' 'জয় বিক্রমপুরের জয়' 'জয় সম্রাটের জয়' ইত্যাদি রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সহরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

মুন্সীগঞ্জের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর সেনের বহির্ব্বাটিতে বসু দম্পতীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ডাঃ বসু মহাশয়কে দেখিবার জন্য সেখানে এক বিরাট জনতার সমাবেশ হইয়াছিল।

## প্রথম দিন।

সভা আরম্ভ হইবার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার বাসস্থান হইতে সভামণ্ডপে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণের মধ্যে অনেকেই রত্নেশ্বর বাবুর বাসায় গমন করেন। সেখান হইতে এক শোভা-যাত্রা করিয়া সকলে সভামণ্ডপে উপস্থিত হন। শোভা-যাত্রার শৃঙ্খলা অতি মনোরম হইয়াছিল। সর্ব্বাগ্রে স্বেচ্ছাসেবকগণ, তৎপরে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ও সভ্যগণ, তাঁহাদের পশ্চাতে বিক্রমপুর-মুকুট ঋষিক জগদীশচন্দ্র। তাঁহার পরিধানে গরদের জোর ছিল; তাঁহার শুদ্ধশান্ত সৌন্দর্য্যে চতুর্দ্দিক সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সভাপতির ঠিক পার্শ্বেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় ছিলেন। সভাপতি মহাশয় সভায় পৌঁছিলে ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে সেই আনন্দ-বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে জ্ঞাপিত হয়, এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

সভার কার্য্যারম্ভে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক বাবু অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ সুললিত স্বরে সংস্কৃত ভাষায় স্বস্তিবচন পাঠ করেন। অতঃপর উদীয়মান কবি শ্রীযুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ এম এ ও শ্রীযুক্ত শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ কবিতা পাঠ করেন। কবিতা পাঠের পর আবাহন-সঙ্গীত গীত হয়। গানটী অতিশয় হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। সঙ্গীতের পর অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শৈলেন্দ্র বাবু তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। শৈলেন্দ্র বাবুর অভিভাষণ পঠিত হইলে ঘন ঘন করতালি ধ্বনির মধ্যে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রায় জানকীনাথ রায় বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণের

কিয়দংশ পাঠ করিয়া,—উহা বিক্রমপুর-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের হস্তে অর্পণ করেন। যোগেন্দ্র বাবু তাঁহার স্বাভাবিক সুললিত উচ্চ কণ্ঠে অভিভাষণ পাঠ সমাপন করেন।

অতঃপর কুরসাইল গ্রাম নিবাসী অনারেবল রায় শরচ্চন্দ্র সেন বাহাদুরের প্রস্তাবে ও কুমার প্রমথ নাথ রায় বাহাদুরের সমর্থনে সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'সভাপতি বরণ' শীর্ষক সঙ্গীতটি গীত হয়।

তৎপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি তাঁহার অভিভাষণটী সমগ্র নিজে পাঠ না করিয়া বিক্রমপুর-সম্মিলনীর সম্পাদক, কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর পড়িবার ভার দেন। তিনি উহার প্রায় সমুদয় অংশ পাঠ করেন,—কিন্তু শেষাংশ স্বয়ং সভাপতি মহাশয় পাঠ করেন। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে পুনরায় আর একটী সঙ্গীত গীত হয় ও সেদিনকার মত সভার কার্য্য শেষ হয়। আমরা এখানে অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শৈলেন্দ্র বাবু সভাপতি রায় জানকীনাথ রায় বাহাদুর এবং সভাপতির সমর্থনকারী কুমার প্রথমনাথ রায়ের বক্তৃতা মুদ্রিত করিলাম।

## অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

এই সভায় আমার বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যিনি সর্ব্ব সিদ্ধি-দাতা এবং সকল মঙ্গলের আকর সেই ভগবানের চরণে আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দ! সম্মিলনীর কার্য্যে আপনাদের উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া আমার প্রাণ আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। এমন ভাষা আমার নাই, যাহা দ্বারা আমার হৃদয়ের আবেগ আপনাদিগকে জানাইতে পারি। আপনারা আমার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমাদের এই শুভ মিলনের নিদানভূত "বিক্রমপুর সম্মিলনী" সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সম্ভবতঃ আপনারা অনেকেই অবগত

আছেন. গত কয়েক বৎসর যাবৎ কলিকাতা মহানগরীতে "বিক্রমপুর সম্মিলনী" নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। বিক্রমপুরের সর্ব্ববিধ হিতসাধনই তাহার উদ্দেশ্য। আমাদের বিক্রমপুরেরই কৃতী সন্তান যোলঘর-নিবাসী, মহামান্য হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি প্রথিতনামা স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয় উক্ত সম্মিলনীর সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

বিগত বর্ষে উক্ত সম্মিলনীর একটী শাখাসমিতি মুন্সীগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং সেই শাখা সম্মিলনীর উদ্যোগে এই সম্মিলনীর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইল। লক্ষ্মী সরস্বতীর একত্র সমাবেশসাধন করিয়া যাঁহারা বিক্রমপুরের গৌরব-স্তম্ভ স্বরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, ভাগ্যকূলের সেই দানশীল জমিদারগণের অন্যতম রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় বাহাদুর সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির পদে বৃত হইয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহারই অগ্রজ স্বধর্ম্মপ্রাণ রাজা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় মহোদয় স্বকীয় উদারতা গুণে বার্দ্ধক্যজনিত অপারগতা স্বত্বেও অভ্যর্থনাসমিতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় যে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়াতে এ কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি নিজে আসিতে না পারিলেও, সম্মিলনীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় সহানুভূতি আছে এবং তিনি কার্য্যেও তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। তিনি তাঁহার কৃতী পুত্র কুমার শ্রীমান প্রমথনাথ রায়কে এই সভায় প্রেরণ করিয়াছেন; এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সম্মিলনীর বর্ত্তমান অধিবেশনের সাহায্যার্থ ইতঃপূর্ব্বে একশত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন এবং আরও অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কুমার প্রমথনাথও ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার নাম স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে মুন্সীগঞ্জে একটী club house নির্ম্মাণ জন্য সাত হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

অভ্যর্থনাসমিতির বর্ত্তমান সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় বাহাদুর মহাশয়কে আপনাদের নিকট পরিচয় করিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা-মাত্র। অসামান্য লোকহিতৈষিতা ও স্বদেশপ্রীতির জন্য ইহার যশঃ কেবল মাত্র বঙ্গদেশেই আবদ্ধ নহে। ধর্ম্মার্থে ও দেশ-হিতের জন্য ইনি ইহার বিপুল ধন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে ইঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কেহই কখনও নিরাশ হয় নাই। বর্ত্তমান অনুষ্ঠানেও আপনারা নিশ্চয়ই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদকরূপে আমার বক্তব্য আমি প্রায় শেষ করিয়াছি। ইহার সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়কে আপনাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়া আমি আসন গ্রহণ করিলাম। উপসংহারে নিবেদন করিতেছি, অতি অল্প সময় মধ্যে আমাদিগকে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। দেশের যে সকল মনীষিবৃন্দ বিদেশে আছেন, এবং নানাস্থান হইতে বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক এ স্থানে জন্মভূমির হিতকামনায় সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই তজ্জন্য বহু ক্রটী রহিয়া গিয়াছে। তবে আমাদের এইমাত্র ভরসা যে, আপনারা নিজ কার্য্যে নিজ গৃহে আসিয়াছেন, সুতরাং আমাদের সকল ক্রটী-বিচ্যুতি আপনাদের নিকট মার্জ্জনীয় হইবে।

## কুমার প্রমথনাথ রায়ের বক্তৃতা।

বিক্রমপুরবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ ও সমবেত সভ্য ভদ্রমণ্ডলী! আজ আমাদের এক মহা আনন্দের দিন, আমাদের কেন, সমগ্র বিক্রমপুরবাসীর পক্ষে কি মহা আনন্দের দিন নয়? আজ বিক্রমপুরের সব স্বনামধন্য দেশবিদেশ যশস্বী সুসন্তানগণ এবং আমাদের দেশের পূজ্য আহূত ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র দূরদেশ হইতে নিজ নিজ স্বার্থত্যাগ করিয়াও অশেষ পথকষ্ট ও কায়ক্লেশ সহ্য করিয়া জননী মাতৃভূমির চরণকমলে অর্চ্চনা করিবার বাসনায় এক মনে এক প্রাণে সমবেত হইয়াছেন।

অন্য বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, লর্ড কেলভীন, এডিন, সাইমন, জেপলীন, টমসন, ওয়াট, বেল, গিলবার্ট প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্ সমকক্ষ আমাদের সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে প্রাপ্ত হইয়া আমরা ধন্য ও চরিতার্থ হইয়াছি। তিনি ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী, অসাধারণ বিদ্বান্, ও চরিত্রবান, সুধী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ; তিনি জগতের মঙ্গলকামনায় বিজ্ঞানজগতে এক অভিনব যুগ সৃষ্টি করিবার মানসে সংসার ভুলিয়া তন্ময় হৃদয়ে বিজ্ঞান-বীণার মূর্চ্ছনায় যে গান গাহিতেছেন, সে অভূতপূর্ব্ব মধুর গানের তান নিশীথে দূরাগত বীণাধ্বনির মত তৃষিত পথিকের কর্ণে নির্ঝরিণীর অস্ফুট কুল কুল গীতির ন্যায় বঙ্গে, শুধু বঙ্গে কেন, ভারতে, শুধু

তারকে কেন, সমগ্র জগতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ও বেড়াইবে। তাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে কে না সুখী হয়? ইহা কি আমাদের বুকভরা গর্ব্বের বিষয় নয়? আমরা কি আজ আনন্দে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হইতে পারি না? কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি এবং ভরসা করি জন্মভূমির হিতসাধনে এইরূপ বাসনা ও তদর্থে একাগ্রতার যে বীজ আমাদের হৃদয়ে হইল, ইহা কি দূরস্থ কি নিকটস্থ সকল বিক্রমপুরবাসীর হৃদয়ে পরিপোষিত হইয়া যথাসময়ে অমৃতময় ফল উৎপাদন করিবে।

এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সর্ব্বজনপ্রিয় মাননীয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সভাপতির আসন গ্রহণ করার প্রস্তাব আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

## অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির বক্তৃতা।

বিক্রমপুরবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ,

আপনারা বিক্রমপুর সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে আমাকে বৃত করিয়া যে সম্মান দান করিয়াছেন, আমি যে তাহার অযোগ্য, সে কথা আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবগত আছি। আজ এই সভাস্থলে এমন অনেকে উপস্থিত আছেন, যাঁহাদিগের দ্বারা এই কার্য্য অধিকতর যোগ্যতা ও গৌরবের সহিত সম্পাদিত হইতে পারিত। নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া এই পদের কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে হইলে, আমি সে ভার গ্রহণ করিতে কিছুতেই সাহসী হইতাম না। কিন্তু আপনারা যখন আমাকে সে অবসর না দিয়াই, আমাকে কর্ত্তব্যপালনে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন আমি আপনাদের অনুরোধ আমার প্রিয় জন্মভূমির আদেশ মনে করিয়া অবনত মস্তকে গ্রহণ করা ব্যতীত আমার উপায়ান্তর নাই, সে আদেশ উপেক্ষা করিবার শক্তিও আমার নাই। আর আমার ভরসা এই যে, আমরা সকলেই বিক্রমপুরবাসী, স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালার এক পবিত্র অংশে আমাদের জন্ম; আমি আপনাদেরই একজন, আমি আমাদের বিক্রমপুরের এক জন দীন সেবক বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে গর্ব্ব অনুভব করি। আপনারা সকলেই আমার ভ্রাতৃস্থানীয়। এই মিলন-মন্দিরে ভ্রাতার কার্য্যে

কোন ত্রুটি আপনারা লক্ষ্য করিবেন না, পরন্তু ক্ষমা করিবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। এক্ষণে, আমি কার্য্যারম্ভে সিদ্ধিদাতা ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, মাতৃভূমিকে প্রণাম করিয়া সানন্দে ও সাগ্রহে আপনাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি। ভগবানের কৃপায় আমাদিগের এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, বিক্রমপুর আবার উন্নতির উচ্চ চূড়ায় অবস্থিত হইয়া সমগ্র বঙ্গের আদর্শ হউক, ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা ও প্রার্থনা।

সভার সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে আমি আপনাদিগের সম্মতি লইয়া বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমর সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিব। এ যুদ্ধ ইউরোপে আরম্ভ হইলেও ইহা এসিয়া পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। বিশেষ যে ইংরেজ ভারতের ভাগ্যবিধাতা, সেই ইংরাজগণও ইহাতে লিপ্ত। ভারতবর্ষ বিশাল বৃটিশসাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত; সুতরাং এ যুদ্ধের ফল ভারতবর্ষকেও ভোগ করিতে হইয়াছে। আমাদের ব্যবসায় বাণিজ্য এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ছোটলাট স্যার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল বলিয়াছিলেন, পাটের জন্য সমগ্র জগৎ বাঙ্গালার মুখাপেক্ষী। সেই পাট বিক্রমপুরের প্রধান বাণিজ্য-সম্পদ। সুতরাং ব্যবসায়ের ক্ষতিতে বিক্রম-পুরের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বর্ণনীয় নহে। তবে আমরা আশা করি, অচিরে এই যুদ্ধের অবসান হইবে এবং ইংরাজ-শাসনে আমাদের দেশের ব্যবসায়ের পূর্ব্বাবস্থা আবার ফিরিয়া আসিবে। যুদ্ধ শেষ হইতে যতদিনই কেন লাগুক না, এ যুদ্ধে ইংরাজের জয় অনিবার্য্য। যে জাতি এ দেশে অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি ও অরাজকতার পরিবর্ত্তে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সে জাতির নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ হইবার নহে। তাই বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতবাসীরা ইংরাজের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এ যুদ্ধে ইংরাজের জয় কামনা করিতেছি।

বিক্রমপুর প্রাচীন স্থান। সেনবংশীয় রাজগণের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতেই বিক্রমপুর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপ, গৌর, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানের সৌভাগ্যোদয়ের পূর্ব্বে বিক্রমপুর শিক্ষায় ও সভ্যতায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। দীপঙ্কর, শ্রীজন যে সময়ে শিক্ষায় ও সুগতপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের

আলোক দেশ বিদেশে বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালার অন্যান্য ভাগ বিক্রমপুরের প্রতিফলিত আলোকেই উজ্জ্বল হইয়াছিল। কালবশে বিক্রমপুরের সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এখনও বিক্রমপুরে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ পুরা-কীর্ত্তির অভাব নাই। এখনও ভগ্ন বা ভগ্নপ্রায় তৃণগুল্মাচ্ছাদিত মন্দিরে, মঠে, দুর্গে প্রাচীন সভ্যতার ও শিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। পদ্মাগর্ভে বহুকীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, তবুও যাহা এখনও কালের সহিত সংগ্রাম করিয়া জীর্ণদেহে বা অপরিজ্ঞাত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। সে সকল অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই সকল বহুমূল্য রত্ন সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। ভারত-সরকার এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তদবধি এই বিভাগের চেষ্টায় বহু পূরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লর্ড কর্জ্জন কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে এ সম্বন্ধে সরকারের কর্ত্তব্য বিবৃত করিয়াছিলেন। তদবধি এ বিষয়ে সরকারের আগ্রহ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আর দেশের লোকও এ কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী হইয়াছেন। কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ বহু পূরাকীর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন; রাজসাহীতে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। বিক্রমপুরে পুরাকীর্ত্তি রক্ষার কার্য্যে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, সরকারকে সাহায্য করিতে হইবে, আপনাদেরও কাজ করিতে হইবে। আমাদের মনে যে এইরূপ কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সুখের বিষয়। বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানাদির নির্দ্দেশ করিয়া, তথ্য সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে উত্তরবংশীয়দিগের জন্য ইতিহাসের উপাদান সঞ্চিত করিতে হইবে।

শিক্ষাগৌরবে বিক্রমপুর পূর্ব্বকালে গৌরবান্বিত ছিল। নবদ্বীপের মত বিক্রমপুরও এক কালে "ভারতীয় রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ" ছিল। আমাদের বর্ত্তমান অধিবেশনের সুযোগ্য সভাপতি বিশ্ববিখ্যাত কীর্ত্তিমান আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় প্রমুখ বিক্রমপুরের সুসন্তানগণ বিক্রমপুরের সেই

গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন বটে, কিন্তু দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার অভাব রহিয়াছে। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতিরই উন্নতি হইতে পারে না। এই কথা মনে করিয়া দেশমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চশিক্ষালাভ সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে—সমাজের সর্ব্ব স্তরে সকলের পক্ষে প্রয়োজনও নহে। কিন্তু দেশের জনসমাজের সকল স্তরে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে জাতীয় দুর্গতি দূর হইবার নহে। ইউরোপ ও মার্কিনে অনেক স্থানেই বালকগণ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য। এ দেশে পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহোদয় সেইরূপ বিধি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। কিন্তু বরোদা, কোচিন প্রভৃতি রাজ্যে সেইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। এদেশে সব কাজই যে সরকারকে করিতে হইবে এমন কথা নাই। দেশের লোকের হিতকর কার্য্য দেশের লোকেরই করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা সে কাজে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহাদের পক্ষে সরকারী সাহায্য সুলভ হয়। যাহাতে দেশমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা হয় এবং উচ্চ শিক্ষালাভার্থী প্রজ্ঞাবান ছাত্র, শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, সে ব্যবস্থা বিক্রমপুরবাসীকেই করিতে হইবে। পরিবারের পর গ্রাম, গ্রামের পর জেলা, জেলার পর দেশ, দেশের পর জগৎ। আমরা গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্র জেলায় বিস্তৃত করিতে পারিলেই আপাততঃ আমাদের উপকার হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী-শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। রুষিয়ার রাজার সচিব ডি উইট প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে দেশ কৃষিপ্রাণ, সে দেশে মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ-দুঃখ অনিবার্য্য। সকল দেশকেই শিল্পচর্চ্চা করিতে হইবে। একথা আমাদের দেশে পরলোকগত রানাডে প্রমুখ অর্থশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা বুঝাইয়াছেন। এ দেশে এখন শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও হইতেছে। আমরা বুঝিয়াছি, শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আমাদের দারিদ্র্য দূর হইবে না। সরকারও এবিষয়ে আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এবার ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে বিদেশী পণ্যের অভাবে এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার যে সুযোগ উপস্থিত, আমাদিগকে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। এই কাজের

সুবিধার জন্য সরকার ভারতের নানা নগরে বিদেশী ও ভারতীয় পণ্যের প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং গত ২৪শে মে তারিখে শিমলায় যে কমিউনিক প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরিত মালের রেলের ভারা কমাইবার কথাও বলিয়াছেন। সরকার এ দেশের শিল্পের অবস্থানুসন্ধানের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মিষ্টার ক্যানিং, মিষ্টার গুপ্ত ও মিষ্টার সোয়ান অনুসন্ধান সন্ধানকালে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে সকল পাঠ করিলে আমাদের অনেক উপকার হইবে। আমি আশা করি, যাহাতে বর্ত্তমান সুযোগে এদেশে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা সকলেই করিবেন। অধ্যাপক বসু মহাশয় দেখাইয়াছেন, এই সুযোগে জাপান এ দেশে পণ্য বিক্রয়ের বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। আমরা কি এই সুযোগে স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার উপায় করিয়া দেশের লোকের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করিতে সচেষ্ট হইব না? শিল্প প্রতিষ্ঠা হইলে দুস্থ ভদ্র মহিলাদিগের অর্থোপার্জ্জনের উপায়ও হইতে পারিবে। যশোহরে একটী চিরুণীর কারখানায় বহু স্ত্রীলোক কাজ পাইতেছেন, তাঁহারা গৃহে বসিয়াই জীবিকার্জ্জন করিতে পারিতেছেন। দেশে বড় বড় কারখানা, যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা সময়সাধ্য হইতে পারে, কিন্তু ছোট ছোট কারবার স্থাপন বা এদেশের দেশীয় শিল্পের উন্নতিসাধন সহজেই হইতে পারে। সে জন্য প্রয়োজন, উদ্যমের, উৎসাহের এবং সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

আমরা যতই কেন চেষ্টা করি না, ভারতবর্ষ—বঙ্গদেশ, এখনও দীর্ঘকাল কৃষি প্রধান থাকিবে, দেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্যে দিনাতিপাত করিবে। এ অবস্থায় কৃষির বিশেষ উন্নতি চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হইবে। ইউরোপে ও আমেরিকায় বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষিকার্য্যে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—এক ফসলের উপযোগী জমি অন্য ফসলের উপযোগী করা হইয়াছে,—শস্যের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষিক্ষেত্রে ফসল কমিতেছে; সারের অভাবে, উৎকৃষ্ট বীজের অভাবে, গো-জাতির অবনতিতে কৃষিকার্য্যে কেবল অসুবিধাই হইতেছে। কৃষিকার্য্যে উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ জন্য সরকার স্থানে স্থানে পরীক্ষাক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন। রঙ্গপুরের কৃষিক্ষেত্রে গো-জাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা হইতেছে। সংপ্রতি কৃষিবিভাগের মিষ্টার ব্লাক উড বাঙ্গালার গবাদি পশু সম্বন্ধে একখানি পুস্তকও প্রচারিত করিয়াছেন। কিন্তু দেশের ও আমাদের অভাবের তুলনায় সরকারী কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা অতি অল্প। এবিষয়েও আমাদিগকে সরকারের কাজে সাহায্য করিতে হইবে। সংপ্রতি অযোধ্যার কয়জন জমিদার প্রজাদিগের সুবিধার জন্য আপনারা কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া উৎকৃষ্ট, বীজ সরবরাহের সুব্যবস্থা করিতেছেন। বাঙ্গালার জমিদার-দিগের দ্বারা এই আদর্শ অনুকৃত হইলে অচিরে সুফল ফলিবে।

মামলার আধিক্যে দেশের লোকের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। কোর্টফির আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সরকারও শঙ্কিত হইয়াছেন। ইহার প্রতিকারকল্পে কিছু করিলে দেশের লোকের উপকার হয়। এ কার্য্যে সরকারেরও সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই মহাহিতকর কার্য্যের ভার লইতে হইবে, দেশের লোকের—বিশেষ দেশের শিক্ষিত লোকের। তাঁহারা উদ্যোগী হইয়া এই কাজ করিবেন,—তাহা হইলেই তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা ধন্য হইবে এবং তাঁহাদের শিক্ষার সুফল দেশের সকল লোক লাভ করিতে পারিবে।

বিক্রমপুরের বহুলোক বিদেশে আছেন। যাহাতে সকল স্থানের বিক্রম পুরবাসীরা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া একযোগে বিক্রমপুরের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাহাই সম্মিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে আমাদের পক্ষে দেশের কল্যাণকর কার্য্য সংসাধনের পথ সুগম হইবে; কারণ একতাই বল, একতাই উন্নতির উপায়।

বিক্রমপুরের স্বাস্থ্যোন্নতির বিষয়ে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে পানীয় জলের অভাবই আমাদের সর্ব্বপ্রধান অভাব। এদেশের বর্ষার জল বৎসর বৎসর আবর্জ্জনা ধৌত করিয়া জমিতে পলি ফেলিয়া যায় বলিয়া আজও ম্যালেরিয়া প্রবল হইতে পারে নাই। কিন্তু বিক্রমপুরে পানীয় জলের অভাব সর্ব্বত্রই অনুভূত হয়। তাহাতে দেশের লোকের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতেছে। অনেক গ্রামে প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার না হওয়ায় জল পঙ্ককলুষিত বিষাক্ত হইয়াছে। বহু স্বত্বাধিকারীর অবস্থাবৈষম্যে ও মতের অনৈক্যে অনেক জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার হইয়া উঠে না; গ্রামবাসীরা পুষ্করিণী

সংস্কারের ব্যয়ের একাংশ বহন করিতে স্বীকৃত হইলেও জেলাবোর্ড তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন না। বাঙ্গালার জলকষ্টের কথা সরকারের অবিদিত নহে। স্যার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জীর সময় হইতে ইহার প্রতিকারকল্পে চেষ্টাও হইতেছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা সরকার যে সারকুলার প্রচার করেন, তাহাতে প্রথম সরকারী সাহায্য দানের কথা ব্যক্ত হইয়াছিল। তখন প্রস্তাব হইয়াছিল, জেলা হইতে সম্পূর্ণ ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ ও স্থানীয় লোকের নিকট এক তৃতীয়াংশ সাহায্য পাইলে, সরকার প্রতি জেলায় ৫ হাজার টাকা এবং সমগ্র প্রদেশে ৫০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে প্রস্তুত। তাহার পর গত ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর তারিখে এই বিষয়ের বিচার জন্য দার্জ্জিলিংএ এক পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সে সভার সদস্যগণ এই মত প্রকাশ করেন যে, বাঙ্গালার পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার যত প্রয়োজনীয়, নূতন পুষ্করিণী খনন তত প্রয়োজনীয় নহে। তজ্জন্য পুষ্করিণীর মালিকেরা যাহাতে জেলাবোর্ডকে পুষ্করিণী সংস্কার করিতে দেন, সে বিষয়ে চেষ্টা করিবার প্রস্তাবও হইয়াছিল। নবেম্বর মাসে এ সম্বন্ধে সরকারের মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। পাবলিক-করের টাকা বোর্ডের হস্তগত হওয়ায় কোন কোন জেলায় উল্লেখযোগ্য কাজও হইয়াছে। বিক্রমপুরে এ কার্য্যের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক। যদি প্রয়োজন বুঝিলে জেলা বোর্ড বা ইউনিয়ন কমিটী পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করাইবার অধিকার লাভ করেন, তবে এ বিষয়ে সুফল লাভের বিশেষ আশা থাকে। গত অক্টোবর মাসে সরকার যে সারকুলার প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, প্রয়োজনানুসারে স্থানীয় লোকের সাহায্য না পাইলেও, এ বৎসর জেলাবোর্ড হইতে সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করিয়া পুষ্করিণী খননের বা সংস্কারের ব্যবস্থা করা হউক। আমরা আশা করি, জেলাবোর্ড ও দেশের জনসাধারণ এই সুযোগ অবহেলায় হারাইবেন না, এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তৎকালীন ছোটলাট যে আশা ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই আশা পূর্ণ হইবে।—"The Local Government and the local bodies and the local public will all

be found working together in regard to measures of this kind."

বাণিজ্যের ও যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিক্রমপুরের নানাস্থানে পথের অভাব দূর করিতে হইবে। যে স্থানে সম্ভব স্থলপথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে; কিন্তু এই নদী মাতৃক দেশে স্থলপথ নির্ম্মাণ সর্ব্বত্র মঙ্গলজনক নহে। স্থলপথের বিশেষ রেলপথের আধিক্যে বাঙ্গালার ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, এই মত অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু জলপথের সুবন্দোবস্তে সে আশঙ্কার কারণ নাই; পরন্তু জলনিকাশের সুবিধা হইলে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি ও পতিত জমির উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান সময়ে সরকার যশোহর জেলার ভৈরবখালি ড্রেনেজ ও হরিহর ড্রেনেজ সংস্কারের ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিতেছেন। বিক্রমপুরে লোকের স্থানাভাব হইতেছে। পূর্ব্বে পদ্মা একটী শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হইত; তখন উহা উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেহদীগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইত। এখন পদ্মার আক্রমণে বিক্রমপুর হতশ্রী। স্থানের অভাবহেতু বিভাগের বাহুল্যে প্রজাস্বত্ব এমনই জটিল হইয়াছে যে, অনেক স্থলে বংশবৃদ্ধি হইলে ভদ্রলোকের পক্ষে বাসস্থান নির্ম্মাণের জমি পাওয়া দুষ্কর হয়। ধলেশ্বরী ও পদ্মার সংযোগে বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া খাল খনিত হইলে নানা অসুবিধা দূর হইতে পারে। প্রথমতঃ এই খালে যদি বর্ত্তমান সময়ের মত বৎসরে চারি মাসের পরিবর্ত্তে সকল সময়ই নৌকা চলাচল সম্ভব হয়, তবে লোকের বিশেষ সুবিধা হয়, আর পাট প্রভৃতি পণ্য অনায়াসে রপ্তানি হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে জলনিকাশে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি ও জলাভূমি বাসোপযোগী হয়। যদি সরকার স্বয়ং এই ব্যয়ভার বহন কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া কোন ট্রাষ্ট বা সিণ্ডিকেটকে খাল ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জমি কিনিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি দেন, তবে দেশের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হয়। এই খালে কুত লইবার ব্যবস্থা থাকিলে অল্প দিনেই খাল খননের ব্যয় সঙ্কুলান হয়। আর পার্শ্ববর্ত্তী জমিতে বসতির ব্যবস্থা করিলে বহু বিক্রমপুরবাসীকে আর স্থানাভাবে বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিতে হয় না। সম্প্রতি ঝিমলা খালের ধারের

জমিতে এইরূপ লোকের বাসের ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন। বিক্রমপুরে যদি সেইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, তবে অচিরে খালের দুই পার্শ্বে সমৃদ্ধ ও জনবহুল গ্রাম ও বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে পারে। আর বিক্রমপুরে যদি এইরূপ কার্য্য আরম্ভ হয়, তবে ক্রমে তাহা সমগ্র বঙ্গে অনুকৃত হইয়া বাঙ্গালীকে আবার স্বাস্থ্য, সম্পদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া পল্লীবাসী করিবে; তাহাতে পল্লীপ্রাণ বাঙ্গালার পল্লীগুলির নষ্টশ্রী ফিরিয়া আসিবে, - বাঙ্গালীর দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানের উপায় হইতে পারিবে।

আমাদিগের সম্মিলনের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলিয়াই আমি নিরস্ত হইলাম। এ সকল বিষয় এই সম্মিলনে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে এবং বহু বক্তা এ সকল বিষয়ে মত ব্যক্ত করিবেন। আর যিনি আমাদিগের সভাপতি হইবেন, সেই বরেণ্য আচার্য্য বসু মহাশয় এ সকল বিষয়ে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিবেন। সুতরাং আমি আর সে সকল বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না।

আরম্ভে যে মঙ্গলময় সিদ্ধিদাতা ভগবানের নাম করিয়াছিলাম, এখন পুনরায় তাঁহারই নাম স্মরণ করিতেছি এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানে তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বিক্রমপুর সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে পুনরায় আপনাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণপূর্ব্বক আমি আসন পরিগ্রহ করিলাম। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হউন।

---

## ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর
## রামপাল ভ্রমণ।

পাঠকবর্গ জানেন, বিগত বড় দিনের ছুটির সময়ে মুন্সীগঞ্জে যে বিক্রমপুর সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে বিক্রমপুরের অতুল্য গৌরব-ধন

জগদ্বরেণ্য আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জে আসিয়া যে অতাল্প সময় তথায় ছিলেন তাহারই মধ্যে সময় করিয়া মুন্সীগঞ্জের অনতিদূরবর্ত্তী রামপালে যাইয়া সেই প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার রামপাল ভ্রমণকাহিনী আমাদের রিপোর্টার প্রদত্ত বিবরণ হইতে নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

অতি প্রত্যূষে ডাক্তার বসু মহাশয় সস্ত্রীক রামপাল ভ্রমণে বাহির হইলেন। সঙ্গে চলিলেন মিঃ পি কে বসু বার-এটল, রায় রমেশচন্দ্র গুহ বাহাদুর ও ডাক্তার বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়। রামপালের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ দেখাইবার জন্য সঙ্গে "বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ও গমন করিলেন।

ডাঃ বসু মহায় পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি রামপাল দেখিতে যাইতেছেন দেখিয়া, প্রতিনিধিবর্গেরও অনেকে সহযাত্রী হইলেন। একটি অতি সুপুষ্ট দল রাজপথ দিয়া রামপালের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এক সঙ্গে এরূপ জনসঙ্ঘ শীঘ্র রামপাল দর্শনে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। স্কুলের ছেলের দলের আনন্দধ্বনি, পতাকাহস্তে ভলেণ্টিয়ারগণের 'জগদীশ চন্দ্রের জয়গীত' পল্লীর পথ প্রতিধ্বনিত করিতেছিল। শীতের সুন্দর প্রভাত। দুই ধারে সুন্দর শ্যামল শস্যপূর্ণ মাঠ। সহর পার হইয়া আমরা মাঠে পড়িলাম। বাঁধান সরকের এক পার্শ্বে একটী পানের বোরজ। ডাক্তার বসু বলিলেন—যোগেন্দ্র! আমি কোন দিন পানের বোরজ দেখি নাই চল দেখিয়া আসি। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু সাগ্রহে তাঁহাকে লইয়া পানের বোরোজে প্রবেশ করিলেন। পানের বোরজটী দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বোরোজের মধ্যে কি কি ফসল হয়, কোন্ সময় পানের গাছ রোপণ করিতে হয় এই সকল খুঁটি নাটি প্রশ্নের উত্তর একজন

বারুজীবী বসু মহাশয়কে নানা কথায় বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর রামপালের সমীপবর্ত্তী হইলে বজ্রযোগিনী স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণ তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়া লইল। এই সময়ে রামপালবাসী গৃহস্থগণ এক অভিনন্দন-

পত্র পাঠ করিয়া আচার্য্য বসুর অভ্যর্থনা করে। ইহার প্রতিলিপি নিয়ে প্রকাশিত হইল।

---

## বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় এবং অন্যান্য মহানুভব ব্যক্তিগণের প্রতি রামপালবাসী গরীব গৃহস্থগণের ভক্তি-উপহার।

আজি রামপাল তাহার প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের ভগ্নাবশেষ ও সরল অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট বিদ্যাহীন গৃহস্থগণকে ক্রোড়ে করিয়া, বহুকাল পরে ক্ষণকালের জন্য বিক্রমপুরের মহদ্ব্যক্তিগণকে পাইয়া. বোধ হয় কোন ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা করিয়া, বিষাদে হাসির আভাস প্রকাশ করিতেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যেস্থান আটশত বৎসর পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদে সুশোভিত হইয়া আনন্দ ধ্বনিতে বিক্রমপুরের যশঃ কীর্ত্তন করিত, আজ সেস্থান প্রায় মরুতুল্য হওয়া সত্ত্বেও, আমরা মহান্ বিজ্ঞানবিদ্ জগদীশচন্দ্র বসু মহোদয় ও অন্যান্য মহদ্ব্যক্তিগণের সমাগম দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। আজ দয়াময় অনুগ্রহ করিয়া হয়ত কোনও মহৎ কার্য্য সমাধা করিবার জন্য মহিমান্বিত ব্যক্তিবর্গকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। অহো! মহিমান্বিত আচার্য্য ও সমস্ত স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষগণ, আপনাদের অভ্যর্থনা করিতে আমাদের অশ্রুবর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। আপনারাই আপনাদের সম্মান সম্ভ্রম ও অভ্যর্থনা রক্ষা করিবেন। কেবলঃ বিদ্যার অভাবে, এবং একমাত্র বিদ্যার অভাবে আমরা সকল বিষয়ে দুর্ব্বল; তাই, আমরা কেবল মাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ভক্তি প্রকাশ করিতেছি। আমাদের জন্মভূমি বিক্রমপুরকে সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর করিবার অভিপ্রায়ে যে সকল স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ দূরদেশ হইতে কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানি না। তাই মনের ভাব মনেই রহিল। উপসংহারে পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট একান্ত প্রার্থনা যে, তিনি আপনাদিগকে দীর্ঘজীবন দান করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যাপৃত রাখুন।

বিদ্যা ও উন্নতি বিষয়ে রামপালের কৃষকগণ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। রামপালবাসীগণের উন্নতির কথা আপনাদের মহৎ অন্তঃকরণের কোণে স্থান পাইলেও আমরা নিতান্ত আপ্যায়িত ও কৃতার্থ হইব, এবং অত্র স্থানে আপনাদের পদার্পণ স্মৃতি আমাদের অন্তরে সর্ব্বদা জাগরুক থাকিবে।

এই অভিনন্দনটী পঠিত হইলে পর বজ্রযোগিনী স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় একটী সংস্কৃত অভিনন্দন পাঠ করেন।

বজ্রযোগিনী স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় এখানে ডাক্তার বসুর সহিত পরিচিত হইলেন এবং তিনি স্থানীয় বহু কথা তাঁহার নিকট বিবৃত করিতে লাগিলেন।

একস্থানে ইক্ষু গুড় প্রস্তুত হইতেছিল। সঙ্গীয় একজন চৌকিদার ডাঃ বসুকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "হুজুর আখমারা কল দেখেছেন। এখানে আখি গুড় তৈরী হয়"। চৌকিদারের এই কথায় ডাঃ বসু ও তাঁহার স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন—"চল, কল দেখে আসি"। চৌকিদারের আনন্দ দেখে কে? সে. যে বড় কড়াইতে গুড় জ্বাল হইতেছিল একবার সে গুলো, একবার যে হাঁড়ীতে তরল ভাবে গুড় রহিয়াছে সেগুলো, এইসব দেখাইয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে মনের আনন্দে ইক্ষু চাষের ইতিহাস ডাঃ বসু মহাশয়কে বলিয়া যাইতে লাগিল। যে কৃষকের গুড় তৈরী হইতেছিল, সে একটা হাঁড়ী হইতে খানিক গুড় তুলিয়া লইয়া বলিল—"হুজুর একটু গুড় খান।" বসু মহাশয় অমনি হাত পাতিয়া সেই গুড় গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করিলেন। এ সময়ে ছেলেরা চারিদিক হইতে তাঁহাকে এমন করিয়া ঘিরিয়া ধরিয়াছিল যে তিনি এক পা অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। একজন ভদ্রলোক ছেলেদিগকে একটু সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাহাতে ডাঃ বসু বলিলেন— "না না, ওদের আজ একটু আনন্দ করিতে দিন।"

একে একে তিনি রামপালের বল্লাল বাড়ী. মিঠাপুকুর, অগ্নিকুণ্ড ইত্যাদি দর্শন করিয়া বাবা আদমের মসজিদ দর্শন করিলেন। এখানে একজন মৌলভি মসজিদের বিবরণ ও বাবা আদমের সম্পর্কিত বিচিত্র কিংবদন্তীর উল্লেখ করিলেন। অতঃপর রঘুরামপুরের পুষ্করিণী দেখিয়া তিনি রামপালের দীঘির উত্তর তীরে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে শ্রীযুক্ত রমেশবাবু

তাঁহাদিগের জলযোগের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ছোট ছোট ছেলেদিগকে বসু মহাশয় স্বহস্তে কমলা বিতরণ করেন। রামপালের কৃষকগণের পক্ষ হইতে একটী মুসলমান বালক একটি অভিনন্দনপাঠ করিয়াছিল।

অতঃপর সেখানে তাঁহাদের একখানি আলোক-চিত্র গৃহীত হয়।

রামপালের কৃষকেরা ডাক্তার বসু মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া নানাভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। একজন কৃষক অপর একজন কৃষককে তাহার স্বাভাবিক গ্রাম্য ভাষায় বলিতেছিল, "ভাই দেইখা ল, এ বড় সোজা লোক নয়, বিনা তারে খবর দেয়।" কৃষকদের ফসল ভরা মাঠের উপর দিয়া" শত শত নর চলিয়া যাইতেছে সে দিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। কৃষকেরা বলিতেছিল,—ভাগ্যবান হাটিয়া যাইতেছেন, আমাদের মাঠে সোণা ফলিবে। সকলে অতুল আগ্রহে গর্ব্বিত নয়নে তাহাদের জগদীশচন্দ্রকে দেখিতেছিল। সেদিন যেন সমগ্র রামপাল এক অভিনব উৎসাহে অভিনব জাগরণে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ডাঃ বসু রামপালের দর্শনীয় স্থান সমূহ দেখিতে দেখিতে নানাজনের সহিত নানারূপ সরস হাস্য কৌতুক করিতেছিলেন। যোগেন্দ্র বাবুকে বলিতেছিলেন—'তোমাদের বিক্রমপুরত নদীয়ায় চলিয়া গেল, আর কি? এখন আর তোমাদের গৌরব কিসের?"

রামপাল হইতে মুন্সীগঞ্জ পঁহুছিতে বেলা প্রায় ১২টা হইয়া ছিল। কাজেই সভার কার্য্য সেদিন পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সময়ের অর্দ্ধঘণ্টা পরে আরম্ভ হইল।

---

## প্রসঙ্গ-কথা।

একবার অর্জ্জুন কোন অন্যায় অপরাধ করিয়া বিশেষ অনুতপ্ত হন এবং কি করিলে তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় সে সম্বন্ধে সখা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "সখা আত্ম প্রশংসা কর তাহা হইলেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার শেষদিন যখন ধন্যবাদের পালা চলিতেছিল তখন আমার মনে শুধু এই কথাটিই বিশেষ করিয়া জাগিতেছিল।" হায়! অনুতপ্ত সন্তানগণ এতদিনে দেশ প্রীতির পবিত্র মন্দির দ্বারে তোমরা সেবক রূপে উপস্থিত হইয়াছ। দীর্ঘকালের সঞ্চিত পাপরাশি এতদিনে তোমাদের আত্ম-প্রশংসায় বুঝি দূর হইতে চলিল! দেশকে বুঝিতে বা জানিতে হইলে যে ত্যাগ ও যে মহৎ আদর্শের প্রয়োজন হয় তাহা বক্তৃতায় সম্পন্ন হইতে পারেনা তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে প্রকৃত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়। এ শিক্ষা—এ দীক্ষা পাইয়া বিক্রমপুরের কর্ম্মবীরেরা এবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন—বুঝিয়াছেন—দীন দরিদ্র নিরন্ন যাঁহারা তাহারাই তাহাদের আপনার—জাতিভেদের সংকীর্ণতা সেখানে নাই—বিশ্বজনীন প্রেমই তাহার ভিত্তি—সেবাই তাহার সাধনা—পরার্থে আত্ম-নিয়োগই তাহার মূল মন্ত্র

আর,—জাতি কুলে, ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন আর্ত্তি বিনে না মিলে কৃষ্ণেরে॥

* * * *

ডাক্তার জগদীশচন্দ্রের অভিভাষণ—এক অপূর্ব্ব জিনিষ। ইহাতে ভাষার ছটা নাই প্রাদেশিকতার গন্ধ নাই, পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই, করতালি সঞ্চয়ের মত উচ্ছ্বাসও উহাতে ছিল না। তবে যাহা উহাতে আছে তাহা বাঙ্গলার কোন বড় কবি বড় লেখক বড় পণ্ডিতের অভিভাষণে নাই। কেন নাই? সে সকল কথা প্রাণ দিয়া লেখা নয়, সে সকল ত প্রকৃত উপলব্ধি দ্বারা লিখিত নয়, কাজেই সে সব সাহিত্যিক কসরত ক্ষণিক আনন্দ দিয়া হৃদয়ের মধ্য হইতে চির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ডুবুরি নামাইয়া দেখিয়াছি কই সন্ধান ত মিলিল না! আর জগদীশচন্দ্রের অভিভাষণ পড়িতে পড়িতে চক্ষের সমক্ষে "পঙ্কে অর্দ্ধনিমজ্জিত, অনশন ক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্ম্মসার কৃষককুলের পতিত শ্রেণীর শোচনীয় দৃশ্য পতিত হয়। তখন মনে জাগে আমাদের আবার শিক্ষা আমাদের আবার দীক্ষা; আমাদের আবার গৌরব সে—কিসের? আমরা শুধু জানি কথা। নচেৎ এই আট কোটি শিক্ষিত বাঙ্গালীর অধ্যুষিত বাঙ্গলার পল্লীর দুর্দ্দশা হইবে কেন? পল্লীর নরনারী অনাহারে মহামারীতে প্রাণ দিবে কেন? শোন

তবে তোমরা প্রবাসী বিক্রমপুরবাসী দেশের প্রতি মমতা বিহীন যাহারা তাহারা শোন—ঐ বৎসরের ফলাফল শোন।

'বিগত নভেম্বর মাস হইতে ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত শ্রীনগর ও সেরাজদিঘা থানায় এক ওলাউঠা ব্যারামেই ১৬১৫ জন লোকের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে!' বিক্রমপুরের অন্যান্যস্থানে যে আরও কত লোক কাল-কবলে পতিত হইয়াছে তাহারত সংখ্যাই নাই। দেশের এই শোচনীয় অবস্থা দূরী করণের জন্য দেশের লোক উদ্যোগী না হইলে কিরূপে চলিবে?

এবারকার সম্মিলনীতে বুঝিতে পারিয়াছি এখনও বিক্রমপুরের লোক দেশের প্রতি মমতা বিহীন নহেন। অনেকে সুযোগের অভাবে দেশের সেবা করিতে পারেন না। এক্ষণে সে অভাব দূর হইয়াছে। 'বিক্রমপুর সম্মিলনীর শাখা কার্য্যালয় মুন্সীগঞ্জে স্থাপিত হইয়াছে। কর্ম্মবীর শৈলেন্দ্রচন্দ্র, উমেশচন্দ্র, উমাচরণ, কামিনীকুমার, দুর্গামোহন, কামাখ্যাচরণ, জ্ঞানচন্দ্র ও অম্বিকাচন্দ্র প্রভৃতি প্রাণপণে দেশের সেবায় আত্ম-শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। বিক্রমপুরের কলেরা প্রপীড়িতস্থান সমূহে ডাক্তার প্রেরণ করিয়া সেবাশ্রমের সেবক দ্বারা সেবার ব্যবস্থা করিয়া ও দীন দরিদ্রের পথ্য যোগাইয়া মাতৃ পূজার সোণার মন্দির তুলিয়াছেন। সম্মিলনীর প্রয়োজনীয়তা সম্মিলনী যে তাদের কত বড় প্রাণের জিনিষ এবার দেশের নরনারী তাহা বুঝিয়াছে! বুঝিয়াছে সম্মিলনী বাঁচিয়া থাকিলে তাহারা বিনা চিকিৎসায় বিনা শুশ্রূষায় মরিবেন না! আমরা বলি দেশের জন্য—সেবার জন্য যিনি যাহা পারেন তাহা সম্মিলনীর কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কুমার প্রথমনাথ রায়ের নিকট ৬৮নং শোভা বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা এই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের নিকট বিক্রমপুর বাসীর ঋণের সংখ্যা নেহাৎ কম নহে। তাঁহারা দেশের কোন শুভানুষ্ঠানে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। 'বিক্রমপুরের পাঠক পাঠিকারা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে বিক্রমপুর সম্মিলনীর স্থায়ীধন ভাণ্ডারে রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় বাহাদুর ও অনারেবল শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। দেশের কোনও স্থায়ী হিতানুষ্ঠানের জন্ম তাঁহারা আরও বহু টাকা দান করিবেন আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে সে সংবাদও জ্ঞাত আছি।

+　　+　　+　　+

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক আছেন তাহারা অকর্ম্মা সমালোচক। তাহাদের প্রধান কার্য্য কোনও কার্য্যের ত্রুটি ধরা বা অযথা নিন্দাকরা। বিক্রমপুর সম্মিলন সম্পর্কেও নানাজনে পূর্ব্বে নানারূপ সমালোচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন কাজত কিছুই হইবেনা শুধু হইবে অর্থের অপব্যয়। উদ্যোক্তাগণের মধ্যে কতজনকে যে কত মর্ম্মভেদী কথা শুনিতে হইয়াছে তাহার অন্তঃ নাই। মুন্সীগঞ্জের নেতৃবৃন্দ সময়ে নিরাশ হইয়াছেন হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন কিন্তু বৃদ্ধ রাজা শ্রীনাথকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত করিয়া পত্র লিখিলে পর যখন তিনি লিখিলেন যে "আজ আমি ধন্য যে এ বৃদ্ধ বয়সে মাতৃভূমির সেবার অধিকারী হইলাম।" তখন নিরুৎসাহ হৃদয়ে উৎসাহ জাগিল—সত্য সত্যই মরাগাঙ্গে বাণ ডাকিল! আর দেশের চারিদিক হইতে আশারবাণী, উৎসাহের বাণী ও অর্থ সাহায্য আসিতে লাগিল। মায়ের পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। ধনী দরিদ্রকে কোল দিলেন, দরিদ্র সে ধনীকে কোল দিল। বুঝিল—আমরা এক মায়ের সন্তান। দূরে যাহারা ছিলেন তাহারা সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া প্রাণেপ্রাণে যে কি মর্ম্মবেদনা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা আমরা অন্তরে অনুভব করিতে পারি।

\+ \+ \+ \+

সে দিন যখন সভা মণ্ডপে ঋত্বিক জগদীশচন্দ্র বলিতেছিলেন বড় করুণ বড় কোমল কণ্ঠে বড় মর্ম্মস্পর্শী সে স্বর—"বিক্রমপুর বিক্রমশালী সন্তানের জন্মভূমি, মনুষ্যত্ব হীন দুর্ব্বলের নহে। আমার পূজা হয়ত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এই সাহসে ভর করিয়া আমি বহু দিন বিদেশে যাপন করিয়া জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। হে জননী! তোমারই আশীর্ব্বাদ বঙ্গভূমি এবং ভারতের সেবকরূপে গৃহীত হইয়াছি।" তখন আমাদের হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল। এইত মহাপ্রাণ মহামনস্বী ব্যক্তি এইত মানুষ যিনি—মাকে মা বলিয়া ডাকিতে লজ্জা বোধ করেন নাই দীনা জননীকে মা বলিতে যাঁহার হৃদয় অপূর্ব্ব আনন্দ রসে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আমি ভাবিতেছিলাম যেন দীপঙ্কর আবার জগদীশচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিভুবন বি জয়ীরূপে আমাদের গৌরব রক্ষা করিলেন। আর কতজনকে

দেখিয়াছি অর্থ বলে বলী হইয়া নিজ মাতৃভূমিকে জন্মভূমি বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন—পাছে তাঁহারা 'বাঙ্গাল' আখ্যায় আখ্যায়িত হন। আর অই শোন জগদীশচন্দ্রের বাণী 'আমরা বাঙ্গাল, বাঙ্গালের গোঁ যেন আমাদের থাকে, তাহা হইলেই আমরা মানুষ হইব।'

এক বৎসর পূর্ব্বে আমরা লিখিয়াছিলাম "দেশে যেমন কন্‌গ্রেশ, কন্‌ফারেন্স বা সাহিত্য সম্মিলন হয়, তেমনি প্রতিবর্ষে একবার বিক্রমপুরবাসীর সম্মিলন হওয়া চাই। জগদীশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে। এখন আমাদের দুইটী বক্তব্য আছে। কথা কয়টী আগেও বলিয়াছিলাম, পুনরায় বলিতেছি। বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য হানির প্রধান কারণ জলাভাব ও জল ব্যবহারের অনভিজ্ঞতা। এই অভাব দুইটী দূর করিতে হইলে দু একবার সভাসমিতির অধিবেশনে স্থায়ীফল হইবে না। সম্মিলনীর জন্য একজন বা দুইজন ডাক্তার স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাঁহাদের কর্ত্তব্য হইবে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের অবস্থা দর্শন, পুষ্করিণী ইত্যাদির উন্নতির আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া আর ম্যাজিক লেণ্টার্ণের সাহায্যে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের বীজাণু কিরূপে বৃদ্ধি পায় এবং কিরূপে ঐ রোগ সহজেই সংক্রামিত হইয়া পড়ে, এ সকল বিষয় গুলি চিত্রের সাহায্যে বুঝাইয়া দেওয়া তাহা হইলে অতি সহজেই সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে। নচেৎ এ ক্ষেত্রে বক্তৃতার দ্বারা স্থায়ী ফল আশা করা অন্যায়। ডাক্তার জগদীশচন্দ্রও আমাদের দেশের স্বাস্থ্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। ঐ কথা কয়টি অনুধাবণ যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন "আমার বিবেচনায় স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়, গৃহ ও পল্লী পরিষ্কার, বিশুদ্ধ জল ও বায়ুর ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ। এসব বিষয়ে শিক্ষা বিস্তার এবং আদর্শ-গঠিত পল্লী প্রদর্শন অতি সহজেই হইতে পারে। ইহার উপায় মেলা-স্থাপন। পর্য্যটনশীল মেলা বিক্রমপুরের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পদিনেই অন্য প্রান্তে পঁহুছিতে পারে। এই মেলায় স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে ছায়া-চিত্রযোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া কৌতুক ও ব্যায়াম প্রচলন, যাত্রা, কথকতা, গ্রামের শিল্পবস্তুর সংগ্রহ, কৃষি প্রদর্শন ইত্যাদি গ্রাম হিতকর বহুবিধ কার্য্য সহজেই সাধিত হইতে পারে।

আমাদের কলেজের ছাত্রগণও এই উপলক্ষে তাহাদের দেশের পরিচর্য্যা-বৃত্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন।"

* * * *

এবার বিক্রমপুরে দুইজন রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। সেখরনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় মহাশয় হইয়াছেন রায়বাহাদুর। আর পুরুল্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষ মহাশয় হইয়াছেন রায় সাহেব। আমরা তাঁহাদের এই রাজ-সম্মানে আনন্দিত।

* * * *

সারস্বত সমাজের পণ্ডিতগণ দানশীল মহাত্মা রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাদুরকে এ বৎসর 'ভক্তি বিনোদ' উপাধি ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন।

* * * *

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই অর্থের ব্যবহার জানেন না। কেমন করিয়া অর্থের ব্যবহার করিলে সমাজের উন্নতি ও দেশের কল্যাণ সাধিত হয় সেদিকে কাহারও বড় একটা লক্ষ্যই নাই। সে দিন কাগজে দেখিলাম 'একজন জমিদারের দেড় লক্ষ টাকার করেন্সী নোট উইর উদরে নিঃশেষিত হইয়াছে। এরূপ বিচিত্র সংবাদ শুধু আমাদের দেশেই সম্ভবে!'

আমরা জানি, কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাদের এ অঞ্চলের কোনও ধনী বাড়ীর বিবাহ ব্যাপারে থিয়েটার, মদ, বাসা ভাড়া ইত্যাদিতে সহস্র সহস্র টাকা জলের মত ব্যয় হইয়াছিল, সেই পণ্ডিত ধনী ব্যক্তি দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্ত কপর্দ্দক ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই যে হীনতা—এই যে অর্থের অপব্যবহার—ইহা ভাবিলেও ঘৃণায় ও লজ্জায় শরীর শিহরিয়া উঠে। আমরা আবার মানুষ! আমাদের আবার গর্ব্ব! উচ্চাভিলাষ! সমাজে এত দিন ছোট বলিয়া যাহারা ঘৃণিত ছিল—তাহারা এখন বুঝিতে পারিয়াছে কি তাহাদের শক্তি, তাই সমাজের কৌলীন্ত—গর্ব্বে গর্ব্বিত বা জাত্যাভিমানে স্ফীত অহঙ্কারীর দল ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছে! যায়, তাদের মান সম্ভ্রম যে যায়! সংকীর্ণতা দ্বারা মানুষ কখনও সত্যকে আবৃত রাখিতে পারে না। যাহা সত্য, যাহা ধ্রুব—তাহা শত বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়াও

মাথা তুলিবেই তুলিবে। তাই হে ধনি! হে জমিদার! হে অর্থশালী সম্পত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি, স্বার্থের সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়িয়া একবার আপনাকে বৃহত্তের মাঝখানে আনয়ন কর! প্রাণ দিয়া পরের ব্যথা অনুভব কর! যদি জাগিতে চাও—যদি সভ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চাও—যদি জগতের মাঝখানে আপনাদের গর্ব্বোন্নত শির উচ্চ রাখিতে চাও, তাহা হইলে আপনার পুত্র পরিবারের সুখ বৃদ্ধিকেই জগতের সার সম্পদ বলিয়া মনে করিও না।

* * * *

'বিক্রমপুর সম্মিলনীর' মুন্সীগঞ্জের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন প্রণালী খুব ভাল হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। প্রকৃত কর্ম্মী লোকের নাম তাহাতে খুব বেশী নাই। কেহ কেহ এত দূরে আছেন যে তাহারা কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় উপস্থিত হইবেন কিনা তাহাও সন্দেহ। কাজেই এরূপ সভ্য-নির্ব্বাচন করা বা না করা সমান। আমাদের সভা সমিতির কার্য্য স্থায়ী ভাবে না হইবার প্রধান অন্তরায় অধিকাংশ স্থলেই প্রায় একরূপ। দু' চারিজন খুব উৎসাহের সহিত কাজ করেন আর সকলে—শুইয়া শুইয়া স্বপ্ন দেখেন। দেশের কাজে সংকীর্ণতা—পক্ষপাতিত্ব ও আত্মম্ভরিতার বিজয় ডঙ্কা উড়াইবার ভাবনা যত কম থাকে তাহাই ভাল। আমরা বিক্রমপুরের এমন অনেক স্বার্থত্যাগী কর্ম্মীর নাম জানি যাঁহারা এই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য থাকিলে সমিতির কার্য্যে মুন্সীগঞ্জের নেতৃবৃন্দের যথেষ্ট সহায়তা হইত। আমাদের এ মন্তব্যে কেহ মনে করিবেন না যে নির্ব্বাচিত সভ্যগণের প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত কোনও বিদ্বেষের কারণ আছে। আমরা শুধু চাই কাজ—নিষ্ঠা এবং ন্যায়পরায়ণতা; দেশের কাজের ন্যায় মহৎ কার্য্যে যেন ব্যক্তিগত দ্বেষের গরল না থাকে। নিষ্ঠার সহিত সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হয় ইহাই আমাদের কামনা।

* * * *

পল্লীগ্রামের সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা আজকাল একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কত শত আজগুবি কল্পনা, কত লম্বা লম্বা কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ দেখিতে পাইতেছি! কিন্তু কাজ ত দেখিতে পাই না! দেশে আজ কত বৎসর যাবত কনফারেন্স হইতেছে—জলকষ্ট ম্যালেরিয়ার আক্র-

মণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, কিন্তু কনফারেন্সের যাহারা নেতৃত্ব করেন তাহারা কি হাতে কলমে কিছু করিতে চাহেন? তাহারা শুধু ভাবেন— আমরা প্রতিনিধিবর্গের চব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়ের এমন ব্যবস্থা করিব যাহাতে প্রতিনিধিরা আমাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ দেন। যদি প্রতি বৎসর কনফারেন্সের তহবিল হইতে সে সকল জেলায় একটী পুস্করিণী বা দীর্ঘিকা খনিত হইত, আর তাহার নাম হইত 'কনফারেন্স পুকুর' তাহা হইলে আজ বাঙ্গলা দেশে কতগুলি পুষ্করিণী বা দীঘির সৃষ্টি হইত! কতগুলি জলাভাবে ক্লিষ্ট নরনারী কৃতজ্ঞতার সহিত কনফারেন্সের নাম লইত! কই তাহাত হইল না!

* * *

আমরা সেদিন কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত 'নোয়াখালী' নামক ত্রৈমাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। কুমার অরুণচন্দ্রের ন্যায় চিন্তাশীল—দয়াবান এবং কর্ম্মবীর জমিদার অতি অল্পই দেখিয়াছি। 'নোয়াখালী' বাহির হইবার পূর্ব্বে তিনি আমাদের সহিত কোন কোন বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। ব্যথিত দীন দরিদ্র প্রজার দুঃখে সত্য সত্যই তাঁহার প্রাণ কাঁদে, তিনি শুধু বাক্যেই সেই প্রীতি শেষ করিয়া দেন না—কার্য্যেও উহা সম্পন্ন করেন। নোয়াখালীতে বিদ্যালয় স্থাপন—প্রজাদের জলকষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত পুকরিণী খনন—ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি দূর করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন করিতে তিনি সর্ব্বদা মুক্তহস্ত। "নোয়াখালী" তাঁহার এই প্রীতির পরিচায়ক। আপনার জমিদারী নোয়াখালীকে তিনি প্রাণের জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'নোয়াখালী' পাইয়া তাহাকে শিরে ধারণ করিয়াছি। জগদীশ্বর এই পত্রিকাখানার দীর্ঘজীবন দান করুন। অরুণচন্দ্রের ন্যায় লক্ষপতি যে কাগজের সম্পাদক তাহার উন্নতি অনিবার্য্য। এই সংখ্যায় সর্ব্বশুদ্ধ ষোলটী বিষয় আছে। প্রত্যেকটি বিষয়ই শিক্ষাপ্রদ ও সুন্দর সংযত ভাষায় লিখিত। নোয়াখালী সম্মিলনীর বাৎসরিক কার্য্য-বিবরণী অনেক জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। "বেদনা বক্ষে সন্ধ্যা" শীর্ষক কবিতাটি ঢাকার 'তোষিণী' কাগজেও বাহির হইয়াছে। একই কবিতা দুই কাগজে মুদ্রিত হইল কেন? অন্যান্য প্রবন্ধের

মধ্যে "বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার" ও "নোয়াখালীতে কৃষিকার্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধ দু'টী উল্লেখযোগ্য।

*    *    *    *

সেদিন আমাদের একজন বন্ধু বলিতেছিলেন—'দেখুন আমরা পূর্ব্ববঙ্গের লোক যত হুজুগে মাতি—তেমন পশ্চিম বঙ্গের লোকেরা নন,—আর আমরা কি করিয়া মানুষ গড়িতে হয়, কি করিয়া একটা বিষয় বুঝাইয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হয় তাহাও জানি না—জানি শুধু বাড়ীতে বসিয়া জটলা করিতে আর বৃথা দর্প করিতে।" ভাবিয়া দেখিলে সব কয়টী কথা ঠিক। পূর্ব্ববঙ্গে এত বড় বড় লোক আছেন—কিন্তু তাঁহারা কোন্ মহৎ কার্য্যটী নিজেরা ভাবিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন? কয় জন সাহিত্য সেবীর সাহিত্য-চর্চ্চার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন? কয়টী সৎকার্য্য দ্বারা দেশের সেবা করিয়াছেন? ইহাদের এ সকল সুকুমার কলার দিকে মনোযোগ আছে বলিয়াই মনে হয় না। তার পর ছোট ছোট সহরে দেখিতে পাই যে কয় জন সাহিত্যসেবী আছেন তাঁহারা পরস্পরে মনের গুমরে মরিতেছেন—ভাবিতেছেন আমি দ্বিতীয় রবি ঠাকুর! না আছে প্রাণের মিলন—না আছে ভাবের আদান প্রদান—না আছে সহযোগীতা—না আছে পরস্পরের পরিচয়। আনন্দ বলিয়া একটা জিনিষ থাকিতে পারে তাহা আমাদের দেশের লোকেরা জানে না। যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী তাহারা শুধু উপাধি-গর্ব্বেই গর্ব্বিত—খাঁটি জ্ঞানচর্চ্চার দিকে লক্ষ্য নাই। কি আছে? আছে শুধু অনুকরণ—নিন্দা ও সমালোচনা। ঢাকার মত বড় সহরে সাহিত্যিক আব্‌হাওয়া একেবারেই নাই। একবার প্রখ্যাতনামা কবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় ঢাকাতে আসিয়া এলোপ্যাথিক ঔষধের শিশির ঝাঁকড়ানের মত একটা নাড়া দিয়াছিলেন—তাহাতে একটু প্রাণ জাগিয়াছিল। তিনি কবি মানুষ আনন্দময় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়াই তাঁহার অভ্যাস—তিনি যে আনন্দের বার্ত্তা প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন—সে আশার বাণী সে পীযুষধারা শুষ্ক মরুতে পড়িয়া শুকাইয়া গিয়াছে! ঢাকা সহরে লোক আছে, প্রাণ নাই! সাহিত্যিক আছে সাহিত্য নাই! পুস্তকের দোকান আছে তাহাতে কে পি বসুর এলজেবরা আছে, কিন্তু কোন সুলেখকের

কাব্য খুঁজিয়া পাইবে না! প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণ ব্যক্তি কখনই বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিত হন না, যেখানে কিছু নাই সেখানে শূন্য আস্ফালন একান্তই হাস্যাস্পদ। পুরাতন পুঁথি প্রচারে যাহারা মাতেন তাহারা একবারও ভাবেন না কত উদ্যমশীল তরুণ দরিদ্র যুবক আছেন যাহাদের গ্রন্থ মুদ্রিত করিলে তাহাদের শুধু প্রাণ রক্ষা নহে, সাহিত্যের সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য পরিষদের এখন পুরানা অস্থি-পঞ্জর লইয়া নারা চড়ার সময় আইসে নাই; সে কাজ ঢাকার যাদুঘর করিলেই ভাল হয়। তাঁহারা এখন সরল-সুন্দর মাধুর্য্য মণ্ডিত সাহিত্য-গঠনে প্রয়াসী হউন। নবীন কবি নবীন গল্প লেখক, নবীন চিত্রকর, নবীন নাট্যকার নবীন সাহিত্য সেবকের দল সৃষ্টি করুন। যদি তাহা না পারেন তাহাহইলে তাহাদের সাহিত্য পরিষদ বা সমাজ জাগিবে না।

* * * *

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় বাহাদুর ও অনারেবল রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায় বাহাদুর 'বিক্রমপুর সম্মিলনীর' হস্তে যে পাঁচহাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন আমাদের বিবেচনায় এবৎসরই ঐ টাকার দ্বারা বিক্রমপুরের যে সকল স্থানে জলকষ্ট তথায় প্রয়োজন মত জলাশয় খনন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। নচেৎ কার্য্য কিছুই হইল না বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের অবনতির মূল কারণ গ্রাম্য জনগণের অমনোযোগীতা। নচেৎ পুকুর খনন করিয়া দিলেই যে কার্য্য সুসম্পন্ন হইল তাহা নহে। দাতার দানও সার্থক হইল মনে করি না। আমাদের মনে হয় নিম্নলিখিত সর্ত্তানুযায়ী "সম্মিলনী-পুষ্করিণী" খননের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

১। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে পুষ্করিণী খনিত হইবে। পুষ্করিণী খননের স্থান বা প্রাচীন পুষ্করিণীর যিনি পঙ্কোদ্ধারের বা সংস্কারের জন্য দান করিবেন স্বত্ত্ব ত্যাগ করিয়া বা উহা তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য দান করিতে হইবে।

২। পুষ্করিণীর তীরে কোনও গাছ থাকিতে পারিবে না। উহার জলে বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া স্নান ইত্যাদি করিতে পারিবে না। কেবল জল পানের জন্য জল ব্যবহার করিতে পারিবে।

৩। সম্মিলনীর তহবিল হইতে পুষ্করিণী খননের জন্য যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা আদায়ের জন্য পুষ্করিণীতে মৎস্য পালন। পুকুরের পারে

কলাগাছ রোপণ করিয়া কলা ও মৎস্য ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া আদায় করা হইবে।

৪। গ্রাম্য মাতব্বরগণ এই সর্ত্তে সম্মিলনীর তহবিল হইতে টাকা লইয়া নিজ নিজ গ্রামে পুষ্করিণী খনন করিলে এবং সাধুতার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ-চেষ্টা করিলে অচিরেই গ্রামে নূতন নূতন পুষ্করিণী খনিত ও প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবে, নচেৎ কুবেরের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিলেও তোমাদের অভাব ঘুচিবে না।

*    *    *    *

সেদিন ঢাকার পথে একটী যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি বলিতে পারেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন কোথায় ?' আমি বালকটীকে তথায় যাইবার প্রয়োজন কি জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল কলিকাতা বেলুরমঠ হইতে যে মহারাজেরা আসিয়াছেন তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছি। আমি বলিলাম শুধু দর্শনেই কি তোমার তৃপ্তি হইবে। আজ্ঞা হাঁ নতুবা আমরা সংসারি লোক আর কি করিতে পারি। যুবকটীর বাড়ী হাঁসাড়া, এবার সে ম্যাট্রিকুলেশন দিবে।

সে সংসারী সে কি কাজ করিতে পারে। এই যে সংসারী কথাটা এটা আমাদের সমাজে সংক্রামক রূপে দেখা দিয়াছে। যিনি অর্থশালী ব্যক্তি তাঁহার নিকট কোনও সৎকার্য্যের জন্য যাও তিনি বলিবেন আমরা সংসারী লোক আমরা কি করিতে পারি ? মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন ব্যক্তি তিনিও উত্তর দিবেন "আমরা কি করিতে পারি ? যুবক ! তোমরা কি করিতে পার ? তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পার। তোমরাই দেশের প্রকৃত কার্য্য করিতে পার। বরপণের তীব্র বেদনা হইতে অসমর্থ দরিদ্র কন্যার পিতাকে বাঁচাইতে পার। তোমরা অবসর কালে অশিক্ষিত জন সাধারণকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে পার। স্বাস্থ্যরক্ষার স্থূল নীতিগুলি গ্রাম্য রমণী ও অজ্ঞ জনগণকে সেগুলি বুঝাইতে পার। শারিরীক বলবর্দ্ধক ক্রীড়া-কৌতুক প্রচলন করিতে পার। সেবা দ্বারা পল্লী-জননীর পীড়িত ব্যথিত সন্তানগণের কল্যাণ-শ্রী বৰ্দ্ধিত করিতে পার। গ্রাম্য লুপ্ত প্রায় পথ ঘাট মাঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য যত্ন করিতে পার। তোমরা কিনা পার বুঝিনা, তোমরা সব পার। ইংরেজ রাজত্বের শুভ শাসন ছায়ায় থাকিয়া তোমরা বিশ্ব জগতের জ্ঞান

আহরণ করিয়া ক্ষুধিত চিত্তের ব্যাকুল ক্ষুধা দূর করিয়া নিরক্ষর পল্লীবাসি গণকে সে সুধা ভাণ্ডারের অমৃত সুধা বিতরণ করিতে পার। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের সুন্দর উপদেশ 'ওরে কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর।' তোমরা সেই কাজ কর। বাধা বিঘ্ন আসিবে, তাহা সহিতে হইবে। আগুণে না পুড়িলে সুবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। মাণ্যবর লায়ন সাহেবের এই যুক্তি পূর্ণ কথাটি প্রত্যেক গ্রাম্য যুবকের মনে রাখা উচিত। "দেশের গ্রামের সকলকে শিক্ষা দিতে হইবে। গ্রামের মধ্যে যেন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সম্প্রীতি থাকে। যাহাতে গ্রামে পরস্পর পরস্পরের উপকার সাধন করিতে পারে পরস্পরকে ঘৃণা না করে, সেই সকল বিষয় দেখিতে হইবে।"

---

# পৌষের প্রবাসী

শিহরে শীতের রাতি ; ঘরে পতি একা
দক্ষালয়ে গেছে সতী, নাহি আর দেখা !
গিন্নি বিনা গৃহ মিছা—সিন্নি বিনা পীর
বিছার কামড়ে মরে বিছানায় বীর !
বিরহে বালিস ভেজে "সে" যে শেষে নাই
চামচিকা নাড়ে পাখা—চমকিয়ে চাই !
শৈত্য নহে দৈত্য !—দেহে হিমের প্রলেপ
জুজু হয়ে আছি ভয়ে জড়াইয়া লেপ !
ঠক্ ঠক্ কাঁপে অঙ্গ ঠিক্ যেন কাল
দীঘল রাক্ষুসী নিশি তিলে তিলে তাল !
মনে পড়ে—"পাটীসাপ্টা"—বাটি ভরা পুলি
রসে পক্ক চারু "চসি", যোক্ক—"মুগগুলি"
কুলের অম্বল, ঘণ্ট, ঝোলে ফুল বড়ি
কণ্ঠ ভরি হে প্রবাসী ! বল হরি হরি !

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

---

তৃতীয় বর্ষ | মাঘ, ১৩২২ | ১০ম সংখ্যা।

# শীত প্রভাতে

লক্ষীমায়ের বারতা বহিয়া অতিথি এসেছে দ্বারে,
আয় তোরা সবে আয় ছুটে আয়, বরণ করেনে তারে।
রূপের লহর খেলিছে আকাশে,
পীযুষের ধারা ঝরিছে বাতাসে,
স্নিগ্ধ শ্যামল অঞ্চল তার এসেছে ভূতলে লুটায়ে।
পরশ হরষে সরস কাননে পদ্ম-পলাশ ফুটায়ে।

সাগরে জানাতে এশুভ বারতা যেতেছে তটিনী বহিয়া,
ছুটিছে সমীর তটিনীর মধু পরশন টুকু লইয়া।
অন্ত বিহীন করুণা তাঁহার
শিশিরের রূপে ঝরে অনিবার,
ভৃঙ্গের তানে পাপিয়ার গানে ধরণী পুলকে বিভশা,
নন্দন হ'তে লক্ষ্মী এসেছে ধরণী করিতে সরসা।

সাগর ধ্বনিছে গুরু গম্ভীরে তারি আগমনী ঘোষণা,
বন্দনা-গীতি গাহিছে কুঞ্জে লক্ষ বিহগ রসনা;
ধান্যের ক্ষেতে মেলি অঞ্চল,
শুভ্র কমলে রাখি পদতল,
বঙ্গের গৃহে হাসি রাশি দিতে আশায় ভরিতে প্রাণ
নন্দন হ'তে অতিথি এসেছে গাহিতে আশার গান।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

———•:()*:•———

## বিক্রমপুরের দুঃস্থ লোকদিগের সাহায্য করা সম্বন্ধে

# কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ।

বিক্রমপুর আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। জন্মভূমি ধাত্রী, সাক্ষাৎ মাতৃ-রূপিনী। ভক্ত বলিয়াছেন "সকলে এই দেশটাকে পাহাড় সংকুল নদী মাতৃক, গিরিগহ্বর সমন্বিত শস্য শ্যামল একটা ভূমিখণ্ড মনে করে; আমি তাহা মনে করি না। আমি ইহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জননীর শরীরাংশ মনে করি, এই দেশটা মূর্ত্তিময়ী জননী।" বাস্তবিক আমাদের এদেশ প্রকৃত তাহাই। যে দেশের মাটীর সহিত আমাদের পূজ্য পূর্ব্ব পুরুষগণের অস্থি মজ্জা মিশিয়া আছে যাহার প্রতি ধূলি কণার সহিত অতীতের পুণ্যময়ী স্মৃতি বিরাজিতা, যে স্থানের নাম শুনিলে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে, হায়! আজ তাহার কি দুর্দ্দিনই না উপস্থিত! বিধাতা বলিতে পারেন, কবে এই তমিস্রা রজনীর অবসান হইবে।

বিক্রমপুরের পল্লীবাসীদের মধ্যে কত অসংখ্য লোক আজ দরিদ্র, পীড়িত, ব্যাধিক্লিষ্ট ও নিরন্ন, শীতবস্ত্র-বিহীন, জলাভাবগ্রস্থ এবং অন্যান্য বহুবিধ উপদ্রবে উপদ্রুত। এই সমস্ত অভাব দূরীকরণ মানসে দেশের সন্ত্রান্তগণ ব্রতী না হইলে আমাদের সাধের বিক্রমপুর দরিদ্রপুরে পরিণত হইবে। আমরা কিছুকাল হইল একটী সেবাশ্রমের সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইহা বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, গৃহস্থ কৃষক খাদ্যাভাবে আত্মহত্যা করিতে যাইয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছে। নিরাশ্রয় বিধবা জননী ক্ষুৎপীড়িত সন্তানের অন্ন-সংস্থান করিতে না পারিয়া উদ্যানে আত্মহত্যার উদ্যোগ করিয়াছে, হিন্দু মহিলা সধবার চিহ্ন সাধারণ শঙ্খের অভাবে বিধবার মত শঙ্খ-বিহীন হস্তে জীবন সিরাভরণে অর্পণ করিয়াছে। সধবা উপযুক্ত পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করিতে না পারিয়া সংগৃহীত পুরাতন সাদা বস্ত্রে পুরাতন বস্ত্র বান্ধিয়া পরিধানে লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন। সুপেয় পানীয় জলের অভাবে কত স্থান কলেরার আবাস ভূমিতে পরিণত হইতেছে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে পল্লীবাসী অসাড় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্যের অভাবে কত লোক রোগ-যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। কিন্তু আমরা তবু নিরাশ হই নাই, এক নবজাগরণের সাড়া যেন মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। কাহার মঙ্গলময় স্পর্শ যেন সকলের প্রাণকে মাতাইয়া তুলিতেছে। আজকার এই মহাযজ্ঞে সমস্ত সুসন্তানগণের একত্র সমাবেশ যেন সেই স্পর্শেরই পূর্ণ পরিণতি। আমরা দৃঢ় চিত্তে আশা করি জননীর সুসন্তানগণ মাতৃভূমির দৈন্য অপনোদনের সুব্যবস্থা না করিয়া পারিবেন না। সকলে আজ আত্মহারা হইয়া ঋষিদিগের পূত মন্ত্রটী উদ্‌যাপন করিয়া যাইবেন।

যস্মিন্‌ সর্ব্বান ভূতানি
আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ
একত্বমনুপশ্যতঃ॥

যখন মানবের একাত্ম প্রত্যয় জন্মে তখন সমস্ত শোক দুঃখের অবসান হয়। এই একাত্ম বোধ এই সম্মিলনীর প্রাণ। এই মাতৃভূমির বেদনার অনুভূতির সাড়া এই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা। উদ্যম উৎসাহ ত্যাগ-মন্ত্র, এই যজ্ঞের আহুতি। আমার ভক্তিভাজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনে এই একাত্ম বোধ ও ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। এই মহাপুরুষ এক শীতার্ত্তকে দেখিয়া নিজের শীত বস্ত্র দানে তাহার কম্পন নিবারণ করিলেন।

এই পর দুঃখ বিমোচনের সাড়ায় বিক্রমপুরকে কে জানি যেন নিয়ত উদ্বুদ্ধ করিতেছে। গত বৎসর এই সমবেদনা বোধ হইতেই যেন হাসারা গ্রামে দানবীর পল্লী পাঠশালার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত পদ্মলোচন ঘোষ আজীবন অর্জ্জিত সযত্নে রক্ষিত পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে একটী সুন্দর দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। সেখরনগর গ্রামে সুধী শ্রীযুত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর মহাশয় দ্বিতীয় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বিদগাঁ গ্রামে সৌম্যমূর্ত্তি শ্রীমান সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত তৃতীয় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া এই নব জাগরণের সহায়তা করিয়াছেন।

বিক্রমপুরের কতকগুলি পল্লীতে পরমহংস দেব রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের

অনুকরণে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত আছে। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে রুগ্নের অন্নক্লিষ্টের অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ এবং সর্ব্ববিধ উপায়ে মাতৃভূমির সেবা এই সেবাশ্রম গুলির উদ্দেশ্য। বিক্রমপুরে এইরূপ ৪।৫টী সেবাশ্রমের বিষয় আমার জানা আছে। আমরা আশা করি গ্রামে গ্রামে অথবা প্রত্যেক unionএ একটী একটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হউক এবং মাতৃভূমির মুখোজ্জলকারী যুবক বৃদ্ধ ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই স্বদেশ-সেবাব্রত গ্রহণ এবং চারিদিগের ত্যাগের আদর্শ করুক।

সৎকার্য্যের মূল মন্ত্র প্রীতি ও ত্যাগ। আসুন আমরা প্রীতিদ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া নিজ নিজ সাধ্যানুসারে অর্থ ব্যয় করিয়া দেশের অভাব মোচন করি।

শ্রীউমাচরণ সেন।

---

# ষড়যন্ত্র।

## প্রথম পরিচ্ছেদ

সুবোধ বলিল "দেখ মেজ বৌদি ডলিতে আর মেনীতে বড়ই ভাব। উহাদের দেখিলে আমার বড়দাদা আর বড় বৌদিদির কথা মনে পড়িয়া যায়। দুই জনে ঠিক যেন দা কুমড়া সম্বন্ধ। মেনী তখন প্রাচীরের উপড়ে দাঁড়াইয়া পলায়নের পথ খুঁজিতেছিল, আর ডলী লাফ দিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিয়া প্রত্যেক বারই বিফল হইতেছিল। সুবোধের কথা শুনিয়া তাহার মেজবৌদিদি হাসিয়াই আকুল, কি উত্তর দিবেন ভাবিয়াই পাইতেছিলেন না। ডলি দুই তিনবার ইটের দেওয়ালে ধাক্কা খাইয়া মাটিতে দাঁড়াইয়াই তার স্বরে ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল।

তাহা দেখিয়া সুবোধ আবার কহিল, দেখ বৌদিদি ডলির এই বারে বড় দাদার অবস্থা হইয়াছে। দাদা আমার যখন বৌদিদির সঙ্গে আটিয়া উঠিতে না পারেন, তখন আমাদের না পারিলে, গরীব আমলাদের উপরে তাহার শোধ তোলেন।

মেজ বৌদিদি সরোজিনী তখন মুখ হইতে আন্দাজ এক হাত অঞ্চলের

কাপড় বাহির করিয়া মন্দ মন্দ হাসিতে হাসিতে কহিলেন "ঠাকুরপো তুমি বেশ এক একটি কথা বল, হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিড়িয়া যায়। সত্যি, আজ পাঁচ বছর আমার বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে একদিন বড় ঠাকুর বা দিদিকে হাসি মুখে দিন কাটাতে দেখলুম না।

"মেজ বৌদিদি" এই সব দেখে শুনেই জোটাইনা। তোমার অন্যায় কথা ঠাকুর পো, সকলেরই কি এক দশা হবে। এই দেখনা—"যেমন আমার মেজ দাদা, আর মেজ বৌদিদি? পাঁচ বছরের মধ্যে মেজ দাদা আর সদরে বসেন নি।"

সরোজিনীর মুখ খানি সদ্য বিকসিতা কুমুদিনীর মত, তাহা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া কহিলেন,—"যাও ঠাকুর পো তোমার ঐ এক কথা।" তোমার মেজদাদার কি আমার সঙ্গে কথা কহিবার অবসর আছে, তিনি দর্শন শাস্ত্র লইয়াই আছেন। শ্বশুর বইয়ের আলমারীটির সঙ্গে ঠাকুরটির বিয়ে দিলেই ভাল করিতেন। "কই মেজ বৌদি তোমাকেওত ঘরের বাহিরে দেখা যায় না।" কি করিব বল ঠাকুর পো? বড় ঠাকুরের ঘরে দিবা রাত্রি রাম রাবণের যুদ্ধ লাগিয়াই আছে, যেমন বড় ঠাকুর তেমনি দিদি ছেলে মেয়ে গুলাও তেমনি হইয়াছে। তাই বলি তুমি যদি বিবাহ করিয়া একটি রাঙ্গা টুক টুকে বৌ আনিতে তাহা হইলে দুই দণ্ড কথা কহিয়া প্রাণ জুড়াইতাম। অত কথার কাজ কি মেজ বৌদি, তুমি আসিবার পূর্ব্বে সেগুলী সদরে ছিল, এখন অন্দরে আসিয়াছে।

এই সময়ে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে চটী জুতার শব্দ হইল, সরোজিনী ঐ বড় ঠাকুর আসিতেছেন বলিয়া ঘোমটা টানিয়া ছুটিয়া পলাইলেন। সুবোধ ডলীকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ডলি বন্ধন ভয়ে উৰ্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিল। সঙ্গে সঙ্গে মেনকা পিসি রান্না ঘর হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গেল গেল ঐ সব গেল, ও সুবোধ তোর লক্ষ্মীছাড়া কুকুর বুঝি রান্নাঘরে ঢোকে। সুবোধ ব্যস্ত হইয়া রন্ধনশালার দিকে ছুটিল, এই সময় অন্দরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া সুবোধের বড় দাদা সুরেশচন্দ্র ডাকিলেন "সুবোধ।"

সুবোধ রান্না ঘরের চারিদিকে ডলিকে খুঁজিতেছিল, সে উত্তর দিল "যাই।" রন্ধনশালার ত্রিসীমানায় ডলিকে খুঁজিয়া না পাইয়া সুবোধ অন্দরে আসিল। দেখিল তাহার দাদা সুরেশচন্দ্র একখানি নূতন নামাবলী গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! নামাবলী দেখিয়া সুবোধ চমকাইয়া গেল, সুরেশচন্দ্র কহিলেন "আজ বৈকালে দক্ষিণ পাড়া হইতে সাতকড়ি বাবু তোমাকে দেখিতে আসিবেন; তোমার বড় বৌদিদিকে গিয়া বল যে বৈকালে চারি পাঁচ জন ভদ্রলোকের জল খাবার তৈয়ারী করিতে হইবে। সুবোধ উত্তর করিল "যাই।" সুরেশচন্দ্র সদরে ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ পিছন ফিরিয়া বলিলেন "দেখ সুবোধ আজ থেকে তুমি একবার একবার কাছারীতে বসিও এখন বড় হইয়াছ, বিষয় কর্ম্ম বুঝিয়া লও. আমার কাশী বাসের সময় হইয়াছে সংসারের ভার আর আমি বেশী দিন বহিতে পারিব না। সুবোধ বহু কষ্টে হাসি চাপিয়া বলিল "আচ্ছা।"

সুরেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন, সুবোধ মনে মনে ভাবিল যে আজিকার ঝগড়াটা গুরুতর, কারণ দাদার সহিত বৌদিদির কথা বন্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি নিজেই বড় বৌদিদিকে একথা বলিয়া আসিতেন। দ্বিতীয় কথা বড় বৌদিদির বাক্যবাণগুলী চোখা চোখা তাঁহার বচনের চোটে দাদা আমার বিবাগী হইবার উদ্যোগে আছেন। তৃতীয় কথা নামাবলীখানি নূতন, বাড়ীতে এমন নামাবলী ছিল না, মেনকা পিসির একখানি আছে তাহা গরদের নহে সূতি, বহু পুরাতন নারিকেল তৈল-সিক্ত এবং শত ছিদ্র, এখানি নূতন গরদের এবং হরে কৃষ্ণের বদলে শিব দুর্গা লেখা। চতুর্থ কথা দাদার এখনও বিবাগী হইবার সময় হয় নাই, কারণ তিনি এখনও গরদের নামাবলী পড়িবার লোভ ছাড়াইতে পারেন নাই। পঞ্চম, বৌদিদির মেজাজ বোধ হয় এখনও গরম আছে, কারণ বড় দাদার রণে ভঙ্গ দিবার পরে তাহার ক্রোধ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, এবং কণ্ঠস্বর পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িতে থাকে ফলে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তাঁহার মহল ছাড়িয়া পলাইয়া যায় মানুষত দূরের কথা।

এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া সুবোধচন্দ্র স্থির করিল যে এখন বড় বউদিদির নিকটে যাওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। সে ধীরে ধীরে তাহার মেজ বৌ দিদির শয়ন ঘরের দুয়ারে আস্তে আস্তে একটি পা দিল।

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে ভিতর হইতে কে দরজা খুলিয়া দিল, সুবোধ দেখিল মেজ দাদা দাঁড়াইয়া আছেন। সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "মেজ বৌ দি কোথায় ?"

সুধীরচন্দ্র অতি ধীরে ধীরে কহিলেন "ঘরে নাই।" সুবোধ অন্দর ছাড়িয়া রন্ধনশালার দিকে চলিল, গিয়া দেখিল সরোজিনী রান্না ঘরে মেনকা পিসির নিকটে বসিয়া পরমানন্দে আচার ভক্ষণ করিতেছেন। ঠাকুরপোকে দেখিয়া তিনি এক হাত ঘোমটা টানিয়া দিলেন। সুবোধ অবসর বুঝিয়া মহাব্যস্ততার ভাণ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "দেখ মেজবৌদি বড় দাদা বলিয়া গেলেন যে দক্ষিণ পাড়ায় অনামুখো মুখুয্যেদের বাড়ী থেকে বিকালে আমাকে দেখিতে আসিবে। তুমি বড় বৌ-দিদিকে বলিও যে সেই সময় চারি পাঁচ জন ভদ্র লোকের জল খাবার চাই। সরোজিনী আচার ভক্ষণকালে ধরা পড়িয়া লজ্জিত হইয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়াছিলেন সেইজন্য এখন তিনি বড়ই ফাঁপড়ে পড়িলেন। বড় বৌয়ের ঘরে যখন কামান গর্জ্জিত তখন শান্তিপ্রিয় মেজবৌ সে তল্লাট ছাড়িয়া পালাইত। তিনি ঘুমটা খুলিয়া পারিব না বলিবার পূর্ব্বেই সুবোধচন্দ্র অন্তর্হিত হইয়াছিল, সুতরাং অগত্যা সরোজিনীকে আচার ছাড়িয়া উঠিতে হইল।

মেজবৌয়ের স্কন্ধে বড় গিন্নির সহিত কথা কহিবার ভার চাপাইয়া দিয়া সুবোধ ডলির সন্ধানে চলিল। অন্দরের দুয়ারে তাহার সহিতে সুধীরচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল সেজদা আপনার খাওয়া হয়েছে ? সুধীরচন্দ্র বড় একটা কথা কহিতেন না। তিনি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে তখনও তাহার আহার হয় নাই। সুবোধ কহিল আপনি একবার শীঘ্র বাহিরে যান বড় দাদা বোধ হয় রাগ করিয়া কাশী যাইতেছেন। সুধীরচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া সদরে চলিলেন, সুবোধ তখন নিশ্চিন্ত মনে একটি সিগারেট ধরাইল এবং ডলির সন্ধানে চলিল।

রান্নাঘরের পাশে বাড়ীর দেওয়ালের খানিকটা পড়িয়া গিয়াছিল। বর্ষাকালে মেরামত হইবে না বলিয়া সেখানটায় বেড়া দেওয়া হইয়াছিল। ডলি পরিশ্রম করিয়া সেই বেড়ার ভিতর দিয়া একটা ছিদ্র করিয়া রাখিয়াছিল

এবং অন্ত পথ না পাইলে সেই ছিদ্র দিয়া ভ্রমণ করিতে বাহির হইত। সুবোধ তাহা জানিত না।

সে মেনকা পিসিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন তোমার কুকুর বেড়ার ফাঁক দিয়া কোথায় পালাইয়াছে। সুবোধ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ডলি মাঝে মাঝে অনুমতি না লইয়া বেড়াইতে যায় বটে, কিন্তু সে অন্য সময়। সুবোধের স্নানাহারের সময় মত কোথাও যায় না; সুবোধ কাঁধে গামছা ফেলিয়া ডলির শিকলটা হাতে লইয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া ডলির সন্ধানে বাহির হইল। কোথায় ডলি? সে ঝড়ের মত কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা বড় কঠিন। সুবোধ সাড়া গ্রামটী তাহাকে খুজিল, পথে পথে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া বেড়াইল, কিন্তু ডলি আসিল না।

সে তখন বিরক্ত হইয়া স্নানে চলিয়া গেল। গ্রামের নিম্নে নদী, তাহা বড় অপরিষ্কার দামে ভরা। সুবোধ সাঁতার দিতে বড় ভালবাসিত, সেইজন্য সে নদীতে যাইত না গ্রাম-প্রান্তে নীল কুঠির ঝিলে স্নান করিত। স্নান শেষ করিয়া সুবোধ তীরে উঠিয়া দেখিল যে ডল ওরফে ডলি সুবোধ বালক-টির মত দাঁড়াইয়া আছে। সুবোধ যখন তাহাকে ধরিতে গেল তখন সে পলাইল। সুবোধ বিরক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিল, ডলি লেজটী নীচু করিয়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটিল।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ঝিলের বুকের উপর দিয়া ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিয়া তাহার বক্ষোদেশে চিন্তাকুল ললাটের মত রেখাঙ্কিত করিয়া দিল। একটা পুরাণো জীর্ণ ঘাটের ভাঙ্গা ধাপের উপরে বসিয়া একটি যুবক রুমাল দিয়া মুখ মুছিতেছিল।

ভয়ানক গরম, সাত দিন বৃষ্টি হয় নাই। মেঘের চিহ্ন মাত্রও নাই, শ্রাবণের আকাশ শরতের মত মেঘশূন্য নির্ম্মল নীল। মাঝে মাঝে এক একখানা শুভ্র খণ্ড মেঘ, নীলের সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছে। যুবকটী জীর্ণ ঘাটের উপরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, সে হঠাৎ মুখ তুলিয়া ডাকিল "ডলি"। একবার দুইবার তিনবার ডাক হইল, আসিলনা। তখন নায়ের

তলা হইতে একটা বন্দুক আর একটা গুলিয়া তুলিয়া লইয়া সুবোধ নৌকা হইতে উঠিল। ঝিলের উপরে জঙ্গল, সুবোধ সেই জঙ্গলের মধ্যে ডলিকে সন্ধান করিতে লাগিল।

খানিকটা দূর চলিয়া সুবোধ একেবারে নীল কুঠির সম্মুখে আসিয়া পড়িল। কুঠীর সম্মুখটা যেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, ঘর দুয়ার গুলা মেরামত হইয়াছে, দেখিয়া সুবোধ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। নীল কুঠি বহুকাল পরিত্যক্ত জীর্ণও পতনোন্মুখ, ভূতের ভয়ে সেখানে মানুষ আসিতে চাহে না। সেই কুঠির ঘাটে, মস্ত একটা পুরাতন ঘাটের লম্বা পইটার উপরে কে একজন বসিয়া আছে, আর ডলি বার বার কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহার চরণ তলে লুটাইয়া পড়িতেছে। ডলিকে দেখিয়া সুবোধের একবার ইচ্ছা হইল যে তাহাকে ডাকিয়া শাসন করে, কিন্তু সে তখনই ভাবিল যে লোকটাকে তাহার পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়া লওয়া উচিৎ অনেক দূর হইতে স্ত্রী লোকের মত দেখাইতেছে। ঠিক;এই সময়ে তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সুবোধচন্দ্র ডলিকে ডাকিতে ভুলিয়া দূরে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

সেটি একটী স্ত্রী-লোক, বয়স অল্প কিশোরী কি যুবতী। একখানি নীলাম্বরী শাড়ী পরা কেবল মুখ খানি দেখা যাইতেছে কিন্তু মুখখানি এত সুন্দর যে তাহা সুবোধকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। সুবোধ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া সুন্দরীকে দেখিতে লাগিল। অমন করিয়া, ভদ্র মহিলাকে দেখা যে নীতি-বিরুদ্ধ তাহা সে ভুলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে তাহার যখন এই কথা মনে উঠিল তখন সে জঙ্গলের মধ্যে ফিরিয়া গেল। তখন অন্ধকার আসিয়া গাছের তলায় তলায় লুকাইয়াছে। সে বড় বড় গাছের আড়ালে লুকাইয়া ঝিলের কাছে আসিল এবং লুকাইয়া অপরিচিতা সুন্দরীকে দেখিতে লাগিল।

নানা কথা এই সময়ে তাহার মনে হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে তাহার মনে হইতে লাগিল যে ব্যাপারটা ভৌতিক, কারণ নীল কুঠি অনেক দিন হয় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল কিন্তু ভৌতিক কাণ্ডে কি ডলি বাই চিত্তে যোগদান করিতে পারিত, কখনইনা। তবে নীল কুঠিতে কে আসিল? কুঠিটা মেরামত হইয়াছে, তবে নিশ্চয়ই লোক আসিয়াছে। কিন্তু কুঠিতে

লোক আসার কথাত গ্রামের লোকে শুনে নাই। সুন্দরী ঘাটের রাণায় বসিয়া ঝিলের জলে পা ডুবাইতেছিলেন, সুবোধ এক এক বার তাহাই দেখিতেছিল, আর এক বার ভাবিতেছিল ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, কুঠিতে আলো জ্বলিয়া উঠিল, তিনি ঘাট ছাড়িয়া উপরে উঠিলেন এবং ডগিকে আদর সম্ভাষণ করিয়া কুঠির দিকে ফিরিলেন।

সুবোধ এতক্ষণ বেশ ছিল, হঠাৎ যেন কেমনতর হইয়া গেল। সে যেন কোন স্বপ্ন রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল, হঠাৎ কে যেন তাহাকে কঠোর বাস্তব জগতে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিল। ডগি অনেকক্ষণ পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া তাহার গায়ের উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল. তখন সুবোধের চমক্ ভাঙ্গিল সে গৃহের পথ অবলম্বন করিল।

প্রকৃত পথ অবলম্বন করিলেই যদি গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হওয়া যাইত, তাহা হইলে আর দুঃখ কিসের? সুবোধ অল্প দূর যাইতে না যাইতেই পথ ভুলিল অনেক দূর চলিয়া যখন সে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল তখন তাহার হুঁশ হইল যে সে পথ ভুলিয়াছে সে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া চারদণ্ড রাত্রির সময়ে বাড়ী ফিরিল। দেখিল যে তাহার বাল্যবন্ধু নরেশ তাহার জন্য বসিয়া আছে। নরেশকে দেখিয়া সুবোধের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যে সেই নরেশকে তাহার নিজ তরফ্ হইতে দূর করিয়া সাতকড়ি মুখুজ্যের মেয়ে দেখিতে পাঠাইয়াছিল। এই কথা মনে হইতেই সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। অন্যদিন সে যেমন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নরেশের আখ্যান শুনিয়া যাইত আজ তাহার কিছুই দেখা গেল না। নরেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কোনও রকমে নরেশকে বিদায় করিয়া দিয়া সুবোধ শুইয়া পড়িল। তখন বাহির বাড়ীর বৈঠকখানায় আর কেহই ছিলনা। সুধীরচন্দ্র অন্দরে দর্শন শাস্ত্র অনুশীলন করিতেছিলেন এবং সুরেশচন্দ্র রামলাল ঘটকের সহিত কথা কহিতে কহিতে গ্রামের দিকে গিয়াছিলেন। সুবোধ বৈঠক খানার আলো নিবাইয়া দিয়া বৈঠক খানার বারান্দার একখানা বেঞ্চের উপরে শুইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

সে এতদূর তলাইয়া গিয়াছিল যে জ্যেষ্ঠ সুরেশচন্দ্রের চটিজুতার শব্দ অথবা চাকরের হাতের লণ্ঠনের আলো তাহাকে খুঁজিয়া পায় নাই।

বড়দাদা যখন ডাকিলেন "সুবোধ" তখন সে ঝিলের ধারে শ্যামল জলরাশির মধ্যে ফুল্লরাবিন্দতুল্য চরণযুগলের অথবা নীলাম্বরী-মণ্ডিতা পদ্মিনী সুন্দরীর ধ্যান হইতে ফিরিয়া আসিল। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আজ্ঞে"।

"তুমি বাহিরে কেন"?

"আজ্ঞে বড় গরম"।

"ভিতরে যাও"।

সুবোধ ভিতরে চলিল। পথেই সরোজিনীর নিকট ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হইয়া গেল সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিলেন কি ঠাকুরপো? "কনে পছন্দ হয়ে গেল"? "সুবোধ অন্যমনস্ক হইয়া বলিল হুঁ"। সরোজিনী হাসিয়া বলিল "ও বাবা এর মধ্যেই এত? তবুত এখন বৌঘরে আসেনি! সুবোধ এতক্ষণে বুঝিল যে সে একটা লজ্জার কথা স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল" কি বলিলে মেজ বৌদিদি?

"তুমি কি বাড়ী ছিলে না"?

"সে কি এইত সন্ধ্যাবেলা এসেছি"।

"ছিলে কোথায়"?

"শীকার করিতে গিয়াছিলাম"।

"বলি সন্ধ্যা বেলায় কোথায় ছিলে?"

"কেন সদরে।

"উহু, মনটা কোথায় ছিল?

সুবোধ তাহার মনটী কোথায় এই কথা মনে করিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িল. সরোজিনী অবসর পাইয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন।

কি ঠাকুর কথা কওনা যে?

"হু"।

"ধ্যানস্থ নাকি?"

"কার"?

এই দক্ষিণ পাড়ার সাতকড়ি মুখুজ্যের মেয়েটির।

"আঃ, ছিঃ"।

"ছি বইকি।"

"না সত্যি মেজ বৌদি তোমার দিব্যি, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি।"

আর আমাকে নিয়ে টান পাড়াপাড়ি কেন ভাই? আমি বুড় মানুষ। সেই রাঙ্গা চরণ যুগল জড়িয়ে ধরে যদি ঐ কথা বলতে পার তবে বুঝবো যে সত্যি। সুবোধ পরাজয় স্বীকার করিল। অন্যদিন তাহার সম্মুখে সরোজিনী বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে পারেন না, কিন্তু আজি সে অন্য মনস্ক ছিল বলিয়া হারিয়া গেল। নিমিষের মধ্যে সংসারের সকলেই জানিতে পারিল যে এতদিন পরে সুবোধ বা ছোট বাবুর মনের মত কন্যা মিলিয়াছে। এই কথা সে মেজ বধুঠাকুরাণীর নিকট কবুল করিয়াছে। সুবোধ নামে মাত্র আহারে বসিল, এবং দুই এক গ্রাস মুখে দিয়াই পালাইল। ইহাও তাহার পূর্ব্বরাগ বা লজ্জার লক্ষণ বলিয়া স্থির হইয়া গেল। গভীর রাত্রে সুরেশচন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন এবং ছাদে বসিয়া মধ্যম ভ্রাতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুধীরচন্দ্র আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সুবোধের মত হয়েছে? শুনছি তাই।

"ঠিকত?"

বাড়ীর ভিতরে শুনিলাম যে নিশ্চয় মত হয়েছে, হলেই ভাল। দেখ ভাই অনেক মৎলব করে তবে দক্ষিণ পাড়া থেকে সম্বন্ধও আনান গেল। রামলাল ঘটকই এর মূল।

আমি ভাবছি যে সুবোধের বিবাহে টাকা কড়ি আর কি চাইব। চরলক্ষ্মী পুরের চার আনা অংশ, সেটা মোহিনীদের ভাগে পড়েছিল, সেটা সাতকড়ি বাবু নীলামে কিনেছেন সেইটেই সাতকড়ি বাবুকে মেয়ে জামাইর নামে লিখে দিতে বলব।

সুধীরচন্দ্র উত্তর দিলেন না। ছাতের পাশে দ্বিতলের বারান্দায় সুবোধ শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল, সে সমস্তই শুনিল। শুনিয়া তাহার মনে ধিক্কার জন্মিল কারণ তাহার মন তখন জাগরণে ঝিলের নীলজলে দুখানি ক্ষুদ্র শুভ্র চরণের স্বপ্ন দেখিতেছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

# বিক্রমপুরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সংস্থানের উপায়।

বিক্রমপুরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব হইল কেন? যে বিক্রমপুরে সহস্র সহস্র পুকুর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেদেশে বিশুদ্ধ জলের অভাবের কারণ কি? ধর্ম্মহীনতা এবং সরিকি বিবাদ এই ভীষণ জলাভাবের কারণ। সরিকি বিবাদের ফলে বিক্রমপুরের কোন প্রাচীন পুকুরেরই পঙ্কোদ্ধার হইতেছে না। পুকুরের সংস্কার ত অতি দূরের কথা. ঐ কারণে অধিকাংশ পুকুরের পানা জঙ্গল ইত্যাদি পরিস্কার করা হয় না। আজ ২ বৎসর যাবৎ বিক্রমপুরের সকল পুকুর, খাল, কচুরী গাছ নামক এক জাতীয় গুল্ম দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। এই কচুরী পানা, জঙ্গল অপেক্ষাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর।

## (১) পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের উপায়।

১। বিক্রমপুর সম্মিলনীর পক্ষ হইতে একজন স্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ও কর্ম্মঠ ডাক্তার নিযুক্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

২। উক্ত ডাক্তার বাবু প্রতিগ্রামের পুকুরগুলির একটী তালিকা এবং তৎসঙ্গে সেই সেই সেই পুকুরের স্বত্বাধিকারী বা সরিকদের নাম ধাম ইত্যাদি সংগ্রহ করিবেন।

৩। বিক্রমপুর সম্মিলনী উক্ত ডাক্তার বাবুকে একটী অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা জল পরীক্ষার আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া দিবেন। উক্ত ডাক্তার বাবু প্রত্যেক পুকুরের জল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কোন্ কোন্ পুকুরের জল পানা, জঙ্গল বা কচুরী পরিস্কার করিলেই পানীয় জলরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং কোন্ কোন্ পুকুরের পঙ্কোদ্ধার একান্ত আবশ্যক তাহা তিনি সম্যকরূপে সংগ্রহ করিয়া সম্মিলনীকে জ্ঞাপন করিবেন।

৪। এই সম্মিলনী উক্ত ডাক্তার বাবুর রিপোর্ট অনুসারে সর্ব্বাগ্রে যে যে পুকুরের পানা জঙ্গল ও কচুরী পরিস্কার করিলেই পানীয় জলরূপে সকলে ব্যবহার করিতে পারিবে, সেই সকল পুকুর পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিবেন।

৫। যে সকল পুকুরের একান্ত আবশ্যক সম্মিলনীর সভ্যগণ সেই সেই পুকুরের সরিকদিগের বিবাদ মীমংসা করিয়া দিবেন। অংশীগণের স্বত্বের কোন ব্যতিক্রম না করিয়া অবস্থাপন্ন সরিককে কতিপয় বৎসরের জন্য পুকুরের মৎস্য ও চারি পাড় ভোগ করিতে দিলে, বোধ হয় অনেক পুকুরেরই পঙ্ক উদ্ধার হইয়া যাইতে পারে।

৬। উক্ত ডাক্তার বাবু পুকুরের তালিকা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গ্রামের চিকিৎসক, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, শিক্ষক ও ছাত্রগণকে লইয়া একটী "সেবাশ্রম" প্রতিষ্ঠা করিবেন। এই সেবাশ্রমের সভ্যগণ গ্রামের পীড়িত ব্যক্তিদের সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবেন ও পুকুরের জল যাহাতে কেহ দূষিত করিতে না পারে এজন্য সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। এতদ্ভিন্ন শিক্ষিত মহাত্মারা গ্রামের অশিক্ষিত নর নারীগণকে দূষিত জল পানের অপকারিতা ভালরূপ বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন।

৭। যে স্থানে সরিকদের অর্থাভাব বশতঃ পুকুরের পঙ্কোদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে সম্মিলনী যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিবেন। নানা কারণে সম্মিলনীর উক্ত কার্য্য অসাধ্য হইলে গবর্ণমেণ্ট ও জিলা বোর্ডের সাহায্য লইয়া সম্মিলনী সেই সেই পুকুরের সংস্কার করিবার ব্যবস্থা করিবেন। অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার বিষয় এই যে অতি তুচ্ছ কারণে সরিকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়া পুকুরের সংস্কারের গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। এই সম্মিলনী মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলে আমরা আশা করি বিক্রমপুরের বহু পুকুরের পঙ্কোদ্ধার হইয়া যাইবে।

৮। শ্রীনগর থানার অধিকাংশ পুকুরের অবস্থা অতীব শোচনীয়। অনেক পুকুরের মধ্যে বা পাড়েই পায়খানা দৃষ্ট হয়। এই সম্মিলনী অবিলম্বে সেই সকল পুকুর হইতে পায়খানা দূর করার জন্য যথাসাধ্য যত্ন চেষ্টা করিবেন।

৯। বিক্রমপুরের শিক্ষিত মহাত্মারা অনেকেই বিক্রমপুর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া বাস করিতেছেন। ইহার ফলে বিক্রমপুরের অবস্থা অত্যন্ত অবনত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত মহাত্মারাই বিক্রমপুরে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করেন ও ভাল পুকুর খনন করেন তাহার ব্যবস্থা করা

একান্ত কর্ত্তব্য। শিক্ষিত মহাত্মারা গ্রামে বাস না করিলে দেশের উন্নতির আশা কি?

১০। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিম বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই অতি ভীষণ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই সম্মিলনী অবিলম্বে তথাতে ঔষধ ও পথ্য সহ ৪।৫ জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবেন। উক্ত ডাক্তারগণ দরিদ্রদিগকে বিনা মূল্যে ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিবেন এবং তথাতে ওলাউঠার প্রতিষেধক নিয়মগুলি অবলম্বন করিবেন।

আমরা ইতি পূর্ব্বে যে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার নিযুক্ত করার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য এই যে বিক্রমপুরে কোন পীড়া প্রকাশ পাইলেই উক্ত ডাক্তার বাবু তথাতে যাইয়া তাহাদের চিকিৎসা করিবেন এবং যাহাতে ঐ পীড়া ভীষণ আকার ধারণ করিতে না পারে সে বসন্ত ও ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা অনেক পরিমাণে নিবারণ করিতে পারেন।

১১। পুষ্করিনীর মৎস্য বিক্রয় একটী লাভ জনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। বিক্রমপুরে এমত অনেক জেলে আছে যাহারা কতিপয় বৎসরের জন্য পুকুরের মৎস্য ও স্থল বিশেষে পুকুরের চারি পাড় ভোগ করিতে পাইলে হৃষ্টচিত্তে পুকুর কাটাইয়া দিতে প্রস্তুত আছে। এই সম্মিলনী অতি সহজে ও বিনা ব্যয়ে এই উপায়ে অসংখ্য পুকুরের সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

১২। প্রত্যেক গ্রামে এমন ২।১ জন ধনী ও ব্যবসায়ী আছেন যাঁহারা উক্ত নিয়মে সমস্ত গ্রামের পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিতে পারেন। ফলতঃ উপরি উক্ত উপায়ে পুকুর সংস্কার করাইয়া দিলে স্বত্বাধিকারীদের কোনই ক্ষতির কারণ নাই, অপরন্তু যথেষ্ট লাভের কারণ দৃষ্ট হয়। তাহারা বিনা ব্যয়ে একটী ভাল পুকুর পাইবেন, পুকুরের মাটি বাড়ীতে ও বাগিচাতে উঠাইয়া লইতে পারিবেন, ম্যাদ অন্তে পুকুরের মৎস্য ও তাঁহারা ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন। এবং বাড়ীর চারিদিকের গর্ত্ত, ডোবা, গরখাই গুলি পুকুরের মৃত্তিকা দ্বারা ভরাট করাইয়া দিলে ম্যালেরিয়ার হাত হইতেও রক্ষা পাইতে সক্ষম হইবেন।

১৩। কৃষকদের সকলেরই বাড়ীর ও ক্ষেতের জন্য মৃত্তিকার দরকার হইয়া থাকে, অথচ তাহারা অর্থ দ্বারাও তাহা পায় না। এই সম্মিলনী যদি উক্ত কৃষকদের দ্বারাই কাটাইবার ব্যবস্থা করেন, তবে বিনা ব্যয়ে পুকুর সংস্কার হইয়া যাইতে পারে ও কৃষকদের ও মৃত্তিকার অভাব দূর হয়। সম্মিলনী একটু যত্ন চেষ্টা করিলেই উক্ত উপায়ে কৃষক পল্লীর অসংখ্য পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

১৪। কৃষক পল্লীতে কয়েকটি পুরাতন পুকুর পাট বাঁশ ইত্যাদি ভিজাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত। কৃষক পল্লীর পানীয় জলের পুকুরের জল যাহাতে তাহারা দূষিত করিয়া না ফেলে তজ্জন্য গ্রাম্য যুবকদের তীব্র দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ও সময়ে সময়ে তাহাদিগকে দূষিত জল পানের অপকারিতা ও পুকুরের জল বিশুদ্ধ রাখার উপায়গুলি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিবেন। সময়ে সময়ে উক্ত ডাক্তার বাবু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দূষিত জলের কীটাণুগুলি ২।৪ জন মাতব্বর লোককে দেখাইয়া দিলে, বোধ হয় কেহই দূষিত জল পান করিতে সাহসী হইবে না। ভদ্র পল্লীতেও এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে বিস্তর সুফল লাভের সম্ভাবনা।

১৫। বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামের খাল ভরট হইয়া গিয়াছে এবং সেই খালে বড় বড় গাছও জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই সম্মিলনী বিক্রমপুরের খালগুলি পরিস্কারের ব্যবস্থা করিবেন। ক্রমে খাল কাটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে গ্রামের যথেষ্ট কল্যাণ হইবে। কারণ খাল পরিষ্কার থাকিলে অনেকে খালের জলও ব্যবহার করিতে পারে।

এদেশের সকলেরই খালের ধারে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। এই কু অভ্যাস যাহাতে লোকে পরিত্যাগ করে এজন্য সকলেরই যত্ন করা কর্ত্তব্য।

১৬। বিক্রমপুরের অতি অল্প স্থানেই নূতন পুকুর খননের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। নূতন পুকুর কাটাইতে যথেষ্ট সময় ও অর্থের প্রয়োজন। অতএব সম্মিলনী ক্রমে ক্রমে ২।১টি নূতন পুকুর খননের ব্যবস্থা করিবেন। মোট কথা বিক্রমপুরের পুরাতন পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার ও পরিষ্কার করিলেই বিক্রমপুরের জলাভাব দূর হইয়া যাইবে।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

## বিশুদ্ধ জল পাওয়ার অতি সহজ উপায়।

১। এই সম্মিলনীতে অদ্য বিক্রমপুরের যে সকল সুসন্তান উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সমীপে আমার এই বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা অদ্য হইতে সকলে জল সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা শীতল হইলে পান করিবেন। জল খুব ফুটাইলে জলের অনেক দোষ নষ্ট হইয়া যায়। জাপান ও চীন দেশের লোকেরা সকলেই জল সিদ্ধ করিয়া পরে তাহা পান করিয়া থাকে। ইহার ফলে সে সকল দেশে ওলাউঠা প্রায় নাই বলিলেই হয়। আমি পুনরায় নিবেদন করিতেছি, আপনারা এই অতি সহজ উপায়টি কেহই ভুলিবেন না, নিজেরা ঐ উপায় অবলম্বন করিবেন ও গ্রামের প্রত্যেক নর নারীকে জল সিদ্ধ করিয়া পরে শীতল হইলে তাহা পান করিতে বাধ্য করিবেন।

২। ছোট ছোট পুকুর গুলির জল পটাশ পারমেঙ্গনেশ নামক ডাক্তারী ঔষধ দ্বারা অতি সহজে ও সামান্য ব্যয়ে (২।১৲ টাকা ব্যয়ে) শোধিত করা যাইতে পারে। এই সময়ে জল শোধিত করিয়া পান করিলে ওলাউঠা প্রভৃতি পীড়া প্রায়ই আক্রমণ করিতে পারে না।

৩। জল পরিষ্কারের উপায়, দূষিত জল পানের অপকারিতা এবং ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া বসন্ত প্রভৃতি ভীষণ পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় গুলি সম্বন্ধে শিক্ষিত মহাত্মারা নিরক্ষর গ্রামবাসিগণকে সর্ব্বদা উপদেশ প্রদান করিবেন। আমি এই উদ্দেশ্যে 'পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা' সম্বন্ধীয় এক সহস্র খণ্ড সম্মিলনীর হস্তে প্রদান করিলাম। সম্মিলনী এই বই সর্ব্বত্র বিতরণ করিবেন। আমি আশা করি শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই বই খানি অশিক্ষিত গ্রামবাসিদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে দেশের অনেক উপকার হইবে।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—— •০• ——

# সংস্কৃত শাস্ত্রে বাঙ্গালী।

## মহারাজ লক্ষ্মণসেনের পঞ্চ রত্ন।

জয়দেব, গোবর্দ্ধনাচার্য্য শরণ, উমাপতি ধর, ধোয়ী।
মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের তোরণ দ্বারে লিখিত ছিল—
"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয় দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্যাব।"

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' প্রণেতা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বচন। গোবর্দ্ধনা-চার্য্য, শরণ, জয়দেব, উমাপতিধর এবং কবিরাজ (ধোয়ী) ইঁহারা পাঁচ জন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভায় পঞ্চরত্ন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের "নবরত্নের" অনুকরণেই মহারাজ লক্ষ্মণ সেন এই "পঞ্চরত্নের" স্থাপন করিয়া থাকিবেন। বাঙ্গালী জাতীর পক্ষে বাস্তবিকই এই পঞ্চরত্নের সভ্যগণ অমূল্য রত্ন।

মহারাজ বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি। খৃঃ একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ বল্লাল সেন প্রাদুর্ভূত হন এবং খৃঃ ১২০৩ অব্দে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের তিরোভাব হয়। ইহাদের উভয়ের রাজত্ব কাল খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দী। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাত্র তিন বর্ষ রাজত্ব করেন। এই উভয় রাজার রাজত্ব সময়েই আমরা পূর্ব্ব কথিত পাঁচ ব্যক্তিকে দেখিতে পাই। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভায় এই পাঁচ মহাত্মা রাজ সভায় ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আবার—

"বহুরূপ স্থচো নাম্না অরবিন্দো হলায়ুধরঃ
বাঙ্গালাশ্চ সমাখ্যাতা পঞ্চৈতে চট্টবংশজা।
পূতিগোবর্দ্ধনা চার্য্যঃ শিরো ঘোষাল সম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীচ শিশুনামা কুন্দো রোষাকরা স্তথা।
জাহ্নুনাখ্য স্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদায় ধীঃ
দেবলো বামন শ্চৈব ঈশান মকরন্দকঃ
উৎসাহ গরুড় খ্যাতৌ মুখবংশ প্রতিষ্ঠিতো

কানু কুতুহলা বেতৌ কাঞ্জিকুতুল সমুদ্ভবৌ
উনবিংশতি সংখ্যাতাঃ সমতা লোক সম্মতাঃ
এতে সর্ব্বে মহাত্মানং সভায়াং বল্লালস্যচ
রাজ্ঞ প্রপূজিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখাঃ।”

রঘুনাথ বাচষ্পতি কৃত কুল রাম।

পাঠক মহাশয় দেখিতেছেন মহারাজ বল্লালসেনের নিকট রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলে চট্ট বংশের বহুরূপ, শুচ অরবিন্দ হলায়ুধ বাঙ্গাণ, পূতিতুণ্ড বংশীয়, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ঘোষাল বংশে শির ঘোষাল, গাঙ্গুলী বংশে শিশু কুন্দলাল, বংশে রোষাকর, বন্দ্য বংশে জাহ্নন, মহেশ্বর দেবল, বামন, ঈশান মকরন্দ, মুখুটী, বংশে উৎসাহ ও গরুড় কাঞ্জিলাল বংশে কানু ও কুতুহল এই উন বিংশতি ব্যক্তি প্রতিগ্রাহী নহেন বিধায় মহারাজ বল্লালসেনের সভায় কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ইহাদের মধ্যে পূতি তুণ্ড বংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে আমরা অগ্রণী দেখিতে পাইতেছি। আবার লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক যে রাঢ়ীর কুলীনবর্গের সমীকরণ হয় তন্মধ্যে প্রথম সমীকরণে

অহিত বহুরূপাখ্যঃ শিরো গোবর্দ্ধন সুধীঃ
সাং শিশু মকরন্দশ্চ জাহ্নসাখ্যঃ সখাইমে।

লক্ষ্মণ সেনের সভায় সেই গোবর্দ্ধনাচার্য্যকেই আবার দেখিতে পাই। এই পঞ্চ রত্নের মধ্যে গোবর্দ্ধনাচার্য্যই কুলীন। অন্য তিন জনই রাঢ়ী শ্রেণীর শ্রোত্রিয় সুতরাং কোলীন্য সভায় বা সমীকরণ স্থলে আমরা বোটী,—উমাপতি ধর, জয়দেব, ওশয়নের নাম দেখিনা। কিন্তু ইহারা সমুদয়েই সমসাময়িক ব্যক্তি সুতরাং ইঁহারা যে বল্লাল ও লক্ষ্মণ এই উভয় মহারাজের সমসাময়িক ও খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর ব্যক্তি তদ্বিষয়ে আর জল্পনা নাই।

“পদ্মাবতী হৃদীশ্বরো জয়দেব মহা কবিঃ
কাঙ্গী বংশাবতংসৈকঃ কেন্দুবিম্বে রসোদ্বহঃ
কৌলিন্য মলিনো ধোয়ী ক্ষাসতিঃ পায়াধি-র্বুধঃ
লক্ষণেন সমারাধ্য কবিভিশ্চ সুপূজিতঃ

রাঢ়ী প্রাণী ভরদ্বাজ উমাপতি ধর কবিঃ
শ্রোত্রিয়েষু জঘন্যত্বাৎ বিষ্ণুপাদং সমাশ্রিতঃ।
পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি ধৃতসারা বলী

অহিতস্য পরিবর্ত্তাঃ আর্ত্তা দেবলকে পুরী
চট্টেন বহুরূপেন মকরন্দে সমোচিতঃ
জাহ্নবেন সমানোসৌ পূতি গোবর্দ্ধনে নচ
উচিতেন আষ্টকেন দেবলোক সমোচিতঃ
মহিন্তা মাধবেঃ ক্ষেম্যো গুড়ি শয়নকস্তথা
উধক ললিকষ্টৈব পুত্রদ্বৌ খ্যাত পৌরুক্ষৌ
ধ্রুবানন্দ মিশ্র—

জয়দেব গ্রন্থশেষে অর্থাৎ তৎপ্রণীত সুপ্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ গ্রন্থের শেষ শ্লোকে "শ্রীভোজ দেব প্রভবস্য বামাদেবী সুত শ্রীজয় দেবকস্য" অর্থাৎ ভোজ দেব তাহার পিতা এবং বামাদেবী তাঁহার জননী বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন।

জয়দেব প্রণীত প্রধান কাব্য "গীত গোবিন্দ"। গীত গোবিন্দ গীতিকাব্য। রাধাকৃষ্ণ প্রেম, গীত গোবিন্দের বর্ণনীয় বিষয়, সংস্কৃতে প্রকৃত গীতি কাব্যের সংখ্যা বহু নহে। মহাকবি কালিদাস বিরচিত "মেঘদূত" অত্যুৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য। কবিত্বেও উচ্চ ভাবের সমাবেশে মেঘদূতের নিকট "গীত গোবিন্দ" তুল্যস্থান পাইবার যোগ্য না হইলেও গীতি কাব্যের ঐশ্বর্য্য-সম্ভারে জয়দেবের গীতগোবিন্দ প্রায় অতুলনীয়। গীতিকাব্য বলিতে কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতু-সংহার দূরে রাখিলে সংস্কৃত কোন গীতি কাব্যই গীত গোবিন্দের নিকট দণ্ডায়মান হইবার উপযুক্ত নহে, এই কথা বলিলে বোধ হয় বড় বেশী অত্যুক্তি হইবে না। শব্দ-সম্পদে গীত গোবিন্দ পরমাত্য। গীত গোবিন্দের ভাষা মন্দ মারুতান্দোলিতা ধীর মন্থরগামিনী স্রোতঃস্বতীর ন্যায় কল নাদিনী ও মধুময়ী। অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধাক্ষরিত হইতেছে। গীত গোবিন্দকে গীতি কাব্য বা গীতি নাট্য বলা যাইতে পারে। রাধাগোবিন্দ ও সখীগণ এই নাটকের পাত্র, পাত্রী। গীত গোবিন্দ তাল মান লয়ে গীত হয়। এই গ্রন্থে

বিবিধ রাগ রাগিণী পূর্ণ অনেকগুলি হৃদয় গ্রাহী সঙ্গীত আছে সংখ্যা ২৮৫ তন্মধ্যে ২৪টী গীত—

১ম—৪৯
২য়—২১
৩য়—১৬
৪র্থ—২৩
৫ম—২০
৬ষ্ঠ—১২
৭ম—৩২
৮ম—১১
৯ম—১১
১০ম—১৬
১১ম—৩৪
১২শ—৩০
—————
২৮৫

গীতিগোবিন্দ আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিবেচনায় অশ্লীল কবিতা পূর্ণ। কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায় জয়দেব কৃত গীত গোবিন্দ কাব্যখানিকে একখানা ধর্ম্ম গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। এমন কি স্নান না করিয়া অশুচি দেহে গীত গোবিন্দ স্পর্শ করা ও পাপ জনক মনে করেন। গীতগোবিন্দে ভাগবতের রাস লীলার ছায়া পতিত হইয়াছে। ভাবও ভাষার সাদৃশ্যে গীতগোবিন্দ পাঠ করিতে ২ বৈষ্ণব সাধুগণ রাস লীলা পাঠের সুখানুভব করেন। শারদীয়া পূর্ণিমা "শারদোৎ ফুল্লা মল্লিকা সুগন্ধে যমুনা সৈবত সুগন্ধ ময়। জলে কুমুদ কহ্লার, স্থল স্থলেপদ্ম প্রভৃতি প্রসূণালঙ্কার সুশোভিত এই সুখময়ী নিশাতে যুবক যুবতীর লতাকুঞ্জে মিলন অপূর্ব্ব পার্থিব সুখকর। এই কল্পনা, সে আনন্দ রাশি তুমি আনন্দ মনে পর্য্যন্ত কর এবং আত্মারাম রূপে আত্মাতে আত্মাতে রমণ কর, আত্মাময় হও সাধক তবে তুমি বুঝিবে কৃষ্ণলীলা, তবে বুঝিবে রাধাকৃষ্ণ লীলা। বুঝিবে জীব শিবের এবং শিব জীবের জন্য, পূর্ণাত্মা

জীবাত্মার জন্য জীবাত্মা, পূর্ণ আত্মার কারণ লালায়িত। জীব ও শিব কবে এক হইয়া যাইবে আনন্দময়ের বাঞ্ছা কল্পতরুর এই বাঞ্ছা। আনন্দময়, প্রেমময় প্রভু জীবকে তাঁহারদিকে টানিয়া নিতেছেন ; জীব আপনার বুদ্ধিদোষে নিজ বুদ্ধি ভ্রংসতায় কত মনে কত অভিমান করিতেছে কত লালসার বন্ধনে বদ্ধ হইতেছে এবং ভগবান পাশ ছেদন পূর্ব্বক আমাদিগকে মোহন বংশী বাজাইয়া তাহার দিকে টানিয়া নিতেছেন এবং বাসনা ক্ষয়ে জীব, সমুদয় বস্তুতে শিব স্বত্বায় অনুভব করিতেছে, শিব স্বত্বায় লীন হইতেছে এই গভীর সত্যই জয়দেবের গীতগোবিন্দ ব্যাখ্যাত ও বর্ণিত হইয়াছে। কবি দুইটী সামান্য কথায় প্রেমের একটী যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন. ক্ষুদ্র কবি শত ছত্রেও তাহা প্রকাশ করিতে পারেন কি না সন্দেহ, কবি ষষ্ঠসর্গে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলিয়াছেন।

"মুহুরব লোকিত মণ্ডণ লীলা
মধুরিপুরহ মিতি ভাবন শীলা।"

রাধিকা বারংবার শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বেশবিন্যাশশীলা হইয়া নিজকে নিজে যেন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রকৃত প্রেমিক আপনার প্রিয় জনে যেন এক হইয়া. প্রণয়ীর সঙ্গে যেন একটা অদ্বৈত ভাবের উন্মেশ জনিত মহাপ্রাণতার ভাবে বিভোর হন। আবার ভগবানে প্রীতি জনিত ভাবনায় যখন সাধক বিভোর হন তখন সেবক ও সেব্য আর দ্বৈত ভাব থাকে না এই সত্যটী, এই মহত ভাবটী এই অদ্বৈত জ্ঞানটীর বিষয় দুইটী সরল কথায় কবিব্যক্ত করিয়াছেন।

নায়ক নায়িকার পরস্পরে আসঙ্গ লিপ্সা লালসা পার্থিব সমুদয় লালসার মধ্যে প্রধান। মানুষ ঐ ভোগ লালসার আশায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া যায় এবং ঐ সুখ উপভোগকে পরমানন্দময় মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সামান্য যুবক যুবতীর ঐ সুখ ভোগের পরিণাম বিষপ্রদ। এই আনন্দ ক্ষণ স্থায়ী। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ ভোগ লালসা ভগবানে পর্য্যাপ্ত করিতে উপদেশ দিয়াছেন। নেও প্রভু তোমার পুণ্য নেও তোমার পাপ! যাহারা পার্থিব সমুদয় সুখ-দুঃখ-লালসা, পিপাসা, ভগবৎ চরণে সমর্পণ করিতে পারেন তাঁহাদের কি আর লালসা থাকিতে পারে তাহাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন।

"আত্মঅঙ্গ প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম
কৃষ্ণ অঙ্গে প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥

জয়দেব ও স্বীয় কাব্যে ঐকথাটী সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি ইঙ্গিতে বলিয়াছেন।

"হরিচরণ-শরণ-জয়দেব কবিভারতী
বসতু হৃদি যুবতীরিব কোমল কলাবতী ॥ ৭।১০

কলাবতী কোমলাঙ্গী যুবতী যেমন যুবজনের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে হরিচরণ-শরণ জয়দেবের এই কবিতাবলী ও তদ্রূপ ভক্তদের হৃদয় অধিকার করুক। জয়দেব আবার বলিতেছেন।

"সজল জলদ সমুদয় রুচিরেণ।
দহ-তিণসা হৃদি বিরহ ভরেণ।
কনক নিকষ রুচি শুচি বসনে ন
শ্বাসিতিনসা পরিজন হসনেন
সকল ভুন জন বর তরু ণেন
বহতিন সা রুজ মতি করুণেন ॥
গীত গোবিন্দ সপ্তম সর্গ। ৩৫।৩৬।৩৭ ॥

জয়দেব "গীত গোবিন্দ" কাব্যে ভগবল্লীলা প্রকাশ করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন। তাঁহার নিজের কার্য্যের প্রশংসা অহঙ্কার জন্য নহে, ঐরূপ সন্ন্যাসীর ওরূপ ধর্ম্মোন্মাদের অহঙ্কার থাকিতে পারে না তিনি নিজ কাব্যে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে পারিয়াছেন নিজ ইষ্ট রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াছেন :—

"যদি হরি স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস কাল সুকুতুহলং।
মধুর কোমল কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং।

আবার গীতগোবিন্দের কবিত্ব ও গীত গোবিন্দ পাঠের ফল বলিতেছেন

সাধ্বী মাধ্বীক চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ শর্করে কর্করাসি।
দ্রাক্ষে দ্রক্ষন্তি কেত্বা সমৃত মৃত মসি ক্ষীরনীরং রসস্তে।

মাকন্দ ক্রন্দ কান্তাধর ধরণীতলং গচ্ছ যচ্ছান্তি যাব
ত্তাবং শৃঙ্গার সারস্বত মিহ জয় দেবস্য বিষ্ঠ গ্বচাংসি। ১২।১৯*॥

জয়দেব রচিত এই গীতিকাব্য যে আদিরসাত্মক, মধুর রস জগতে প্রদান করিতেছে তাহার পর হে মধু! তোমার মধুরতা আর কে অনুভব করিবে। হে সর্করে অতঃপর তোমার মধুরতা আর অনুভবনীয় হইবে না তুমি; কর্কশ বস্তু মধ্যেই পরিগণিত হইবে। হে দ্রাক্ষে তোমাকে আর কে অবলোকন করিবে? হে অমৃত তুমি এখন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে। হে ক্ষীর তোমার রস এখন নীরবৎ হইল। হে আম্রফল তুমি ক্রন্দন করিতে থাক; হে কান্তাধর তোমার এইক্ষণ পাতালে গমন করাই শ্রেয়।

জয়দেব যে গীত গোবিন্দ লিখিয়া স্বয়ং ভগবৎ প্রেমে বিহ্বল হইয়াছেন এবং স্বয়ং সালোক্য মুক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন মাত্র তাহাই নহে। গীতগোবিন্দ লিখিয়া তিনি দেশে বিদেশে বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ১৪১৯ হইতে ১৪৬৯ খৃঃ অব্দ রাণা কুম্ভের রাজত্ব সময়। রাজস্থানে রাণা কুম্ভের কি স্থান তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠক সুন্দররূপে অবগত আছেন। জয়দেবের গীত গোবিন্দ রচিত হওয়ার ২৫০ বৎসর পরে সুদুর রাজস্থানের একজন রাজচক্রবর্ত্তী স্বয়ং গীতগোবিন্দের এক বিশদ টীকা লিখিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করেন এবং রাণাকুম্ভের পত্নীও জয়দেবের গীত-গোবিন্দের জন্য টীকা লিখিয়া ছিলেন আবার বিদেশী ঐতিহাসিক পণ্ডিত হাণ্টার মহোদয় হিন্দু-গীতি কাব্যের সমালোচনায় বলেন:—"One of the most beautiful is Git Goabinda or song of the devine Herdman, written by Joydeba about 1200 A. D.

জয় দেবের গীত গোবিন্দ বৈষ্ণব জগতে এক নব্য ভাবের ও নব্য চিন্তার স্রোত সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। জয়দেবের পরবর্ত্তী বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ কোথাও জয়দেবের ভাব নিয়া কোথাও বা অনুকরণে কোথা বা অনুবাদ ক্রমে ঐ জয় দেবের নব্য ভাবের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। জয়দেবের

---

* See Tods Rajsthan

† Hunter's A brief history of the Indian People.

"মুখর মধীরং, অঙ্গমঞ্জীরং রিপুমিব কেলিধু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমির পুঞ্জং, শীলয় নীল নীচোলং।"
"মুহুরব লোকিত মণ্ডন লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবন শীলা॥
যগ্দান্ধর্ব্বফলাসু কৌশল মণুধ্যান দ্বেত যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃদিয়ে বিবেকতত্ত্বমপি যৎকাব্যেষু লীলায়িতং
তৎসর্ব্বং জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ।
ত সানিন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রী গীতগোবিন্দতর"

"হে সুধীবর্গ যদি আপনারা সঙ্গীত-কলা-বিদ্যা-নৈপুণ্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন যদি পরমাত্মা বিষ্ণু ভজনে এবং কাব্য রসের মধ্য দিয়া মহা প্রেমানুধ্যান ক্রমে ভগবল্লীলা অনুধ্যান ইচ্ছা করেন তবে কেবল কৃষ্ণগত প্রাণ জয়দেব কবির গীতগোবিন্দ পাঠ করুন"।

এইক্ষণ পাঠক দেখিতেছেন কি উদ্দেশ্য নিয়া এবং কি ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সাধারণ নায়ক নায়িকার প্রেমকে কি উচ্চ আদর্শে পৌছাইবার জন্য মধুর ভাবে ব্রজাঙ্গনার ভাবে কিরূপে ভগবদুপাসনা উচ্চস্তরে উত্থিত হওয়ায় গীত গোবিন্দ তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছে।

জানকী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবিধ মণি-মাণিক্য সংযোজিত রত্নহার হনুমান প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন 'মা, এ হারে আমার ইষ্টদেব রামচন্দ্রের নাম নাই। ভগবান্নাম বিরহিত হার ভগদ্‌ভক্তের নিকট ভস্ম পাশা হইতে অকিঞ্চিৎকর। জয়দেব ও সেইরূপ লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ অন্য চারিরত্নের ও নিজের কার্য্য সমালোচনা না করিয়া বলিয়াছেন "উমাপতি ধর কেবল বাক্য বিস্তারেই নিপুণ; শরণ কবি দ্রুত কঠিন কবিতা লিখিতে সমর্থ। সামান্য নায়ক নায়িকার প্রেম বর্ণনাযুক্ত আদিরস বাহুল্য কবিতা লিখিতে গোবর্দ্ধনাচার্য্যের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে কে সমর্থ?, ধোয়ী কবি শ্রুতি ধর বলিয়া বিখ্যাত। ভগবল্লীলা যুক্ত বিশুদ্ধ কবিতা লিখিতে মাত্র জয়দেবই জানেন। অর্থাৎ যে কবিতাতে ভগবানের গুণানুবাদ নাই, যে কাব্যে ঈশ্বরানুরক্তি প্রকাশ নাই সেরূপ কবিতা জয়দেবের মতে কবিতাই নহে।

যে সারস্বত কুঞ্জে শ্রীহরির পদধূলি নাই, যে গীতে গোবিন্দ নাম নাই যে প্রেমে ভগবানানুরক্তি নাই যে ভাবে ঈশ্বরাবেশ নাই, যে পতি পত্নিতে রাধা কৃষ্ণের মিলন নাই তাহা ব্যর্থ। যুবতীর মুখ পদ্মে সেই রূপসাগরের রূপ, কুসুমে ভগবানের গাত্র গন্ধ, মলয়ানীলে তাঁহার নিশ্বাস, সূর্য্যরশ্মিতে তাঁহার তেজ গভীর অম্বুধি সলিলে ভগবৎ চরণ বিধৌত চরণামৃত যে অনুভব করিতে পারে না তাহার মনুষ্য জন্ম বিড়ম্বনা মাত্র। এইভাবে অণুপ্রাণিত হইয়া জয়দেব তাঁহার গীত গোবিন্দ কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীকামিনীকুমার ঘটক।

—•○•—

## প্রকাশ ও গোপন।

প্রকাশ কহিল ডাকি গোপন চেষ্টারে,
অয়ি মূঢ়ে আজ তুমি এস এক ধারে!
মিলিয়াছে বধূ বর বাসর শয়নে,
দীপেরে কোরো না ছায়া, নয়নে নয়নে
উভয়ের হৃদি দোঁহে করিবেক পাঠ,
আজ রেখে দাও তব পুরাতন ঠাট!
কহিল গোপন চেষ্টা আলোকে বাহিরে,
ভাবেরে পাবে না খুঁজি, আঁধার কন্দরে,
অতলেতে নীড় তার; আমি দ্বারী তার,
তুমি যেথা ব্যর্থ সেথা সাফল্য আমার!

শ্রীআমোদিনী ঘোষ

# প্রসঙ্গ-কথা।

সম্প্রতি ঢাকাতে "বিক্রমপুর সম্মিলনীর" একটী শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের উন্নতি কল্পে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের এরূপ মনোযোগ ও আগ্রহ বিশেষ আশাপ্রদ। ঢাকার শাখার দ্বারা মুন্সীগঞ্জের সভার সাহায্য হইবে বলিয়া মনে করি। ঢাকা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড বিক্রমপুরের পথ ঘাট সংস্কার ও খালগুলির মুখ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করিতে যাহাতে মনোযোগী হন, সেজন্য আমরা ঢাকা সভার নেতৃগণকে অনুরোধ করিতেছি।

"বিক্রমপুর সম্মিলনীর" কার্য্যকারিতার দিকে এখন নানা স্থানের শিক্ষিতজনগণেরই দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ সময়ে ঢাকা ও মুন্সীগঞ্জের নেতাগণের উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। বিক্রমপুরের জলাভাব সমুদয় রোগের মূল। জলাভাব দূর করিবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

বিগত সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, মহাশয় একটী অতি সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছিলেন. প্রস্তাবটি এই যে বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামের প্রতি সক্ষম গৃহস্থের নিবাস হইতে প্রতি বৎসর একটি করিয়া পয়সা সম্মিলনীর জন্য সাহায্য গ্রহণ করা, এইরূপ দান গৃহীত হইলে প্রতি বৎসর ন্যূন কল্পে কয়েক সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ সংগ্রহ ব্যা পারে সম্মিলনীর একজন নিযুক্ত কর্ম্মচারীর গ্রামে গ্রামে যাইয়া উদ্দেশ্য বুঝাইয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা উচিত। আমাদের বিশ্বাস এই প্রস্তাবানুযায়ী অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে অতি সহজেই প্রচুর অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে। নলিনী বাবুর প্রস্তাবটী আমরা বিস্তারিত ভাবে "বিক্রমপুরে" মুদ্রিত করিব।

এবার "বিক্রমপুর সম্মিলনীর" পক্ষ হইতে দুই একটী পুষ্করিণী খনিত না হইলে, বড়ই দুর্নামের কারণ হইবে। অর্থের অভাব একথা এবার প্রযুজ্য নহে। অর্থ থাকিতে যদি অর্থের সদ্ব্যবহার না হয় তাহা হইলে বড়ই লজ্জার কথা। এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলেন। প্রথম কথা আমাদের দেশের লোকেরা অধিকাংশ স্থলেই "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যাগ্র মেদিনী" এ নীতির

অনুসরণকারী, এই নীতির ফলে অতি ক্ষুদ্র কার্য্যেও মোকদ্দমা অনিবার্য্য হইয়া উঠে, এরূপ অবস্থায় সম্মিলনীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ যে সকল গ্রামে জল কষ্ট সে সকল গ্রামের লোকদের সম্মতি লইয়া বিনা বিবাদে পুষ্করিণী খনন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন কি? যদি না পারেন তাহা হইলে আমাদের অকর্ম্মণ্যতা প্রকাশ পাইবে। অথচ পুষ্করিণী সংস্কারের সময় বহিয়া যাইতেছে, এ সময়ে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে সময় বহিয়া গেলে কার্য্য না হওয়ায় দরুণ দশজনের হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। অপর পক্ষে যদি এইরূপ হয় যে সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের সংকল্পানুযারী জলাভাব দূরীকরণের ব্যবস্থার জন্য পুষ্করিণীর সংস্কারে সফলকাম হইতেছেন না, তাহা হইলে গভর্মেণ্টের সহযোগীতায় কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে নির্ব্বিবাদে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। মোটের উপর করিব বলিয়া বসিয়া থাকিলে করা হইবে না, করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এখন সম্মিলনীর অগ্নি-পরীক্ষা, কার্য্যের সময় উপস্থিত। "হয় জয় কিংবা পরাজয়।"

* * * *

জাপানে কলেজ ও স্কুল ছুটি হইলে অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ গ্রামে যাইয়া বিদ্যালয় খুলিয়া কৃষকও সাধারণ জনগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এইরূপ ভাবে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুব্যবস্থা হয়। আমাদের দেশে এই রীতিটি অতি সহজেই অনুসৃত হইতে পারে। মানুষের কাজ করিবার ক্ষেত্র অপ্রশস্ত নহে, তবে আমাদের তেমন প্রাণ কই? দেশের সর্ব্বত্র সভা সমিতির অধিবেশন হয়, বক্তৃতা ও বিবিধ মন্তব্য ও প্রচারিত হয় কিন্তু কাজের সময় আমরা পশ্চাতে পড়িয়া থাকি। আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস না জন্মিলে কোন কার্য্যই হয় না।

আমাদের দেশের লোকেরা ছুটি বা অবসর সময়টাকে নিদ্রার নিরবচ্ছিন্ন আরামে কাটাইয়া দিতে পারিলেই সার্থক জ্ঞান করেন। এইরূপ সার্থকতা হীনতার পরিচায়ক। কলেজের ছেলেরা বা অধ্যাপকেরা দেশের প্রকৃত গৌরবের জিনিষ, তাঁহারা যদি অবসর সময়ে গ্রাম্য অশিক্ষিত জনগণশিক্ষার মধুর স্বাদ প্রদানের ব্যবস্থা করেন তবে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়।

আমোদের সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থাটি বড় সুন্দর। সরল ভাবে নির্দ্দোষ

আমোদ দানের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্বাস্থ্যতত্ব, ও কৃষিকথা সম্বন্ধে গ্রামের ছোট, বড় সকলকে বুঝাইবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়।

ডাক্তার জগদীশচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে পর্য্যটনশীল মেলার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন—এব্যবস্থাটি বড় সুন্দর। আপাততঃ তাহা কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না। তেমন প্রাণের আকর্ষণ ও ত্যাগী ব্যক্তির সহায়তা ব্যতীত এ সকল কার্য্যে সাফল্য লাভ অসম্ভব।

আমাদের মনে হয় যে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে স্বাস্থ্য ও কৃষিতত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুগম উপায়। এই সকল কার্য্যে গভর্মেণ্টের সহযোগীতা প্রার্থনীয়। একটী ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন কলিকাতা হইতে সংগ্রহ করা খুব বেশী ব্যয় সাধ্য বলিয়া মনে করি না, তদুপযোগী চিত্র প্রস্তুত ও বেশী ব্যয় সাধ্য নহে। কলিকাতার মূল সভা হইতে এ সব ব্যবস্থা করা উচিত।

তারপর আরেকটি কথা প্রণিধান যোগ্য। সখের কার্য্য খুব স্থায়ী ফলপ্রসূ হয় না। কি ঢাকা, কি কলিকাতা, কি মুন্সীগঞ্জ এ তিনটি সভার পরিচালকগণ সকলেই অর্থ সংগ্রহের জন্য নানা বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিযুক্ত, তাঁহারা দেশের জন্য অবসর সময়টুকু ব্যতীত খুব বেশী সময় দিতে পারেন না। তাহার ফলে আশাপ্রদ ফল পাওয়া যাইবে না। দুই একবার সখে বিক্রমপুর বেড়াইয়া আসিয়া রিপোর্ট দেওয়া অপেক্ষা আপাততঃ যদি একজন উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য বৎসর এক হাজার টাকা ব্যয় করা যায় তাহা হইলে অনেক ফল পাওয়া যাইতে পারে। এই ব্যক্তির কার্য্যপ্রণালী নিম্নলিখিতরূপ হইবে।

১। ম্যাজিক ল্যাণ্ট্যার্ণ সাহায্যে রোগের বীজাণু, ক্রম বিকাশ ইত্যাদি প্রদর্শন ও দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক দৃশ্য ও কৃতী ব্যক্তিগণের জীবন কথা চিত্র সহযোগে বিবৃত করা।

২। প্রত্যেক উপার্জ্জন ক্ষম গৃহস্থের নিকট হইতে মাত্র একটী করিয়া পয়সা "সম্মিলনীর তহবিলের জন্য সাহায্য গ্রহণ ও সংগৃহীত অর্থ সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।

৩। প্রত্যেক গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট সম্মিলনীর সভাপতির নিকট প্রেরণ। গ্রামে গ্রামে শাখা সম্মিলনী প্রতিষ্ঠাও তাহার কার্য্য মধ্যে গণ্য হইবে।

৪। গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণের সহযোগীতায় এ কার্য্যে অগ্রসর হইলে অর্থ সংগ্রহের কিংবা অন্যান্য কোন কার্য্যেরই অভাব বা অভিযোগ উপস্থিত হইবে না। সম্মিলনীর সংগৃহীত অর্থ দ্বারা নানা গ্রামে অর্থের পরিমাণানুযায়ী পুষ্করিণী সংস্কার এবং দুঃস্থের সাহায্য ইত্যাদি করিলে দেশের প্রচুর কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের সহযোগীতা নানা কারণে প্রার্থনীয়। সে কথা কয়টীও এখানে বলিতেছি। (১) সাধারণের বিশ্বাস যে যাহারা কোন সাধারণের কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন তাহারা নিজেদের সুখ সুবিধাই বেশী পরিমাণ লক্ষ্য করেন। সংবাদ পত্রে প্রায়শঃই এরূপ অভিযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। (২) সাধারণের অর্থ হাতে পড়িলেও নানারূপে তাহার অযথা অপব্যবহার হয়। তাহার বহু প্রমাণ সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে বিদ্যমান। (৩) অভাব অভিযোগের নিরপেক্ষতা অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় না। তোলোমাথায়ই অধিকাংশ স্থলে তেল দানের ব্যবস্থা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সম্মিলনীর পক্ষে গভর্ণমেণ্টের সহযোগীতায় কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইলে খাল কাটাই বল, পুষ্করিণী সংস্কারই বল অর্থের ব্যবহারই বল কোন দিকেই লোকের অসন্তোষের কারণ হইবে না। আমরা যতই কেন নিজেদের সক্ষম ও পারগ বিবেচনা করি না কেন কার্য্য ক্ষেত্রে তাহা অধিকাংশ স্থলেই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। প্রমাণ আমাদের ফ্যাক্টরী, মিল, ধন ভাণ্ডার, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি বিবিধ অনুষ্ঠান।

আমরা যাহা উপলব্ধি করিতেছি তাহাই লিখিলাম। মোট কথা আমাদের তর্ক বিতর্কের সময় নাই, দেশ যে জলকষ্টে প্রপীড়িত, দুঃস্থ ব্যক্তির হাহাকারে প্রতিধ্বনিত ব্যধির নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত, ও পর্য্যুদস্ত। পল্লী গ্রামের অবস্থা দিন দিন শোচনীয়তর হইতেছে। এখন আমাদের কাজের সময় আসিয়াছে।

* * * *

গোখেলেরও পারঞ্জপের ন্যায় ত্যাগী মহাপুরুষের আদর্শে বিক্রমপুরের একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিকেও কি আমরা আমাদের প্রস্তাবিত সহস্র মুদ্রা বার্ষিক বেতনে কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেখিব না।

*　　　*　　　*　　　*

এবৎসর বহু প্রবাসী বিক্রমপুরের কৃতী সন্তান 'বিক্রমপুরের' গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের কার্য্য সম্পর্কে বিবিধ বিবরণ প্রদান করেন, তবে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমরা সম্প্রতি গভর্মেণ্টের প্রকাশিত "Annual Reports of the Expert officers of the department of Agriculture Bengal" নামক গ্রন্থখানা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই গ্রন্থখানা বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ, আমরা বারন্তরে বিশেষজ্ঞগণের কৃষি সম্পর্কিত কতকগুলি মন্তব্যের অনুবাদ প্রকাশ করিব।

*　　　*　　　*　　　*

বিক্রমপুরবাসী লেখক ও লেখিকাগণকে উৎসাহ প্রদানার্থ আমরা আগামী বৎসর হইতে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিব। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া প্রতিযোগিতা চলিবে। (১) ছোট গল্প (২) উপন্যাস (৩) উপকথা (৪) কবিতা (৫) প্রবাদ প্রসঙ্গ ও ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ।

আগামী সংখ্যার কাগজে পুরস্কারের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইবে।

*　　　*　　　*　　　*

ঢাকার "হেরল্ড" কয়েক দিন হইল রাজধানী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। আলোচনাটী অতি সময়োপযোগী ও সুন্দর হইতেছে। আজকাল চারিদিকে রাজধানী পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। জানিনা এই জনরবের মধ্যে কতটুকু সত্য নিহিত আছে। আমাদের বক্তব্য এই যে যদি রাজধানী সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা স্থির করেন তাহা হইলে ঢাকাতেই বাঙ্গালা দেশের রাজধানী হওয়া কর্ত্তব্য। সহযোগী হেরল্ডের এ মন্তব্য আমরা বিশেষরূপ সমর্থন করি।

*　　　*　　　*　　　*

বাঁকুড়া অঞ্চলে এবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। অন্নাভাবে শত শত লোক কাল-কবলে নিপতিত হইতেছে। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলার লোকের এই দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট নরনারীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া উচিত। যাহার যেমন শক্তি তাহার তেমনি সাহায্য করা কর্ত্তব্য। "প্রবাসী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামে কিংবা "রামকৃষ্ণ মিশনের" স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামে বেলুর মঠের ঠিকানায় পাঠাইলেই যথা স্থানে সাহায্য পঁহুছিবে।

---

# বিক্রমপুর

| তৃতীয় বর্ষ | ফাল্গুন, ১৩২২ | ১১শ সংখ্যা। |
|---|---|---|

## তন্ময়।

আমি যে হয়েছি সখা! তোমাতে তন্ময়,
আপনার বলে আর নাহিক আমার.
জীবন-যৌবন-ধন, অর্পি সমুদয়
ও চরণ-ছবি শুধু করিয়াছি সার।
রবি, শশী হাসে যবে হেরি আমি নাথ!
চেয়ে আছ আত্মহারা, তুমি মোর পানে,
মলয় বীজন সনে পাইযে সাক্ষাৎ
তব পূত স্নিগ্ধ সুধা অঙ্গ পরশনে।
ফুলের হাসির মাঝে বসন্ত-প্রদোষে
তোমার সে প্রীতি হাসি দেখে লাজে মরি,
সাগরের তরঙ্গিত উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে।
আপন অস্তিত্ব ক্ষুদ্র নেহারিয়ে ডরি।
তুমি মোরে ভালবাস সারা প্রাণ দিয়ে,
আমিত তন্ময় তাই তোমারে চাহিয়ে।

শ্রীযোগানন্দ গোস্বামী।

——•০•——

# ষড়যন্ত্র।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রামে জমিদার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ দক্ষিণ পাড়ার কুলীনের দল ব্যতীত গ্রামটিতে আর একটী শক্তি ছিল। সেটি মহিলা পার্লামেণ্ট। প্রতিদিন তৃতীয় প্রহরে বালবিধবা তারিণী ঠাকুরাণীর জনশূন্য বিশাল গৃহে এই মহাসভা বসিত। কেহ কেহ বলিত যে এই পার্লামেণ্টেই গ্রামের লোকের ভাগ্য পরীক্ষিত হইয়া থাকে। জমিদার সুরেশচন্দ্র, এবং দক্ষিণ পাড়ার কুলীন চূড়ামণিরা সময়ে সময়ে এই পার্লামেণ্টের হাতে নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন এবং মুখে যে যাহা বলুক মনে মনে সকলেই ইহাকে ভয় করিয়া চলিয়া থাকেন।

সুবোধ যেদিন নীলকুঠির ঝিলের ধারে চিত্ত হারাইয়া আসিয়াছিল, এবং সুরেশচন্দ্র যে দিন চরলক্ষ্মীপুরের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাহার পরদিন সরোজিনী আহারান্তে একটা বড় বই ও ডিবা হাতে করিয়া তারিণী পিসীর বাড়ীতে যাইতেছিলেন। তাহার সঙ্গে মেনকা পিশি আর নীরদা ঝি। তারিণী পিসীর বাড়ীর সীমায় পদার্পণ করিয়াই একটা কলরব শুনিতে পাওয়া গেল, সরোজিনী মেনকা পিসির মুখের দিকে চাহিলেন। পিসী তখন দন্ত হীন বদনে তামাক পোড়া দিতেছিলেন, এবং সেইজন্য তাহার মুখের কোণে কিঞ্চিৎ অসিতবরণী লালা দেখা যাইতেছিল।

পিসীমা মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, 'মুখে আগুন, আবার হয়ত দলাদলি। সরোজিনী বলিলেন, তাইত পিসী, ঠাকুরপোর বিয়ের সময় ? কি একটা বিভ্রাট বাধবে দেখছি ?' উভয়ে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে একই সময়ে দুইস্থানে ঘোরতর তর্ক হইতেছে ; হাতাহাতি হইবার উপক্রম। সরোজিনীকে দেখিয়া দশস্থানের বিশজন একসঙ্গে তাহাকে মধ্যস্থ মানিল। সকলেই বলিল 'মেজবৌ' ইহার মীমাংসা করুক।

তারিণী পিসী মামীর একখানা গামছা বাঁধিয়া একখানা নীল চশমা লাল সূতা দিয়া বাধিয়া তাহা নাকে লাগাইয়া ঘরের মাঝখানে বসিয়াছিলেন। সরোজিনী চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া অন্ধকারে দেখিতেছিলেন, তাহা

দেখিয়া তারিণী পিসী তাহাকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন, ওরে তোরা থাম্ একটু থাম! মেজ বৌকে সকল কথা শুনিতে দে। কোলাহল বন্ধ হইলে, পিসী বলিলেন "বৌমা বস।" সরোজিনী হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তখন পিসী বলিতে আরম্ভ করিলেন, দেখ বৌমা তুমি সুধীরের বৌ এখন মুখুজ্জে গুষ্ঠির মেজ গিন্নী।

তার উপর তুমি লেখা পড়া জান, কলিকাতার মেয়ে, তোমার স্বামী মস্ত বিদ্বান্ পাঁচটা পাশ। তুমি বাছা এই তর্কটার একটা মীমাংসা কর। এই ছুঁড়ী গুলির জ্বালায় আজ আর কাজের কথা কিছু হল না।'

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিলেন 'হাঁগা পিসীমা কথাটা কি ? পিসী কহিলেন 'বাছা আজ কদিন হল নীল কুঠিতে কারা এসেছে। তাদের নাকি একটী সোমত্ত মেয়ে আছে, সে নাকি একটী অপ্সরী' এমন রূপসী আর ভূ-ভারতে নাই। এই কথা।'

'পিসীমা আমিত তাকে দেখিনি কি করে বলবো বল'। সঙ্গে সঙ্গে দশ জন বলিয়া উঠিল, 'চল এখনি দেখাইয়া আনিব।'

সরোজিনী উঠিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন 'তোমরা তাকে দেখলে কোথায়' ?

দশ জনেই এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল' কেন ঝিলের আর পারে।

"বয়স কত" ? "ষোল সতের"। "উনিশ কুড়ি"। "তেইশ চব্বিশ "না—না চৌদ্দ পনের"।

সরোজিনী বলিলেন্ 'ঠিক কোন্‌টা।' আবার দশ যায়গায় তর্ক বাধিয়া গেল। "সরোজিনী তখন বলিলেন, 'ভাল তর্কে কাজ নাই, আমি কাল নিজের চোখে দেখে এসে বলে যাব"।

গোল থামিল, পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ বৌমা সুবোধের বিয়ে নাকি" ? সরোজিনী বলিলেন হাঁ সেই জন্যই আপনার কাছে এলুম"। পিসী প্রসন্ন বদনে একটু হাসিয়া বলিলেন কোন ভয়নেই মা। সুবোধের বিয়ে এতে আমি কোন গোলমাল হতে দিব না। সরোজিনী পিসীকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

সরোজিনী অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া শুনিলেন যে সুবোধ আজ দুই

তিনবার তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল। তিনি শয়ন কক্ষে নিয়া স্বামীকে পিসীর অভয় দানের কথা জানাইয়া সুবোধের সম্বন্ধে বলিলেন। পথেই সাক্ষাৎ মিলিল, সরোজিনী ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া সুবোধ অন্দরের উঠানে কামরাঙ্গা গাছের তলায় দাঁড়াইয়াছিল, সরোজিনী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ঠাকুর পো, খবর কি ? কি করতে হবে বল ? আর কি দেরী সইছেনা" ? সুবোধ উত্তর দিবার চেষ্টা করিলনা বলিল, "মেজ বৌদি আমার বড় দরকার আজ আপনি আমার সঙ্গে উপরের ঘরে চলুন"। সুবোধ বরাবর সরোজিনীকে তুমি তুমি বলিয়াই ডাকিত, আজি হঠাৎ আপনি বলায় সরোজিনীও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন. তিনি বলিলেন, 'কি ঠাকুর পো ? চল যাচ্ছি।"

দ্বিতলে একটী গৃহে সুবোধ শয়ন করিত, উভয়ে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। সুবোধ ঘরের দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া সরোজিনীর পায়ের তলায় লোটাইয়া পড়িল, তিনি অবাক হইয়া গেলেন। সুবোধ বলিল, মেজ বৌদি আমার মা নাই, আপনি আমার মায়ের মত। আমি দক্ষিণ পাড়ায় বিয়ে করতে পারিব না। সরোজিনী ব্যাস্ত হইয়া পা ছাড়াইয়া দূরে দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, ছি, ছি ঠাকুর পো কর কি ? বিয়ে করিবে না কেন ? হল কি ? "না মেজ বৌদি, চরলক্ষীপুর অধঃপাতে যাক, বিষয় যাক আমি চাকরি করিয়া সংসার চালাইব। আপনি মেজদাকে দিয়া বড় দাদাকে বলান"। "কেন হল কি ? নরেশ আসিয়া বলিল বৌ পছন্দ হল, বড় ঠাকুর সমাজ নিমন্ত্রণ করিতেছেন। এখন বিয়ে করিবে না কি ?"

'মেজ বৌদি আপনি যদি আমাকে না রাখেন. তাহা হইলে আমি দেশ ত্যাগী হইব। সুবোধকে বড়ই কাতর দেখিয়া সরোজিনী তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। যথা সময়ে সুধীরচন্দ্র আসিয়া সুরেশচন্দ্রকে বলিলেন যে সুবোধ বলিয়াছে দক্ষিণ পাড়ায় বিবাহ দিলে দেশত্যাগী হইবে।' সুরেশচন্দ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। নরেশকে ডাকা হইল, রামলাল ঘটক আসিল, তখন সুবোধকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা বেলায় সুরেশচন্দ্র মধ্যম ভ্রাতাকে জানাইলেন, যে তিনি শীঘ্রই কাশীবাস করিবেন এবং গরদের নূতন নামাবলী খানা গায়ে দিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী।

# বিক্রমপুরের বনফুল

আষাঢ়—

আষাঢ় মাস বিক্রমপুরের বৃষ্টি ও জলের সময়। স্বভাবতঃই স্থলে ফুল ফুটিবার মাস নহে। এই মাস হইতে বিক্রমপুর জলে প্লাবিত হয় এবং এইমাস হইতে বিক্রমপুরে জলের ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। সেগুলি ও এ প্রবন্ধ মধ্যেই উল্লেখযোগ্য। এইসব জলজফুল মধ্যে (১) সাপলা (কুমুদিনী)ই খুব বেশী দেখা যায়। সাপলা এখানে অনেক রকম জন্মে— সাধারণ সুন্দী ও রক্ত সাপলা। প্রথমোক্ত গুলি সর্ব্বত্র জন্মে ও প্রথমে আষাঢ় মাসে ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সাপলা ফুল দেখিতে খুব সুন্দর, গন্ধ অল্প রং সাদা। ইহার লম্বা বৃন্তটী তরকারীরূপে ব্যবহার হয়, ইহার ফল কে বিক্রমপুরে "ঢেপ" বলে এবং বীজ দিয়া "খই" ভাজা যায়। এবং বীজগুলি মাটীতে পড়িয়া গাছ হয় এবং ক্রমে বড় হইলে সেগুলিকে "সালু" বলে। তাহার মধ্যের পদার্থটী শ্বেত বর্ণ ও তাহা মূলভোজী জন্তুর খাদ্য ও মনুষ্যেও খাইতে পারে। এই সাপলা হইতে মনুষ্যের একটী খাদ্য বস্তু বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিলে হয়।

"সুন্দী" সাপলা কবিরাজগণ ঔষধে নীলোৎপল নামে ব্যবহার করেন। ফুলগুলি সাধারণ সাপলা হইতে ছোট। ফুল, পাতা ও বৃন্ত গুলিও দেখিতে অন্য প্রকার ও ছোট। বিশেষত্ব এই যে এইগুলি মাঠেই বেশী হয়।

রক্ত সাপলা পুকুরে ও দীঘীতে হয়। ফুল, পাতা ও বৃন্ত লাল বর্ণ, দেখিতে বেশ সুন্দর। ফুল ও তার বৃন্ত ঔষধে লাগে।

(২) "টগর পচুকা"—আষাঢ় মাস হইতে মাঠে জন্মে। অন্য সময় পুকুরে হয়। ফুলগুলি ক্ষুদ্র কিন্তু সুগন্ধ হয়; কেহ আদর করে না কিন্তু অনেকটী একত্র করিয়া নিকটে রাখিলে সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়। পাতাগুলি ঘা'র ঔষধ। ইহার নাম কোন স্থানে "পাতারি" কোন স্থানে "কচুরি" শুনিয়াছি। ফুলগুলি রোগ বিশেষের ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

ভাদ্র—

১। এই মাসে এক প্রকার নূতন জলের ফুল হয় তাহাকে সাধারণ কথায় "রামকলা" বলে। ফুলের নিম্নভাগে যে ফলটী থাকে তাহা একটী ছোট

কলার মতন বলিয়াই এই নাম হইয়াছে। ফুলগুলি ছোট ছোট সাদা রং এবং এক এক স্থানে বহুতর জন্মিয়া থাকে। ফুল, ফলের গঠনও আকৃতি সাপলার মতন নহে। ফুলের তিনটী ভিন্ন পাপড়ি,ফুলটী ফলের উপরে স্থিত। ফল দীর্ঘাকার সাপলার মত গোলাকার নয়। ভিতরে সাপলার মত পিচ্ছিল রসের মধ্যে অগণ্য বীজ সাধারণ লোকের ছেলে পিলেরা তাহা আমোদ করিয়া খায়। যে গাছড়াতে এই ফুলগুলি হয় তার পাতাগুলি লম্বা প্রায় জলের নীচেই থাকে। অন্যান্য জলজ ফুলের পাতার ন্যায় পাতা গোল নহে বা জলের উপর ভাসিয়া থাকে না।

২। স্থলের ফুলের মধ্যে শিরীশ বা কড়ুই ফুল। বিক্রমপুরে যে গাছকে আমরা কড়ুই বলি পশ্চিম বঙ্গে তাহাকে শিরীষ গাছ বলে, কিন্তু যখন ঢাকা কলেজে কুমারসম্ভবে "শিরীষ পুষ্পাধিক সুকুমার্য্যো' পড়িতাম তখন "শিরীষ" পুষ্পের পরিচয় সাবেক ঢাকা কলেজের পশ্চিম ধারে যে দুই প্রকাণ্ড পুরাতন বৃক্ষ ছিল তাহার ফুল দেখিয়াই আমাদের হইয়াছিল। সে বৃক্ষ কিন্তু আমাদের কড়ুই নহে যদি ও ফুল গুলি এক রকমই বটে এবং ঐ গাছও কড়ুই গাছ এক শ্রেণীরই বটে এবং আমি চট্টগ্রামে ঐ উভয় প্রকার গাছই দেখিয়াছি অতএব কেবল মাটীর গুণে গাছ দুই রকম হওয়ার কথা নয়। যাহা হউক যদি বিক্রমপুরের ঢাকা কলেজের তখনকার ছাত্রেরা নিজের বাড়ীর কড়ুই গাছে "শিরীষ' ফুল ফুটে বলিয়া জানিত তবে নিশ্চয়ই বাড়ীতে আসিয়া তাহারা ঐ কড়ুই গাছের ফুল সাদরে খুজিত। এই ফুল বৃহৎ Legume-nous জাতির অন্তর্গত; সাধারণতঃ ফুলের সুন্দর ভাগ তাহার পাপড়ি (petals) কিন্তু শিরীষ ফুলের যাহা দ্রষ্টব্য ও "সুকুমার" তাহা এই ফুলের পরাগ কেশর (stamen) গুলি বটে, সে গুলি খুব কোমল চুলের গুচ্ছের মতন। এক এক বৃন্তে অনেক গুলি ফুল একত্র থাকে।

আশ্বিনে—

আশ্বিন মাস দুর্গোৎসবের মাস। এই শরৎ কালে বাগানে নানা প্রকার ফুল প্রচুর পরিমাণে ফুটে ও লোকে সাজি ভরিয়া তাহা আনিয়া মণ্ডপে দেবীর পূজা করে। কিন্তু বাগানজাত ভিন্ন দুই রকম বনফুল দুর্গাপূজার খুব সাদরে ব্যবহার হয়। (১) জলপদ্ম (২) টুনি ফুল। জল পদ্মের পরিচয়

দেওয়া অনাবশ্যক তাহা চিরকালের দেশ প্রসিদ্ধ "পদ্ম"। এরূপ সুবৃহৎ, সুমহৎ ও সুন্দর ফুল এ দেশে আর নাই বলিলেই হয়। এই ফুলের আবার (sepal) পাঁচটী, পাপড়ী অসংখ্য ও মধ্যে গর্ভ কেশর একটী সুন্দর সংযুক্ত ফল, উপরে বিস্তৃত নিম্নে সরু। আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষে পদ্মের সঙ্গে কি কবি কি সাধারণ লোক চক্ষের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু পদ্ম ফুলের কোন অংশের সহিত চক্ষের তুলনা হয় তাহা পদ্ম ফুলের কোন অংশই এমন দেখিনা যাহা খুব সুন্দর বা বিস্তৃত নয়নের মত দেখায়। কিন্তু আমার বোধ হয় তুলনা পদ্মফুলের সঙ্গে নয় কিন্তু পদ্ম গাছের পাতায় নিম্নভাগে যে সুন্দর অঙ্কিত ও বিস্তারিত, সুদীর্ঘ একটী চক্ষুবৎ দাগ আছে তাহার সঙ্গে বটে। এবং অনেক স্থলেই পদ্ম "পত্র" সঙ্গে চক্ষের তুলনা লিখা থাকাতে এই কথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। পাঠক যদি পদ্মের একটী পাতা উল্টাইয়া দেখেন তবেই ঐ সুন্দর দাগটী দেখিতে পাইবেন। ঐ দাগটী কিরূপে ও কেন হয় তাহা পদ্ম পাতাটী প্রথম অবস্থায় জলের উপরে কি ভাবে উঠে ও থাকে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়।

"টুনীফুল" গুলি ছোট ছোট খুব সুগন্ধী জলের ধারে এক প্রকার সরু লতাতে হয়। ফুলগুলির গন্ধ ঝুমকা ফুলের ন্যায় মিষ্ট। ফুলটী ৫টী লাল রেখা চিত্রিত সংযুক্ত পাপড়ী। মধ্য ভাগে পরাগ কেশর ও গর্ভ কেশর জড়িত ভাবে অবস্থিত। টুনীফুল দুর্গাপূজায় বিশেষতঃ লক্ষ্মী পূজায় নিতান্ত চেষ্টা করিয়াও লোকে দিয়া থাকে।

কার্ত্তিক—

আশ্বিন মাস শেষ হইতে না হইতে এবং কার্ত্তিকের প্রথমে "ছাইতান" বা "ছাতিম" ( সপ্তপর্ণী ) ফুলের সুমিষ্ট কিন্তু তীব্র গন্ধে গ্রাম আমোদিত হয়। সন্ধ্যার প্রারম্ভে হইতে গন্ধ আরম্ভ হয় তাহা সমস্ত রাত্রি থাকে ও দিনের বেলায় ও কতক সময় গন্ধ পাওয়া যায়। নিকটে একটী ছাতিম গাছ থাকিলেই অনেক দুর পর্য্যন্ত তাহার ফুলের গন্ধ বিস্তৃত হয়। সাধারণ লোকে বলে এই গন্ধে মাথা ধরে। ফুলগুলি সাদা ছোট ছোট ঝাড়ের মত, থ্যেক অনেকগুলি একত্র ফুটে।

"ষড়ুরা" এই সময় যাহা ষড়ুরা নামক আগাছার ফুল ফুটীতে আরম্ভ হয়।

ফুলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাপী রঙ্গের তাহাতে বিস্তর মক্ষিকা গুণ্ গুণ্ করিয়া বিচরণ করে। গন্ধ বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু ফুলে অবশ্য মধু আছে তজ্জন্যই মক্ষিকা আসে। লম্বা এক একটী বৃন্তে অসংখ্য ফুল হয়। মড়ুয়া গাছ, ফুল বা ফল লোকের কোন ব্যবহারে আসে না। কোন কোন গরুতে খায়। এগুলি ক্ষেত্রের জঙ্গল কৃষকের কষ্ট দায়ক।

অগ্রহায়ণ—

উপরের লিখিত মড়ুয়া ফুল মাঠে বিস্তর দেখা যায়। তদ্ভিন্ন আর কলম্বী ফুল ফুটে। শীতের সময়ে ফুলের প্রাচুর্য্য থাকে না। কলম্বীয় ফুল দেখিতে সুন্দর, ধুতুরা ফুলের ন্যায় ৫টী পাপড়ী যুক্ত কিন্তু তাহা হইতে ছোট।

পৌষ—

(১) মাঠে "বাষালতার" ফুল ফুটিতেছে। এই লতা গাছড়াগুলি ক্ষেতের এক অনিষ্টকারী জঙ্গল বলিয়াই গণ্য। তাহাদ্বারা মনুষ্যের কোন কাজ হয় কিনা জানা নাই। এগুলি গরুতেও বিশেষ খায় না। ফুলগুলি সুন্দর গন্ধ বেশী নাই। পাপড়ীগুলির নিম্নভাগ সংযুক্ত উপরি ভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। নিম্নের ভাগ চিত্রিত জিহ্বার ন্যায় ব্যাদিত। উপরের ভাগ টাবর ন্যায়।

(২) এক প্রকার দুর্গন্ধ বিশিষ্ট গাছড়া কেহ বলে "শিয়াল মুত্রা" কেহ বলে "ভূত নাগিনী" গড়ের ও পুকুরের পাড়ে জন্মে। এই সময় তার ফুল হয়। এক একটী ফুল অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের সমষ্টি তাহা বৃত্তাকার এখন উপরের দিকে ফুটীতে থাকে এবং ক্রমে মজিয়া গিয়া সিন্দুরের ন্যায় একটী ফল-সমষ্টির দণ্ড হয়। ফুলের গন্ধ ও গাছের গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ কিন্তু ফুল দেখিতে খুব সুন্দর। গাছগুলি গরুতে খুব খায়।

শ্রীজগন্মোহন সরকার।

# নয়নের জল।

'Let not the fierce sun dry one
tear of pain before thyself has
Wiped it from the sufferers eye'.
—— Voice of silence.

——•০•——

দুঃখীর বেদনা দেখি নয়ন বাহিয়া
ঝরিতেছে অশ্রুরাশি ? ফেলনা মুছিয়া
প্লাবি তব গণ্ড বক্ষঃ পড়ুক ধরায়,
দেখুক নিখিল বিশ্ব, নাহি লাজ তায়।
যতদিন দুঃখ তার করনি মোচন
শুষ্ক যেন নাহি হয় তোমার নয়ন।
দিবানিশি ব্যথিতের সে চিত্র উজ্জ্বল
করুক হৃদয় তব সরস কোমল।
পূত অশ্রুধারা সিক্ত শরীর তোমার
বহু যত্নে প্রস্ফুট হক শক্তির আধার।
তুমি আর ব্যথিত সে যাঁহার সন্তান
আশীর্ব্বাদ লভি তাঁর হও শক্তিমান।
নাশিতে দুঃখীর দুঃখ হও অগ্রসর
ধন্য কর আপনার জীবন নশ্বর।
নিরর্থক সৃষ্টি কিছু নাহি এ ধরায়,
এ জগতে যত্ন কভু বৃথা নাহি যায়।
অতএব দুঃখ তার করিতে মোচন—
কিংবা আপনার তুমি কর দৃঢ় পণ।
যতদিন বেদনার হবে না বিরাম
ততদিন তব তরে নাহিক বিশ্রাম।

পরের জীবন তরে জীবন আপন
উৎসর্গ করিতে আত্মা চাহিবে যখন
তখনি মানব তুমি লভিবে নির্ব্বাণ,
যে ব্যথা সহিছ তার হবে অবসান।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত।

—•০•—

# বিক্রমপুরের গ্রাম্য বিবরণ।

## ষোলঘর—(২)

গ্রামের সাধারণ স্বাস্থ্যমন্দ নহে। প্রতি বৎসর বর্ষায় জলপ্লাবন জন্য বিক্রমপুর ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ষোলঘরেও ম্যালেরিয়া নাই। তবে প্রতিবৎসরই কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘ মাস পর্য্যন্ত ছু'চারিটা কলেরার আক্রমণের কথা শুনা যায়। যে বৎসর বর্ষায় জল খুব বেশী হয় এবং জল নামিয়া যাইতে বিলম্ব হয় সেবারই কলেরার প্রকোপ বেশী হয়। কোন কোন বৎসর কলেরা একেবারে সংক্রামক হইয়া উঠে এবং মৃত্যুসংখ্যা অত্যন্ত বেশী হয়। ইহার কারণ এই যে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ষোলঘর ও সন্নিকটস্থ গ্রাম সমূহে খাল ও পুষ্করিণীর জল পচিয়া যায় এবং দূষিত পানীয় পান করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকে কলেরায় আক্রান্ত হয়। গ্রামের ভদ্রপল্লী ছাড়া অন্যত্র পরিস্কার জলাশয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সার চন্দ্রমাধব ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু চৌধুরী মহাশয় কয়েকটি দীঘী খনন করিয়া দিয়াছেন।

কলেরা ব্যতীত জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি সাধারণ রোগের প্রকোপও আছে। গ্রামে একটি দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সার চন্দ্রমাধব ঘোষ বাহাদুর গ্রামের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। এজন্য ষোলঘর ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের জন-সাধারণ তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বঙ্গেশ্বর

লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর সেদিন হাসাড়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ে পদার্পন কালে সাঁর চন্দ্রমাধবের এই স্মরণীয় কীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ষোলঘরে দীঘী পুষ্করিণীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। তাহার কারণ এই যে গ্রামটি 'আড়িয়ল বিলের' একাংশে স্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং ভূমির উচ্চতা সাধন নিমিত্ত অনেক মৃত্তিকা উত্তোলন করা দরকার হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ পুষ্করিণীই শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদে পরিপূর্ণ এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল তাহাদের পঙ্কোদ্ধার করা হয় নাই। অনেক পুষ্করিণীর তীরদেশে পায়খানা নির্ম্মিত হওয়ায় জল অত্যন্ত দুষিত ও অব্যবহার্য্য হইয়াছে।

বাণিজ্যে ষোলঘর তেমন উন্নত নয়। অধিবাসিগণ অধিকাংশই গরীব এবং চাষবাস ও দৈনিক মজুরীর উপরই জীবিকার জন্য নির্ভর করে। গ্রামের প্রধান বাণিজ্য বাসন পত্র আমদানী ও রপ্তানী এবং ধান চাউলের ব্যবসায়। প্রথমটি সম্পূর্ণরূপে সাহা বণিক্য ও কতক কতক নমঃশূদ্রদের হস্তে। সাহাগণই এ গ্রামে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী এবং বাসন পত্রের বাণিজ্যই তাহাদের প্রধান ব্যবসা। বণিকগণের অবস্থাও খুব ভাল, তাহাদের মধ্যে অনেক ভাল ভাল স্বর্ণকারও আছে। ধান চাউলের ব্যবসায় প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণের এক চেটিয়া। ষোলঘরে সদ্গোপদের অবস্থাও বেশ ভাল। এখানকার ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি ও কৈ মৎস্য খুব প্রসিদ্ধ। ষোলঘর পূর্ব্বে অলঙ্কারের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্যের সূক্ষ্ম শিল্পী এখানে আছে।

(মুসলমান সম্প্রদায়)

ষোলঘরের মুসলমানসম্প্রদায়ের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। মুসলমানগণ অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র ও নিরক্ষর। কেবল মাত্র 'কাজী' গণই উচ্চশ্রেণীর ও অনেকাংশে শিক্ষিত। তাঁহাদের বেশ একটি অতীত ইতিহাস আছে এবং বংশটিও বহু পুরাতন। এই কাজী বংশের দুইজন দারোগা হইয়াছেন এবং একটি ছেলে ঢাকা কলেজে দর্শন-শাস্ত্রে 'অনার' সহ বি-এ পড়িতেছে। ষোলঘর কাজী পাড়ার আম্র দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত 'গিলা' আম্র অনেকের মতে 'ল্যাংড়া' হইতেও উৎকৃষ্টতর।

ঘোলঘরের সাহিত্যসেবীদের সম্বন্ধেও কিছু বলিবার আছে। নিম্নে কয়েকজনের কথা উল্লেখ করা হইল :—

১। ৺কৃষ্ণচন্দ্র সিংহরায়। ইনি প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঁহার একটি 'কবির দল' ছিল, ইনি সেজন্য বহু সঙ্গীত ও গীতাভিনয় রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কিছু কিছু লেখা এখনও আছে, তাহা প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। কবিত্ব মাধুর্য্যে, ছন্দঝঙ্কারে, ভাবলালিত্যে তাহা এতই প্রাণস্পর্শী যে এই অখ্যাতনামা কবিকে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসের একটি উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে। আমি বারান্তরে ইঁহার জীবনী ও কাব্য সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

( সাহিত্যসেবী )

২। ৺মোক্ষদাকুমার বসু। ইনি আগড়তলার বর্ত্তমান মহারাজের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। 'ভারতী', 'বঙ্গভাষা' প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার দিনলিপিগুলি অপরূপ কাব্যমাধুর্য্যে পরম রমণীয়। তাঁহার জীবনেও যথেষ্ট কাব্যের উপাদান সঞ্চিত ছিল। দিনলিপিগুলি শীঘ্রই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবে।

৩। শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ। মাসিক সাহিত্যের পাঠকবর্গের নিকট এই অতুল শক্তিমতী লেখিকার নাম সুপরিচিত। ইনি আমাদের গ্রামের গৌরব, বিক্রমপুরের গৌরব, বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব। ইনি যে পূর্ব্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ লেখিকা তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইঁহার গদ্য প্রবন্ধগুলি ভাষালালিত্যে ভাবে এবং চিন্তাশীলতায় বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী সম্পদরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। 'যুথিকা' নামে ইঁহার একখানি গল্পপুস্তক আছে। গল্পরচনায় এই লেখিকা যে কিরূপে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন এই সুন্দর গল্পগুচ্ছই তাহার পরিচায়ক। ইঁহার অনেক কবিতাও নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে, সেগুলি লেখিকার প্রচুর কবিত্ব সম্পদের পরিচয় প্রদান করে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান মহিলা সাহিত্যে যে শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ জায়ার আসন প্রায় সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত এবিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। আমাদের আশা এই যে তিনি দীর্ঘজীবন

লাভ করিয়া সাহিত্য সাধনায় উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া স্বগ্রামও স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করুন।

৪। 'শান্তি' ও 'নির্ব্বাণ' রচয়িত্রী। এই লেখিকার কাব্য দুখানি অনাড়ম্বর সরলতার জন্য যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে। কবিতাগুলি যেন স্বচ্ছ নির্ঝরজলের মত স্বতঃ উৎসারিত ও অনাহত কলগতিতে প্রবহমান। ইনি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের পুত্র বধূ।

এতদ্ব্যতীত আগড়তলা প্রবাসী ৺কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের নাম 'চক্র দত্তের' অনুবাদক ৺প্যারীমোহন সেন মহাশয়ের নাম এবং দু' এক জন নবীন সাহিত্যিকের নামও উল্লেখযোগ্য। ৺কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় এক-খানা ইতিহাস প্রণয়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ষোলঘর গ্রামের আভ্যন্তরীন অবস্থা অতি শোচনীয়। উপযুক্ত পথ ও সেতুর অভাবে গমনাগমন বড়ই অসুবিধাজনক। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসু চৌধুরী মহাশয়ের উৎসাহে কয়েকটি কাষ্ঠসেতু নির্ম্মিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতেও অসুবিধা দূর হয় নাই। আরও অন্ততঃ দশ বারটি সেতুর দরকার। রাস্তাঘাট এত অপরিসর ও অসুবিধাজনক যে সামান্য বৃষ্টি হইলেই চলাচল একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়ে। গ্রামের শিক্ষিত জনমণ্ডলী প্রায়ই বিদেশে থাকেন, কাজেই দেশের সুবিধা অসুবিধার দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে।

পথ ঘাট।

এই গ্রামের স্থাপিত বিগ্রহ ও পূজাস্থানের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্থাপিত বিগ্রহ ও পূজাস্থান।

১। কাত্যায়নী। ৺তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। পিত্তলের দশভূজা মূর্ত্তি, বহু পুরাতন।

২। কৃষ্ণ, বলরাম ও গৌরাঙ্গ। শ্রীযুত রাধাচরণ আচার্য্যের বাড়ীতে স্থাপিত। নিম্বকাষ্ঠের সুন্দর মূর্ত্তিত্রয়।

৩। কালী। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহোদয়ের স্থাপিত। তাঁহার বাড়ীর উত্তর দিকে অবস্থিত।

৪। শালগ্রাম ও শ্রীধর বিগ্রহ। মুন্সীবাড়ী, উত্তর মুন্সীবাড়ী, ডাক্তার

বাড়ী, সেনবাড়ী, কর্ম্মকার বাড়ী, পুরোহিত বাড়ী, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বাড়ী, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী, চৌধুরী বাড়ী এবং আরও কয়েক বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত।

৫। ভৈরববাড়ী। বট ও অশ্বথ বৃক্ষ, উচ্চ ভূমিতে জন্মিয়াছে। প্রায়ই পূজা ও বলি হইয়া থাকে।

৬। 'বুড়া ঠাকুরাণীর তলা'। একটি প্রকাণ্ড হিজল গাছ, প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তির দিন বৃক্ষতলে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসিয়া থাকে। মেলাতে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকেরাই আসিয়া থাকে। বৃক্ষতলে কবুতর উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

ষোলঘর গ্রামে প্রায় সকলপ্রকার জাতিই বসবাস করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক্য, কর্ম্মকার, শূদ্র, সাহা, তন্তুবায়, ক্ষৌরকার, রজক, মালাকর, দৈবজ্ঞ, নমঃশূদ্র, ধীবর প্রভৃতি প্রায় সকলপ্রকার জাতিই আছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ভিন্ন আর সকল জাতিই প্রায় নিরক্ষর। নমঃশূদ্র, তন্তুবায় প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর অবস্থা খুব খারাপ। নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণও অতি দরিদ্র, প্রায় কাহারও (সাধারণ অবস্থা) দৈনিক সংস্থান নাই। কৃষাণ খাটিয়া, মজুরী করিয়া ইহারা দিনাতিপাত করে। বর্ষায় যেবার জল খুব বাড়িয়া উঠে সেবার দরিদ্রদের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকে না। কলেরার আক্রমণও নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বেশী হয়।

গ্রামে একটি সব্‌ পোষ্টাফিস্‌ আছে, কিন্তু টেলীগ্রাফ আফিস নাই। শ্রীনগর হইতে ষোলঘরে টেলীগ্রাফের তার আনা খুব ব্যয়সাধ্য বলিয়া মনে হয় না। একবার এবিষয়ে আন্দোলন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল।

গ্রামের একটি অশেষ কল্যাণকর বিষয় পশ্চিম ঘোষপাড়ার শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের একটি কীর্ত্তি। ইনি তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর স্মরণার্থ একটি পাকা শ্মশান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' উল্লিখিত হইয়াছে যে পাকা শ্মশান বিক্রমপুরে একমাত্র তেলির বাগে আছে। ইহা ভুল। ষোলঘরের পাকা শ্মশান খুব উচ্চভূমিতে নির্ম্মিত এবং সেখানে শববাত্রীদের আশ্রয়ের জন্য একটি টিনের ঘর ও কাষ্ঠাসন আছে।

উৎসাহী যুবকগণের চেষ্টায় গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার ও একটি ফুটবল্ ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। অর্থাভাবে সাধারণ পাঠাগারটি লুপ্তপ্রায়। উপযুক্ত মাঠের অভাবে ক্লাবটিও অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িয়াছে। গ্রামের কর্ম্মকারবাড়ী হইতে বিক্রমপুরের বিভিন্ন ক্লাবে খেলার জন্য একটি প্রকাণ্ড রূপার শিল্ড্ প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা যোলঘরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শেষ করিলাম। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের যুগে গ্রাম্যবিবরণী যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবেনা।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

---

# পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েলি সংস্কার।

২১৪। রাবণের চিতা আজ পর্য্যন্ত ও জ্বলে।

২১৫। দন্তকাষ্ঠ (খরকা) দ্বারা দাতখুঁচিয়া দুইভাগ করিয়া ফেলিতে হয়—উহাই রাবণের চিতার জ্বালানি কাষ্ঠ।

২১৬। ভাঙ্গা কাঁসার শব্দে লক্ষ্মী পালায়।

২১৭। ধলাদ্রব্য (দুধ) খাইয়া পয়সা না দিলে শ্বেতী হয়।

২১৮। বারুইর বোরোতে পাণ চুরি করিতে নাই—কুষ্ঠ হয়।

২১৯। ছয় চক্ষে ক্ষয়। (এজন্য তৃতীয়বারে বিবাহ কালে শুভদৃষ্টির সময় কবুতর বা কলাগাছ দৃষ্টিকরাইয়া পরে পাত্রীকে আনয়ন করা হয়)।

২২০। ভোজনের পূর্ব্বে রাত্রিকালে এক পুত্রের মাতা বাঁশের বাঁশীর শব্দ শুনিলে ভোজন করে না।

২২১। ননী বা মাখন জ্বাল দিবার কালে 'ঘি' বলিতে নাই—'ঘি' বেশী ওঠে না।

২২২। চাউল তেল প্রভৃতির অভাব হইলে গৃহস্থরমণী 'নাই' বলেনা—বলে, 'বাড়ন্ত বা অনেক হইয়াছে'।

২২৩। অরক্ষণীয়া অবিবাহিতা মেয়েকে গোপনে পদাঘাতে অপরের চুলা ভাঙ্গিতে দেখা যায়—ইহাতে সকালে বিবাহ হয়।

২২৪। সকলে গাছের কলম কাটে না—বলে, 'আস্ত চায়,।

২২৫। যাত্রাকালে হাঁচি পড়িলে বা কেহ পেছন হইতে ডাকিলে যাত্রা ভঙ্গ হয়। অন্যথা অকল্যাণ ঘটে।

২২৬। ছাতি ( ছাতা ) মাথায়দিয়া বৃষ্টির সময় ব্যতীত কাহারও উঠানের উপর দিয়া যাইতে দেয় না।

২২৭। গায়ে উকুন জন্মিলে অমঙ্গল ঘটে—পত্নীহানীরই বিশেষ সম্ভাবনা।

২২৮। গায়ে ( শরীরে ) উকুন জন্মিলে বলিতে নাই—বলিলেই সংখ্যায় বাড়ে।

২২৯। দুঃস্বপ্ন গাছের কাছে বলিলে দোষ সারে।

২৩০। যজ্ঞের কলা স্ত্রীলোকে খাইলে ছেলে হয়।

২৩১। যমজ কলা স্ত্রীলোকের খাইতে নাই—যমজ সন্তান হয়।

২৩২। তিন দিন পর্য্যন্ত নবপ্রসূত বৎসকে ( বাছুর ) চোখে চোখে রাখিতে হয়। মাণিকপীড় লুকাইয়া রাখিতে পারে।

২৩৩। পাতিশিয়াল ( শৃগাল )কে গালিদিতে নাই—বাটীতে আসিয়া বাহকরে।

২৩৪। পাটখড়ি পাটশলা ( সরমাইল ) দ্বারা কাহাকেও আঘাত করিতে নাই শরীর শুকায়। জলে ফেলিয়া দিলে দোষ সারে।

২৩৫। পান খাইতে আগে একটু থুতাইয়া ফেলে।

২৩৬। ভাঙ্গা কাঁসার পাত্রে খাইতে নাই।

২৩৭। বাড়ীর বাটায় ধোপার বাসস্থান দিলে বাটীর ভাল হয় না।

২৩৮। দুর্গাপূজা করিয়া কেহ উন্নত হইতে পারে না।

২৩৯। ভাদ্রমাসে কোলার ব্যাংও লড়ে না—কাজেই নাইরীর যাতায়াত বন্ধ।

২৪০। মরা কার্ত্তিকে ( কার্ত্তিক মাসে নাইরীর যাতায়াত বন্ধ।

২৪১। পৌষ মাস বন্ধ্যা মাস নাইরীর যাতায়াত বন্ধ।

২৪২। চৈত্র মাসে নায়রীর যাতায়াত নাই।

২৪৩। কার্ত্তিক মাসের প্রথমদিন যে যেখানে থাকে, উক্ত সংক্রান্তিদিন ও তাহাকে সেখানে থাকিতে হয়; অন্যথা পরিবারস্থ অপর কেহ যাইয়া তথায় রাত্রিবাস করে।

২৪৪। কোলের লাথি লাগিলে মথায় মাথায় ছোয়ায়।

২৪৫। মস্তকে মস্তকে ঢুস (আঘাত) লাগিলে পুনর্ব্বার একটী ঢুস দিতে হয়।

২৪৬। হাতে হাতে লবণ দেয়না গুণ নষ্ট হয়।

২৪৭। দুধে লবণ মিশাইলে খাইতে নাই গোমাংস তুল্য।

২৪৮। কাঁচাপোয়াতীর (অল্পদিন পূর্ব্বে যাহার প্রসব হইয়াছে) চাউল ও দাইল ধোয়া জল একত্র করিতে নাই।

২৪৯। একে অপরের গায়ে ভর করিয়া উঠেনা।

২৫০। বগলের নীচদিয়া যদি কেহ যায়, তবে তথায় ফোট হয়।

২৫১। খাইতে বসিয়া হাঁচি দিলে কাই (কনিষ্ঠ) অঙ্গুলী দ্বারা মৃত্তিকাতে একটী দাগদিয়া লইতে হয়।

২৫২। সোনা পাওয়া ভাল না দোষ।

২৫৩। একত্রে ভোজনেরত ব্যক্তিদের মধ্যহইতে যদি কাহাকেও পূর্ব্বে উঠিতে হয় তবে কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা মত্তিকাতে দাগদিয়া উঠিতে হয়।

৩৫৪। জ্বালান প্রদীপ মাটীতে রাখে না।

২৫৫। অঙ্গুলি দ্বারা মেটে প্রদীপের সলিতা বাড়াইতে নাই।

২৫৬। ফু' দিয়া বা থাবা দিয়া বাতি নিবাইতে নাই।

২৫৭। দক্ষিণ দিকে বাতির মু' রাখিয়া বাতি দেয় না।

২৫৮। মেটে বাতির জল ভরিবার ছিদ্র পথের উপর দিয়া সলিতা জ্বালাইতে নাই।

২৫৯। বাতির উপরে জ্বালান বাতি রাখিতে নাই।

২৬০। কার্ত্তিক মাসে লেপ গায়দিতে নাই—খুজলী হয়।

১৬১। চৈত্রমাসে লেপ গায় দিতে নাই।

২৬২। জোনাকী পোকা গৃহে প্রবেশ করিয়া বাতিতে পুড়িয়া মরিলে অমঙ্গল আশঙ্কা।

২৬৩। ঝগড়া লাগিলে ছিকা ঝুলায়—ঝগড়া সহজে থামেনা।

২৬৪। দুর্গাপূজার পরবর্ত্তী কালহইতে সরস্বতী পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইলিশ মৎস্য খাইতে নাই।

২৬৫। এক অঙ্গুলি দ্বারা ফলবান্ বৃক্ষে ফল দেখাইতে নাই।

২৬৬। মধ্যমাঙ্গুলী ব্যতীত দাঁত মাজিতে নাই—সান্নিক আসে।

২৬৭। বেলে মাটীতে দাঁত মাজা দোষ।

২৬৮। বাতির সলিতা জলিতে ২ মেটে বাতির বুকপর্য্যন্ত গেলে দোষ।

২৬৯। বেলা পর্য্যন্ত প্রাতে ঘুমাইতে নাই।

২৭০। খইএর তুষ পোড়ে না।

২৭১। বুৎমা ( খর্ব্বাকৃতি ) লাউ অনেকেই খায় না।

২৭২। সরস্বতী পূজাদিন ইলিশা মৎস্য খাওয়া চাই। অনেকে জোর মৎস্য আনে।

২৭৩। সরস্বতী পূজাদিন ইলিশ মৎস্য সহ বেগুণ আনিতে হয়।

২৭৪। প্রদীপ জ্বালাইয়া জোকার সহকারে মৎস্য ঘরে তুলিয়া লয়।

২৭৫। স্নানান্তে ভিজাকাপড় না চিপিয়া বাটী আসিতে নাই - জলের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষী ঢোকে।

২৭৬। গর্ভিণীর উপরদিয়া মৌমাছির ঝাঁক উড়িয়া গেলে পুনশ্চ পোকা উড়িয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত প্রসব হয় না।

২৭৭। সাপের পা দেখিলে রাজা হয়।

২৭৮। সন্তান জন্মিবার পরেই উহাকে মধুখাওয়ায়—মধুরমত মিষ্টস্বর হয়।

২৭৯। নদী পাড়ী কাটিতে নৌকার মাথায় একটু জল দিয়া লয়।

২৮০। জলপথে কোনও জীব যদি সম্মুখদিয়া পাড়হয়, তবে নৌকার মাথায় জলদিতে হয়।

২৮১। ভাদ্রমাসে গোবরদিয়া চাচ লেপিতে নাই।

২৮২। বালুকাষারা দা' ধারদিয়া 'বালুগচা'তে থুথু দিতে হয়।

২৮৩। দক্ষিণমুখী হইয়া লিখিতে নাই।

২৮৪। ঝাট দিবার কালে যদি পিছা ( ঝাঁটা ) কাহারও পায় লাগে

তবে উহাহ একটু অংশ ছিড়িয়া থুথু দিয়া উক্ত ব্যক্তির পায়ের মধ্যদেশে ফেলে দেয়।

২৮৫। বামহাতে ধরিয়া জল খাইতে নাই।

২৮৬। কাটাচুল জলে ফেলে দিতে হয়—কাকেনিলে বড় দোষ।

২৮৭। বামহস্তে কোনও দ্রব্য খাইতে নাই।

২৮৮। ভাত ফেলিয়া খাইতে নাই—ভাতে ছাড়ে।

২৮৯। স্ত্রীলোকের বুকে কোনও দ্রব্য লাগিলে সে উহা খায় না।

২৯০। আলাদিয়া গাভীর দুধ আলদিবার কালে দেখিতে নাই—গাভীর দুগ্ধ কমিয়া যায়।

২৯১। গাভীর দুগ্ধ কুকুরে খাইলে—দুগ্ধ শুকাইয়া যায়।

২৯২। গাভীর নিজদুগ্ধ পাড়াইলে ক্ষতি হয়।

২৯৩। প্রাতে দরজায় জল না দিয়া বা বিছানা তুলিয়া ঝাট না দিয়া টাকা পয়সা আদান প্রদান করে না।

২৯৪। সাপের বিষের সঙ্গে সঙ্গে পিপড়ার বিষও উঠে।

২৯৫। কেহ কাহারও গায় ঘুমিয়া পড়িলে অসুখ বা অমঙ্গলের সূচনা মনে করে—ঘুমন্ত ব্যক্তিকে সাতটা লাথি বা পিছা (ঝাঁটা) দিয়া সাতটী আঘাত করিলে দোষ সারে।

২৯৬। সাঁকো হইতে পড়িলে স্নান করাইয়া শেষে চিড়াকলা খাওয়ায়।

২৯৭। কাহারও গায় হাঁচি বা কাশি দিলে মুছাইয়া লয়। মুছিবার কালে বলিতে হয়—হ্যাচলাম্ কাশলাম্, পাট কাপড়দা মোছলাম।'

২৯৮। বগলের নীচে ফোট হইলে বলিতে নাই—বলিলেই আরও হয়।

২৯৯। দক্ষিণে ঢেকি, উত্তরে বেল। সেই বাড়ী জাহান্নামে গেল॥

৩০০। শেষ ঘরে হয় পুং। সংসারে লাগে ভুত॥
শেষ ঘরে হয় মাইয়া। ঘি-পড়ে ছিকা বাইয়া॥

৩০১। তিন পোলার পর হয় মাইয়া। ঘি-পড়ে ছিকা বাইয়া॥

৩০২। পৌষ মাসে হিন্দুরা মূলা খায় না—গরুর সিং সদৃশ। এরূপ বহুসংস্কার সমাজের ভিতর আধিপত্য করিতেছে। প্রসঙ্গ ক্রমে কয়েকটী মাত্র পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

# পরিচয়!

ক'দিনের পরিচয় বেশী দিন নয়
তবু কেন মনে হয় পলকে প্রলয় ?
আমার এহিয়া মাঝে যত ভালবাসা
সবটুকু দিয়ে তবু মিটেনা পিপাসা।
ক'দিনের পরিচয়—বেশী দিন নয়,
হারাই হারাই বুঝি এই সদা ভয়!
উজল অরুণ প্রায় মম হৃদি মাঝে
তাঁহারি মুরতি খানি সদা যেন রাজে!
কুসুমের বুকে ভাসে তার হাসি খানি,
নদী লহরে বাজে তারি সুধা-বাণী ;
তাঁহারি পরশ লভি উঠেছিগো জাগি,
সে আমার, আমি তাঁর চির অনুরাগী।
ক'দিন থাকিব কাছে বেশী দিন নয়,
সুখ আশা ভালবাসা সব পাবে লয় ;
তবু কেন এত ব্যথা এত ভালবাসা,
ওপারেও পাব তাঁরে এই কি ভরসা ?

শ্রীপ্রভাবতী ধর।

—— ◦0◦ ——

# খেলায় শিক্ষা।

স্বীকার করিতেই হইবে, এরূপভাবে খেলার মধ্যে বিশেষ করিয়া সমিতি সংস্থাপনের রীতি আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল না। খেলার জন্ত এরূপ অর্থব্যয় কখনও হইত না। যে ভাবে আমাদের স্বভাব ও রীতি যে পথ ধরিয়া বিকাশ হইতে চলিয়াছে, তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা ভিন্ন। এজন্ত এ সকল খেলা পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথাকে কোন প্রকারে অতিক্রম করিয়া চলিতেছে বলিয়া

উহাদিগকে উপেক্ষার চক্ষে দূরে সরাইয়া রাখিতেই হইবে, এ ভাব কোন প্রকারেই সঙ্গত বা শুভকর হইতে পারে না।

যেরূপভাবে আমাদের সামাজিক চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং যেরূপ দ্রুত আমাদের সমাজের পূর্ব্ব আদর্শ-স্থানভ্রষ্ট হইতেছে তাহাতে সকল দিকেই একটা বিপ্লবের সূচনা দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বতন গণ্ডীর মধ্যে জোর করিয়া এই পরিবর্ত্তনের প্রবল স্রোতকে বদ্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব। আর যিনিই উহা আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াস করিবেন, তিনিই উপহাসাস্পদ, এবং বিফলতায় ম্রিয়মাণ হইয়া ফিরিবেন।

যখনই সমাজে দুই প্রতিদ্বন্দীভাব আসিয়া বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে, যিনি শুধুই এক পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই ক্লান্ত ও নিরাশ হইয়া ফিরিয়াছেন। পুরাতনও নূতনের সংযোগ, অতীতও ভবিষ্যতের সামঞ্জস্য, অভিজ্ঞতাও পর্য্যা-লোচনার মীমাংসা নিয়া যিনি ধীরভাবে বিপ্লবক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন তিনিই যুগপূজ্যনেতা বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়াছেন। কোন বিপ্লবের মধ্যেই এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই।

আজকাল চরিত্র সংঘটন সমিতি অনেক দেখা যায়। কেহ ভক্তির উৎস সৃজন জন্য যুবকমণ্ডলী সংস্থাপন করিতেছেন। পরোপকার প্রবৃত্তির স্ফুরণ জন্য কোথাও সেবাসমিতির উদ্ভব হইতেছে। সকলেই সমাজে মানুষ সৃষ্টি করিতে চেষ্টিত কিন্তু যাহাদিগকে সমাজের আদর্শস্থানীয় বলিয়া সম্মান করি, অবতার সদৃশ বলিয়া ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করি, তাহারাও সম্পূর্ণ নহেন। মানুষের গুণ বলিতে যাহা কিছু বুঝায় সবটা তাহাতে পাই না। তাঁহাদের অসম্পূর্ণতা দরুণ যদি সমাজের কোন বিশেষ বিভাগে তাহারা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন— তাহা হইলে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হন কিন্তু সাহস করিয়া কখনও তাহা প্রকাশ করেন না। এরূপভাবে সর্ব্বত্রই আধখানা মানুষের ভিত্তিযোজন হইতেছে।

স্বাস্থ্য ব্যতীত মানুষ যে অনেকটা পঙ্গু, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, তদ্দিকে কেহ দৃষ্টি না করিয়াই মানুষ সৃজনে ব্যস্ত। যাহারা স্বাস্থ্যহানির কারণানুসন্ধানে পচা পুকুরের পানার নীচে মশকবীজের আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের নিকট এ তথ্যটাও উপেক্ষিত হইবে না, যে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যহানির একটা প্রধান কারণ নিয়মিত ব্যায়ামের অভাব। ব্যায়ামের

দোহাই দিয়া, বিপথগামী ছেলেদিগকে সমর্থন জন্ম খেলার ও নানা ক্রীড়া সমিতির club) উপকারিতার বক্তৃতা ফাদিব, এ ভয় করিয়া বৃদ্ধ অনেকেই তাহাদের সেই কল্প প্রাচীন কথার অবতারণা করিয়া হয়ত বলিবেন, আমাদের সময় এত খেলা, এত ব্যায়াম শিক্ষার আড়ম্বর ছিল না, তবু আমরা স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘায়ুঃ এবং তোমাদের অপেক্ষা জীবনী শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলাম। তখন আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু যথার্থ বস্তুটি ছিল। নিয়ম নিবদ্ধ club বা সমিতি ছিল না, কিন্তু খেলা ছিল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলম যুদ্ধ ছিল না, কিন্তু ছিল প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম, তখন যথেচ্ছ মুদ্রা বিনিময়ে ফল বিক্রয় ছিল না: ছিল ক্ষিপ্র সঞ্চালনক্ষম হস্তপদ, বন্যফল মূল আহরণে সতত অভ্যস্ত। তখন দল বাঁধিতে হইত না; আপনি আসিয়া জুটিত। অর্থের তত প্রয়োজন হইত না বলিয়া চাঁদার আটাআটি ছিল না। স্বয় প্রধান হওয়ার ভাবটা তেমন প্রবল ছিল না বলিয়া সভ্যের নিয়ম গড়িতে হইত না। এবং বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান ছিল বলিয়া অধ্যক্ষ নির্ব্বাচনে গোলযোগ হইত না।

এখন তাহা নাই—সময়ের পরিবর্ত্তনেই হউক, অথবা ভিন্ন রীতি নীতির সংঘর্ষেই হউক, সে সব দিনের প্রথা আজ আর চলে না। অথচ যাহা গিয়াছে তাহার স্থান শূন্য রাখাও যায় না। ব্যায়াম যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনী-শক্তির আধার, তেমন সমাজের প্রাণ। সুস্থ শরীর ভিন্ন কোন সাধনাই অসম্ভব। সাধনা ভিন্ন সিদ্ধি নাই। শরীরের নিয়মিত চালনাভিন্ন স্বাস্থ্য আয়ত্ত হয় না। স্বাস্থ্য আয়ত্তে না থাকিলে বল সঞ্চয় হয় না। আর বলহীনতাই মৃত্যু। ব্যষ্টিভাবে ব্যায়াম যেরূপ প্রয়োজনীয়, সমষ্টিভাবে উহা তেমনই অতুল্য। শক্তি ভিন্ন সমাজ রক্ষা কোথায় হইয়াছে? সমাজের শক্তি চালনা ভিন্ন কোথায় সমাজ ও দেশের উন্নতি বা অভ্যুদয় সম্ভবপর হইয়াছে?

যাহাতে সমাজে প্রত্যেকটী বালক ও যুবক দৃঢ় ও পুষ্ট হয় তৎপ্রতি প্রবীণদিগের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। উহাদের মধ্যে নিয়মিত ব্যায়াম প্রবর্ত্তন করা স্বাস্থ্য লাভের একটী উপায়। এরূপ ব্যায়ামে উৎসাহ প্রদান তো দূরের কথা, প্রকৃতি সুলভ ক্রীড়াশীলতা পুত্রাদিতে দেখিলেও কেহ কেহ রুষ্ট হন। কোনপ্রকার উৎসাহ প্রদর্শন করিলেও পুত্রগণকে তিরস্কার

করেন। তাহারা পুত্রদিগকে সকালে সন্ধ্যায় জোর করিয়া পুস্তকের সঙ্গে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ফলে শরীরটা জড়ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণে পরিণত হয়। মনটাও অনুমাত্র উহার স্বাধীন বিচরণে অভ্যস্ত না হওয়ায় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহাদের অভিভাবকেরাই উত্তরকালে সবচেয়ে বেশী নিরাশ হয়েন। মনুষ্যত্বকে বিড়ম্বিত করিয়া তাহার নিকট শ্রদ্ধা পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা অনেকের মধ্যেই প্রবল দেখা যায়। আঘাত করিবার পর প্রতিঘাত যেমন সুনিশ্চিত, মনুষ্যত্বের অবমাননার দুঃসহ প্রতিদানও তেমনই অপরিহার্য্য। আমরা যখনই মানুষ গড়িতে যাইয়া কাহাকেও নানা বাঁধার মধ্যে টানিয়া রাখি—তখন তাহার মানুষ হবার একটাদিক পঙ্গু হইয়া থাকে। এই পঙ্গুতা জন্য ধিকার তাহার মধ্যে সর্ব্বদাই প্রতিধ্বনিত হয়। একারণেই আমরা আজকাল পুত্রও ছাত্রগণ হইতে সাময়িক বশ্যতামাত্র পাই কিন্তু আন্তরিক শ্রদ্ধা পাই না। আর শ্রদ্ধাহীনতা এত প্রবল ও সংক্রামক যে উহার গতিরোধ করা একরূপ অসম্ভব। যে দিকে যাই, সে দিকেই এই এক কথাই শুনিতে পাই যে শ্রদ্ধাবিহীন শিক্ষা এদেশে কি করিয়া আসিল! আজকালকার যুবক সম্প্রদায় এতটা শ্রদ্ধাবিচ্যুত কিরূপে হইল?

প্রাচীন শ্রেয়ের আদর্শের স্থান যখনই নবযুগের শ্রেয়ের আদর্শ আসিয়া অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখনই আমরা কথঞ্চিৎ স্বার্থান্ধ; এবং স্বার্থনিরপেক্ষ শিক্ষা দান আমাদের পক্ষে অসম্ভাব্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। যেখানেই এরূপ ঘটিতেছে, সেখানেই মনুষ্যত্ব বিকাশের উদ্যমে পঙ্গুতা ও তজ্জনিত শ্রদ্ধাহীনতার আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা এদিকে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া, খেলাও club প্রভৃতির উপরই সমুদয় দোষ আরোপ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকি। কিন্তু কাহারও মধ্যে স্বাধীন মানুষটাকে গড়িয়া তুলিতে যিনিই অভিমান সংযত, চরিত্র সবল, উদারতা উন্মুক্ত ও সহানুভূতিকে সচেষ্ট রাখিতে পারিয়াছেন, তিনিই নির্ম্মল শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত হইবার আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাদানে অভিভাবকগণ যেরূপ যত্ন লেন, শরীরও হৃদয়ের শিক্ষাজন্য যদি তাঁহারা সেরূপ মনোযোগী হইতেন, তবে আমাদের শ্রদ্ধাশিক্ষার জন্য তাহাদিগকে এতটা উৎকণ্ঠিত হইতে

হইত না। অন্নপূর্ণার দানের মত উহা ক্রমাগত বাড়িয়াই যাইত। অগাধ ও অপ্রমেয় হইত। বুদ্ধিবৃত্তির চালনার পরে হৃদ্‌বৃত্তি চালনাতেও শিক্ষার যে একটু প্রয়োজনীয়তা আছে, সংসার আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা অনেকেই উহা ভুলিয়া যাই। পুত্রস্থানীয়দিগের শিক্ষায় প্রথমাবধিই তাহাদের উপার্জ্জন ক্ষমতার প্রতি যে এক প্রসন্ন লক্ষ্যক্রিয়া করিতে থাকে, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য না দিয়া ঈশ্বর আমাদিগকে আর একটী আগন্তুক মর্ম্ম পীড়া হইতে বাঁচাইয়াছেন। যতই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও হৃদয়ের শিক্ষায় দিকে লোক আকৃষ্ট হইবে, ততই কর্ম্মিষ্ঠ, দক্ষ ও দৃঢ় চরিত্র যুবকের সংখ্যা বাড়িতে থাকিবে। পুস্তকের কীটের মত সঙ্কোচপরায়ণ ও ভঙ্গুর যুবক অপেক্ষা ইহারাই বরং পিতার ও ভাইয়ের পশ্চাতে একটুক সাহস নিয়া দাঁড়াইতে শিখিবে।

শাস্ত্রজ্ঞানে উপদেশ দিবার শক্তি বাড়িতে পারে। একাকী নির্জ্জন গৃহে কল্পনা রাজ্য বাঁধিবার প্রয়াস প্রবুদ্ধ হইতে পারে, মনে মনে দেশ প্রচলিত নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অগ্নিময়ী বক্তৃতার মোসাবিদা চলিতে পারে, সর্ব্বোপরি অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবন ত্যাগ শ্লাঘ্য, পরার্থে আত্মবসর্জ্জনই মহত্বের আদর্শ ইত্যাদি চিন্তা করিয়াই নিজকে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করা সহজ হইতে পারে; কিন্তু কার্য্যকালে, যখন উপদেশ পালন করিবার সময় উপস্থিত হয় তখন তিনিই হয়তো সর্ব্বাগ্রে বিধিভঙ্গ দোষে কলুষিত হয়েন। দেশ প্রচলিত কুপ্রথা নিবারণ জন্য যে দৃঢ়তা প্রয়োজন, তাহার অভাব হেতু কুপ্রথাকেই বরণ করিয়া লয়েন, নিজের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারকে সত্বগুণাবলম্বী হইয়া ক্ষমা করিতে থাকেন; যে অপচার, ও অন্যায়কে নিতান্ত অধমও সহ্য করে না, তাহাই তিনি স্বীকার করিয়া রক্ষার্থ ব্যাকুল হ'ন। পরার্থে সামান্য অসুবিধা ভোগটুকু স্বপ্নেও অসহনীয় বলিয়া মনে করেন।

আমাদের মনের যেরূপ শরীরের উপর একটা একটা প্রভূত প্রভাব আছে, শরীরেরও তেমন মনের উপর কিছু আধিপত্য আছে। মনে মনে যতই উদার কল্পনা করিনা কেন, শরীরের জড়তা আসিয়া উহাদিগকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়। যখন শরীরের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হইয়া ভাল চিন্তা করি—

তখন আমাদের গতি অবাধ, কর্ম্মক্ষমতা অসীম, শুভানুষ্ঠান অনন্ত অনুবোধ করি। কিন্তু কোন কাজই দেহ নিরপেক্ষ হইয়া করিলে চলে না। শরীরের জড়তা কার্য্যকালে আসিয়া আমাদিগকে বাঁধা দেয়। এতদ্দরুণ ভাবুকবীর গণের ভাবনা ও সাধনা একরূপ হয় না। সাধনার প্রথম সোপান অতিক্রম করিতেই তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। কাজেই যিনিই বড় হইতে চান সমাজে ও দেশের কর্ম্ম প্রবাহ আনিতে চান, তাঁহাকেই মনের ও বুদ্ধিবৃত্তির চালনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের চালনাও করিতে হইবে। শরীরের জড়তা নাশ করিতে ও উহাকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করিতে ব্যায়াম আবশ্যক। আর হৃদয়ের ভীরুতা নাশ করিতে শাস্ত্রশিক্ষা ও সাময়িক শিক্ষার নিতান্তই প্রয়োজন। উভয়টাই মৃত্যুভয় নাশ করে। উদারতা উদারতা বলিয়া চেঁচাইতে পারি কিন্তু দেহটার বাহিরে যে ইহার প্রসারতা দেখা যায় না! যখন দেহটাকে তুচ্ছ করিতে পারি তখনই উদারতা তাহার বাহিরেও প্রকাশ পায়। যতদিন মৃত্যু ভঁয় থাকে ততদিন তাহা হয় না। উদারতা শিক্ষা-কল্পে শাস্ত্রশিক্ষা ও সাময়িক শিক্ষা প্রয়োজন। এ উভয়টা আবার আত্মরক্ষার্থও প্রয়োজন। যে আত্মরক্ষার জন্য সামান্য চেষ্টায়ও অভ্যস্ত নয় তাহা হইতে সমাজ ও পরিবার যে কিছুই আশা করিতে পারে না।

কিন্তু আজকাল রাজানুশাসনেই হউক, অথবা আপ্রাতঃসন্ধ্যা কলম কালীর সংস্পর্শে জড় ভাবের প্রাবল্য দরুণই হৌক, শাস্ত্রশিক্ষা বা সাময়িক শিক্ষার প্রতি সমাজস্থ লোকদিগের কিছুমাত্র মনোযোগ পরিলক্ষিত হয় না। তবে ইহা না বলিলে চলেনা, যে Hockey, foot ball ইত্যাদি খেলা আজকাল সাময়িক শিক্ষার স্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ফুটবল খেলা সমর নিপুণ লোকদিগের মধ্যে প্রথম আরম্ভ হয়। এখন উহা সামরিক বিভাগের একটা প্রিয় খেলা। এ সকল খেলায় কি কি ভাবে আমাদের কোন্ বৃত্তিগুলি উত্তেজিত হয়— চীনদেশে, একটু আলোচনা করিলেই উহা পরিষ্কার হইবে। আমাদের দেশের হাডুডুডু খেলাও একটা অতি উত্তম খেলা। যাহারা এ সকল খেলায় যোগদান করিয়াছেন,তাহারাই শুধু বুঝিতে পারিবেন,কি করিয়া বিপদের সম্মুখীন হইবার একটা অজ্ঞাতসাহস সহসা আসিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করে।

এখানে ফুটবল ও হাডুডুডু এই দুটী মাত্র খেলার দোষগুণ গুলি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ফুটবল খেলাতে ১। খেলোয়ারদিগকে অধিক দৌড়িতে হয় বলিয়া সাধারণতঃ ইহাদের শরীর একটু পাতলা হয়। ইহাদের মুখ একটু ভাঙ্গিয়া পড়েও কোণবিশিষ্ট হয়।

২। সর্ব্বদাই প্রতিপক্ষের উপর দ্বন্দ্বের ভাবটা জাগিয়া থাকে বলিয়া জিঘাংসা বৃত্তি উত্তেজিত হয়।

৩। সর্ব্বদাই উহাদিগকে বাঁধা দিবার অভ্যাস ও চিন্তা হইতে চরিত্রে একটু উগ্রতা ও উদ্যমশীলতা প্রকাশ পায়।

৪। ক্ষিপ্র না হইলে খেলিয়া উঠা ভার হয় বলিয়া ক্ষিপ্রকারিতা অভ্যস্ত হয়।

৫। সকলের আক্রমণের মধ্য হইতে 'বল' নিয়া যাইতে হয় বলিয়া, পলাইয়া আত্মরক্ষার ভাবটা তত জাগিতে পারে না; বরং তাহাদের আক্রমণকে উপেক্ষা করিবার ভাব জাগিয়া উঠে; সময়ে কৌশলে আত্মরক্ষা করিবার প্রয়াস জন্মে। যতই এ ভাবের প্রাবল্য জন্মে ততই অন্যক্ষেত্রে উহারা বিপদের সম্মুখীন হইতে অধিক সাহসী হয়।

৬। কিন্তু সাধারণতঃ ইহাতে পাশব বলের প্রয়োজন হওয়াতে, প্রকৃতিতে পাশব বলের একটু প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়।

৭। ছেলেদের শরীর পুষ্ট না হইতেই এই খেলায় উহারা উন্মত্ত হইয়া পড়ে। খেলার উত্তেজনাকে দমন করিবার অভ্যাস হয় না বলিয়া ইহাদের মধ্যে সংযমের অভাব পরিদৃষ্ট হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

৮। অপুষ্ট শরীরে খেলিবার সময় পরিশ্রমের গুরুমাত্রা উত্তেজনাবশে অনুভব করিতে পারে না—কাজেই অবসাদ অত্যধিক হয়। অভিভাবকদের ভয়ে উহা সর্ব্বদাই সংগোপনে করে এবং উপযুক্ত বিশ্রাম করিতে পায় না। ভদ্রূপ শরীর নষ্ট হয় ও জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়। এরূপ ফুটবলারগণ দীর্ঘায়ু হইতে পারে না।

৯। গুরু পরিশ্রমের পর ভালরূপ বিশ্রাম না করিয়া এমনকি মস্তিষ্ক জলসিক্ত দ্বারা ভালরূপ স্নিগ্ধ না করিয়াই অনেক সময় ছেলেরা পড়িতে

বসে। তখন পড়া একেবারেই হয় না। তন্দ্রা প্রবল হয়। পুস্তকের সঙ্গে হিজিবিজি দেখে ; ধারণাশক্তি একটু নষ্ট হয়। হয়ত একারণেই ইহাদের মধ্যে তেমন তুখোর ছেলের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

হাডুডুডু খেলায়—১। খুব বেশী দৌড়িতে হয় না। যাহারা পুষ্ট তাহাদের পরিশ্রমই একটু গুরু হয়।

২। প্রতিপক্ষের মাঝে ডাক নিয়া উপস্থিত হওয়ার সময় যুযুৎসার ভাবটা প্রবল হয়। বিপক্ষ পরিবেষ্টিত থাকায় সর্ব্বদা সতর্ক হওয়ার বৃত্তি কর্ষিত হয়। বিপক্ষের মধ্যে যাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিবার বৃত্তি জাগরিত হয়। প্রতিপক্ষের মাঝখানে একা থাকিতে হয় বলিয়া জিঘাংসার ভাবটাকে একটু চাপিয়াই রাখিতে হয়।

৩। ক্ষিপ্র না হইলে জয়ের সম্ভাবনা থাকে না, একটুমাত্র অসাবধান হইলে বিপক্ষের অনেক সুবিধা হইয়া পড়ে। এ কারণে ক্ষিপ্রকারিতা ও সাবধানতা অবিলম্বে অভ্যস্ত হয়।

৪। সাধারণতঃ অপুষ্ট শরীর বালক খেলায় অগ্রসর হইতে পারে না ; কাজেই অতি পরিশ্রম দরুণ তাহাদের শরীরের অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম।

৫। বলিষ্ঠ ও সুকৌশলী দলের রক্ষক ও নেতা। এ কারণে নেতা-নির্ব্বাচনে অতি সহজেই হইয়া যায়। তৎপ্রতি বশ্যতা সকলেরই সহজ মনে হয়।

৬। এ খেলায় যে যে পরিমাণ পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হয়, তাহাকে তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না ; কারণ পরিশ্রান্ত হইলে ডাক রাখিতে পারে না। তদুপরি পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামও আছে। এতদ্দরুণ অতি পরিশ্রম দরুণ ফুটবলে যে অনিষ্ট হয়, ইহাতে তাহা হয় না।

উভয় খেলাতেই নানা দুর্ঘটনার কথা শুনা যায়। উহা অসাবধান ও অতিমাত্র উত্তেজিত যুবকদিগের জন্যই সঞ্চিত থাকে। সাধারণ খেলা তজ্জন্য বিশেষ দায়ী বলিয়া মনে হয় না।

আজকাল কতকগুলি দোষের ভারও খেলোয়ারদিগকে ঘাড়ে করিতে হইতেছে। তাহারা নাকি বড় অশিষ্টাচারী, অবিনয়ী, কর্ত্তব্যে অমনোযোগী, অভিভাবকের আদেশে অতিমাত্র অবাধ্য। ইহা যে খেলার দোষ—ইহা

কেহই সজ্ঞানে অবিসংবাদে স্বীকার করিবেন না। যে সকল দোষারোপ করা হইতেছে তাহা যে নিতান্ত অমূলক তাহাও নয়। কোন কোন খেলোয়ারের মধ্যে ইহা দেখা যায়। ইহার কোন সুসঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে; আর তাহার প্রতীকার থাকাও একেবারে অসম্ভব নয়।

যাহাতে দেশে খেলার মধ্যে অভিচারিতা প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্ত আমাদের প্রত্যেকেরই ইহার কারণানুসন্ধান ও তন্নিবারণ চেষ্টা করা আবশুক।

খেলাটাও শিক্ষার অঙ্গ, ইহা অস্বীকার করিতে অন্ততঃ Kindergarten-এর যুগে এরূপ কেহ থাকিতে পারেন এ বিশ্বাস আমার নাই।

কি ভাবে খেলা শিক্ষার অঙ্গ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিলেই, অতি সহজে আমরা শিক্ষার অপচারগুলি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বুঝিতে পারিব।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ গুহ।

---

# কে হয় আমার ?

খুঁজিয়া না পাই তাঁরে কে হয় আমার ?
চন্দ্রমা অমিয় মাখা
নীলাকাশে আছে আঁকা
অনন্ত পয়োধি-নীরে ছবিটি কাহার ?
নদ-নদী-উপবন
গিরি হিম-নিকেতন
নীরদে দামিনী-ছটা বিভূতি যাঁহার
খুঁজিয়া না পাই তাঁরে, কে হয় আমার ?

খুঁজিয়া না পাই তাঁরে কে হয় আমার ?
বসন্তে শ্যামল সাঁজে
প্রকৃতির অঙ্গে রাজে
কুসুম-ভূষণে যাঁর সুষমা বিস্তার
মহিমা বিহগ-গানে
অলির গুঞ্জন তানে
নির্ঝরিণী রবে গীত শুনি অনিবার।
খুঁজিয়া না পাই তাঁরে কে হয় আমার ?

খুঁজিয়া না পাই তাঁরে কে হয় আমার
অসীম সঙ্কটে পড়ি
যদি তাঁর নাম স্মরি
নিরাশায় আশা-বারি যে করে সঞ্চার
যগ্যপি মুদিয়া আঁখি
তন্ময়ে তাঁহারে ডাকি
হৃদয়-মন্দিরে থাকি করিয়ে ওঙ্কার
জানায় আমিই তাঁর, সে হয় আমার।

শ্রীরসিকচন্দ্র রায় মহাশয় ।

---

## প্রসঙ্গ-কথা।

বিক্রমপুরসম্মিলনীসভা নিম্নলিখিত রূপ সর্ত্তে নূতন পুষ্করিণী খননের বা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের কার্য্য করিতে স্বীকৃত আছেন। পুষ্করিণীর স্বত্বাধিকারীগণকে সম্মিলনীর নিকট বার বৎসরের জন্য পুষ্করিণী ইজারা দিতে হইবে। যে সকল পুষ্করিণীর মালিকেরা সম্মিলনীর প্রস্তাবিত সর্ত্তে পুষ্করিণী খনন বা সংস্কারের কার্য্য করিতে সম্মত আছেন, তাঁহারা কলিকাতা "বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট পত্র লিখিলেই সমুদয় বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

*　　*　　*　　*

পারিজাত ফুলের আঘাতে ইন্দুমতী মর্ত্ত্য-লীলা সংবরণ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের অধিকাংশ সাহিত্যসেবী, সাহিত্যসভা, সমাজ ও পরিষদের পরিচালকগণও অতীত যুগের ইন্দুমতীর ন্যায়—সমালোচনারূপ পারিজাত ( উপমাটা ঠিক্ হইল না—সুধীবর্গ মার্জ্জনা করিবেন ) স্পর্শে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত, কাণ্ডজ্ঞানহীন, সময়ে সময়ে বীররসের অভিনয়ের জন্য অগ্রসর হইয়া থাকেন। জনসাধারণের কার্য্যে এই শ্রেণীর 'ফুলবাবু'দের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। যাহারা নিরপেক্ষ সমালোচকের বাক্য সহিতে পারেন না—ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারা হইয়া পড়েন, তাহাদের হামবড়া হইবার বাসনা

বস্তুতঃই হাস্যাস্পদ। হৃদয় বড় না হইলে মানুষ বড় হইতে পারে না। পুতুলকে নাচের মানুষ করিয়া তুলিলেও সে নাচের মানুষ হয় না।

'ঢাকা সাহিত্য পরিষদ' ঢাকার গৌরবের সামগ্রী, আমরা তাহার উন্নতিকামী হিতাকাঙ্ক্ষী—তবে কথা হইতেছে এই যে, উহা জন কয়েকের খামখেয়ালিতে পরিচালিত হয় ঐ মতের একান্ত বিরোধী। সাহিত্য পরিষদের' এই পাঁচ বৎসর বয়সে উহা দ্বারা ঢাকার বা পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যের কোন উন্নতি হইয়াছে বলিয়া জানিনা। 'প্রতিভা' কাগজ খানা ব্যতীত 'সাহিত্য পরিষদ' স্থায়ী কোন কার্য্য করে নাই। অথচ ঢাকা সহরে তাহারা অনেক কাজ করিতে পারিতেন।

ঢাকা এক সময়ে গীতি নাট্যের জন্য বিখ্যাত স্থান ছিল। এখান হইতে বহু গীতিনাট্য রচিত অভিনীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সে মনোজ্ঞ ইতিহাস "সাহিত্য পরিষদ" সংগ্রহ করিয়াছেন কি? কালী বাবুর 'সীতার বনবাস' রামপ্রসাদ বাবুর 'ভরত-মিলন,' প্রসন্নপণ্ডিত মহাশয়ের 'মালতী মাধব' নবাবপুরে রঙ্গালয়ের অভিনীত বিল্ব মঙ্গল, সীতার বনবাস 'জটিল', মোগলটুলিতে অভিনীত 'দক্ষযজ্ঞ' দক্ষিণ মৈষণ্ডীতে অভিনীত 'অর্জ্জুন পরাজয়' বা 'বভ্রুবাহণ', বাঙ্গালা বাজারের 'সুবল মিলন', 'রূপ সনাতন' 'জগাই মাধাই এক্রামপুরের 'নিমাই সন্ন্যাস' আর কত নাম করিব, এ সকল প্রাচীন গ্রন্থকারগণের কোন কথা তাহারা জানেন কি? না এ সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য কোন ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন? ঢাকা সহরে প্রথম দীনবন্ধুর 'নীল দর্পণ' অভিনীত হইয়াছিল। ঢাকা সাহিত্য পরিষদ যদি এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল ঢাকা সহর হইতে প্রকাশিত প্রাচীন পত্রিকা, পুস্তক ও ঢাকার প্রাচীন লেখকগণের জীবন চরিত, তাহাদের কার্য্য বিবরণী চিত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া 'প্রতিভা' পত্রে প্রকাশ করিতেন কিংবা ঐ সকল গ্রন্থ নিজেদের পুস্তকালয়ে সংগ্রহ করিতেন—তাহা হইলে আমরা 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদের' নিকট চিরজীবন ঋণী থাকিতাম। এখন আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদের' নিকট সর্ব্বসাধারণ বিন্দু মাত্রও ঋণী নহে। কলিকাতা সাহিত্যপরিষদের যাহারা পরিচালক, কিংবা রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের যাহারা পরিচালক তাহাদের

মধ্যে প্রকৃত কর্ম্মী এবং সাহিত্যসেবী অনেক আছেন, কিন্তু 'ঢাকা সাহিত্য পরিষদ' তাহারই অভাব। এবারকার বার্ষিক অধিবেশনেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 'সাহিত্য পরিষদের' বার্ষিক অধিবেশনে কেবল একটী মাত্র প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধ লেখকের সাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না বিশেষ তাহার উর্ব্বর মস্তিকের অসাধারণ গবেষণার ফলের নিশ্চয়ই। তাঁহার প্রবন্ধ হইতে আমরা দুটী কথা নূতন শিখিয়াছি (১) নির্জীব মোগল (২) রসহীন ইংরেজ! নির্জীব মোগল কথাটা বুঝিলাম না। যে জাতি সুদীর্ঘ পাঁচশত বৎসর কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করিলেন তাঁহারা নির্জীব আখ্যায় আখ্যাত হইলেন! হে মোস্লেম সন্তানগণ! তোমরা এই সুপণ্ডিত লেখকের গৌরব বাণীতে নিতান্তই কৃতার্থ হইয়াছ, তারপর 'রসহীন ইংরেজ কথাটা কেহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি? যে ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, যে সাহিত্যে সেক্সপিয়ার, মিল্টন; বাইরণ, শেলি, টেনিসন প্রভৃতি কবির অভ্যুদয়—সে জাতি রসহীন। আবিষ্কারের জন্য লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে 'শিরোপা' দেওয়া উচিত।

'সাহিত্য পরিষদ' কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। কাজেই উহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আমরা ক্রমশঃ বহুকথারই আলোচনা করিব। আমাদের মন্তব্যগুলি পরিচালকগণের ক্রোধ-বহ্নিতে ইন্ধন যোগাইলেও পরিষদের প্রকৃত হিতৈষী ব্যক্তিগণ মন্তব্যগুলি পাঠে তৃপ্তিলাভ করিবেন বলিয়াই বিশ্বাস।

*　　*　　*　　*

১৯১৪—১৯১৫ পর্য্যন্ত যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেবৎসর মুন্সীগঞ্জ লোকেল বোর্ড কি কি কার্য্য করিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। লোকেল বোর্ড দ্বারা সাধারণতঃ গ্রাম্য রাস্তা ঘাট ইত্যাদির সংস্কার হইয়া থাকে, বিগত বর্ষে লোকেলবোর্ড সে হিসাবে কি কি কার্য্য করিলেন তাহা সাধারণের অবগতির জন্য "বিক্রমপুরে" প্রচার হওয়া আবশ্যক। উক্ত লোকেল বোর্ড ৩৮৩৬০ বর্গমাইল স্থানের ৬৯২,৪০৭ অধিবাসী লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। কাজেই তাহাদের কার্য্যপ্রণালী সাধারণের জানা কর্ত্তব্য।

*　　*　　*　　*

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই চিরন্তন রীতি। তবে প্রকারভেদ আছে। স্বর্গীয় রত্নমণি গুপ্ত মহাশয় বিক্রমপুরের একজন কৃতীশালী যশস্বী ব্যক্তি ছিলেন। ঢাকা রামমোহন লাইব্রেরী তাঁহার এক অক্ষয় কীর্ত্তি। ময়মনসিংহ সহরে তাঁহার মৃত্যুতে এক শোকসভা আহুত হইয়াছিল—তথাকার বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সেই মহাপ্রাণ ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন—আর ঢাকায় কোন কথাটিও হয় নাই। ব্রাহ্ম সমাজের উদার নেতাগণও এই মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য একটী সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন! যে দেশের লোকেরা মহৎ ব্যক্তির শ্রদ্ধা করিতে জানেনা—তাহারা কোনদিনই আপনার পায়ে দাঁড়াইতে পারিবেনা, ইহা অবিসংবাদিত সত্য।

* * * *

তৃষিত চাতকের ন্যায় বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র লক্ষকণ্ঠে শুধু একই বাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছে 'দে জল! দে জল! সর্ব্বত্রই জলাভাব। জলের অভাবের জন্যই নানাদেশে নানারূপ ব্যাধির নির্য্যাতন। আমাদের মনে হয় জমিদার ও অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষে এক্ষণে নিজ নিজ এলাকায় গ্রামে পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা করা উচিত। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডও লোকেল বোর্ডের পক্ষে পথ ঘাট প্রস্তুত অপেক্ষা পুষ্করিণী খনন ও সংস্কারের জন্য অর্থব্যয় করা কর্ত্তব্য।

* * * *

আমরা সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের প্রকাশিত 'The reports on the working of the District Boards in Bengal নামক বিবরণী গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারিলাম যে বিগতবর্ষে ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জ লোকেল বোর্ড একটী খালের সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং জঙ্গল পরিষ্কার ও গড় ডোবা ভরিয়া ফেলা এরূপ সামান্য কতিপয় কার্য্য মাত্র সম্পন্ন করেন। খাল সংস্কারের কার্য্যাদি ব্যতীত অপর কোন কার্য্যই তেমন উল্লেখ যোগ্য নহে। আমাদের মুন্সীগঞ্জ লোকেল বোর্ড বিগত বর্ষে কি কি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন তাহার কোন বিবরণ ঐ রিপোর্টে উল্লেখ দেখিলাম না।

---

# বিক্রমপুর

| দ্বাদশ সংখ্যা। | চৈত্র, ১৩২২। |
|---|---|

## কবিতা।
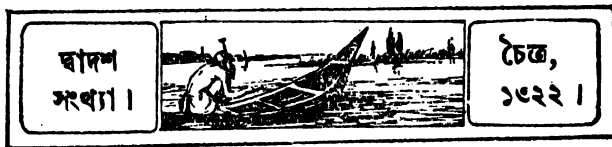
একি কুসুমের বুকে ভরা সৌরভ,
তটিনীর কল হাসি ?
একি তরুণীর মুখে লাজ-গৌরব,
জ্যোছনার সুধারাশি ?
একি উষার আননে হেম অঞ্চল,
শিশুর অফুট কথা ?
একি কাননের প্রাণে চিরচঞ্চল,
মর্ম্মর আকুলতা ?
একি ফাগুনের রাতে বায়ু-হিল্লোল'
আষাঢ়ের মেঘ ছায়া ?
একি জলধির চির কলকল্লোল,
আকাশের নীল মায়া ?
একি ফুটি ফুটি দেহে নবযৌবন,
শিহরিত তনুলতা ?

একি লাজারুণ মুখে প্রেম চুম্বন,
কাণে কাণে শতকথা ?
একি ঘিরি ঘিরি ছুটি চরণোৎপল,
রুণু ঝুনু গীতি বাজে ?
একি করুণায় চোখে বেদনোচ্ছল,
মুকুতার ধারা রাজে ?
একি জননীর শত স্নেহ-আহ্বান,
শিশুমুখে 'মা মা' বাণী ?
একি নারীকরযুগে জাগে কল্যাণ,
মুছি নিখিলের গ্লানি ?
একি মরুভূমি মাঝে চিরনন্দন,
নিঃস্বের চির আশা ?
একি দেবতার পায়ে আঁকা চন্দন,
বিশ্বের মহা ভাষা ?

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

——০O০——

# বিক্রমপুরের মাশ্চটক বংশ।

রাজা আদিশূর যথাবিধানে যাগযজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচটী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তন্মধ্যে ক্ষিতীশ শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। আদিশূরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ভূশূর রাঢ়ে আসিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন এবং উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের পাঁচটী পুত্র তাঁহার সঙ্গে রাঢ় দেশে আসেন। এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ ছিলেন এবং কালক্রমে তাঁহার ১৬টী পুত্র জন্মে। এই ষোল পুত্র যথাক্রমে বন্দ্যঘটি, কুসুম, দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষাল, বটব্যাল, পরিহাল, কুলকুলী, মাস, কুশারী সেউক গড়, আকাশ, কেশব, দীর্ঘগ্রামী, কড়াল ও সুহাগী গ্রামে বসবাস করিতে থাকেন এবং যে যে গ্রামে

বাস করেন সেই সেই গাঞী কথিত হয়। ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্রের বংশধর গণের মধ্যে ইদানীং অনেক বংশ লোপ পাইয়াছে। ভট্টনারায়ণের অষ্টম পুত্র বুঢ় বীরভূম জিলায় মানগ্রামে বাস করেন এবং তাঁহার বংশধরগণ মাশ্চটক গাঞীনামে অভিহিত হয়। প্রাচীন মানগ্রামের বর্ত্তমান নাম মানদহ। মানগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুহেতু অথবা সকলের সেই গ্রামে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান না হওয়ায় বা যে কোন কারণেই হউক বুঢ়ের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ মান গ্রাম ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুর শ্রীনগর থানার সন্নিহিত কুশারীপাড়া আসিয়া বাস করেন। নিম্নে মাশ্চটকদের আদিবংশ তালিকা প্রদত্ত হইল।
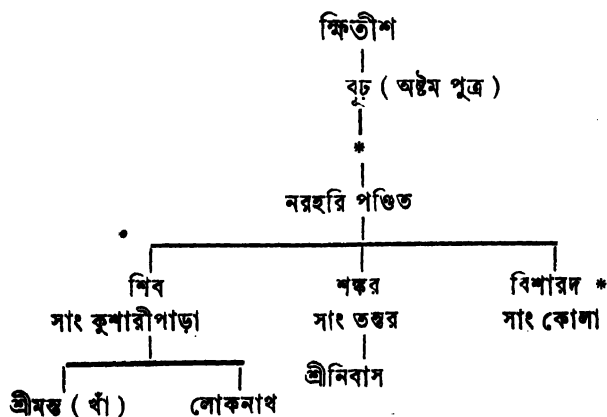
ক্ষিতীশ হইতে শ্রীমন্ত খাঁ পর্য্যন্ত সময় নির্দ্ধারিত করিতে হইলে আদিশূর হইতে আকবর পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া মোটামুটি ৫৫০ বৎসর অনুমান করা যায়। এক শত বৎসরে চারি পুরুষ হিসাবে ধরিলে ক্ষিতীশ হইতে শ্রীমন্ত খাঁ পর্য্যন্ত বাইশ পুরুষ ধরা যায়। সুতরাং বুঢ় হইতে নরহরি পণ্ডিত পর্য্যন্ত অনুমান ষোল পুরুষের নাম পাওয়া যায় না। আমি অনেক বিজ্ঞ, বৃদ্ধ ঘটকের নিকট এই নাম গুলি সংগ্রহের জন্য ঘুরিয়াছি কিন্তু কাহার ও নিকট কিছু পাওয়া যায় নাই।

* মতান্তরে প্রকাশ নরহরি পণ্ডিতের মাত্র দুই পুত্র শিব ও শঙ্কর।

যতদূর জানা যায় নরহরি পণ্ডিতের পুত্রগণই প্রথমে বিক্রমপুর আসেন। এবং তাঁহারা কুশারীপাড়া কতদিন একত্রে বাস করিয়া অবশেষে দ্বিতীয় পুত্র শঙ্কর তঙ্কর গ্রামে এবং তৃতীয় পুত্র বিশারদ ঘটক উপাধি পাইয়া কোলা গ্রামে যাওয়া বাস করেন। কিন্তু প্রথম পুত্র শিব বিক্রমপুরে মাশ্চটকদের আদিস্থান কুশারীপাড়াই বাস করিতে থাকেন। অতঃপর কুশারীপাড়া হইতে শ্রীমন্তের এক পৌত্র কয়কীর্ত্তন গ্রামে স্থানান্তরি হয়।

## শ্রীমন্ত খাঁ।

এই অতীত প্রাচীন মাশ্চটক বংশ একদিকে যেমন কুলমর্য্যাদায় সমাজে অত্যুচ্চস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে, অপরদিকে তেমনই বিক্রমপুরের ইতিহাসের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। বারভূঞার অন্যতম ভূঞা চাঁদরায় কেদার রায় যখন বিক্রমপুর দুর্দ্দন্ত প্রতাপে শাসন করিতেছিলেন, দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদসাহের নিকট একে একে অন্যান্য ভূঞাগণ নত শিরে বশ্যতা স্বীকার করিলে মধ্যাহ্ন ভানুর ন্যায় মহাপ্রতাপশালী কেদার রায়ের দুর্দ্দমনীয় তেজঃপুঞ্জ যখন সারা বঙ্গকে ঝলসিত করিয়াছিল, তখন এই বংশের শ্রীমন্ত কেদার রায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। শ্রীমন্ত প্রথমতঃ কেদার রায়ের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন সত্য কিন্তু কালক্রমে নিজের অসাধারণ বুদ্ধি প্রভাবে কেদাররায়ের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া বিখ্যাত হয়েন।

শ্রীমন্ত পরে খাঁ উপাধি লাভ করেন। কথিত আছে কেদার রায় একদিন পদ্মাতে বেড়াইতে বহির্গত হইলে ভাসমান তাম্র পাত্রস্থিত একটী বালক দেখিতে পান এবং সেই শিশুকে বাড়ী আনিয়া লালন-পালন করেন। কালক্রমে উক্ত বালকের জাতি-নির্ণয় করিবার দরকার হইলে কেদাররায় এক মহতী সভার আহ্বান করেন; এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসাইয়া উক্ত বালককে সভার মধ্য স্থানে ছাড়িয়া দেন। উক্ত বালক হাটিতে হাটিতে ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে উপনীত হইলে কেদার রায় তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং "গোষ্ঠিপতি" (এক গাঞীর) ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। উক্ত বালককে ব্রাহ্মণ সমাজে চলিত

করিবার নিমিত্ত কেদার রায় যাবতীয় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেন এবং উক্ত বালক দ্বারা পরিবেশন করান। এই নিমন্ত্রণ সভাতে শ্রীমন্তকে উক্ত বালক অন্ন পরিবেশন করিলে শ্রীমন্ত অন্নগ্রহণ না করিয়া বসিয়া থাকেন। তখন কেদাররায়ের মাতা আসিয়া বলেন "শ্রীমন্ত খাঁ (৩)" তথাপি শ্রীমন্ত খাইলেন না কিন্তু তদবধি শ্রীমন্ত খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন।

উপরোক্ত কিংবদন্তী কত দূর সত্য, বলা যায় না। তবে শ্রীমন্ত সেই সময়ে যে প্রকার ক্ষমতাশীল, দক্ষ এবং কেদার রায়ের প্রিয় কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাতে মনে হয় কেদার রায় নিজেও তাঁহাকে খাঁ উপাধি দিতে পারেন।
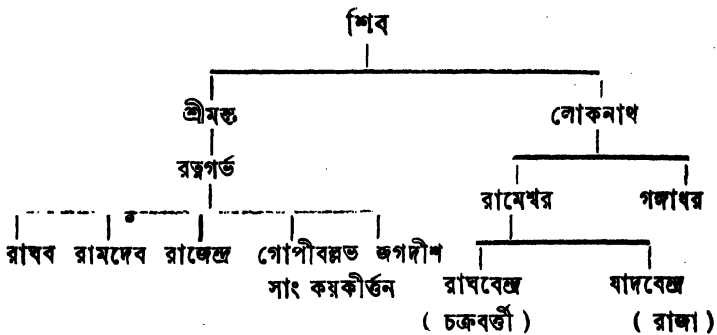
সময়ানুসারে বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটে। বুঝি বিজয়-লক্ষ্মী কেদার রায়ের প্রতি অপ্রসন্না হইলেন। পূর্ব্বোল্লেখিত গোষ্ঠিপতি ব্রাহ্মণ বালক পরিণত বয়সে বিবাহাদি করিলে কালক্রমে তাহার কন্যা বিবাহোপযুক্তা হয়। কেদার রায় শ্রীমন্ত খাঁর পৌত্রের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব করেন কিন্তু শ্রীমন্ত তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর শ্রীমন্ত ধর্ম্মার্থে কিছু সময়ের জন্য ৺ কাশীধাম গেলে কেদার রায়ের অনুমত্যানুসারে শ্রীমন্ত খাঁর পৌত্র গোপীবল্লব উক্ত গোষ্ঠিপতি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীমন্ত খাঁ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পৌত্রের এতাদৃশ যথেচ্ছাচার সন্দর্শনে ক্রুদ্ধ হন এবং পৌত্রকে ত্যাগ করেন। গোপীবল্লভ ইতঃপূর্ব্বেই কেদার রায় হইতে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ কুশারীপাড়ার সংলগ্ন কয়কীর্ত্তন গ্রাম এবং অন্যান্য কতকগুলি যৌজা

( খণ্ড তালুক বিশেষ ) প্রাপ্ত হন। সুতরাং এখন পিতামহ দ্বারা ত্যজ্য হইলে তিনি কয়কীর্ত্তনে যাইয়া বাস করেন এবং সেই অবধি কয়কীর্ত্তন ও মাশ্চটকের গ্রাম হয়।

কেদার রায়ের প্ররোচনায় পৌত্র গোপীবল্লভ গোষ্ঠিপতি কন্যা বিবাহ করিয়া কুলে কলঙ্ক আনিয়াছেন, ইহা বৃদ্ধ শ্রীমন্ত খাঁ ভুলিতে পারিলেন না। এই ক্রোধ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনি ছলে কেদার রায়ের ভগ্নী সোণামনিকে সোনার গাঁয়ের ভূঞা ঈশাখাঁর হাতে সমর্পণ করেন এবং অবশেষে মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের যুদ্ধ সংঘর্ষণ হইলে কেদার রায়ের বিরুদ্ধে তিনি নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া কেদার রায়কে পরাজিত এবং নিহত করেন।

## কুশারীপাড়া চক্রবর্ত্তী বাড়ী।

রাঘবেন্দ্র তৎসাময়িক প্রতিষ্ঠাপন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে চক্রবর্ত্তী উপাধি লাভ করেন এবং তাঁহার বংশধর অদ্যাবধি চক্রবর্ত্তী উপাধি বহন করেন এবং প্রত্যেক পুরুষে একজন শাস্ত্রাধ্যাপক খ্যাতনামা পণ্ডিত হইয়া আসিতেছেন। বোধ করি শঙ্কর ও বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং সেই জন্য তাহার বংশধরগণ অর্থাৎ তন্তরের সকল মাশ্চটকই চক্রবর্ত্তী উপাধি লিখেন। এই মাশ্চটক বংশে শঙ্করের বংশধর রুস্দি নিবাসী রাসমোহন সার্ব্বভৌম মহাশয় অদ্বিতীয় খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন এবং বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন; বর্ত্তমানে কুশারী পাড়া নিবাসী রাঘবেন্দ্রের বংশধর শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বিদ্যালঙ্কার ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন কাব্যতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিরত্ন মহাশয়গণ এবং শঙ্করের বংশধর তন্তর নিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতেছেন। রাঘবেন্দ্র কুশারীপাড়ার যে বাড়ীতে বাস করিতেন, তাহা এখনও চক্রবর্ত্তী বাড়ী বলিয়া খ্যাত।

## কুশারীপাড়া রাজবাড়ী।

তৎকালীন সমস্ত ব্রাহ্মণই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। মাশ্চটক বংশধর যাদবেন্দ্র ও পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি প্রাপ্তি বিষয়ে দুইটী কিংবদন্তী আছে :—

প্রথম কিংবদন্তী—রাজা রাজবল্লভের সভাতে শাস্ত্র বিষয়ে কোন তর্ক উত্থাপিত হইলে উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী তাহা মীমাংসা করিতে পারেন না। সুতরাং পণ্ডিত প্রবর রাঘবেন্দ্রকে উক্ত সভায় নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইয়া উক্ত তর্ক মীমাংসা করিয়া দিয়া আসিতে রাজবল্লভ অনুরোধ করিয়া পাঠান। সেই সময়ে রাঘবেন্দ্র কার্য্যান্তরে বাড়ী ছিলেন না; সুতরাং তাহার কনিষ্ঠ সহোদর যাদবেন্দ্র রাজার অনুরোধ রক্ষার্থে রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত যুক্তি দ্বারা উত্থাপিত শাস্ত্রীয় তর্ক মীমাংসা করিয়া দেন। তাহাতে রাজবল্লভ সন্তুষ্ট হইয়া যাদবেন্দ্রকে পুরস্কার স্বরূপ এক তোড়া টাকা অর্পণ করিলে যাদবেন্দ্র তাহা তুচ্ছ জ্ঞানে অগ্রাহ্য করেন। রাজবল্লভ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এবম্বিধ উদারতা ও নির্লোভীতা সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং যাদবেন্দ্রকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

দ্বিতীয় কিংবদন্তী—তখনও এরূপ প্রকার ব্রিটীশ গভর্মেণ্ট হয় নাই। কোন দুই ব্যক্তি ঝগড়া করিলে গ্রামের মোড়ল বিচারের জন্য তাহাদিগকে কাজির নিকট উপস্থিত করে। কিন্তু বিচারপ্রার্থী উভয় ব্যক্তি কুশারী পাড়া নিবাসী যাদবেন্দ্র দ্বারা তাহাদের বিচার সম্পন্ন হওয়ার জন্য কাজির নিকট প্রার্থনা করিল। কাজি তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া যাদবেন্দ্রর নিকট লোক পাঠাইয়া দেন। দরিদ্র যাদবেন্দ্র কাজির লোক মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া নগ্নপদে একখানা সামান্য নামাবলী স্কন্ধে ফেলিয়া তালপত্রের ছত্র সহ বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন। কাজি যাদবেন্দ্রকে দেখিয়া হাস্য সহকারে বিচারপ্রার্থীদের প্রতি যাদবেন্দ্রের প্রাধান্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা উত্তর করিল "তিনি ধনের কাঙ্গাল কিন্তু মানের রাজা।" সেই অবধি যাদবেন্দ্র কাজি দ্বারা "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই দুইটী কিংবদন্তীর মধ্যে প্রথমটীই বিশ্বাস যোগ্য এবং যাদবেন্দ্র যে রাজবল্লভের সমসাময়িক লোক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে কারণেই হউক কুশারীপাড়ার যে বাড়ীতে যাদবেন্দ্র বাস করিতেন সেই বাড়ী "রাজাবাড়ী" বলিয়া খ্যাত। শ্রীনগর পোষ্ট আফিসের সৃষ্টি হইতে কুশারী পাড়া, রাজাবাড়ী" ঠিকানায় চিঠি লিখিলে তাহা রীতিমত বিলি হয়। আমি এই বাড়ীর বহু পুরাতন চিঠিপত্রাদি এবং অন্যান্য দলিল দেখিয়াছি তাহাতে

দলিল গৃহীতার নামের পূর্ব্বে "রাজা" শব্দ আছে এবং রাজা যাদবেন্দ্রের বংশধরগণকে অদ্যাপি তাহাদের নামের পূর্ব্বে বা পরে "রাজা" শব্দ সংযোজিত করিয়া অভিহিত করা হয়।

## কুশারীপাড়ার ভগ্ন মঠ।

মাশ্চটক মানগ্রাম হইতে বিক্রমপুরে কুশারীপাড়া আসিয়াই প্রথম বাসস্থান নির্দ্ধারিত করে এবং কুশারীপাড়া হইতে পরে তস্তর, কোলা, রুসদি ও কয়কীর্ত্তন গ্রামে যায়। কুশারীপাড়াতে এখনও এক দীঘি আছে এবং তাহা "শ্রীমন্ত খাঁর দীঘি" বলিয়া খ্যাত। কুশারীপাড়ার মাশ্চটক বংশীয় এই দীঘি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনুমান ৩০০ এবং ১০০ হাত। এই দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে জুমুরগাও হইতে মাশ্চটক বংশীয় শিবচরণ চৌধুরী মহাশয় যোগবলে সিদ্ধি লাভ করেন ; এবং নির্জ্জনে যোগাভ্যাস করিবার জন্য একটী মঠ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেই মঠ এখনও জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান আছে।

কুশারীপাড়া, তস্তর, কোলা, রুসদি ও কয়কীর্ত্তনের মাশ্চটকগণ উল্লিখিত এবং অনুল্লিখিত নানাকারণে চৌধুরী, চক্রবর্ত্তী, ভট্টাচার্য্য এবং ঘটক উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সকলেই এক বংশ সম্ভূত। চৌধুরী উপাধি অনুমান করি মুসলমান রাজা দ্বারা প্রদত্ত হইয়া থাকিবে কারণ পূর্ব্বে তালুকদারদিগকে চৌধুরী বলা হইত। বল্লালের সময়ে যখন বংশমর্য্যাদার অত্যন্ত গৌরবছিল তখন এই মাশ্চটকগণ সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। সেই সময় রাঢ়ী ব্রাহ্মণের যাবতীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ এই বংশের কন্যার পাণিগ্রহণে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং তখন মাশ্চটকগণ প্রধান কুলীনকে ও মাত্র পাঁচটী হরিতকি বরপণস্বরূপ প্রদান করিতেন। প্রায় ৪০ বৎসর হয় কোন খাসবাড়ীর মুখোপাধ্যায় বিবাহ খরচ সঙ্কুলনার্থে বরং কন্যাকর্ত্তাকে দুইশত টাকা প্রদান করতঃ এই বংশের একটী কন্যা তাহার পুত্রকে বিবাহ করাইয়া সমাজে ধন্য হইয়াছিলেন।

পৃথিবীর যাবতীয় পুরাতন জিনিষই কালে লোপ পাইবে, সেই সনাতন নিয়মাধীন বলিয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক মাশ্চটকবংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

শ্রীজ্ঞানদাকিশোর চৌধুরী।

## বর্ষ-বিদায়

( চৈত্র )

মাস খানি শুধু আর
　　আছে পরমায়ু
কানাকানি করে তাই
　　বসন্তের বায়ু
তপ্ত গাত্র—রক্ত নেত্র—
　　মৃদু মৃদু শ্বাস
বিদায়—বিদায়—বঁধু!—
　　ওগো মধুমাস!

শ্রীকুলচন্দ্র দে।

—•০•—

## চ্যাণ্ডিকান নগরী ( ৩ )

### "চ্যাণ্ডিকানের" স্থাননির্দ্দেশ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতাবলী।

বাখরগঞ্জ জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত H. Beveridge সাহেব তদীয় The District of Bakargunj নামক গ্রন্থে এবং ১৮৭৬ সনের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত Were the Sunderbans inhabited in ancient times নামক প্রবন্ধে চ্যাণ্ডিকানের অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে এতদ্বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্ত ও যুক্তিসমূহ বঙ্গ ভাষায় বিবৃত হইল।

বেভারিজ সাহেব বলেন,—চ্যাণ্ডিকান কোথায় অবস্থিত ছিল, এবং কে ইহার নৃপতিছিলেন, এতদ্বিষয়ে আমার বিশ্বাস যে, ধূমঘাট অথবা উহার সন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থান এবং চাণ্ডিকান অভিন্ন। উহা নিশ্চয়ই চব্বিশ

পরগণা জেলায় এবং আধুনিক কালীগঞ্জের বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল; এবং প্রতাপাদিত্যই যে চাণ্ডিকানের অধিপতি ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে বেভারিজ সাহেব নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, রামরাম বসু প্রণীত এবং হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক আধুনিক ভাষায় ভাষান্তরিত প্রতাপাদিত্য-চরিত পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বঙ্গেশ্বর দায়ুদ সাহের নিকট হইতে প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য যে শুন্দরবনস্থ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বতন সত্বাধিকারীর নাম চাঁদখাঁন ছিল: এই চাঁদখান হইতেই চ্যাণ্ডিকান নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। বৈদেশিকগণ চাঁদখাঁনকে বিকৃত উচ্চারণ করিয়া চাণ্ডিকান করিয়াছেন। চাঁদ খাঁ মসন্দরির অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারীর অভাবে সমুদ্রতটস্থ তদীয় রাজ্য বণাকীর্ণ হইয়া পড়ে।

দিল্লীশ্বরের সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত দায়ুদ শাহের অচিরেই ধ্বংস অনিবার্য্য জানিয়া তদীয় মন্ত্রী বিক্রমাদিত্য পূর্ব্বেই সতর্ক হইয়া আত্মরক্ষার জন্য ঐ বনাবৃত দুর্গম স্থানে পুরী নির্ম্মাণ করেন। বঙ্গেশ্বর দায়ুদ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। যদি ও উহার পূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্য পূর্ব্বোক্ত নগর পত্তন করিয়াছিলেন, তথাপি ঐ সময়েই তিনি বাসার্থ তথায় গমন করেন। তাঁহার বংশের মাত্র ২৪।২৫ বৎসর রাজত্বের পর জেসুইটগণ প্রথমে তদীয় রাজ্যে গমন করেন, এবং তখন পর্য্যন্ত পুরাতন মালিক চাঁদ খাঁর নাম রাজ্যের সহিত জড়িত থাকা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ, প্রতাপাদিত্য তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত যশোহর নগরে সর্ব্বদা বাস করিতেন না, তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ধূমঘাটে একটি স্বতন্ত্র নগর প্রতিষ্ঠা করেন। চাঁদখাঁর পুরাতন রাজধানীর স্থানেই হয়ত এই ধূমঘাটের পত্তন হইয়াছিল, এবং ধূমঘাটে প্রতাপাদিত্যের স্থানান্তরিত হওয়ার দুই তিন বৎসর পরও উহা চাঁদখাঁন অথবা চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত হওয়া অসম্ভব নহে। যশোহর পূর্ব্বে খাঁ জাহান আলির অধিকারভুক্ত ছিল। বিক্রমাদিত্যের যশোহরে আসিবার প্রায় ১২০ বৎসর পূর্ব্বে, ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে খাঁ জাহান আলির মৃত্যু হয়। চাঁদ খাঁ হয়ত তাঁহারই একজন বংশধর হইতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, সন্দ্বীপের অধিকার লইয়া পর্ত্তুগীজগণের আরাকান-পতির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর্ত্তুগীজগণ চ্যাণ্ডিকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকানপতি তৎকালে প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, এবং ডুজারিকের বিবরণানুসারে বাকলা রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ডুজারিক বলেন, চ্যাণ্ডিকানপতি তৎকালে যশোহরে অবস্থান করিতেছিলেন, * এবং পর্ত্তুগীজ সেনানায়ক কার্ভালোও তখন ঐ স্থানে ছিলেন। আরকান-পতির সহিত সদ্ভাব করিবার উদ্দেশ্যে চ্যাণ্ডিকান-পতি আশ্রিত বীর কার্ভালোকে হত্যা করেন। যশোহরে এই হত্যা সংসাধিত হয়। ডুজারিক বলেন, এই হত্যার সংবাদ তৎপরবর্ত্তী দুপ্রহর রাত্রিতে চ্যাণ্ডিকান নগরীতে পৌঁছে। ইহা হইতেই যশোহর ও চ্যাণ্ডিকানের দূরত্ব অনুমিত হয়। যশোহর ও ধূমঘাটের দূরত্বও ঠিক এতদনুরূপ ছিল। সুতরাং, চ্যাণ্ডিকান ও ধূমঘাট অভিন্ন ছিল বলিয়া প্রতীত হয়।

তৃতীয়তঃ, ফন্‌সেকা বাকলা হইতে চ্যাণ্ডিকান যাওয়ার পথের যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, অদ্যাপি তাহা বাখরগঞ্জ জেলা হইতে সুন্দরবন অঞ্চলে যাওয়ার পথের প্রতি প্রযুজ্য। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনের অরণ্যানী যতই আবাদ হইয়া যাইতেছে, বন্য জন্তুর প্রভাব ততই হ্রাস পাইতেছে। কিন্তু এই অঞ্চলে হরিণ প্রভৃতি বন্য জন্তুর বাহুল্য হেতু অদ্যাপি সুন্দরবনের একটি বৃহৎ নদী হরিণ-ঘাটা নামে অভিহিত হয়। সুতরাং, চ্যাণ্ডিকান যে সুন্দরবনের কোন স্থানে অবস্থিত ছিল, এইরূপই অনুমিত হয়।

---

* বেভারিজ সাহেব যে উপাদান হইতে উপরোক্ত দ্বিতীয় যুক্তিটির অবতারণা করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় তদীয় "প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থে (১০৪, ১০৫ পৃঃ ; সেই উপাদান হইতেই তদপেক্ষা একটি প্রবলতর যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তাহা এইরূপঃ— ডুজারিকের বিবরণানুযায়ী কার্ভালোর হত্যাসাধন কালে চ্যাণ্ডিকানাধিপতি যশোহরে অবস্থান করিতেছিলেন। ডুজারিকের বর্ণনায় চ্যাণ্ডিকান-পতির অন্যতম আবাসস্থান যশোহরের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায় তিনি যে যশোহর-পতি প্রতাপাদিত্য, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

চতুর্থতঃ, ফন্‌সেকা চ্যাণ্ডিকান যাইবার পথে যখন আট বৎসর বয়স্ক বাকলা নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি ফন্‌সেকাকে কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করাতে ফন্‌সেকা উত্তর করেন,—আমি আপনার ভাবী শ্বশুর চ্যাণ্ডিকান-পতির নিকট যাইতেছি। ইহা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য বাকলা রাজ রামচন্দ্র রায়ের শশুর ছিলেন, তাহা সুপরিজ্ঞাত ঘটনা। ফন্‌সেকা বর্ণিত আট বৎসর বয়স্ক বাকলা-নৃপতিই রামচন্দ্র রায়, এবং তদীয় শ্বশুর চ্যাণ্ডিকানপতিই যে প্রতাপাদিত্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পঞ্চমতঃ, ডুজারিক বলেন, আরাকান-পতি যখন বাকলা রাজ্য অধিকার করেন, বাকলার অধিপতি তখন স্বীয় রাজ্যে অনুপস্থিত ছিলেন। রামচন্দ্র রায় তাঁহার শ্বশুরের রাজধানীতে আবদ্ধ ছিলেন, এবং প্রতাপাদিত্য গোপনে স্বীয় জামাতার হত্যা সাধনে চেষ্টা করেন। সম্ভবত, রামচন্দ্ররায়ের আবদ্ধ অবস্থাতেই আরাকান-পতি তাঁহার রাজ্য জয় করেন।

ষষ্ঠতঃ, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন ফার্ণাণ্ডেজ চ্যাণ্ডিকানে গমন করিয়া চ্যাণ্ডিকান-পতি দ্বারা তদীয় রাজ্যে গির্জ্জা প্রস্তুত করিবার ও খৃষ্টান করিবার ক্ষমতা পত্র স্বাক্ষরিত করিয়া লন, তখন নৃপতির আদেশ ক্রমে তিনি উহাতে দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক যুবরাজের স্বাক্ষরও গ্রহণ করেন। এই যুবরাজ সম্ভবতঃ উদয়াদিত্য যিনি তদীয় ভগ্নীপতি রামচন্দ্ররায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এবং প্রতাপাদিত্যের আক্রোশ হইতে যিনি তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ফার্ণাণ্ডেজ ও ফন্‌সেকার বিবরণ হইতে রামচন্দ্র রায় ও উদয়াদিত্য সমবয়স্ক ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে, এবং ইহা হইতে তাঁহার বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এই অনুমানও সমর্থিত হয়।

চ্যাণ্ডিকান-পতির সমস্ত বিবরণই প্রতাপাদিত্যের সহিত মিলিয়া যাওয়াতে এবং পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সমূহের বলে বেভারিজ সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে, ধূমঘাটকেই পাশ্চাত্য পর্য্যটকগণ চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত করিয়াছেন, এবং প্রতাপাদিত্যই তাঁহাদের উল্লিখিত চ্যাণ্ডিকান-পতি ছিলেন।

ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় তদীয় "প্রতাপাদিত্য" গ্রন্থে চ্যাণ্ডিকান-পতি ও প্রতাপাদিত্যের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে বেভারিজ সাহেবের সহিত সম্পূর্ণ একমত। তাঁহাদের এতদ্বিষয়ক যুক্তি সমূহও একই প্রকারের।

সুতরাং, পুনরুক্তি ভয়ে এস্থানে তাহা বিবৃত হইল না। এতদুভয়ের যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে তাহা ইতি পূর্ব্বে পাদটীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে। চ্যাণ্ডিকান ও ধূমঘাট অভিন্ন, শ্রীযুক্ত নিখিল বাবু বেভারিজ সাহেবের এই মতের প্রতিবাদ করিয়া এতদ্বিষয়ে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নে আমরা তদীয় 'প্রতাপাদিত্য' গ্রন্থ হইতে ( ১৩৫—১৪৫ পৃঃ ) তাঁহার মত উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীযুক্ত নিখিল বাবু লিখিয়াছেন ঃ—"শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেব মহোদয় চ্যাণ্ডিকান যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাটের সহিত অভিন্ন তাহা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। * * * আমরা কিন্তু তাঁহার সহিত একমত নহি। আমরা তাঁহার মতের সমালোচনা করিয়া পরে আমাদের নির্দ্দিষ্ট চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ ধূমঘাট কোথায় তাহা বেভারিজ সাহেব সুস্পষ্টরূপে অবগত নহেন। যশোর ও ধূমঘাট যে পরস্পর সংলগ্ন এতৎ সম্বন্ধে বেভারিজ সাহেব কোনরূপ প্রমাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। রামরাম বসু মহাশয় বিশদরূপে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ধূমঘাট যশোর পুরীর দক্ষিণ পশ্চিমভাগে এবং ধূম ঘাটের পুরী নির্ম্মিত হইলে তিনি তাহাকে 'যশোহরপুরী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। * ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে যে যমুনা ও ইচ্ছামতীর মিলন স্থলে ধূম্রঘট্ট পত্তন নির্ম্মিত হয়, † এবং সেই মিলন স্থলে যে যশোর নগরও অবস্থিত ছিল অদ্যাপি তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। বর্ত্তমান সময়ে যশোর ও ধূমঘাট উভয় নামেরই স্থান দৃষ্ট হয়, এই উভয় স্থানই ঈশ্বরীপুরের সংলগ্ন। ঈশ্বরীপুরেই যশোরেশ্বরী অবস্থিত আছেন, এবং প্রতাপাদিত্য যে যশোরেশ্বরীর নিকট আপনার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যশোর ও ধূমঘাট পরস্পর সংলগ্ন হওয়ায়, কার্ভালোর হত্যার সংবাদ যশোর হইতে ধূমঘাটে পঁহুছিতে বিলম্ব হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং চ্যাণ্ডিকান যে ধূমঘাট হইতে স্বতন্ত্র

* রামরাম বসুর মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

† "যশোর দেশ বিষয়ে যমুনেচ্ছা প্রসঙ্গমে।
ধূম্রঘট্ট পত্তনেচ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।"—ভবিষ্যপুরাণ।

তাহা স্বীকার করিতে হইবে; এবং ধূমঘাট ও যশোর যে একই নগর তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিক্রমাদিত্য ও প্রতাপাদিত্যের সময় তাঁহাদিগের রাজ্য যশোর রাজ্য নামে অভিহিত হইত। তাহার চাঁদ খাঁ নাম কদাচ শুনা যায় না। দিগ্বিজয় প্রকাশ ও ভবিষ্যপুরাণে তাহাকে যশোর দেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং কোন কালে যে তাহার চাঁদ খাঁ নাম ছিল, তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না, এবং চাঁদখাঁর সহিত চ্যাণ্ডিকানের সামান্য উচ্চারণ সাদৃশ্য ব্যতীত অভিন্নতার আর যে কোন প্রমাণ আছে, তাহাও বুঝা যায় না। এরূপস্থলে ধূমঘাট বা চাঁদখাঁকে চ্যাণ্ডিকান বলা যাইতে পারে না। তদ্ভিন্ন চ্যাণ্ডিকানের অবস্থিতির সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। এক্ষণে চ্যাণ্ডিকান কোথায় তাহাই আলোচিত হইতেছে। আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে এরূপ স্থির হয় যে, সাগর দ্বীপকে তাৎকালিক ইউরোপীয়গণ চ্যাণ্ডিকান নামে অভিহিত করিতেন। তৎসম্বন্ধে প্রথম প্রমাণ এই যে সার টমাস রোর মানচিত্রে চ্যাণ্ডিকানকে একটী দ্বীপরূপে অঙ্কিত ও লিখিত দেখা যায়, এবং তাহাকে গঙ্গার মুখে ও এঞ্জিলি বা হিজলীর নিকট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বেভারিজ সাহেব কোন মানচিত্রে চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ দেখেন নাই বলিয়া লিখিয়াছেন। † কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমরা সার টমাসরোর মানচিত্র তাহার উল্লেখ পাইয়াছি। সার টমাস রোর মানচিত্রে তাঁহার সহচর বেসিন কর্ত্তৃক অঙ্কিত হয়। এতদ্ভিন্ন সমুয়েল পার্শা চ্যাণ্ডিকানকে গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং গঙ্গার জলে কুম্ভীর ও স্থলে ব্যাঘ্রের কথাও লিখিতে বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং হিজলীর নিকট গঙ্গার মোহনাস্থিত

---

* "উপবঙ্গে যশোরাদি দেশাঃ কানন সংযুতাঃ—দিগ্বিজয় প্রকাশ।

"যশোর দেশ বিষয়ে"—ভবিষ্যপুরাণ।

§ হেজেসের উপরোক্ত উক্তিই তাহার প্রমাণ।

† "Chandeican does not appear to be marked on any of the old maps."

‡ "There is in Ganges a place called Ganges gauga sagar that is entire of the Sea—Beveridge,"—Parcha 1683.

"Abont 40 years since when Ye Island called Gange Sugar"—Hodges Diary.

দ্বীপ সাগর দ্বীপ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান সাগর দ্বীপের পূর্ব্বে কি নাম ছিল তাহা অবগত হওয়া যায় না। যেখানে সমুদ্রের সহিত গঙ্গার মিলন হইয়াছে তাহাকে গঙ্গাসাগর কহে। পূর্ব্বেও তাহা গঙ্গাসাগর নামে অভিহিত হইত। সেই জন্য কেহ কেহ সাগর দ্বীপকে পূর্ব্বে গঙ্গা সাগর বলিয়া উল্লেখও করিয়াছেন। † যেখানে গঙ্গা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থান চিরকাল গঙ্গাসাগর নামে প্রসিদ্ধ। পদ্মপুরাণ প্রভৃতি হইতে তাহাকেই গঙ্গাসাগর বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এক্ষণে যাহাকে সাগর দ্বীপ কহে, সেই সমস্ত দ্বীপকে পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর দ্বীপ বলত কিনা জানা যায় না, এবং তাহার তাৎকালিক অবস্থান আধুনিক অবস্থান হইতে যে কিছু বিভিন্ন ছিল তাহার অনুমান হইয়া থাকে। তাহার সাগরদ্বীপ নাম করণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে হইয়াছিল ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। § ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে

তাহার কি নাম ছিল, তাহা সুস্পষ্টরূপে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু পর্ত্তুগীজগণ তাহাকে চ্যাণ্ডিকান নামেই অভিহিত করিতেন। চ্যাণ্ডিকান যে সাগর দ্বীপ, তাহার আর একটী প্রমাণও আছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, যে চ্যাণ্ডিকানাধিপতিই প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্যকে প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাগরদ্বীপের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামরাম বসু মহাশয়ের গ্রন্থের উপরিভাগে তাহাই লিখিত ছিল। আমরা কিন্তু তাঁহার রচিত প্রতাপাদিত্য চরিত্রে যে কয়খানি পাইয়াছি, তাহার সদর পৃষ্ঠা নাই। সে কয়খানিই বাঁধান। কিন্তু ১৮৫০ খৃঃ অব্দে কলিকাতা রিভিউতে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র নামক প্রবন্ধে উক্ত গ্রন্থকে 'রাজা প্রতপাদিত্যের বা সাগর দ্বীপের শেষ রাজার চরিত্র' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। * হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার তাহাকে নব্য বাঙ্গলায় রূপান্তরিত করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার ও সদর পৃষ্ঠার ইংরেজিতে "রাজা প্রতাপাদিত্য বা সাগর দ্বীপের শেষ রাজার বিবরণ" †

---

* "The life of Raja Pratapaditya "the last King of Saugar Island."

† "The History of Raja Pratapaditya, "the last king of Saugar Island.

বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে রেভারেণ্ড লং সাহেব তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার মূল গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিতকে সাগরদ্বীপের শেষ রাজার জীবনচরিত বলিয়া লিখিত ছিল। ‡ সুতরাং রামরাম বসু মহাশয়ের গ্রন্থে ইংরেজিতে প্রতাপাদিত্যকে যে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত হওয়ায় তাৎকালিক ইংরেজ পণ্ডিতেরা প্রতাপাদিত্যকে সাগরদ্বীপের রাজা বলিয়াই জানিতেন, এবং তাহার নাম পূর্ব্বে যে চ্যাণ্ডিকান, ছিল তাহাও সম্ভবতঃ তাঁহারা বিদিত ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'Ancient Monuments in Bengal' নামক গ্রন্থেও প্রতাপাদিত্যকে 'সাগরদ্বীপের শেষ রাজা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। § সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হেজস সাগরদ্বীপের রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন * এবং সেই রাজা যে প্রতাপাদিত্য তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই সুতরাং চ্যাণ্ডিকান দ্বীপের অবস্থান সাগরদ্বীপের

---

‡ "He (Long) had published 16 years ago, in Bengali the life of Raja Pratapditya called in the original "the last king of Saugar island." ( মূল ২৬২ পৃঃ )

§ "Baraduari—* * * He is said to have been erected by Raja Pratap Aditya the last king of Sagar Island."

"The Bara Umra Car—After the Raja of Sagar dethroned &c, Ancient Monumets in Bengalee.

"James Price assured me that about 40 years since, when ye Island called Ganga Sagar was inhabited, ye Raja of ye island gahteed yearly rent out of it to the amount of 26 Lacks of Rupees, and that ye saguel Raja had a country belonging to his Government extending from the River of Ramgopala to the great River that comes from Rajamaul, which brought him in yearly 45 Lacks of Rupees. This country affords great store of large timber to build ships.—Hedges diary 1683. প্রাইসকে আরও ৪০ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলা উচিত ছিল। কারণ প্রতাপাদিত্যই সাগরদ্বীপের শেষ রাজা।

অবস্থানের সহিত ঐক্য হওয়ায়, এবং চাণ্ডিকানাধিপতি ও সাগর-দ্বীপাধিপতি প্রতাপাদিত্য হওয়ায়, চাণ্ডিকান যে সাগর দ্বীপ, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। যশোর হইতে সাগর দূরে অবস্থিত হওয়ায় কার্ভালোর মৃত্যু সংবাদ তথায় পৌছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যে সময়ের মধ্যে সে সংবাদ যশোর হইতে সাগরে পঁহুছায়, উভয়ের দূরত্বানুসারে বর্তমান সময়ে তাহা অসম্ভব মনে হইতে পারে; কিন্তু সে সময়ে দ্রুত জলযানযোগে সর্ব্বদা যেরূপ গতায়াত হইত. এবং কার্ভালোর জাহাজ ও সম্পত্তি প্রভৃতি চাণ্ডিকান বা সাগরে থাকায়, প্রতাপাদিত্যের আদেশে সে সমস্ত করায়ত্ত করার প্রয়োজনে, আরও শীঘ্র তথায় সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। সুতরাং পাদ্রীগণের বর্ণনানুসারে যশোর হইতে চাণ্ডিকানের দূরত্বে তাহাকে সাগর বলিয়াই প্রতীত হইতেছে। ইউরোপীয়গণ সাগরকে চাণ্ডিকান বলিতেন বলিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজ্যও চাণ্ডিকান নামে অভিহিত হইত। পরবর্ত্তীকালে কেহ কেহ সপ্তগ্রাম প্রদেশকেও চাণ্ডিকান বলিয়াছেন।* সপ্তগ্রাম প্রদেশ বা সরকার সাতগাঁর অধিকাংশই প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল। ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগস্থ সরকার সাতগাঁয়ের সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকৃত ছিল। তবে চাণ্ডিকান নামের সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে তাহা আমরা অবগত নহি। উহা কোন দেশীয় নাম হইতে উৎপন্ন কি পর্টুগীজের. উহার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা যেমন রাখিয়াং হইতে আরাকান ও মায়াপুর হইতে পাল মাইয়া করিয়াছেন, সেইরূপ, চাঁদ-খাঁ বা চাণ্ডিকা হইতে চাণ্ডিকান করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর অপর নাম যেমন ঈশ্বরীপুর ছিল, তেমনি তাহার অন্যতম প্রধান আবাসস্থান সাগরের চণ্ডিকা নাম ছিল কি না, তাহাও বিবেচ্য। অথবা পর্টুগীজেরা যেমন গঙ্গাকে Chaberis বলিতেন, সেইরূপ গঙ্গাসাগরের যে চাণ্ডিকান নামকরণ করিয়াছিলেন ইহাও বলা যাইতে

---

* "LA province on se tronne le port d I' Quest est name Satigam, an cienne Kandecan. Elle renferme Satigam, Hugli Schandernagar, Calcutta De, Sitwess sar te petit Gange le Bágrati."—TEANBERNOU-ILLL—Description Historique, &c. Vol. II. Part 2. P, 408.

পারে। ফলতঃ সে বিষয়ে আমরা কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিলাম না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সাগরদ্বীপে প্রতাপাদিত্যের অন্যতম আবাসস্থান থাকিলে, এক্ষণে তাহাতে কোনই চিহ্ন দেখা যায় না কেন? তদুত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে জলপ্লাবনে তাহার অধিবাসিগণের বাসস্থানের চিহ্ন বিধৌত হইয়া গিয়াছে। ইহা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাহার পূর্ব্ব অধিবাসিগণের বাসচিহ্ন যে মধ্যে মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও তাহা বাসের উপযোগী ছিল। এজন্য ইংরেজেরা তথায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণের ইচ্ছা করিয়াছিলেন।* সে সময়েও তথায় কতকগুলি মন্দির অবস্থিত ছিল।† ফলতঃ সাগরদ্বীপে পূর্ব্বে লোকজনের আবাসস্থান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতাপাদিত্য ইহাকে নৌ-বাহিনীর প্রধানস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা তাঁহার রাজধানী যশোর অপেক্ষা ইউরোপীয়গণের নিকট সুপরিচিত ছিল। এইজন্য তাঁহারা তাঁহার রাজ্যকে চাণ্ডিকান ও তাঁহাকে চাণ্ডিকানাধিপতি বলিতেন। বিশেষতঃ সাগর তাঁহাদের পক্ষে সুগম হওয়ায় তথায় সর্ব্বদা তাঁহাদের গতায়াত ছিল। প্রতাপাদিত্যও অনেক সময়ে তথায় অবস্থান করিতেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

---

* "Company's affairs will never be better, out always grow worse and worse with continual patching, till they resolve to quarrel with these people. and build a Fort on ye Island Sagar at the mouth of this river."—Hedge's Diary.

† "Do went in our Badgerous to see ye Pagodas at Sagar."—Hadge's.

# ষড়যন্ত্র।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে সুবোধ দক্ষিণপাড়ার সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করিবে না। সেই দিন মহিলা মহাসভায় সকলে সরোজিনীকে ধরিয়া বসিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। গ্রামে নানান্ কথা উঠিয়া, ক্রমশঃ থামিয়া গেল।

পূর্ব্বদিনের কথা মত সরোজিনী অপরাহ্নে ঝিলের ধারে চলিলেন, চারি পাঁচজন স্ত্রীলোক তাহার সঙ্গে চলিলেন, সরোজিনী দেখিলেন যে, নবাগতা পরমা সুন্দরীর মত রূপ সচরাচর দেখা যায় না; তিনি আরও দেখিলেন যে, সুবোধের পার্শ্বচর গুলি তাঁহার সহিত পুরাতন নীল কুঠির উদ্যানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহা দেখিয়া সরোজিনীর বিস্ময়ের মাত্রা চরমে উঠিল। সুন্দরী, উর্ব্বশী কি তিলোত্তমা,তাহার মীমাংসা আর হইল না; নারী-সমাজে এমন কথার শেষ মীমাংসা কখন হয় না হইবেও না। সরোজিনী চিন্তা করিতে-করিতে বাড়ী ফিরিলেন।

অন্দরের উঠানের এক কোণে একখানা ভিজা কাগজ পড়িয়াছিল, সে খানা আগুনের মত জ্বলিতেছিল। সরোজিনী সেখানা কুড়াইয়া লইলেন। সেখানি একখানা ছবি, নীল কুঠির সেই সুন্দরীর ছবি। সুবোধ বাড়ীতে ফটোগ্রাফ্ তুলিত, কাগজগুলি সমস্তই ভিজা ফটোগ্রাফের। সরোজিনীর আর কোনও কথা বুঝিতে বাকী রহিল না। এই জন্যই সুবোধ দক্ষিণ পাড়ায় বিবাহ করিতে চাহে নাই। উপযুক্ত কারণ বটে!

তারপর দিন হইতে সরোজিনী সুবোধের সম্বন্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি সকলের আগে স্বামীকে দিয়া বলাইয়া ভাসুরের অনুমতি লইলেন, এবং তাহার পর তারিণী পিসীর আশ্রয় লইলেন। তারিণী পিসী শরণাগত রক্ষা করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিলেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না বটে, কিন্তু এই ঘটনার দুই এক দিন পরে গ্রাম্য মহিলাগণ ক্রমশঃ নীল কুঠিতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় দিন অপরিচিতা সুন্দরীর পরিচয় গ্রামে কাহারও জানিতে বাকী রহিলনা।

একজন বলিলেন "ওমা বাঙ্গালী বুঝি, আমি ভেবেছিলাম য়িহুদী ?'

"আমর্ য়িহুদী কেন হতে যাবে, ওরা যে পিরিলী ?"

তুইত ভারি জানিস পিরিলিরা যে মোছলমান, ঘাগড়া পরে আর ঘেরা টোপ্ মাথায় দেয়।"

সরোজিনী পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি এই কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, হাঁগা তুমিত ঠিক পিরিলীদের মেয়ে চিনেছ দেখছি ? এমন পিরিলী কোথায় দেখলে ?

তৃতীয়া কহিলেন—"কেন কল্‌কাতায়।"

"কোথায়"।

মুরগীহাটার মোড়ে মস্ত মস্ত মাগী গুলো মুখে জাল দেওয়া লেপের ওয়ার গায় দিয়ে যায়, তারাইত পিরিলী ? সরোজিনী হাসিয়া বলিলেন ঠিক! এই সময়ে ভট্টাচার্য্য গৃহিণী ও তারিণী পিসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তর্ক থামিয়া গেল। পিসী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের তর্ক ? সরোজিনী বুঝাইয়া দিলেন। তখন পিসী বলিলেন্, "অমন কথাটি মুখে এনোনা মস্ত কুলীন, বেগের গাঙ্গুলী, ওদের পাদোক জল খাইলে অনেক বামুন কুলীন হয়ে যায়। ( বলা বাহুল্য পিসী স্বয়ং গাঙ্গুলীর কন্যা ) বাপের মস্ত বড় চাকরি, সদরওয়ালা, হাজার টাকা মাইনে, রায়বাহাদুর খেতাব। ঐ একটি মেয়ে পরের ঘরে যাবে বলে বাপ বিয়ে দেয় নাই। কর্ত্তার বহুমূত্রের ব্যায়ারাম আছে কিনা তাই ছুটি নিয়ে হাওয়া খেতে এসেছেন।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ পিসী তুমি এত খবর পেলে কি করে" ? পিসী একেবারে চটিয়া আগুন। আমর্ আমার যে আপনার ভাই। "আমার ঠাকুর দাদার ঠাকুর দাদা আর দাদার ঠাকুর দাদা যে খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই"।

সরোজিনী মনে মনে হাসিলেন পিসীর স্নেহময় ভ্রাতা অনেক দিন পূর্ব্বে নীল কুঠিতে আসিয়াছেন এবং এত দিন ভগিনীকে স্মরণ করেন নাই।

একথা কেহই জিজ্ঞাসা করিলেন না। গ্রামবাসীদের সঙ্গে ক্রমে নবাগতদের আলাপ হইয়া গেল। মেয়েটির নাম প্রতিমা দেখিতেও ঠিক দেবী প্রতিমার মত। প্রতিমা সুশিক্ষিতা তাহাকে একদিন ইংরাজী বুই

পল্লিতে দেখিয়া গ্রামের ছোট ছোট বউ—ঝিরা ভয়ে তাহার সহিত বেশী কথা কহিত না। কেবল সরোজিনী তাহার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। সেই জন্যই প্রতিমা তাঁহার বড়ই অনুগত হইয়াছিল।

একদিন সরোজিনী প্রতিমার কাছ হইতে ফিরিয়া সুবোধের ঘরে ঢুকিলেন, সুবোধ তখনও শীকার করিয়া ফেরে নাই। সরোজিনী সমস্ত আলমারির দেরাজ খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে একটি ছোট দেরাজের এক কোণে রেশমী রুমালের ভাঁজের মধ্যে সরোজিনী তাহার অভিলষিত বস্তু খুঁজিয়া পাইলেন। সেখানি একখানা ছোট হাতির দাঁতের ফ্রেম তাহাতে একটি সুন্দরী যুবতীর ফটোগ্রাফ।

ছবিখানি ফুলের মালা জড়ানো এবং রঙ্গীন রেশমী রুমালে বাঁধা সেখানি প্রতিমার। সরোজিনী ছবির সহিত আর একটি জিনিষ দেখিতে পাইলেন, সেখানি একখানা ছোট খাতা। সরোজিনী ফ্রেম হইতে ছবিখানি খুলিয়া লইয়া ফ্রেমখানি আবার মালা জড়াইয়া রুমালে মুড়িয়া রাখিয়া দিলেন, এবং খাতাখানি বাহির করিয়া লইলেন। তাহার পরে সমস্ত আলমারী দেরাজ বন্ধ করিয়া নীচে চলিয়া গেলেন।

খাতাখানি ছোট লাইন টানা, তার অর্দ্ধেকের বেশী ছোট ছোট করিয়া লেখা বড় বড় চিঠি। সরোজিনী ঘরে দুয়ার দিয়া চিঠিগুলি আদ্যোপান্ত পড়িলেন, এবং পরে খাতা খানিকে সযত্নে একটা কাগজের বাক্সে পুরিয়া লোহার সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। ইদানীং ডলির অভ্যাস বড়ই খারাপ হইয়াছিল। সে ছাড়া পাইলেই পালাইত এবং সুবোধ ভিন্ন বাড়ীর লোকে আর কেহ তাহাকে ধরিয়া আনিতে পারিত না।

সে এখন আর বাড়ীতে খাইতে চাহিত না। ডলি মাছ নহিলে খাইতে পারিত না। সমস্ত মাছের মুড়া তাহারই প্রাপ্য ছিল, কিন্তু মেনকা পিসী এই সকল অন্যায় আব্দার সহ্য করিতে পারিতেন না। যে দিন সুবোধ তাহাকে নিজে হাতে করিয়া না খাওয়াইত সে দিন তাহার খাওয়াই হইতনা অথচ ডলি মোটা হইতেছিল। সে কোথায় যাইত কি খাইত এবং কেন মোটা হইত তাহা কেবল সরোজিনীও সুবোধ জানিতেন।

একদিন সরোজিনী ডলিকে ধরিয়া তাহার গলায় একটা কাগজ বাঁধিয়া

দিলেন এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রান্নাঘরে পাশে বেড়ার ফুট দিয়া পালাইল। ইহার অর্দ্ধ দণ্ড পরে নীলকুঠির ফটকের পাশে বসিয়া প্রতিমা ডলির গলায় একটা কাগজ দেখিতে পাইল। ডলি তাহার নিকটে আসিলে সে কলার হইতে কাগজ খানা খুলিয়া লইয়া দেখিল। সেখানা একখানা ফটোগ্রাফ্। লজ্জায় প্রতিমার সুন্দর মুখ খানি রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চরলক্ষ্মীপুরের চারি আনা অংশের শোক সুরেশচন্দ্র কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না। তিনি দুই একদিন অন্তর নামাবলী খানি গায়ে দিয়া বাহিরে আসিতেন এবং রামলাল ঘটকের সহিত কাশীবাসের পরামর্শ করিতেন। সুধীরচন্দ্র নির্ব্বিকার, তবে পত্নীর দীর্ঘকাল অদর্শন মাঝে মাঝে তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিত। প্রতিমার সহিত আলাপ হইয়া অবধি সরোজিনী দিনের বেলায় বাড়ীতে থাকিতে পারিতেন না। এইজন্য সুধীর চন্দ্র মাঝে মাঝে অনুযোগ দিতেন। সুবোধ দুইবার আহারের সময় আসিত। অন্য সময়ে সে যে কোথায় থাকিত তাহা কেহ বলিতে পারিত না।

নরেশ তাহার বাল্যবন্ধু, কিন্তু সে নিত্য আসিয়া মাসে একটি দিন সাক্ষাৎ পাইত কি না সন্দেহ। সুবোধ সকালে খাইয়া বন্দুক লইয়া শীকারে বাহির হইত, আর রাত্রি নয়টায় দশটায় ফিরিত, কিন্তু এক মাসের মধ্যে কেহ তাহাকে একটা পাখী মারিয়া আনিতেও দেখে নাই।

একদিন দ্বিপ্রহরে তারিণী পিসী স্বয়ং সুরেশচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন। সুরেশচন্দ্র তখন বড় বধূর নিকট পরাজিত হইয়া সদরে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পিসী আসিয়াছেন শুনিয়া বড় বধূর মেজাজ গরম হইল, সুরেশচন্দ্র রক্ষা পাইলেন। পিসী সুবোধের বিবাহ সম্বন্ধ লইয়া আসিয়াছিলেন, সে কথা শুনিয়াই সুরেশচন্দ্র মুখ বাঁকাইলেন, এবং জানাইলেন যে তিনি আর ওকথায় থাকিবেননা, শীঘ্রই কাশীবাস করিবেন। একবার তাহাকে বড়ই অপমান হইতে হইয়াছে। দক্ষিণপাড়ার সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ভদ্রলোক, কুলীন, মস্ত জমিদার, তাহাকে কথা দিয়া সুরেশচন্দ্র কথা রাখিতে পারেন নাই। দেশে আর তাহার মুখ দেখাইবার উপায়

নাই। তিনি আর এ সকল কথায় থাকিবেন না। সুবোধ একালের ছেলে তার যাহা ইচ্ছা হয় করুক। পিসী কোন মতেই সুরেশচন্দ্রকে নূতন সম্বন্ধের কথা শুনাইতে পারিলেন না। চরলক্ষ্মীপুরের শোক তখন সুরেশের বুকে শক্তিশেলের মত বিঁধিয়া আছে। অবশেষে পিসী রাগিয়া বলিলেন, "তুমি থাকিতে কি সুবোধ নিজের সম্বন্ধ নিজে করিবে ?" সুরেশচন্দ্র বলিলেন "হাঁ তানইলে সুবোধের বিয়ে হওয়া ভার।

"তবে তাই হবে গো"—পিসী এই বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। তখন ঝিলে বর্ষার নূতন জল আসিয়া দাম শেওলা সমস্ত ঢাকা গিয়াছে, ঝিল একেবারে কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেইদিন অপরাহ্নে নীলকুঠির ঘাটে একটা দুর্ঘটনা হইয়া গেল; প্রতিমা বিকাল বেলায় ঝিলে গা ধুইতে নামিয়াছিল, হঠাৎ সাঁতার দিতে দিতে ডুবিয়া গেল। অন্যান্য মেয়েরা চেঁচাইয়া উঠিল, কেহ কেহ বলিল কুমির আসিয়াছে. কিন্তু কুমিরের কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না। সে সময়ে যাহারা ঘাটে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের কাহারও এমন সাহস হইল না, যে জলে নামিয়া প্রতিমার সন্ধান করে। তাহারা জল হইতে দূরে দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতে লাগিল এবং সংবাদ দিবার জন্য একজন কুঠী-বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল।

সেই সময়ে সুবোধ বন্দুক লইয়া ডলির সঙ্গে কোথা হইতে আসিতেছিল, সে গোলমাল শুনিয়া কুঠীর ঘাটের সম্মুখে আসিল, এবং শুনিতে পাইল যে প্রতিমা জলে ডুবিয়া গিয়াছে। সুবোধ তৎক্ষণাৎ বন্দুক ফেলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গে ডলিও ঝাঁপ দিয়া পড়িল, পাঁচ সাত মিনিট পরে সুবোধ যখন উপরে উঠিল তখনও সে প্রতিমার সন্ধান পায় নাই। সে দেখিল যে ডলি ঠিক ঝিলের মাঝখানে ডুবিতেছে আর উঠিতেছে। তখন সে সেইখানে আসিয়া প্রতিমার দেহ তুলিয়া ফেলিল।

ইহার মধ্যে অনেক লোক ঝিলের দুই পারে আসিয়া জমিয়াছিল. কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই জলে নামিতে সাহস করে নাই। সুবোধ যখন প্রতিমাকে কাঁধে করিয়া পারে আনিল, তখন সকলে মিলিয়া তাহাদের জল হইতে তুলিয়া লইল। প্রতিমার দেহে তখনও প্রাণ আছে, শুনিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতা অনেকক্ষণ পারে বসিয়া পড়িলেন। ডাক্তার আনিতে লোক গেল,

গ্রামময় সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল। গ্রামের অনেক লোক নীল কুঠিতে আসিয়া পৌছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশচন্দ্র ও সুধীরচন্দ্র আসিলেন। তখন সুবোধ আর্দ্রবস্ত্রে ঘাটে বসিয়া প্রতিমার মুখে ফু দিয়া নিশ্বাস বহাইবার চেষ্টা করিতেছে।

সন্ধ্যার পরে প্রতিমার চেতনা ফিরিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর আসিল। সে রাত্রে সুবোধ বা ডলি গৃহে ফিরিল না। দশ দিনের মধ্যে প্রতিমার চৈতন্য হইল না, সে দশ দিন সুবোধ নীল কুঠিতে রহিয়া গেল।

সরোজিনী সকালে আসিয়া সমস্ত দিন বসিয়া থাকিতেন। আবার সন্ধ্যা বেলা গৃহে ফিরিতেন। তারিণী পিসী প্রভৃতি মহিলারা রোজ আসিতেন। গ্রামের অন্যান্য ভদ্রলোকও সংবাদ লইতে আসিতেন। এই উপলক্ষে তাহাদের সহিত প্রতিমার পিতার আলাপ হইয়া গেল। কলিকাতার ডাক্তার যে দিন প্রতিমাকে রোগ মুক্ত করিয়া দিয়া চলিয়া গেল সেই দিন বিকাল বেলায় সরোজিনী প্রতিমার বিছানায় বসিয়া কাপড়ের ভিতর হইতে একখানি ছোট খাতা বাহির করিলেন।

খাতা দেখিয়া সুবোধ চমকাইয়া উঠিল। সরোজিনী বলিলেন, "দেখ ভাই, এই খাতাখানি একদিন একটা আলমারিতে দেখ্‌তে পেয়েছিলুম, একটু পড়ব শোন।"

"তুমি দেবতা তোমাকে যে দিন প্রথম দেখিয়াছি সেই দিনই তাহা বুঝিয়াছি।

সুবোধ হঠাৎ দ্রুতপদে পলায়ন করিল। সরোজিনী একটু হাসিয়া পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করলেন তুমি কামনার বস্তু নহ, আরাধ্য দেবতা। সেই জন্য নিত্য প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তোমাকে দূর হইতে দেখিয়া আসি।

হঠাৎ খাতাখানি সরোজিনীর হাত হইতে সরিয়া প্রতিমার হাতের মারফতে বালিশের তলায় লুকাইল। প্রতিমা মুখ ঢাকিল, সরোজিনী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সুবোধ সেই দিন বাড়ী ফিরিলেন। প্রতিমার পিতা বার বার ডাকিতে পাঠাইয়াও তাহাকে আনিতে পারিলেন না।

সেই দিন বৈকালে সুরেশচন্দ্র যখন অন্দর হইতে বাহিরে আসিতেছেন

তখন অন্দরের দুয়ারে তারিণী পিসীকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। পিসী আসিয়া বলিলেন, "অম্বরেশ শনিবার দিন সন্ধ্যাবেলায় নীলকুঠিতে দাদার মেয়ের বিয়ে, তোমাদের বর পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করে গেলুম। কন্তে পক্ষ থেকে দাদা নেমন্তন্ন করে যাবেন। সকলে যেয়ো।

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন বেশ, পাত্র কোথাকার?

"এই গাঁয়েরই ছেলে"।

"এই গাঁয়ের? কে পিসি"?

"সুবোধ"

সুরেশচন্দ্রের মুখের হাসি শুকাইয়া গেল, তাহা পিসির নজর এড়াইল না। তিনি বলিলেন, "আর শুনেছ"? দাদার ঐ একটি মেয়ে কিনা? তিনি দক্ষিণপাড়ার সাতকড়ি মুখুজ্জের কাছ থেকে চর-লক্ষ্মীপুরের অংশটা কিনে মেয়েকে যৌতুক দিবেন।

তাহার পরে গ্রামের কেহ সুরেশচন্দ্রের নামাবলী দেখে নাই।

শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী।

—o০o—

# ব্রহ্মপুত্র-স্নান।

অতুল লৌহিত্য দেব! মহত্ব তোমার!
অশোক অষ্টমী সনে—
পুনর্ব্বসু সম্মিলনে—
তীর্থরাজ! নীর তব সর্ব্ব তীর্থ-সার
মাতৃবধে যুক্ত-কর
কুঠার খলিত কর
জামদগ্নি-চিত্রে ছবি বিচিত্র তোমার
অতুল মহিমা তব কি বলিব আর?

অতুল অমোঘা-সুত মহত্ত্ব-আধার
নাহি কুটিলতা লেশ
নর নারী সমাবেশ
অবরোধ ছিন্ন-পাশ তোমার আগার
জ্বাল মনে পুণ্য-বাতি
যেমতি কবিত্ব-ভাতি—
প্রদীপ্ত বাল্মীকি-মনে হেরি ক্রৌঞ্চাকার
পবিত্র এ বঙ্গভূমি প্রসাদে তোমার !

অতুল মহিমানদ ! সলিলে তোমার।
ধনী দীন জ্ঞানী জন
করে সম আলিঙ্গন
সম দরশনে হর কলুষ-আঁধার
দেও প্রভো এই বর
সম্বৎসর কলেবর—
পাপের দহনে যেন না দহে আবার
এশুধু কামনা দেব ! চরণে তোমার !

শ্রীরসিকচন্দ্র রায় মহাশয়।

---

# ৺কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা একটি সাধু-হৃদয় দীনদরিদ্র মহাশয় ব্যক্তির পরিচয় সাধারণ্যে উপস্থিত করিতেছি। তিনি আজীবন দরিদ্র পাঠশালার গুরুমহাশয়। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবিতাবস্থায় দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিয়া জীবনপাত করিয়াছেন। দারিদ্র্য, নিত্য অভাব তাঁহার মনুষ্যত্ব গুণরাশি হরণ করিতে পারে নাই। সেই সৌম্য, শান্ত, উদার, সরল,

অমায়িক, চিরহাস্যোজ্জ্বল কর্ম্মী, বাল্য শিক্ষকের কথা যখনই মনে পড়ে তখনই বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু বাহির হয়। এই সাধুহৃদয় গুরুমহাশয়ের নাম ৺কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়। বিক্রমপুরের অন্তর্গত কোলাগ্রামে ১২৭৮ সনের ১লা কার্ত্তিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺রাধাকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। নয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতৃহীন হইয়া আমাদের দরিদ্র কিশোরী অকূল শোক, দুঃখসাগরে নিপতিত হইলেন। দরিদ্রের সন্তান কিশোরী, দরিদ্রানুযায়ী গ্রাম্য পাঠশালা হইতে ছাত্রবৃত্তি ও মধ্যবাংলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা 'সার্ভে স্কুলে' প্রবিষ্ট হন। কিন্তু দারুণ অভাবের তাড়নায় অনতিদীর্ঘ দুই বৎসর কাল তথায় অধ্যয়ন করিয়া, শেষ পরীক্ষার পূর্ব্বেই পাঠ অসমাপ্ত রাখিতে বাধ্য হন এবং গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। পরে বেলতলী মধ্যবাংলা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। উক্ত বিদ্যালয় কালক্রমে ১৯০১ খ্রীঃ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইলে তথায় তৃতীয় শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইয়া ৮ বৎসর কাল কি ছাত্র, কি শিক্ষক, সকলের নিকটই ভক্তি শ্রদ্ধা পাইয়া সুখ্যাতি ও যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। ১৩১৬ সনের ৪ঠা বৈশাখ তারিখে স্ত্রী পুত্র, বৃদ্ধা মাতা ও আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন।

ছাত্রগণ তাঁহাকে শিক্ষকের ন্যায় ভয় করিত না পরন্তু অভিভাবকের ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তিনি বলিতেন "বেত্রাঘাতে ছাত্র বশীভূত করা যায় না, শিক্ষাদান ত দূরের কথা।" তিনি তাই ছাত্রদিগের একাধারে শিক্ষক, অভিভাবক, বন্ধু ছিলেন। মধুর বাক্যে, মৃদু ভর্ৎসনায় ছাত্রকে শিক্ষা দিতেন। অধ্যাপনার ব্যবস্থা যেরূপ সুষ্ঠু ছিল, আজকাল ত সেরূপ দেখা যায় না। শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ, তাহা কেবল তাঁহাতেই দেখিয়াছি।

তিনি বিভিন্নমুখী সদ্‌গুণ নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ শিক্ষকতায় তেমনি আলাপে, হাস্য পরিহাসে, ক্রীড়া কৌতুকে, গান বাজনায়, কোনটাতেই কম ছিলেন না। তিনি "সৌভাগ্য চন্দ্রিকা", "সুশিক্ষাসার" প্রভৃতি ২।৩খানা বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তাঁহার রচনায় অনর্থক শব্দাড়ম্বর, অলঙ্কার নাই পরন্ত সুন্দর সহজবোধ্য ভাষায় কি গদ্য, কি পদ্য লিখিতে পারিতেন। এমন অনেক সঙ্গীত, কবিতা রচনা করিয়াছেন যাহা গানের হিসাবে, কবিতার হিসাবে কম মূল্যবান নহে।

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

—•০•—

# মায়ের প্রাণ

সেই বিহানে গেছিস্ মাঠে, হাতে নিয়ে নড়ি,
অভাগীর ধন ওরে তুই আঁচল-বাঁধা কড়ি ;
সারাটী দিন রইলি তুই, মাঠে আর বনে,
বাড়ীর কথা একবারও কি পড়েনি তোর মনে।
দুপুর বেলা 'কাত্' হয়েছে মুখে পড়েনি 'পানি' ;
'ব্যান্নন্' দিয়ে গেছেরে তোর 'চাচার' ঘরের 'নানী'।
ভাত হয়েছে 'কড়্কড়া' তোর, ডাল রয়েছে 'বাসী ;
সারাটী দিন 'বাছারে' তুই রইলি উপবাসী।
আকুল হয়ে শুধাই সবায় "দুইখা' এলো ফিরে ?
বসে বসে সময় গুন্‌ছি রোদ এসেছে ফিরে।
মুখ হয়েছে রাঙ্গা তোর মাটী-ফাটা রোদে,
তুই কি বুঝ্‌বি মায়ের পরাণ কেমন হয়ে কাঁদে।

শ্রীপ্রিয়কান্ত সেন গুপ্ত।

———

# প্রসঙ্গ-কথা।

দেশের দারিদ্র্যের জন্য আমরা যত কাঁদি সে সকলের প্রতীকারের জন্য ততটা আগ্রহের সহিত অগ্রসর হই না। হইলেও কৃতকার্য্য হই না। না হইবার কতকগুলি অন্তরায় আছে। প্রথম কথা আমাদের দেশের যাঁহারা নেতা তাঁহারা দেশের অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে কেহই বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন। তারপর 'স্বদেশীর' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে যে সকল কল কারখানার উদ্ভব হইল তাহার অধিকাংশই লোপ পাইল। 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে' অনেক দুঃস্থ ব্যক্তি অনেক পতিপুত্র-হীনা বিধবাও অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালীর সেই সাধের বঙ্গলক্ষ্মী মিলের এখন কি অবস্থা তাহা সাধারণের অজ্ঞাত নহে। সাধুতা এবং পরস্পরে বিশ্বাস না থাকিলে ব্যবসা বাণিজ্য জীবিত থাকিতে পারে না। সে সাধুতার অভাবে শত শত প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের উদ্ভব ও বিলোপ হইল—সে সাধুতার অভাবে জন—সাধারণের বহু অর্থ বহু কার্য্যে কর্পূরের ন্যায় কোথায় যে উড়িয়া গেল তাহার সন্ধানও মিলিল না!

বক্তৃতা আমরা প্রতিনিয়ত শুনিতেছি। প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ সেও প্রাত্যহিক ঘটনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এ সকল দ্বারা আমরা কার্য্য ক্ষেত্রে কতটুকু উন্নতি লাভ করিতেছি? বর্ত্তমান সময়ে অন্ন-সমস্যাই প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা সমাধান কিরূপে হইতে পারে সে কথাটা আমাদের বিশেষরূপে আলোচনা করিতে হইবে। দেশের বিধবা ও দুঃস্থ পরিবারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এক গ্রামে পঞ্চাশ ঘর লোক থাকিলে তাহার অধিকাংশ দুঃস্থ পরিবার। এ সকল পরিবারের দারিদ্র্য-দুঃখ কোন সভা সমিতি বা সম্মিলনীর ধন ভাণ্ডারের অর্থ সাহায্যে দূর হইতে পারে না। যাহারা দুঃস্থ তাহাদিগকে কর্ম্মের সাহায্যে নিজ নিজ জীবনোপায়ের ব্যবস্থা করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

শিক্ষাই এ সমুদায় অভাব অভিযোগ দূরীকরণের একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায় যে ভদ্র ঘরের অল্প বয়স্কা কর্ম্মক্ষমা বিধবারা ভিক্ষায়ে উদর পূরণ করাও বরং শ্লাঘ্য মনে করে তথাপি কোনরূপ শিল্পকার্য্য

দ্বারা অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করিতে কিংবা গ্রাম্য বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে অসম্মতা। ভিক্ষা ভাল, তবু আত্ম-শক্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনকে তাহারা হেয় বা অপমানজনক মনে করেন। এই যে অন্ধ সংস্কার এই সংস্কার শিক্ষার অভাব বশতঃই বলিতে হইবে। পরের গলগ্রহ হওয়ার ন্যায় অপমানজনক আর কিছুই নাই।

তারপরে কথা হইতেছে যে যে সকল মহিলারা বা দুঃস্থ পরিবারের লোকেরা আত্মশক্তি দ্বারা জীবনোপায় নির্দ্ধারণের জন্য অগ্রসর হইবেন তাহাদিগকে আমরা এমন কি কার্য্য দ্বারা সুশিক্ষিতা করিতে পারি যাহাতে তাঁহারা ঘরে বসিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন। আমরা এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। (১) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকার্য্য (ক) ঝিনুক দ্বারা বুতাম প্রস্তুত (খ) নেকড়া দ্বারা পুতুল প্রস্তুত (গ) কাগজের দ্বারা খেলনা তৈরী এবং মুজা বুনান এবং বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য। আমার এক বন্ধু ঝিনুকের বুতামের ব্যবসা করেন, তিনি ঢাকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানের বৈষ্ণবীগণের দ্বারা এই বুতাম প্রস্তুত করাইতেছেন। পূর্ব্বে বৈষ্ণবীরা ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিত কিন্তু এখন তাহারা ঝিনুকের বুতাম প্রস্তুত কার্য্যে ব্রতিনী হইয়া আর ভিক্ষায় বাহির হয় না। যদি দুঃস্থ ভদ্রমহিলারা বুতাম প্রস্তুত করিতে শিখেন তাহা হইলে তাহাদের অর্থাগমেরও সুবিধা হয় এবং দেশেরও একটী শিল্পের প্রসার হয়।

(খ) নেকড়ার দ্বারা পুতুল প্রস্তুতও বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে—কলিকাতা অঞ্চলের অনেক দরিদ্র পরিবারের লোকেরা ঐ সকল পুতুল প্রস্তুত করে। বোধ হয় প্রত্যেক ভদ্র পরিবারেই ন্যাকড়ার তৈরী কুকুর, বিড়াল, খরগোষ ইত্যাদি দুই একটী আছে। ইহার ছাট ও রংফলান একটু কঠিন তাহা সামান্য অভ্যাসেই আয়ত্ত হইতে পারে।

(গ) কাগজের পুতুল, ফল প্রস্তুত করার পদ্ধতি অতি সুন্দর। সামান্য সামান্য ছেঁড়া কাগজ ন্যাকড়া ইত্যাদি দ্বারা যে কত সুন্দর সুন্দর কাজ হয় একটু অনুসন্ধান করিলেই তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত হইতে পারা যায়। কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া এসবুদয় পুতুল ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ভবিষ্যতে এসকল বিষয়ের আলোচনা করিব।

৭। আমরা 'অদৃষ্টের' দোষ না দিয়া নিজেরা প্রত্যেক বিষয়ে একটু উদ্যোগী ও অধিকতর মনোযোগী হইলেই কতক পরিমাণে যে অভাব অভিযোগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারি তাহা নিশ্চিত।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক। প্রত্যেক জেলার এবং মহকুমার কতকগুলি বিশিষ্ট শিল্প আছে সে সমুদয়ের জন্যই ঐ সকল স্থান বহুকাল হইতে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে। আমাদের সে সমুদয় বিলুপ্ত বা মৃতপ্রায় জীবিত শিল্প সমূহের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ঢাকা বলিতেই যেমন ঢাকার কাপড়ের কথা মনে আসে সেরূপ এক এক জেলায় একটা একটা শিল্প প্রসিদ্ধ, কোথাও লৌহদ্রব্য, কোথাও পিত্তল কাঁসার জিনিষ, কোথাও বস্ত্রশিল্প, কোথাও মাটীর জিনিষ এরূপ নানাস্থানের নানা দ্রব্যের তালিকা সংগ্রহের জন্য ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য। দেশে এখনও এমন অনেক ধনাঢ্য সঙ্গতিশালী ব্যক্তি আছেন যাহারা এ সমুদয়ের উন্নতি করে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত নহেন। আমরা বিক্রমপুর অঞ্চলের এইরূপ একটা তালিকা প্রস্তুত করিতেছি শীঘ্রই তাহা প্রকাশ করিব। শ্রেণী বিভাগে কার্য্যের শৃঙ্খলা হয়। যিনি সাহিত্য ভালবাসেন, তিনি সাহিত্যের উন্নতির জন্য খাটুন, যিনি শিল্প ভালবাসেন তিনি শিল্পের কথা চিন্তা করুন, যিনি সামাজিক উন্নতি প্রয়াসী তিনি সমাজের উন্নতির কথা ভাবুন এইরূপ কার্য্যের বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য না করিলে আমরা বাঁচিব না। আমাদের দেশ দ্বেষের দেশ, কাজেই সকলে মিলিয়া হৈ চৈ করিলে কোন কার্য্যই হইবে না। আমাদের বিশ্বাস স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এ দু'টাকে মূল করিয়াই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া ভাল।

*　　*　　*　　*

বিক্রমপুরের নানাস্থানে এবার প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে। একদিনত শিলাবৃষ্টি ও হইয়াছিল। ক্ষেতে জল জমিয়া গিয়াছে। এই বৃষ্টি হওয়ায় শস্যের পক্ষে ভালই হইয়াছে ব্যধি পীড়ার আক্রমণও হ্রাস পাইয়াছে।

*　　*　　*　　*

মুন্সীগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকীল 'বিক্রমপুরের' লেখক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘটক মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র হেমচন্দ্র ঘটক বি এল মহাশয় অকালে কাল

গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ কামিনী বাবুর এদারুণ শোকের কোন সান্ত্বনা বাণী নাই। আমরা তাঁহার এই শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। জগদীশ্বর কামিনী বাবুকে এ দারুণ শোক সহ্য করিবার শক্তি প্রদান করুন।

* * * *

আমরা অনেক সময় যাহা বলি তাহা করিতে পারি না কেন ? কথা ও কাজ এক হয় না কেন ? তাহার কারণ চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব আত্মশক্তিতে অতিরিক্ত বিশ্বাস এবং কোন কার্য্যের প্রতিই তেমন প্রাণের আকর্ষণ নাই বলিয়া। সেজন্যই দেখিতে পাই যে সাহিত্য সভা হইতে লিমিটেড কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য একই ব্যক্তি। অথচ তিনি যে মনে প্রাণে কোনটীর জন্যই খাটেন তাহা আদৌ নহে, তাহার ফলে কোনটিই দাঁড়াইতে পারে না। বড় লোকের দুর্ব্বলতা তাঁহারা 'না' বলিতে পারেন না। যিনি কাপড়ের কলের ডাইরেক্টার হইয়াছেন তাঁহাকে আবার জন কয়েক দল বাঁধিয়া চাপিয়া বসিলে চিত্র বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট করাও বিচিত্র নহে। ফলে কাপড়ের কল চিত্র বিদ্যালয় কোনটির প্রতিই তাঁহার মনোযোগ আকর্ষিত হয় না—কোনদিকের মনই তিনি রক্ষা করিতে পারেন না। এরূপ চরিত্রের দৃঢ়তা একনিষ্ঠা এবং কর্ম্মানুরাগের অভাবেই আমাদের সমুদয় কার্য্য পণ্ড হয়। আমাদের এ সকল দুর্ব্বলতার সংশোধনের জন্য বিশেষরূপ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

* * * *

—•০•—